বৃহৎ বঙ্গ

[সুপ্রাচীন কাল হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত]

দ্বিতীয় খণ্ড

রায়বাহাদুর

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ডি. লিট্. (অন্.)

কবিশেখর-প্রণীত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৯৪১

বৃহৎ বঙ্গ

দ্বিতীয় খণ্ড

বৃহৎ বঙ্গ

[সুপ্রাচীন কাল হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত]

দ্বিতীয় খণ্ড

রায় বাহাদুর

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ডি. লিট্. (অন্),

কবিশেখর-প্রণীত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩৪২

পঞ্চদশ অধ্যায়

"Uneasy rests the head that wears the Crown."

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাঠান-রাজত্ব

নদীয়া জয় করিয়া মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার যে সকল বিপদে পড়িয়াছিলেন, তবকাৎ-ই-নাসিরী-প্রণেতা মিনহাজ তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। নদীয়া-জয়ের সময়ে যে দুইজন সৈনিক মহম্মদ ইবন বক্তিয়ারের সহচর ছিলেন, মিনহাজ তাহাদেরই মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন। ইবন বক্তিয়ার নবদ্বীপ বিজয়ের পরে গৌড়ের এদিক্ সেদিক্ লুণ্ঠন করিয়া লক্ষণাবতী ও হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানের অধিবাসী মেচজাতীয় একজন নায়ককে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করেন এবং তাঁহাকে 'আলি' উপাধি দেন। আলি মেচের উপদেশে তিনি দশ সহস্র সৈন্য লইয়া তিব্বত জয়ের জন্য রওনা হন। পথে বর্দ্ধনকোট-সম্মুখে বিশালতোয়া বেগবতী নদী; এই নদীর কূল ধরিয়া তিনি দশদিনের পথ পর্য্যটন করিয়া একটা প্রকাণ্ড সেতুর সাক্ষাৎ পান। এই সেতু ২০টি পাষাণনির্ম্মিত খিলানের উপর স্থিত। ইবন বক্তিয়ার সেই সেতু পার হইয়া চলিলেন। দুইজন সেনাপতিকে সেতুরক্ষার জন্য রাখিয়া গেলেন, ক্রমাগত ১৬ দিন চলিয়া গিয়া একটি দুর্গ-রক্ষিত নগর আক্রমণ করেন, তথায় শুনিতে পান, ২৫ ক্রোশ দূরে একটি স্থানে (করমপত্তনে) ৫০,০০০ তুরুক সৈন্য বিদ্যমান আছে, তথায় বহু ব্রাহ্মণ বাস করেন এবং তথায় বৎসরে অনেক সহস্র টাঙ্গন ঘোড়া বিক্রয়ের একটা বাজার বসে। কেহ কেহ মনে করেন, উহা আধুনিক দিনাজপুর জেলার নেক-মর্দ্দনের হাট। মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার ভয় পাইয়া অগ্রসর হইলেন না—ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। খাদ্যের ভয়ানক কষ্ট হইল। শত্রুরা সমস্ত ক্ষেত নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। সৈন্যগণ ঘোড়া মারিয়া সেই মাংস খাইতে লাগিল। ইবন বক্তিয়ার কামরূপ ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন, তাঁহার রক্ষকগণ ঝগড়া করিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং শত্রুরা বেগমতী নদীর সেই বিশাল পাষাণ নির্ম্মিত সেতুর দুইটি থাম ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। তিনি নিকটবর্ত্তী এক দেবমন্দির আক্রমণ করেন। সেখানে দুই তিন হাজার মন স্বর্ণনির্ম্মিত দেবপ্রতিমা ছিল। শত্রুবেষ্টিত হইয়া তিনি ঐ মন্দিরে বন্দীর মত হইয়া রহিলেন, বহুকষ্টে তাঁহার সৈন্যগণ প্রাচীরের একদিক্ ভাঙ্গিয়া নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তীরভূমি হইতে শত্রুর শর তাহাদের ধ্বংসক্রিয়া সাধন করিতে লাগিল। মুসলমান বীর বহুকষ্টে অতি অল্পসংখ্যক পরিকর লইয়া রক্ষা পাইলেন এবং আলি মেচের সাহায্যে

মঃ ইবন বক্তিয়ার খিলিজির শেষজীবন।

দেবকোটে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন এবং ১২০৫-৬ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। কেহ কেহ বলেন মহঃ ইঃ বক্তিয়ারের অধীন নারানকোই স্থানের শাসনকর্তা আলিমর্দ্দন খিলজি সুবিধা পাইয়া রোগশয্যায় তাঁহাকে নিহত করেন। বহুসংখ্যক সৈন্যক্ষয়ের জন্য তাঁহার প্রতি তাঁহার দলের লোকের আর কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। মৃত্যুকালে তিনি নিঃসহায় ও বান্ধবহীন অবস্থায় দুর্গতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পবের দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া আলেয়ার আলোর মত যে স্বল্পস্থায়ী যশঃপ্রভা তাঁহাকে গৌরব দান করিয়াছিল তাহার বিনিময়ে তিনি কি লাভ করিলেন?—পার্ব্বত্য প্রদেশে অশেষ বিড়ম্বনা, পরাজয়জনিত লাঞ্ছনা, স্বজনধ্বংস ও অকালমৃত্যু। মহঃ ইঃ বক্তিয়ার দ্বারা সমস্ত বাঙ্গলাদেশ মুসলমানাধিকৃত হয় নাই। এমন কি নবদ্বীপকে ফিরিয়া জয় করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে সম্ভবতঃ কেশবসেন (লক্ষ্মণের পুত্র) গৌড় শাসন করিতেছিলেন এবং মুসলমানদের হাত হইতে দেশ রক্ষা করিতে না পারিয়া পূর্ব্ববঙ্গ আশ্রয় করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরে স্বর্ণগ্রাম রাজধানী করিয়া সেনবংশীয়েরা আরও এক শতাব্দীর ঊর্দ্ধকাল পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মৃত্যু ১২০৫ খৃঃ।

ইহার কোন সময়ে সেন বংশের এক শাখা লাহোর ও কাশ্মীরে যাইয়া তথায় রাজ্য লাভ করিয়া থাকিবেন। (৪০৯ পৃঃ)

মহঃ ইবন বক্তিয়ার খিলজির প্রিয়পাত্র মহম্মদ শিরান বঙ্গদেশের রাজা বলিয়া নিজেকে প্রচার করেন। এই ব্যক্তি এরূপ দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন যে, একাই অশ্বারোহণপূর্ব্বক লক্ষ্মণাবতীর নিকট কোন জঙ্গলে ১৮টি হাতী ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত সাহস দেখিয়া তিব্বতে অভিযানের পূর্ব্বে ইবন বক্তিয়ার তাঁহাকে গৌড়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। প্রভুর মৃত্যুর পর সামন্তগণ ও নেতারা একত্র হইয়া মহম্মদ শিরানকে রাজপদ প্রদান করেন। রাজা হইয়া তিনি প্রথমেই প্রভুহত্যায় অভিযুক্ত আলিমর্দ্দনকে পরাস্ত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন। কারাধ্যক্ষকে ঘুষ দিয়া আলিমর্দ্দন পলাইয়া মুক্তিলাভপূর্ব্বক দিল্লী যাইয়া কুতুবুদ্দিনের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। কুতুবুদ্দিন এই সময়ে সাম্রাজ্যের দৃঢ় ভিত্তি গড়িবার প্রয়াসী হইয়া অযোধ্যার শাসনকর্তা কাএমাজ রোমীকে পূর্ব্বাঞ্চলের যুদ্ধ-বিগ্রহের ভার প্রদান করেন। গঙ্গোত্রীর শাসনকর্তা সম্রাট্-সৈন্যদের সহযোগিতা করিয়া দেবকোটের শাসনকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। অপর অপর সেনাপতিরা দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার না করিয়া কাএমাজ রোমীর সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ চালাইয়াছিলেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া কুচবিহারের দিকে পলায়নপর হন। ইহাদের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হয়, মহম্মদ শিরান এই কলহের ফলে নিহত হন। মহম্মদ শিরান ১২০৫ হইতে ১২০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে কুতুবুদ্দিন দিল্লীশ্বর ছিলেন (১২০৫-১২১০ খৃঃ) কিন্তু তিনি দিল্লীশ্বরের অধীনত্ব স্বীকার করেন নাই।

মহম্মদ শিরান—১২০৫-১২০৮ খৃঃ।

গিয়াসের মৃত্যুর পর আলিমর্দ্দন খিলজি দিল্লীশ্বরের সনদ লইয়া বঙ্গদেশের মসনদ দখল করেন (১২০৮-১২১১ খৃঃ)।

কুতুবুদ্দিনের মৃত্যুর পর আলিমর্দ্দন শ্বেতচ্ছত্রধারণপূর্ব্বক নিজেকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। এইবার তাঁহার কতকটা বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল, এ পর্য্যন্ত তিনি অক্লান্ত-কর্ম্মা যোদ্ধা এবং রাজনীতিকুশল বুদ্ধিমান্ লোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এখন সমস্ত ন্যায়সঙ্গত গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তাঁহার গর্ব্ব আকাশ-স্পর্শী হইল। তিনি প্রকাশ্য দরবারে আপনাকে পারস্য, তুর্কিস্থান এবং দিল্লীর বাদসাহগণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন এবং "তাঁহার অধিকার হইতে বহু দূরে অবস্থিত খোরাসান, ইরাক, গজনী, গোর ও ইসফাহানের অধিকার প্রত্যার্থিগণকে প্রদান করিতেন।" এই সকল রাজ্য তাঁহার অধিকার-বহির্ভূত,—শুনিলে চটিয়া যাইতেন। একদা পারস্য দেশের এক বণিক্ স্বীয় বহুমূল্য দ্রব্যাদি-বোঝাই জাহাজ জলমগ্ন হওয়াতে তাঁহার নিকট সাহায্যের প্রার্থী হন। আলাউদ্দিন তাঁহাকে ইসপাহানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া প্রধান মন্ত্রীকে এক ফরমান প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। এই উপহাস-যোগ্য দুর্ব্বুদ্ধির ফল হইতে তাঁহাকে মন্ত্রী বুদ্ধি-কৌশলে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু নবাবকে স্বীয় অহঙ্কার বজায় রাখিবার জন্য বণিক্‌কে অনেক অর্থ প্রদান করিতে হইয়াছিল। এই সকল বুদ্ধিহীনতা অবশ্য পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের বিরক্তিকর হইয়াছিল—তথাপি তাহা উপহাস যোগ্য মনে করিয়া কেহ কোন প্রতিকূলতা করে নাই। কিন্তু তিনি কিছুদিন পরে অতিশয় নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন; তাঁহার অত্যাচার শুধু আঢ্য ও সম্ভ্রান্ত হিন্দুদিগের উপর সীমাবদ্ধ রহিল না, তিনি অবিচারে খিলিজিবংশীয় অনেক বড় লোককে হত্যা করিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণের চক্রান্তে ১২১১ খৃষ্টাব্দে তিনি নিহত হন। আলিমর্দ্দনের হত্যার পর হসাম উদ্দিন ইউয়জ নামক ইবন বক্তিয়ারের পারস্যবাসী কোন প্রিয় সেনাপতি "গিয়াসউদ্দিন" উপাধি ধারণ করিয়া গৌড়ের মসনদ অধিকার করেন, ইহার পূর্ব্বে তিনি গঙ্গোত্রীর শাসন কর্ত্তা ছিলেন।

আলিমর্দ্দন সুলতান আলাউদ্দিন—১২০৮-১১ খৃঃ।

কথিত আছে পারস্য দেশের দুই দরবেশ ইহার ভাবী সৌভাগ্যসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া ইহাকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইনি সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া কামরূপ, ত্রিহুত ও পুরী জয় করেন। কিন্তু যদিও বীর্য্যবত্তায় ইনি ন্যূন ছিলেন না, ইহার রাজত্বের অধিক সময়ই লোকহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে। ইনি গৌড়ে অনেক রম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন, তথায় অতি মনোজ্ঞ ও বিশাল এক মসজিদ, একটি বড় বিদ্যালয় ও অতিথিশালা প্রস্তুত করিয়া বীরভূম হইতে দেবকোট পর্য্যন্ত এক বিস্তৃত রাজপথ নির্ম্মাণ করেন। দশ বৎসর কাল ইনি শান্তির সহিত শাসন করিয়াছিলেন এবং ধনী ও দরিদ্র সর্ব্বশ্রেণীর প্রতি সমভাবে ন্যায়পরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শেষে ইনি আর দিল্লীতে রাজস্ব পাঠাইতেন না, দিল্লীশ্বর আলতামাস ক্রুদ্ধ হইয়া বঙ্গে অভিযান করেন। নির্ব্বিবাদে বিহার অধিকার করিয়া যখন তিনি বঙ্গের দিকে আসিতেছিলেন, সেই সময়ে গিয়াসউদ্দিন গঙ্গার সমস্ত জলযান দখল করিয়া সম্রাটের আসিবার

গিয়াসউদ্দিন ইউয়জ—১২১১-১২২৬ খৃঃ।

পথ বন্ধ করিয়া ফেলেন। যাহা হউক একটা সন্ধি হইয়া এই কলহের মিটমাট হইয়া গেল। বঙ্গাধিপ দিল্লীশ্বরকে ৩৮টি হাতী এবং বহু লক্ষ টাকা দিয়া তাঁহার অধীনত্ব স্বীকার করেন। আলতামাস মুলক্ আলাউদ্দিনকে বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু সম্রাট্ যাইতে না যাইতেই গিয়াসউদ্দিন সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া বিহার অধিকার করিয়া প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হন। আলতামাসের পুত্র যুবরাজ নাসিরুদ্দিন অযোধ্যা হইতে এক বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করিয়া তদবিরুদ্ধে যাত্রা করেন। এই যুদ্ধে গিয়াসউদ্দিন নিহত হন। গিয়াসউদ্দিন অতি উদারচরিত্র এবং ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন। এমন কি আলতামাস পর্য্যন্ত বলিতেন, "ইনি প্রকৃতই সুলতান হইবার যোগ্য।" ১২ বৎসর ব্যাপী রাজত্বের পর ১২২৬ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

নাসিরুদ্দিন মহমুদ ১২২৬-১২২৮ খৃঃ।

যুবরাজ নাসিরুদ্দিন বঙ্গের রাজা হইয়া শ্বেতচ্ছত্র ও রাজদণ্ড-ব্যবহারের অনুমতি প্রাপ্ত হন। তিনি অতি দক্ষতার সহিত রাজদণ্ড চালনা করিয়াছিলেন। ১২২৮ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়, তখন খিলিজি সামন্তেরা বিদ্রোহী হইয়া বঙ্গদেশে অরাজকতা আনয়ন করে। আলতামাস পুনরায় স্বয়ং বাঙ্গলাদেশে আসিয়া সেই বিদ্রোহ নিবারণ করেন। বিদ্রোহীর নেতা হাসামুদ্দিন খিলিজি অতি অল্প সময়ের জন্য বঙ্গের মসনদ অধিকার করিয়াছিলেন। এক বৎসরের জন্য ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন বঙ্গেশ্বর হইয়াছিলেন।

হাসামুদ্দিন খিলিজি— ১২২৮ খৃঃ; কয়েক মাস ইখ-তিয়ার উদ্দিন ১২২৮-২৯; আলাউদ্দিন জানি— ১২৩০-১২৩১ খৃঃ; সৈফ-উদ্দীন—১২২৩-১২৩৩ খৃঃ।

আলতামাস মুলক্ আলাউদ্দিনকে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন, ইনি চার বৎসর রাজত্বের পর পরলোকগত হন। তৎপরে সেক উদ্দিন তুরুক রাজা হইয়া তিন বৎসর রাজ্যশাসনপূর্ব্বক বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করেন (১২৩৩ খৃঃ)। ইহার পরের বঙ্গাধিপ তোগান খাঁ তাতারদেশীয় লোক ছিলেন, ইহাকে তরুণবয়স্ক, সুশ্রী ও নানাগুণে ভূষিত দেখিয়া আলতামাস ইহার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। ইনি প্রথমতঃ রোহিলখণ্ডে, পরে বিহার এবং সর্ব্বশেষে বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যখন আলতামাস বাদসাহের কন্যা

তোগান খাঁ—১২৩৩—১২৩৪ খৃঃ।

রিজিয়া দিল্লীর মসনদ প্রাপ্ত হন, তখন তোগান খাঁ তাঁহার নিকট অনেক উপঢৌকনসহ একজন বাগ্মী দূত প্রেরণ করেন। রিজিয়া বঙ্গেশ্বরের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইয়া তাঁহাকে ওমরাহগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ দান করেন এবং বঙ্গের মসনদে স্থায়িরূপে ইহার আসন স্বীকার করেন। রাজত্বের প্রথম দিকে ইনি ত্রিহুত বিজয় করেন, তৎপরে দিল্লীশ্বর মামুদের শাসন বিশৃঙ্খল ও শিথিল দেখিয়া কড়া-মানিকপুর বঙ্গের অধিকারভুক্ত করিলেন।

তোগান খাঁর সঙ্গে গঙ্গাবংশীয় অনঙ্গ ভীমদেবের পুত্র নৃসিংহদেবের প্রথম যুদ্ধ একটি স্মরণীয় ঘটনা। নৃসিংহদেব তোগান খাঁর অনুপস্থিতিতে লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিয়া রাজ-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া যায়। প্রতিশোধ লইবার জন্ত তোগান খাঁ জাজনগর আক্রমণ করেন। কিন্তু প্রবলপরাক্রান্ত কলিঙ্গরাজ ও সামন্ত নামক তাঁহার সেনাপতির রণকৌশলে

তোগান খাঁ পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসেন। এই দুরবস্থায় বঙ্গেশ্বর দিল্লীতে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করেন। এখানে বলা উচিত প্রথমতঃ তোগান খাঁ উড়িষ্যার কটাসিন দুর্গ আক্রমণ করেন, প্রতিশোধের জন্য নৃসিংহদেব লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিয়াছিলেন। (১২৪৩—৪৪ খৃঃ।) দিল্লী হইতে তমুর খাঁ অনেক সৈন্য লইয়া বঙ্গে আগমন করেন। বঙ্গেশ্বর এই রাজকীয় সৈন্যের সাহায্যে কলিঙ্গরাজের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া এবারও ব্যর্থকাম হন।

তোগান খাঁ ও তমুর খাঁ: উভয়ের রাজত্ব—১২৪৪-১২৪৬ খৃঃ।

পরন্তু তোগান খাঁর উপর তমুর খাঁ জুলুম করিতে আরম্ভ করিয়া নিজেকে লক্ষ্মণাবতীর অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করেন। কোন একদিন প্রভাত হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত লক্ষ্মণাবতীর বক্ষের উপর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমান সৈন্যের বিবাদ নগরবাসীদের একটা উপভোগ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তোগান খাঁর লোকেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে, এবং তমুর খাঁই ক্ষেত্র-নায়ক হন। শেষে একটা সন্ধি হইয়া এই স্থির হইল যে তমুর খাঁ রাজধানীর যত হস্তী, অশ্ব ও রাজভাণ্ডার তাহা লইয়া যাইবেন কিন্তু তোগান খাঁ বঙ্গের অধিপতি থাকিয়া যাইবেন। তাবকাৎ-ইনাসিরী লেখক মিনহাজ এই তোগান খাঁর সঙ্গে অনেক দিন ছিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত সন্ধি অনেকটা তাঁহারই চেষ্টায় হইতে পারিয়াছিল। তমুর খাঁ প্রায় দুই বৎসর লক্ষ্মণাবতী শাসন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তোগান খাঁ স্বীয় সৈন্যগণ দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অদৃষ্টচক্রে এই দুই সামন্ত রাজা ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে একই দিনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন তোগান খাঁর রাজত্বকালে সুপ্রসিদ্ধ চেঙ্গিস খাঁ ৩০,০০০ সৈন্য লইয়া গৌড় আক্রমণ করিয়াছিলেন। গঙ্গাবংশীয় রাজগণ এই সময়ে প্রবল হইয়া মুসলমানদিগকে বারংবার পরাজিত করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় নৃসিংহদেবের তাম্রশাসনে প্রথম নৃসিংহদেবের এই বিজয়ের কথা-উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে—"তাঁহার অমিত বিক্রমে রাঢ় ও বরেন্দ্রীয় যবনাঙ্গনাগণের কজ্জলরাগমিশ্রিত অশ্রু-সুধা-ধবল-গঙ্গা-প্রবাহকে কালিন্দীর ন্যায় শ্যামায়মানা করিয়াছিল।"

পরবর্ত্তী রাজা মুলুক যুজবেক সম্রাট্ আলতামাসের একজন তাতার দেশীয় দাস ছিলেন। ইনি দিল্লীর সম্রাট্গণের প্রীতিলাভ করিয়া পরমুহূর্ত্তেই তাঁহাদের বিপক্ষতা করিয়াছেন। ইনি

মুলুক যুজবেক (মুগীস উদ্দীন)—১২৪৬-১২৫৮ খৃঃ।

ষড়যন্ত্রী, অকৃতজ্ঞ ও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। তিনি সম্রাজ্ঞী রিজিয়া ও সম্রাট্ বাইরাম সাহ ইঁহাদের উভয়ের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর বঙ্গের মসনদ পাইয়া ইনি সর্ব্বপ্রথমই প্রতিশোধ লইবার জন্য জাজপুরে অভিযান করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে কলিঙ্গরাজের পরাজয় হইল। কিন্তু তৃতীয় বারে যুজবেক ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পরাস্ত হইলেন। তাঁহার সমস্ত হস্তী শত্রুহস্তগত হইল। তন্মধ্যে অতি মূল্যবান্ একটি শ্বেত হস্তী ছিল। এই পরাজয়ের পর তিনি দিল্লী হইতে সৈন্য সাহায্য পাইয়া আর একবার গোপনে কলিঙ্গরাজের রাজধানী আক্রমণ করিয়া ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া লইয়া আসিলেন। বিজয়োল্লাসে যুজবেক দিল্লীশ্বরের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া রক্ত, শ্বেত ও কৃষ্ণ—এই ত্রিবর্ণের চন্দ্রাতপ

ব্যবহার এবং সম্রাট্ মুগীশউদ্দিন উপাধিধারণপূর্ব্বক নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তৎপরে তিনি অযোধ্যা-জয়ার্থ অভিযান করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। কামরূপ-পতি পরাস্ত হইলে ইনি তাঁহার ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। তদবস্থায় কামরূপের রাজা মুগীশ-উদ্দিনের অধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহাকে বাৎসরিক প্রভূত রাজস্ব দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া দূত প্রেরণ করেন, পরন্তু বঙ্গেশ্বরের নামাঙ্কিত মুদ্রা নিজরাজ্যে চালাইতেও স্বীকৃত হন। কিন্তু বিজয়দৃপ্ত মুগীশউদ্দিন এই সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া হিন্দুরা পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করিয়া ফেলিল এবং নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাদের দুর্গম দেশ জলমগ্ন করিয়া ফেলিল। এইবার মুগীশউদ্দিন শত্রুহস্তে পড়িয়া নিতান্ত লাঞ্ছিত হইলেন। হস্তিপৃষ্ঠে পলায়নপর বঙ্গেশ্বরকে সকলেই লক্ষ্য করিতে সুবিধা পাইল; একটি মারাত্মক বাণে বিদ্ধ হইয়া তিনি শয্যাশায়ী হইলেন। মুমূর্ষুকালে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে জীবিত বা নিহত পুত্রের মুখ দেখিতে চাহিলেন। কামরূপের রাজা এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া দিলেন। পুত্র বন্দী হইয়া সমীপবর্ত্তী হইল, অশ্রুসিক্ত চক্ষে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। (১২৫৮ খৃঃ।)

জালালুদ্দিন—১২৫৮,
এক বৎসর; আর্সলন খাঁ—
১২৫৮, ১২৬০-১২৬১ খৃঃ।

১২৫৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বরের সনদ পাইয়া জালালুদ্দিন মসুদ লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তিনি মাত্র এক বৎসর ঐ পদে নিযুক্ত ছিলেন। কড়ার শাসনকর্ত্তা আর্সলন সহসা এক বিপুল বাহিনী লইয়া লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করেন, জালালুদ্দিন নিহত হন (১২৫৮ খৃঃ)। আর্সলন খাঁ দুই বৎসর মাত্র বঙ্গের গদি দখল করিয়াছিলেন। ১২৬০ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। রাখালদাসবাবু এই সময়ের মধ্যে ইজুদ্দিন বলবন নামক আর একজন বঙ্গেশ্বরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

তাতার খাঁ—১২৬১-
১২৬৬ খৃঃ।

আর্সলন খাঁর পুত্র মহম্মদ তাতার খাঁ* সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া সকলের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি সম্রাট্ বুলবনকে বহুবিধ উপঢৌকন পাঠাইয়া তাঁহাকে বশীভূত করেন। এই উপঢৌকনের মধ্যে রেশমী কাপড় ও মস্‌লিন বহু পরিমাণে ছিল, তাহা ছাড়া ৬৩টি হস্তী এবং বহু অর্থ রাজস্বস্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন। বুলবন তাঁহার রাজত্বের সূচনায় এই সুপ্রচুর ভেট পাইয়া উহা একটা শুভচিহ্ন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং তাতারের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়াছিলেন। তাতার খাঁ ১২৭৭ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

তাতার খাঁর মৃত্যুর পর সম্রাট্ তদীয় বিশ্বস্ত ও প্রিয় অনুচর তোগ্রেলকে বঙ্গের অধিকার প্রদান করেন। তোগ্রেল সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই নিজেকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ইহাও প্রচার করেন

* রাখালবাবু তাতার খাঁর পরে শের খাঁ ও আমিন খাঁ এই দুই ব্যক্তির নাম এক যোগে ১২৬৩ খৃঃ হইতে ১২৭৮ খৃঃ নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাদের রাজত্বের কাল উল্লেখ করিয়াছেন।

যে সম্রাট্ বেলিনের মৃত্যু ঘটিয়াছে। তখন দিল্লীশ্বর পীড়িত ছিলেন তাঁহার প্রিয়তম অনুচরের এই অকৃতজ্ঞতা ও দুর্ব্যবহারে, একান্ত ব্যথিত হইয়া তিনি পীড়িত থাকা সত্ত্বেও তাঁহার মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ না রটে এই জন্য নিজে রাজধানীতে প্রকাশ্যভাবে দেখা দিতে লাগিলেন এবং তোগ্রেলকে চিঠি লিখিলেন। তোগ্রেল মগীসুদ্দিন খেতাব গ্রহণ করিয়া স্বাধীন নৃপতি হইয়াছেন, তিনি সে চিঠি উপেক্ষা করিলেন। সম্রাট্ তাঁহার বিরুদ্ধে দুইবার দুইজন সেনাপতি পাঠাইলেন, কিন্তু তোগ্রেল (মগীসুদ্দিন) তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিলেন। সম্রাট্ স্বয়ং বঙ্গদেশে আসিয়া লক্ষ্মণাবতীর দিকে অভিযান করাতে কতকটা ভয় পাইয়া কতকটা লজ্জায় পড়িয়া, বঙ্গেশ্বর তাঁহার অর্থসম্পদ্ লইয়া যাজনগরে আশ্রয় লইলেন। সম্রাট্ চলিয়া গেলে পুনরায় গৌড়ে ফিরিবেন এই উদ্দেশ্য ছিল। সম্রাট্ গৌড়ে হিসামউদ্দিন নামক সেনাপতিকে বঙ্গের মসনদে বসাইয়া যাজনগরে মগীসুদ্দিন তোগ্রেলকে আক্রমণ করিতে অভিযান করিলেন। তোগ্রেল এমন চতুরতার সহিত পলায়ন করিতে লাগিলেন যে দিল্লীশ্বর কোথায়ও তাঁহার সন্ধান পাইলেন না। তিনি বহু চেষ্টার পর একদল বণিকের মুখে সংবাদ পাইয়া অতর্কিতভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া নিহত করেন। দিল্লীশ্বরের এই অভিযানে স্বর্ণগ্রামের দনুজ রায় তাঁহাকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। সম্রাট্ স্বয়ং তোগ্রেলের হস্তী ও ধনসম্পদ্ আত্মসাৎ করিয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহার অন্তঃপুরের মহিলা ও শিশুদিগের শিরশ্ছেদের আদেশ করিলেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাসিরুদ্দিনকে কখনও দিলীশ্বরের বিদ্রোহিতা না করেন (যিনিই দিল্লীর রাজতক্তের মালিক হউন না কেন) এই শপথ গ্রহণ করাইয়া বঙ্গের মসনদে স্থাপিত করেন (১২৮০ খৃঃ)।

তোগ্রেল খাঁ মগীসুদ্দিন—১২৭৮-১২৮২ খৃঃ।

নাসিরুদ্দিনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহম্মদের অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়াতে বৃদ্ধ সম্রাট্ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া তাঁহাকে দিল্লীতে আসিতে লিখিলেন। তাঁহাকে নিজের কাছে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "আমি বৃদ্ধ ও শোকবিচলিত হইয়াছি, যদিও মহম্মদের পুত্র খসরুই এই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, তথাপি সে অতি তরুণবয়স্ক, এত বড় রাজ্যের ভার সে বহন করিতে পারিবে না। আপাততঃ বঙ্গের শাসনের ভার অপর কাহারও উপর দিয়া তুমি কতক দিন এইখানেই থাক। আমি বেশীদিন বাঁচিব না। তুমি একটা ব্যবস্থা করিয়া রাজ্য রক্ষা করিও।"

নাসিরুদ্দিন বগড়া খাঁ—১২৮২-১২৯১ খৃঃ।

কিন্তু সম্রাট্ একটু একটু করিয়া ভাল হইতে লাগিলেন। নাসিরুদ্দিনের আর দিল্লীতে থাকিতে ভাল লাগিল না। রাজ্যের যাহা হয় হইবে, এই মনে স্থির করিয়া, মৃগয়ার ছল করিয়া বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

পুত্রের এই ব্যবহারে সম্রাট্ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, তিনি মহম্মদের পুত্র খসরুকে আনাইয়া তাঁহাকেই তাঁহার উত্তরাধিকারী পদে নির্দ্দিষ্ট করিয়া ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমে পরলোকে গমন করিলেন (১২৮৬ খৃঃ)।

খসরু আইনতঃ উত্তরাধিকারী হইলেও, দিল্লীর আমিরেরা তাঁহার দাবী উপেক্ষা করিয়া বঙ্গেশ্বর নসিরুদ্দিনের অষ্টাদশবয়স্ক পুত্র কায়কোবাদকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। এই বালক কুসঙ্গীদের হাতে পড়িয়া বিলাসস্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন। নাজিমুদ্দিন নামক মন্ত্রীই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। রাজা মন্ত্রীর কুপরামর্শে অতি নিষ্ঠুরভাবে খসরু ও কয়েকজন মন্ত্রীকে হত্যা করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নসিরুদ্দিন ও পরবর্ত্তী পাঠান-রাজগণ

পুত্র সম্রাট্ হওয়াতে নসিরুদ্দিন আনন্দিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন, নবীন সম্রাটের চরিত্রের অধঃপতন হইতেছে, তখন তিনি তাঁহাকে অনেক সদুপদেশ ও মিষ্ট গঞ্জনা দিয়া একখানি চিঠি লিখিলেন। তিনি দুষ্ট মন্ত্রী নাজিমুদ্দিনকে বিদায় করিয়া দিতে পুত্রকে অনুরোধ করিলেন। সেদিন সম্রাট্ কিলখারী নামক স্থানে এক নবনির্ম্মিত বিলাসাগারে আমোদপ্রমোদে লিপ্ত ছিলেন; তিনি পিতার চিঠি উপেক্ষা করিলেন। বঙ্গেশ্বর এক বিপুলবাহিনী লইয়া দিল্লী আক্রমণ করিয়া রাজ্যশাসনের আমূল সংস্কার করিতে ইচ্ছুক হইলেন। এদিকে পুত্র কায়কোবাদও পিতৃগঞ্জনায় বিরক্ত হইয়া এবং মন্ত্রীর পরামর্শানুসারে সৈন্যসামন্ত লইয়া বাঙ্গলার দিকে অভিযান করিলেন। ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে পিতা ও পুত্রের সৈন্যেরা অল্প ব্যবধানে প্রায় মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইল। বঙ্গেশ্বর স্বীয় শিবির সরযূ নদীর তীরে স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং সম্রাটের শিবির ছিল গোগরা নদীর তীরে। এই দুইটি স্থানই বিহারে শারন জেলার অন্তঃপাতী।

নসিরুদ্দিন ও কায়কোবাদ।

নসিরুদ্দিন দেখিলেন তিনি সম্রাটের বিশাল সৈন্যের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না, তখন সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু অভিমানাহত পুত্র মন্ত্রীর প্রবর্ত্তনায় সেই প্রস্তাব ঘৃণার সহিত অগ্রাহ্য করিলেন। তিন দিন এই ভাবে কাটিয়া গেল, চতুর্থ দিন নসিরুদ্দিন নিজ হস্তে সম্রাট্‌কে এইভাবে একখানি চিঠি লিখিলেন. "প্রাণাধিকেষু, তোমার সঙ্গে আমার দেখা করিবার একান্ত ইচ্ছা। জেকবের মৃত্যুকালে পুত্র জোসেফকে দেখিবার জন্য তাঁহার যেরূপ প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল, তোমাকে দেখার সাধ আমার তদপেক্ষা কম নহে; আমার এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধটি পালন কর, ইহার পর আমি আর তোমাকে বিরক্ত করিব না এবং তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিব না।"

এই পত্র পড়িয়া কায়কোবাদ নিতান্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি লোকজন না লইয়া একাকী তখনই তাঁহার পিতৃসকাশে ছুটিয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু কূটনীতিজ্ঞ মন্ত্রী তাঁহার স্নেহের আধিক্য কমাইয়া দিলেন এবং বুঝাইলেন, তিনি সমস্ত হিন্দুস্থানের সাহেন সা সম্রাট্, তাঁহার পক্ষে নিম্নস্থ এক রাজার কাছে—হউন না কেন তিনি পিতা—এভাবে যাইয়া প্রথমে সাক্ষাৎ করা তাঁহার পদোচিত মর্য্যাদার যোগ্য হইবে না।

শেষে এই স্থির হইল যে, দুই পক্ষের সৈন্যের মধ্যস্থলে কোন স্থানে বঙ্গেশ্বর সিংহাসনারূঢ় সম্রাট্‌কে সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিবেন। জ্যোতিষীরা শুভ দিন-ক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল এবং সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক হইল। সম্রাট্ বহু আড়ম্বরের সঙ্গে সৈন্যসামন্তের ঘটা করিয়া দেহরক্ষিপরিবেষ্টিত হইয়া শিবিরে প্রবেশ করিলেন, তৎপরে পিতা সরযূনদী পার হইয়া পুত্রের সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন। যখন তিনি সিংহাসন প্রথম দেখিতে পাইলেন, তখন একবার কুর্নিস করিয়া অভিবাদন করিলেন, আরো একটু অগ্রসর হইয়া দ্বিতীয়বার কুর্নিস ও অভিবাদন করিলেন এবং যখন একেবারে সিংহাসনের পাদদেশে আসিয়া পড়িলেন, তখন তৃতীয়বার কুর্নিস করিতে উদ্যত হইলেন। পিতার এই হীনতা ও দৈন্য দেখিয়া, পুত্র আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া পিতার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া রহিলেন। এই করুণ দৃশ্যের পরে পিতা পুত্রের হাত ধরিয়া সিংহাসনে বসাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সম্রাট্ সেখানে বসিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। পিতাকে সিংহাসনে বসিতে বাধ্য করিলেন এবং নিজে অতি সম্ভ্রমের সহিত সিংহাসনের নিম্নে একটি স্থানে উপবেশন করিলেন। এই ঘটনায় রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী সকলেই বিশেষ প্রীত হইলেন। কয়েক দিন পর্য্যন্ত খুব আনন্দোৎসব চলিল, বাজি ও আলোর ঘটায় আকাশ প্রদীপ্ত হইল এবং রাজার সঙ্গে প্রধান প্রধান আমীরগণ দেখা সাক্ষাৎ করিয়া মহাসুখে সময় কাটাইলেন।

পিতাপুত্রের মিলন—১২৮৮ খৃঃ।

ইহার পর উভয় পক্ষের সন্ধি হওয়ার কোন বাধাই রহিল না। নসিরুদ্দিন বঙ্গ ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলগুলির স্বাধীন নৃপতি হইলেন, কিন্তু দিল্লীর কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না এই সর্ত্ত হইল। ১২৮৮ খৃঃ এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল।

বিদায়ের সময়ে নসিরুদ্দিন পুত্রকে অনেক হিতোপদেশ দিলেন এবং প্রধান মন্ত্রীকে অবিলম্বে বিদায় করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। পরস্পর আলিঙ্গনাদির পর অতি স্নেহের সহিত বিদায়ের উপসংহার হইল। পিতাপুত্র স্বীয় স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই ঘটনার পর নসিরুদ্দিন অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। তিনি প্রায়ই দুঃখ প্রকাশ করিয়া বন্ধুদিগকে বলিতেন—হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্য ও তাঁহার পুত্র উভয়ই তিনি শীঘ্র হারাইবেন। তিনি যাহা ভয় করিয়াছিলেন তাহাই হইল, কারণ এক বৎসর পরে ১২৮৯ খৃঃ কায়কোবাদ খিলিজিবংশীয় এক আমীর কর্ত্তৃক গোপনে নিহত হইলেন।

ফিরোজসাহা খিলিজি ১২৮৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ হইয়া নসিরুদ্দিনকে বঙ্গের মসনদে বহাল

রাখিলেন। তৎপরে আলাউদ্দিনের সময়েও কতকদিন ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সম্রাটের খামখেয়ালির ভাবদর্শনে তিনি আতঙ্কিত হন। তিনি স্বেচ্ছায় বঙ্গের মসনদ ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র লক্ষ্মণাবতী অঞ্চল নিজ অধিকারে রাখেন। আলাউদ্দিন পূর্ব্ববঙ্গের জন্য বাহাদুর খাঁকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। সোণারগাঁয়ে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হয়। মোবারেক সাহ সম্রাট্ হইলে (১৩১৭ খৃঃ) বাহাদুর বিদ্রোহী হন। ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ তোগলক্ বাহাদুরকে দমন করিয়া পুনরায় নাসিরুদ্দিনকে বঙ্গের অধিপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। কোন কোন লেখকের মতে দ্বিতীয় বার নাসিরুদ্দিন রাজত্ব করেন নাই, তখন রাজা ছিলেন রুকুনুদ্দিন। তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নসিরুদ্দিনের পরে বঙ্গদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া শাসনকেন্দ্র লক্ষ্মণাবতী ও সুবর্ণগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাখালবাবু নসিরুদ্দিনের পর এই কয়েকজন নৃপতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন—রুকুনুদ্দিন কৈকাউস সাহ (১২৯১-১৩০২ খৃঃ), শমসুউদ্দিন ফিরোজ সাহ (১৩০২-১৩২২ খৃঃ), নাসিরুদ্দিন ইব্রাহিম্ সাহ (১৩১২-১৩২৫ খৃঃ ইনি লক্ষ্মণাবতীতে শমসুউদ্দিন ফিরোজ সাহের সমকালেই রাজত্ব করিতেছিলেন), গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর সাহ (১৩১০-১৩৩০ খৃঃ)। শেষোক্ত দুইজন নবাব ফিরোজ সাহের পুত্র। গিয়াসুদ্দিনের উল্লেখ বিদ্যাপতির পদে পাওয়া যায় "প্রভু গিয়াসুদ্দিন সুলতান"। ফিরোজ সাহের রাজত্বকালে হিন্দুর প্রাচীন একটি পাষাণ মন্দির কতকটা রূপান্তরিত করিয়া সপ্তগ্রাম-বিজয়ী জাফর খাঁ গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে মসজিদ নির্ম্মিত করেন (১২২৮ খৃঃ)। এই জাফর খাঁর সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাস্তোত্র অনেকেই জানেন। এই পুস্তকের ৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ফিরোজসাহ ও তাঁহার পুত্রগণ—১২৮৯-১৩৩০ খৃঃ।

অতঃপর বহরমখাঁন সোণারগাঁয়ের এবং কুদ্দর খাঁ লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। এই ভাবে বঙ্গের শাসন দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দিল্লীশ্বর উভয়ের ক্ষমতা খর্ব্ব করেন। বহরম খাঁর মৃত্যুর পর ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে ফকীরুদ্দিন নামক তাঁহার এক দেহরক্ষী সেকেন্দর বাদসাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া সোণারগাঁয়ের গদী দখল করিয়া স্বাধীন নৃপতির ছত্রদণ্ড ধারণ করিলেন। এদিকে আলাউদ্দিন আদিবসাহ লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন, ফকরউদ্দিন ও আলাউদ্দিন উভয়ের মধ্যে সর্ব্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতেছিল। আলাউদ্দিন ১৩৪৩ খৃষ্টাব্দে ফকরউদ্দিনকে নিহত করেন এবং তিনিও ইহার এক বৎসর পাঁচ মাস পরে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ইলিয়াস খাজে কর্ত্তৃক নিহত হন।

বহরম খাঁ ও কুদ্দর খাঁ—১৩৩০-১৩৩৮ খৃঃ।

ইলিয়াস খাজে ১০ বৎসর নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার উপাধি ছিল 'সামসুদ্দিন'—ইনি রাজত্বের প্রথমে জাজনগর আক্রমণ করিয়া বিস্তর অর্থ ও হস্তী প্রভৃতি লইয়া আসেন। দিল্লীশ্বরের কাশী-সমীপবর্ত্তী কোন এক স্থান অধিকার করাতে সম্রাট্ ফিরোজসাহ তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া আসেন।

আলাউদ্দিন ও ফকরউদ্দিন—১৩৩৮-১৩৪৩ খৃঃ।

সামসুদ্দিনের পুত্র পাণ্ডুয়ায় ও তিনি স্বয়ং একডালা দুর্গে সৈন্য-সামন্ত লইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে সামসুদ্দিনের পুত্র বন্দী হন, কিন্তু সম্রাট্ কিছুতেই বঙ্গেশ্বরের একডালা দুর্গ জয় করিতে সমর্থ হন নাই। অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহের পর সামসুদ্দিন সম্রাট্‌কে কিছু অর্থ ও সামান্য উপঢৌকন দিয়া সন্ধি করেন, তাঁহার পুত্র মুক্তি পাইয়াছিলেন। ইহার পরে ফিরোজসাহ বঙ্গেশ্বরের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। সামসুদ্দিন ১৬ বৎসর ৫ মাস রাজ্য সুশাসন করিয়া ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

ইখতিয়ারউদ্দিন গাজিসাহ—১৩৪৯-১৩৫২ খৃঃ পর্য্যন্ত সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সামসুদ্দিন ইলিয়াস সাহ—১৩৪৩-১৩৫৮ খৃঃ।

সামসুদ্দিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেকেন্দর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দিল্লীতে একটা বড় রকমের ভেট পাঠাইলেন। কিন্তু ফিরোজ সাহ এই সূত্রে বাঙ্গলা দেশটা সরকারের অধীন করিবার চেষ্টা পাইলেন। তিনি বঙ্গাভিমুখে রওনা হইয়া সেকেন্দর সাহকে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি তাঁহার ভেট পাইয়া খুসী হইয়াছেন. কিন্তু বাঙ্গলা দেশটা তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত এই কথাটা স্বীকার করিলে তিনি খুসী হইয়া সন্ধি করিতে পারেন। বঙ্গেশ্বর স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে স্বীকৃত হইলেন, পরন্তু আরও পাঁচটি হাতী ও মূল্যবান্ উপহার পাঠাইয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

১ম সেকেন্দর সাহ—১৩৫৮-১৩৬৯ খৃঃ।

যুদ্ধের উদ্যোগ দেখিয়া সেকেন্দর একডালা দুর্গে আশ্রয় লইলেন। তথায় তাঁহাকে পরাস্ত করা অসম্ভব দেখিয়া সম্রাট্ ৪৮টি হাতী ও কতক উপহার আর বাৎসরিক কিছু কর দিতে সম্মত করাইয়া সেকেন্দারের সঙ্গে সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার রাজত্বের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত তিনি শান্তিতে কাটাইয়াছিলেন, শেষকালে তাঁহার দুই স্ত্রীকে লইয়া কিছু গোলযোগ উপস্থিত হইল। প্রথমার গর্ভে ১৭টি সন্তান জন্মে। দ্বিতীয়ার মাত্র একটি পুত্র হইয়াছিল। এই পুত্রের নাম গয়েসউদ্দিন। ইনি সর্ব্বজনপ্রিয় ও পিতার আদরের ছিলেন। একদা প্রথমা রাজ্ঞী রাজাকে অনেক শপথ করাইয়া একটি গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কথা তাঁহাকে বলিতে চাহিলেন, রাজা তাঁহাকে অভয় দিয়া সেই কথা তাঁহাকে জানাইতে আদেশ করিলেন। আশ্বাস পাইয়া রাজ্ঞী তাঁহার নিকট জ্যেষ্ঠপুত্র গয়েসউদ্দিন সম্বন্ধে কতকগুলি কথা ব্যক্ত করিলেন—গয়েসউদ্দিন তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজ্য দখল করিতে উদ্যত ইত্যাদি। রাজা বলিলেন, "দুর্ম্মুখি, তোমার সপত্নীর একটি মাত্র পুত্র, তাহাও তোমার সহ্য হইতেছে না—তুমি আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও।"

গয়েসউদ্দিন ভাবে-প্রকারে বিমাতার ষড়যন্ত্র টের পাইয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদে এ অবস্থায় থাকা আর নিরাপদ্ নহে মনে করিয়া সোণারগাঁয়ে যাইয়া বিদ্রোহী হইলেন। সেকেন্দর তাঁহার বিরুদ্ধে রওনা হইলেন। যুদ্ধকালে গয়েসউদ্দিন তাঁহার সৈন্যদিগকে রাজার জীবন সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতার উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও সেকেন্দর সাহ যুদ্ধক্ষেত্রে মারাত্মকভাবে আহত হইলেন। গয়েসউদ্দিন পিতার চরণধারণপূর্ব্বক বারংবার ক্ষমা

চাহিলেন, সেকেন্দর অল্প দুই এক কথায় তাঁহার শুভ ইচ্ছা জানাইয়া ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন (১৩৬৭ খৃঃ)। কিন্তু ষ্টুয়ার্ট প্রদত্ত এই তারিখ গ্রাহ্য নহে। কারণ সেকেন্দর সাহের ১৩৮৯ খৃঃ অব্দের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

গয়েসউদ্দিন আজিমসাহ - ১৩৮৯-১৩৯৬ খৃঃ।

পিতার শব সমাধির ব্যবস্থা করিয়া গয়েসউদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার প্রথম কার্য্য হইল, তাঁহার বৈমাত্রেয় ভাইদের প্রত্যেকের চক্ষু দুটি উপড়াইয়া ফেলিয়া সেগুলি বিমাতাকে উপহার দেওয়া। তিনি আত্মরক্ষার জন্য এই নিষ্ঠুরতা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এই তাঁহার ওজুহাত। সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া ইহার পর তিনি সর্ব্বদা ন্যায়পরতার সহিত রাজত্ব করিয়াছেন। একদিন তাঁহার একটি শর অজ্ঞাতসারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া একজন বিধবার পুত্রকে আহত করে। বিধবা কাজীর নিকট বিচারপ্রার্থী হয়, কাজী সিরাজুদ্দিন সম্রাটের উপর শমন জারি করিতে দ্বিধা বোধ করিয়া শেষে ভগবানকে স্মরণ করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিলেন। যে ব্যক্তির উপর শমন জারি করার ভার ছিল সে ভয় পাইয়া অসময়ে মসজিদে উপাসনার ঘণ্টা বাজাইয়া দিল। ধর্ম্ম লইয়া কে এই ব্যঙ্গ করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য সম্রাট্ সেই লোকটাকে সম্মুখে আনিয়া এইরূপ অদ্ভুত কার্য্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কাজীর আদেশের কথা বলিয়া কহিল, ভয় পাইয়া সে মহারাজের সকাশে উপস্থিত হইতে সাহসী হয় নাই, তজ্জন্য এই উপায় অবলম্বন করিয়াছে। রাজা একটা ক্ষুদ্র তরবারি কটিবাসে গোপন করিয়া আদালতে উপস্থিত হইলেন। কাজী তাঁহার আসনে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন—বাদসাহকে কোনরূপ সম্মান দেখাইলেন না। সেই বিধবার ছেলেটি তিনি আহত করিয়াছেন কি না প্রশ্ন করিলেন, এবং যখন রাজার অপরাধ প্রমাণিত হইল তখন সেই স্ত্রীলোকটির ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য রাজাকে বহু অর্থদণ্ড করিলেন। রাজা সেই টাকা দিলেন। তখনই কাজী তাঁহার আসন হইতে নামিয়া আসিয়া রাজাকে যথোচিত সম্মান করিলেন। রাজা বলিলেন, "ভাগ্যে আপনি সুবিচার করিয়াছিলেন, নতুবা অসিদ্বারা আমি আপনার শির কর্ত্তন করিয়া ফেলিতাম।" কাজী বলিলেন, "আপনি আদালতে যদি আমার অবাধ্য হইতেন, তবে এই বেত্র দ্বারা আপনার পৃষ্ঠদেশ ক্ষতবিক্ষত করিতাম।" স্বীয় রাজ্যে ধর্ম্মভীরু সৎসাহসযুক্ত এমন সুবিচারক আছেন, এজন্য রাজা সন্তোষ জ্ঞাপন করিলেন এবং কাজীকে পুরস্কৃত করিলেন।

গয়েসউদ্দিনের ন্যায়পরতা।

এক সময়ে পীড়িত হইয়া পড়াতে রাজার মনে হইয়াছিল, তিনি আর বাঁচিবেন না, সুতরাং একটা উইল করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে লিখিত ছিল যে তাঁহার প্রিয়তমা তিনটি অন্তঃপুর-চারিণী—'সাইপ্রাস', 'গোলাপ' এবং 'ভুলিপ'—মৃত্যুর পর তাঁহার শব ধুইবার অধিকার

* বিদ্যাপতি যে গিয়াসুদ্দিনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী বলবের কিংবা এই গয়েসউদ্দিন তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে।

পাইবেন। তাঁহাদের প্রতি রাজার এই অনুকম্পাপ্রদর্শনে তাঁহার অপরাপর উপরাজ্ঞীরা নিতান্ত ক্ষুণ্ণ ও হিংসাভাবাপন্ন হইয়া এই তিনটি মহিলাকে "ঘোষালী" বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। সাধারণের শব ধৌত করার ব্যবসায় যে ইতরজাতীয় লোকেরা করে তাহাদের উপাধি "ঘোষালী"। রাজা সারিয়া উঠিলেন। সেই রমণীত্রয় বিদ্রূপের কথা রাজাকে জানাইয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজা একটি কবিতা লিখিয়া তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টি সাধনের চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু একটি ছত্র লিখিয়া তাহার জোড়া মিলাইতে পারিলেন না। যে ছত্রটি লিখিলেন তাহার অর্থ এই—"হে সুরা-পাত্রধারিণি, তোমরা সাইপ্রাস, গোলাপ ও তুলিপের প্রশংসা গান কর।" এই কবিতা সম্পূর্ণ করিবার জন্য তিনি পারস্যের শ্রেষ্ঠ কবি হাফেজের নিকট দূত পাঠাইলেন। তিনি তাঁহার চিঠিতে উক্ত কবিকে বহু অর্থ দেওয়ার কথা বলিয়া বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। কথিত আছে রাজার কবিতার প্রথম চরণ না দেখিয়াই হাফেজ দ্বিতীয় চরণটি লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই—"এই সুসংবাদ তিনটি পরমাসুন্দরী ও প্রিয়তমা "ঘোষালী"দিগকে জ্ঞাপন করা হউক।" গয়েসউদ্দিনের পত্রের উত্তরে কবিবর যে সুন্দর কবিতাটি লিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার দিওয়ান নামক কাব্যগ্রন্থে অন্তর্নিবিষ্ট আছে, তাহার প্রত্যেকটি ছত্রের শেষে "আমার বন্ধু" এই শব্দটি আছে। কবিতাটির শেষ ছত্রের মর্ম্মার্থ এই—"রে হাফেজ! সুলতান গয়েসউদ্দিনকে দেখিবার জন্য তোমার যে তীব্র ইচ্ছা জন্মিয়াছে তাহা লুকাইবার কারণ কি? তুমি যে যাইতে পারিতেছ না তাহার কারণ, তুমি অনেক দূরে আছ—এ কথা সুলতানের নিকট ব্যক্ত কর।"

'সাইপ্রাস', 'গোলাপ' ও 'তুলিপ'।

প্রসিদ্ধ কবি হাফেজ।

হাফেজ যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাতে এতটা দূর তিনি যাইতে সাহস পাইতেছেন না, ইহাই না আসার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি সাংসারিক হিসাবে কতকটা উদাসীন ছিলেন।

ছয় বৎসর কয়েক মাস দক্ষতার সহিত রাজত্ব করিয়া গয়েসউদ্দিন ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন।

পরবর্ত্তী রাজা সৈফউদ্দিন গয়েসউদ্দিনের পুত্র। তিনি রাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। নির্ব্বিবাদে দশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ১৪০৬ খৃঃ তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাঁহার রাজত্বের বিশেষ কোন ঘটনা জানা যায় নাই।

সৈফউদ্দিন হাম্জা সাহ—১৩৯৬-১৪০৬ খৃঃ।

(সৈফউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার পোষ্যপুত্র 'দ্বিতীয় সামসুদ্দিন' নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া তিনি ভাতুরিয়ার রাজা গণেশ কর্ত্তৃক নিহত হন।)

২য় সামসুদ্দিন—১৪০৬-১৪০৯ খৃঃ।

রাজা গণেশ কে?—তাহা লইয়া অনেক বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বঙ্গদেশের অধিকাংশ রাজাকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি

তাঁহার কায়স্থদিগের ইতিহাসের নাম দিয়াছেন—"রাজন্যকাণ্ড"। তাম্র-শাসনাদিতে প্রমাণাভাব হইলেও তাঁহার মতের পোষক কুলজী-গ্রন্থের অভাব হইতেছে না। এই কুলজীগুলির সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে, অনেকের বিশ্বাস নগেন্দ্রবাবু এই সকল কুলজী-লেখকদের দ্বারা বারংবার প্রতারিত হইয়াছেন। এ বিষয়ে রাখালবাবু এত প্রমাণ দিয়াছেন যে নগেন্দ্রবাবুর উত্তর মুখে যোগাইতেছে না। রাখালবাবু লিখিয়াছেন—"বসুজ মহাশয় সন্দেহজনক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া দুই বার সেন-রাজবংশকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, সেই জন্য প্রতিবারেই তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে বসুজ মহাশয় চন্দ্রদ্বীপের ঘটককারিকা অনুসারে চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ-প্রতিষ্ঠাতা দনৌজমাধবকে লক্ষ্মণসেনের পৌত্র প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু দনুজমর্দ্দনের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইলে প্রমাণিত হইয়াছিল যে, চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মণসেনের পৌত্র হইতে পারেন না। …………ইহার পরে দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্র দেবের মুদ্রা প্রকাশিত হইলে সেনবংশের সহিত কায়স্থসমাজের নূতন সম্বন্ধ আবিষ্কারের প্রয়োজন হইল। তদনুসারে বটুভট্টের দেববংশ নামক কুলগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে।" (বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ, ১৩২৪, ১৮৮ পৃঃ)। এক একটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ার পর পূর্ব্ববর্ত্তী সদ্যোজাত কুলগ্রন্থ সূতিকাগৃহ হইতে বহির্গত হইতে না হইতে সেটির সংশোধক ও পরিপূরক হিসাবে অপর একটি কুলগ্রন্থ পাওয়া যায়। এই নিত্য নব আবিষ্কারের ফলে নগেন্দ্রবাবু যে সকল মত দাঁড় করাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা রাখালবাবু তাঁহার বাঙ্গলার ইতিহাস, ২য় ভাগ, ১৮৮–১৮৯ পৃষ্ঠায় ও সান্ন্যাল মহাশয় তাঁহার সামাজিক ইতিহাসের অনেক স্থলে বিশদভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ও এই ব্যাপারে উগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন; রাখালবাবু অতি গম্ভীর বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত মহিমার মধ্যে একটু চাপা রহস্যের ভাষা অবলম্বন করিয়াছেন। নিখিলনাথ রায়, সতীশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি কায়স্থ লেখকদের অভাব নাই, কিন্তু ইঁহাদের অপেক্ষা ঐতিহাসিক শাস্ত্রে অনেক বেশী জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এবং ইতিহাসক্ষেত্রে অপূর্ব্ব উদ্যমশীলতা ও অভূতপূর্ব্ব বিদ্যার পরিচয় দিয়াও পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ নগেন্দ্রনাথ কুলজীশাস্ত্রকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করিয়া এবং ঘটকদিগের কথায় নির্ব্বিচারে প্রত্যয় স্থাপন করিয়া ঐতিহাসিকগণের শ্রদ্ধা কি তিনি কতকটা হারাইয়া ফেলেন নাই? কায়স্থ-সমাজ অতি বিরাট্। যদি কোন জাতি সর্ব্ববিষয়ে বংশের প্রাধান্যের দাবী করিতে পারেন—তবে কায়স্থ জাতি যতটা পারেন, ততটা আর কোন জাতি পারেন কি না সন্দেহ। কিন্তু সোণার উপর রং চড়াইবার প্রয়োজন কি? যাহা স্বভাবতঃই বড়, তাহাকে অধিকতর বড় করিবার চেষ্টা বাহুল্য নহে কি? তাঁহার এই সকল গবেষণার ফলে বঙ্গের বহুমূল্য কুলজীগ্রন্থসম্পদের উপর লোকের কতকটা অনাস্থা জন্মিয়াছে। অথচ খাঁটি কুলজীগ্রন্থগুলি

রাজা গণেশ—১৪০৯-১৪১৪ খৃঃ।

গণেশ কোন্ জাতি?

যে চারণদের গীতির ন্যায় ইতিহাসের বহুমূল্য উপকরণ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

গণেশকে উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে নগেনবাবু চেষ্টা পাইয়াছেন। দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয় নিজে ইচ্ছা করিয়া কিংবা স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তি-বলে কিছু লিখিয়াছেন, তাঁহার শত্রুর মধ্যেও কেহ এ কথা বলিবেন না। তবে হয়ত তিনি ঠাকুরমার ঝুলি হইতে মাঝে মাঝে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি শ্রুতি ও প্রবাদের উপর জোর দিয়াছেন, তজ্জন্য স্থানে স্থানে তাঁহার মত ইতিহাসসঙ্গত হয় নাই। তথাপি রাজা গণেশসম্বন্ধে তিনি যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে পারিবারিক এত কথা আছে যে, সেই প্রবাদগুলি স্থানে স্থানে ভুল প্রতিপন্ন হইলেও উহা সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই মনে হয়। কায়স্থকারিকায় গণেশসম্বন্ধে এত কথা, এত প্রবাদের শতাংশের একাংশও নাই—এই প্রবাদগুলি পারিবারিক দীর্ঘকালাগত সংস্কার ও স্মৃতির পরিচয় দিতেছে। এজন্য আমাদের বিশ্বাস, গণেশ ব্রাহ্মণ-কুলজাত ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। বিশেষতঃ মুসলমান ঐতিহাসিক "ভাতুড়িয়ার" জমিদার বলিয়া তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই "ভাতুড়িয়া" নাম হইতে প্রসিদ্ধ ভাদুড়ী বংশের উদ্ভব হইয়াছে এবং দীর্ঘকাল সেই স্থানের জমিদার বংশের ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রতিপত্তি ছিল।

কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ-সমস্যা।

ভাতুড়িয়ার জমিদার-বংশ—ভাদুড়ীবংশ।

নরসিংহ নাড়িয়াল নামক এক মন্ত্রীর কৌশলে গণেশ মুসলমান বাদসাহকে নিহত করিয়াছিলেন (ঈশান নাগরের অদ্বৈত-প্রকাশ)—"যাহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা। গৌড়ের বাদসাহকে মারি নিজে হৈল রাজা।" * তাঁহার নামের কোন মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। কিন্তু বাদশা হইয়া তিনি সম্ভবতঃ মুসলমান উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক সময়েই রাজা বা বাদশাহের প্রচলিত নাম রাজকীয় দলিলপত্রে ব্যবহৃত হইত না; যিনি মুসলমানী রাজতক্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহার তৎসময়ে সম্মানিত মুসলমানী উপাধি গ্রহণ করা অসম্ভব নহে। গণেশের রাজত্বকাল ১৩৮৫-১৪১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কোন সময়। হয়ত তিনি সাহাবউদ্দিন বায়াজিদ সাহ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে এই নাম কতকগুলি মুদ্রায় পাওয়া গিয়াছে। গণেশ অতি প্রখরবুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন; তিনি প্রবল পরাক্রান্ত মুসলমান সামন্ত ও আমীরগণকে সন্তুষ্ট করিয়া নির্ব্বিবাদে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। একজন মুসমান ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, তিনি মুসলমানদিগের এরূপ প্রিয় হইয়াছিলেন যে, মৃত্যুর পর তাঁহার শব হিন্দুমতে দাহ করা হইবে কিংবা মুসলমানমতে তাঁহার সমাধি দেওয়া হইবে, এই লইয়া দুই শ্রেণীর মধ্যে তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। কিন্তু এত করিয়াও তিনি সর্ব্বশ্রেণীর মুসলমানদের

* এই 'নাড়িয়াল' বংশোদ্ভূত বলিয়া চৈতন্য প্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে 'নাড়া' ও 'নাড়াবুড়া' বলিয়া অভিহিত করিতেন।

প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন, তিনি মুসলমানদিগের প্রতি অকথিত অত্যাচার করিয়াছিলেন। কথিত আছে সেখ বদর উল ইসলাম রাজাকে অভিবাদন না করাতে তিনি তাঁহাকে দণ্ড দিয়াছিলেন। কতকগুলি ওমরাহ তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, এজন্য তিনি তাঁহাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়াছিলেন। এইগুলি বিশেষ কোন অত্যাচার বলিয়া মনে হয় না। যদি তিনি সাহাব-উদ্দিন বয়াজিদ উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার শবের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া লইয়া কেন যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কলহ হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। এদিকে যদু যখন মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হন, তখন রাজা গণেশ সুবর্ণধেনুব্রত করাইয়া তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

প্রায় চারিশত বৎসরের দীর্ঘরজনীর পরে হঠাৎ একটু ঊষার আলোর মত হিন্দুগগনে গণেশের উদয়। যে বংশে তিনি জন্মিয়াছিলেন, সেই ভাদুড়ী বংশ কি তাঁহাকে কখনও ভুলিতে পারে? তাঁহারা এখন নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু গণেশের কীর্ত্তিকথা তাঁহাদের কুল-কারিকায় এরূপ বিস্তৃতভাবে লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, বাহিরের লোকেরাও তাহা ভুলিতে পারিবে না। সান্যাল মহাশয়ের সামাজিক ইতিহাসের এই গণেশের অধ্যায়টি পাঠ করুন, তাহা এত পুঙ্খানুপুঙ্খ ও এত বিস্তৃত যে এই সকল কথা যে মূলতঃ সত্যমূলক তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। যদি দিনাজপুরের সমৃদ্ধ রাজবংশে তাঁহার জন্ম হইত, তবে তাঁহার ইতিহাসসম্বন্ধে সেই পরিবারে সোণায় গিল্টী করা চরিতকথা না থাকিলেও শত শত প্রবাদ থাকিত। সেরূপ একটি প্রবাদেরও অস্তিত্ব আমরা জানি না। তবে যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে ঐরূপ প্রবাদসংবলিত পুস্তক অচির-ভবিষ্যতে আবিষ্কার একটা বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। গণেশ নারায়ণের স্ত্রী মহারাজ্ঞী ত্রিপুরা দেবী এবং যদুর স্ত্রী নবকিশোরীর কাহিনী করুণ রসের উৎস, সেই বিয়োগান্ত দৃশ্যের উপর ভাদুড়ীবংশের চোখের জল এখনও শুকায় নাই। ইহা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে সুবিদিত, যদুর সহিত নবকিশোরীর এবং নবকিশোরীর সঙ্গে আসমানতারার চিঠিপত্রগুলি সান্যাল মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই চিঠিগুলি সে-কালের রহস্যের মোড়কে আঁটা তপ্ত অশ্রু। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এত দিনের চিঠিপত্র এগুলি উপকথার মত শোনায়। কিন্তু এই ভাবে চিঠিপত্র রক্ষা করিবার প্রথা ও ধারা আমরা বাঙ্গলার ইতিহাসে আরও কয়েকবার পাইয়াছি। রাজীবলোচনের কৃষ্ণচন্দ্রচরিত উক্ত রাজার মৃত্যুর প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে লিখিত। সকলেই জানেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ ঐতিহাসিক ও ভাষাবিৎ পণ্ডিত কেরি সাহেবের অনুমোদনে উহা লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেকে বলিয়া থাকেন ঐ পুস্তক ইংরেজদের অনুপ্রেরণায় বিরচিত হইয়াছিল। এই পুস্তকে রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে লইয়া সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে জন কোম্পানির কতকগুলি চিঠিপত্র দেওয়া আছে—তাহাও এই ধরণের। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জীবগোস্বামীর সঙ্গে কবি গোবিন্দদাসের সংস্কৃত চিঠিপত্রগুলি নরহরিবিরচিত ভক্তি-রত্নাকরে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই ভক্তি-রত্নাকর বৈষ্ণবদিগের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এবং

নবকিশোরী ও আসমানতারা।

গোবিন্দদাস ও জীব গোস্বামী এই পুস্তক রচনার পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। এই সকল চিঠিপত্রের ভাষা হয়ত কিছু রূপান্তরিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু ইহাদের মূল ভাবের ব্যত্যয় হইবার সম্ভাবনা নাই। মুসলমানগণ এই ভাবের চিঠিপত্র অনেক রক্ষা করিয়াছেন। এদেশের বাদসাহ আহমেদ শাহ (১৪০৯ খৃঃ) যখন জোয়ানপুরের রাজা ইব্রাহিমকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ভয়ে ভীত হইয়া তাইমুরের পুত্র সাহরুকের নিকট সাহায্য-প্রার্থী হন, তখন তাতার সম্রাট্ জোয়ানপুরের বাদশাহকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা ষ্টুয়ার্ট সাহেবের ইতিহাসে (১৯১০, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১২০ পৃঃ) উদ্ধৃত হইয়াছে। সান্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন. নবকিশোরী বাদসাহকে (যদু) যে কৌটা পাঠাইলেন তন্মধ্যে একটি ভূর্জ্জপত্রে লিখিত কয়েকটি শ্লোক লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। শ্লোক অবশ্য বাঙ্গলায় এবং সান্যাল মহাশয় তাহার সবগুলি দিতে পারেন নাই। তারকা চিহ্ন দিয়া পাদটীকায় লিখিয়াছেন, "মধ্যবর্ত্তী শ্লোকগুলি অপ্রাপ্য।" নবকিশোরীর পুত্র অনুপনারায়ণ। যদু তাঁহার মাতা ও স্ত্রীর প্রতি যে নির্ম্মমতা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য চির অনুতপ্ত ছিলেন। তিনি নিজে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিলেন, কিন্তু এই সময়ে একটাকিয়ার জমিদারির আয় তিনগুণ বাড়িয়া গেল, এই সকল ঘটনা ভাদুড়ীবংশের চিরস্মরণীয়। সুতরাং মূলতঃ বাদসাদ দিয়া এই সকল কাহিনীর যে অনেক কথাই সত্যমূলক তাহা আমরা বলিতে পারি। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাম্রশাসন ও মুদ্রায় যাহা নাই, তাহা যে ইতিহাস নহে, এবং বিজ্ঞানসঙ্গত বলিতে যে শুধু মুদ্রা ও তাম্রশাসন বুঝায় এই অদ্ভুত কথা আমরা আধুনিক কয়েক জন বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের মুখেই প্রথম শুনিয়াছি।

একটাকিয়া বংশের প্রতাপ চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের ইতিহাসের মশালের আলো। চলনবিলের স্বচ্ছ তোয়রাশি মুকুরের মত সম্মুখে রাখিয়া যে গভীর গড়খাই-বেষ্টিত রাজপ্রাসাদ এক সময়ে শত্রুর অনধিগম্য ছিল, যে একটাকিয়া বংশের গৌরবের জন্য হিন্দু-মুসলমান একত্র হইয়া লড়াই করিয়াছে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতেও যে রাজকুলের জন্য পাঠান সেনাপতি কামতার খাঁ প্রাণপাত করিয়া সেই সুচিরাগত রাজভক্তির সংস্কার উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছিলেন, যেখানে ১২ মাসে ১৩ পার্ব্বণে উৎসবের শত শত দীপ জলিয়া উঠিত, যেখানে ব্রাহ্মণগণ পুঁথি ফেলিয়া একটু হইলেই তরবারি হস্তে সমরাঙ্গনে নামিতেন, সেই বঙ্গের শেষ গৌরবরশ্মি একটাকিয়া আজ কোন্ অস্তাচলে মিলাইয়া গিয়াছে!

যদু কেন মুসলমান হইলেন?

যদুসম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, তিনি গণেশের এক মুসলমানী উপপত্নীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন, সুতরাং তিনি মুসলমান হইয়াছিলেন। কেহ আবার বলেন, তিনি কুতুব উল আলাম নামক কোন মুসলমান সাধুর চর্ব্বিত পান খাওয়াতে জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি আসমানতারা নামক কোন মুসলমান মহিলার প্রেমে পড়িয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন। গণেশ কোন পাঠান ওমরাহের সম্পত্তি হরণ করেন নাই, পরন্তু অনেক মুসলমান বিদ্বান্ ও সাধু ব্যক্তিদিগকে বৃত্তি দান করিতেন, এতৎ সত্ত্বেও কতকগুলি ষড়যন্ত্রকারী মুসলমানের

প্রবর্ত্তনায় বিখ্যাত সাধু নুর কুতুব উল আলম বিহারের অধিপতি ইব্রাহিম সাহকে গণেশের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। গণেশ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া এই শত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান, কিন্তু নিজে মুসলমান না হইয়া যত্নকে ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে অনুমতি দেন। তৎসম্বন্ধে প্রচলিত নানারূপ উপাখ্যান দৃষ্টে মনে হয়, অসামান্য প্রতিভা ও বীর্য্যসম্পন্ন হইয়াও রাজা গণেশ পূর্ণ শান্তিতে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। চারিদিকে দুর্দ্দান্ত পাঠান বাদসাহ এবং আমীর ওমরাহ, হিন্দুদিগকে ইহারা বিধর্ম্মী ও কাফের বলিয়া ঘৃণা করিতেন। ইঁহাদের সকলের শীর্ষস্থানে গণেশ রাজা প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ শঙ্কিত ছিলেন। তাঁহার মাথার উপর চিরদিন শানিত খড়্গ ঝুলিতেছিল। রাজনীতি-কৌশল, পরাক্রম, শান্তিপ্রিয়তা প্রভৃতি নানা গুণে মণ্ডিত হইয়া তিনি তাঁহার রাজত্বের আপৎ কালটা কোনরূপে কাটাইয়া দিয়াছিলেন।

কথিত আছে রাজা যদু বা চেৎমল্ল 'জালালুদ্দিন' উপাধি ধারণ করিয়া হিন্দুদের প্রতি মর্ম্মান্তুদী অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য যে সুবর্ণধেনুব্রত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই কার্য্যের অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেককে তিনি গোমাংস খাওয়াইয়া বলপূর্ব্বক মুসলমান করিয়াছিলেন। জালালুদ্দিন সুবিখ্যাত সাধু সেখ সাহেদকে সোণারগাঁ হইতে আনিয়া তাঁহারই নির্দ্দেশ মত সমস্ত রাজকার্য্য করিতেন। তিনি রাজধানী পাণ্ডুয়া হইতে গৌড়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং বহু শিল্পকলা-বিশিষ্ট মসজিদাদি নির্ম্মাণ করিয়া প্রাচীন গৌড় নগর সুসমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভগ্ন মসজিদ, অতিথিশালা, দিঘী প্রভৃতি "জালালী কীর্ত্তি" বলিয়া পরিচিত। অষ্টাদশ বর্ষকাল নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করার পর তিনি ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সম্ভবতঃ স্বীয় রাজ্ঞীর প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া ইনিই কবি চণ্ডীদাসকে হস্তীর পৃষ্ঠে বাঁধিয়া বেত্রাঘাত করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু ষ্টেপলটন সাহেব অনুমান করেন,—উক্ত কবির হত্যাকারী সম্ভবতঃ ইনি নহেন, পরবর্ত্তী বঙ্গেশ্বর।

যদু কর্ত্তৃক অত্যাচার।

জালালুদ্দিন—১৪১৪-১৪৩১ খৃঃ।

জালালুদ্দিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র আহম্মদ সাহ ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, ইনি হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীরই প্রিয় হইয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্ব কালে জোনপুরের বাদসাহ ইব্রাহিম বঙ্গদেশে এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন। ইঁহাদের আক্রমণে আহম্মদ সাহ ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাইমুরলেনের পুত্র সাহরুকের নিকট নিজ রাজ্যের দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়া একখানি চিঠি পাঠান। সাহরুক সুলতান ইব্রাহিমকে যে ভীতি প্রদর্শন করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা ইুয়ার্ট তাঁহার ইতিহাসে আমূল উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহা সেই সময়ে সম্রাটদের প্রতিহিংসার ইচ্ছা যেরূপ ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা রোমাঞ্চকর। সেই চিঠির মর্ম্ম এই—"এই জগতের রাজ-চক্রবর্ত্তীর আদেশ পাওয়া মাত্র এক দিনের মধ্যে আপনি বঙ্গদেশের যত লোক বন্দী করিয়া আনিয়াছেন, তাহাদের বাড়ী পৌঁছাইয়া

আহম্মদ সাহ—১৪৩১-১৪৪২ খৃঃ।

সাহরুকের পত্র।

দিবেন এবং কাজিদের দস্তখতি চিঠি দ্বারা প্রমাণ করিবেন যে আপনি আদেশ প্রতিপালন করিয়াছেন। যদি কিঞ্চিন্মাত্র বিলম্ব করেন, তবে প্রথমতঃ আমার প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্র কাবুলের শাসনকর্ত্তাকে, তৎপর খোটান, গিজনি ও কান্দাহারের শাসনকর্ত্তাদিগকে আপনাকে শাস্তি দিতে পাঠাইব। ইহারা গেলে যদি আপনার যথেষ্ট শাস্তি না হয়, তবে ক্রমান্বয়ে আমার সেনাপতি ফিরোজ সাহ, তৎপরে আমার প্রিয় পুত্র সামসুদ্দিন মহম্মদকে খোরাসান প্রভৃতি সমস্ত রাজ্যের সৈন্য সহকারে প্রেরণ করিব।" এই ভাবে তাঁহার আর আর পুত্রগণ এবং তাঁহার প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যব্যাপী বিবিধ সেনানিবাসগুলির লক্ষ লক্ষ সৈন্য পাঠাইবেন—তাহার একটা বড় রকমের তালিকা দেওয়া আছে। উপসংহারে লিখিত আছে—"আমার প্রিয় পুত্র উল্‌ক বেগ সুরগণকে তুর্কিস্থানের সমস্ত সৈন্য সহকারে পাঠাইব। তাহার উপর আদেশ থাকিবে যে আপনার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করে, অথবা তাহা এমন জায়গায় ঝুলাইয়া রাখে, যেখান হইতে কাকগুলি মাংস ছিঁড়িয়া খাইতে পারে।"

এই ভীতি-প্রদর্শনের ফলে সুলতান ইব্রাহিম, তাইমুরলেনের পুত্রের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন এবং আহম্মদ সাহও নিরুপদ্রবে অষ্টাদশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৪৪২ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইহার কোনও সময়ে দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব বাঙ্গলাদেশে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও বিশ্বাস গণেশ "দনুজমর্দ্দন" উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। মুসলমান-বিজয়ী হিন্দু রাজাদের ঐরূপ উপাধি আমরা আরও দুই এক স্থানে পাইয়াছি। কিন্তু সন তারিখের গোলযোগ না মিটিলে এ প্রশ্নের সমাধান হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে সম্প্রতি আবিষ্কৃত কুলজীগুলির উপর কোনই আস্থা স্থাপন করা যায় না। দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রদেব সম্বন্ধে আমরা ঐ সকল তথাকথিত বংশাবলী একবারে অগ্রাহ্য করি। শ্যামল বর্ম্মা সম্বন্ধেও ঐরূপ বংশাবলী উপস্থিত করা হইয়াছিল। বংশাবলীর প্রমাণ ঠিক ঐতিহাসিক না হইলেও তাহাকে আমরা ইতিহাসের অন্যতম প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু জাল বংশাবলী ও মেকী টাকা চালাইতে গেলেই তাহা চলে না। রাখালবাবু এই সকল পর্ব্বতপ্রমাণ জাল বংশাবলীর উপর সজোরে দম্ভোলি নিক্ষেপ করিয়াছেন। দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রদেব কে ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে পারিলাম না। উভয়ের যে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হয়, দনুজমর্দ্দন ১৩৪০ শকে (১৪১৮ খৃঃ) এবং মহেন্দ্রদেব ১৩৩৯ হইতে ১৩৪৫ শকে (১৪১৭-১৪২২ খৃঃ) বাঙ্গলায় রাজত্ব করিতেছিলেন।

দাস নাসিরের ৮ দিনের রাজত্ব। নসিরউদ্দীন মহম্মদ সাহ—১৪৪২-১৪৫৯ খৃঃ।

আহম্মদের পুত্র ছিল না। নসির নামক এক দাস প্রবল হইয়া সিংহাসন দখল করেন, কিন্তু তিনি ৮ দিন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ওমরাগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া সামসুদ্দিন ভেজরের এক তরুণ বয়স্ক বংশধর নসির সাহকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন, ইনি অপ্রতিহতপ্রভাবে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া ১৪৫৯ খৃঃ অব্দে স্বর্গারোহণ করেন। ইনি গৌড়ে এক বিশাল দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তাহার সিংহদ্বারের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়।

নসির সাহের পুত্র বরবক সাহ রাজা হইয়া আফ্রিকার আবিসিনিয়াবাসী নিগ্রোদিগকে তাহার সৈন্যভুক্ত করেন, ৮ হাজার নিগ্রো অশ্বারোহী সৈন্য তাঁহার অনুগমন করিত, তাঁহার দেখাদেখি গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের রাজারাও এই শ্রেণীর লোকদিগকে বিশ্বাসী ও সাহসী দেখিয়া নিজেদের সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন। ষ্টুয়ার্ট লিখিয়াছেন "য়ুরোপীয়দের হাতে পড়িলে যাহারা পশুর মত ব্যবহার পাইত, এই দেশের রাজারা তাহাদিগকে অনুরাগ ও প্রীতি প্রদর্শন করাতে তাহাদের কেহ কেহ বড় সেনাপতি,এমন কি প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাও হইতে পারিয়াছিলেন।

বরবক সাহ—১৪৫৯-১৪৭৪ খৃঃ।

নসির সাহের পুত্র ইউসফ সাহ ১৪৭৪ হইতে ১৪৮২ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি সুপণ্ডিত ও ন্যায়পর বাদসাহ ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। গরীব ও ধনী ইহাদের মধ্যে বিচার কালে কোন তারতম্য করিতেন না। পক্ষপাত-দোষ-দুষ্ট কাজিদিগকে ইনি কঠোর শাস্তি দিতেন। ইঁহার রাজত্বকালে শ্রীহট্ট বিজিত হইয়াছিল। ইনি পাণ্ডুয়ার অনেকগুলি সূর্য্য ও বাসুদেবের মন্দির মসজিদে পরিণত করেন। "বাইশ দরজা" নামক গৌড়ের বিশাল মসজিদটি ভগ্ন সূর্য্যমন্দিরের উপাদানে নির্ম্মিত।

ইউসফ সাহ—১৪৭৪-১৪৮২ খৃঃ।

ইউসফ সাহের সন্তান হয় নাই। আমির ও মন্ত্রীরা রাজকুলজাত একটি যোগ্য যুবককে রাজপদে মনোনীত করেন। ইনি "ফতে সাহ" উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। ইনি নবীন বয়সেই পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। নিগ্রো ও খোজারা রাজদরবারে বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়াছে দেখিয়া ইনি খুব চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি গুরুতর দোষ প্রচলিত ছিল, তজ্জন্য বাদসাহ তাহাদের কতকগুলি বড় লোককে কঠিন শাস্তি দেন এবং অপর ব্যক্তিদিগকে সাধারণ ভৃত্য অথবা প্রজার শ্রেণীতে পরিণত করিয়াছিলেন। খোজাগণের অন্তঃপুরে গতিবিধির কোন বাধা ছিল না। এই সুবিধা পাইয়া তাহারা ইহাকে রাত্রিকালে শয়নাগারে হত্যা করে। ফতে সাহ ১৪৯০ খৃঃ অব্দে নিহত হন। ইঁহার রাজ্যের সর্ব্ব প্রধান ঘটনা—চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম (১৪৮৬ খৃঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারী)। অন্তঃপুর হইতে রাজা প্রাতে বাহিরে আসিবেন—দেহরক্ষীরা অপেক্ষা করিতেছিল, এমন সময় দেখা গেল, বারেক নামক খোজা রাজ-পরিচ্ছদ পরিয়া সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছেন। তখন প্রধান মন্ত্রী খান-জাহান এবং প্রধান সেনাপতি খোজা মালেক আণ্ডিল রাজধানী হইতে দূরে ছিলেন এবং অপরাপর সেনাপতিদিগকে ঘুস দিয়া বশীভূত করা হইয়াছিল—সুতরাং বারেক খোজা "সুলতান সাহাজাদা" উপাধি লইয়া অনায়াসে সিংহাসন দখল করিয়া বসিলেন। তিনি খোজা ও নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীদিগকে উচ্চপদ দিতে লাগিলেন, কারণ তিনি জানিতেন সম্ভ্রান্ত লোকেরা সুবিধা পাইলেই তাঁহার প্রতিকূলতা করিবেন। তিনি রাজ্যময় খোজা গুপ্তচর নিযুক্ত করেন; তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে কে কি করিতেছে বা কহিতেছে, তাহার বিবরণী

জালালুদ্দিন ফতে সাহ—১৪৮২-১৪৮৬ খৃঃ।

সুলতান সাহাজাদা—আট মাস রাজত্ব।

রাজাকে জানাইতে। প্রথমতঃ প্রধান মন্ত্রী খান জাহান ও প্রধান সেনাপতি খোজা মালেক আণ্ডিলকে তিনি খুবই সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার সিংহাসনের উপর চিরকাল বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন, এই শপথ গ্রহণ করাতে কতকটা দ্বিধার সহিত তাঁহাদিগকে স্ব-স্ব কার্য্যে বহাল রাখিলেন। ইঁহারা বাহিরে প্রভুভক্তির ভান করিলেও ভিতরে ভিতরে রাজাকে হত্যা করিবার সুবিধা খুঁজিতেছিলেন, অত্যন্ত চতুরতার সহিত উদ্দেশ্য গোপন রাখাতে রাজা ক্রমশঃ তাঁহাদের প্রতি আস্থাবান্ হইলেন। অতঃপর রাজগৃহরক্ষীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া আণ্ডিল এক রাত্রে সম্রাট্কে আক্রমণ করেন। তখন তিনি খোজার স্বভাবানুযায়ী স্ত্রীজনোচিত বস্ত্রাদি পরিয়া মদ খাইয়া সিংহাসনের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। আণ্ডিল তাঁহাকে সিংহাসনস্থিত দেখিয়া মারিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন; কারণ তিনি সিংহাসনের প্রতি আজীবন বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন এই শপথ লইয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে রাজা অপর্য্যাপ্ত মদিরা-পানে নেশার ঝোঁকে ঘরের মেজেতে পড়িয়া যান, তখন আণ্ডিল তাঁহাকে খড়্গাঘাত করিলেন। বাদসাহের গায়ে অসুরের জোর ছিল, সেই খড়্গাঘাত খাইয়াও তিনি আণ্ডিলকে ধরিয়া ফেলিয়া ধস্তাধস্তি করিতে লাগিলেন। আর দুই একটি লোকের সাহায্যে আণ্ডিল রাজাকে মৃতবৎ করিয়া ফেলিলেন এবং তিনি মরিয়াছেন মনে করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। ইতিমধ্যে অন্তঃপুর-রক্ষী প্রধান খোজা তাওয়াচি বাশীর ঘরে আসিলে আহত রাজা তাহাকে বিশ্বাসী মনে করিয়া আণ্ডিলের কথা বলিলেন এবং কি কর্ত্তব্য তাহার উপদেশ দিলেন। খোজা যাইয়া আণ্ডিলকে জানাইলেন, রাজা মরেন নাই। তখন আণ্ডিল রাজগৃহে আসিয়া তাঁহাকে হত্যা করিলেন। সাহাজাদা মাত্র ৮ মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন।

রাজার মৃত্যুর পর অমাত্যেরা ঠিক করিলেন, স্বর্গীয় রাজা ফতেসাহের দুই বৎসর বয়স্ক শিশু কুমারকে রাজা করিবেন। তাঁহারা বিধবা রাণীকে যাইয়া এই কথা বলিলেন, এবং বলিলেন, শিশুর রক্ষকই অভিভাবকস্বরূপ রাজ্য শাসন করিবেন।

ফিরোজ সাহ—১৪৮৭—১৪৮৯ খৃঃ।

এখন রাজ্ঞী কাহাকে ঐ পদে মনোনীত করিবেন? রাজ্ঞী এই আপৎসঙ্কুল রাজপদে শিশুটিকে অধিষ্ঠিত করিতে মনে মনে ভয় পাইয়া বলিলেন যে, তিনি শপথ করিয়াছেন—যে তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে পারিবে, তাঁহাকে তিনি রাজসিংহাসনের যোগ্য মনে করিবেন। এই অবস্থায় শিশু আর রাজা হইলেন না—খোজা মালেক আণ্ডিল ফিরোজসাহ নাম গ্রহণপূর্ব্বক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি ইহার পূর্ব্বেই যোগ্যতা ও সৎসাহসের অনেক পরিচয় দিয়াছেন, রাজা হইয়া তিনি জনপ্রিয় নানা অনুষ্ঠান-দ্বারা সুনাম অর্জ্জন করিলেন। কথিত আছে তিনি একদা একলক্ষ টাকা গরীবদিগকে দিতে আদেশ করিয়াছিলেন, টাকাগুলি একত্র করিলে কত বড় একটা বৃহৎ স্তূপ হয় ইহা দেখাইয়া রাজাকে এরূপ অপরিমিত দান সঙ্কোচ করিবার অভিপ্রায়ে মন্ত্রীরা টাকাগুলি জড় করিয়া রাজার যাইবার পথে রাখিয়া দিয়াছিলেন, রাজা ঐ টাকাগুলি দেখিয়া "এসব কি?" জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন এত অধিক অর্থ তাঁহার

আজ্ঞায় বিতরিত হইবার কথা একজন মন্ত্রী স্মরণ করাইয়া দিলেন। রাজা বলিলেন "এত অল্প!" ইহার দ্বিগুণ দেওয়া হউক। (ফিরোজ সাহের নির্ম্মিত মসজিদ, দীঘি ও রমণীয় এক দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও গৌড়ে দৃষ্ট হয়। ১৪৮৯ খৃঃ অব্দে ফিরোজ স্বর্গারোহণ করেন।)

তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নামে মাত্র রাজা হইলেন। হোরস খাঁ নামে এক আবিসেনীয় দাস মন্ত্রী হইয়া সমস্ত ক্ষমতা আত্মসাৎ করিলেন। ইহার ব্যবহার সকলেরই বিরক্তিকর হইল।

মহম্মদ সাহ—১৪৮৯-১৪৯০ খৃঃ।

আবিসেনীবাসী সিদ্ধিবদর নামক এক ব্যক্তি হোরস খাঁকে গোপনে বধ করিয়া তৎপরে মহম্মদ সাহকে নিধন করিলেন। কেহ কেহ বলেন মহম্মদ সাহ ফিরোজ সাহের পুত্র নহেন। তিনি ফতে সাহের শিশু পুত্র, (যাঁহাকে মন্ত্রীরা একদা রাজা করিতে চাহিয়াছিলেন)। মহম্মদ সাহের রাজত্বকাল এক বৎসর মাত্র।

সিদ্ধিবদর 'মুজাফর সাহ' উপাধি লইয়া রাজা হন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান সকলের প্রতি অতি নিষ্ঠুর আচরণ করিতেন। তিনি দরবারের অনেক প্রধান ব্যক্তিকে হত্যা করেন;

মুজাফর সাহ—১৪৯০-১৪৯৩ খৃঃ।

রাজা, আমীর কিংবা জমিদার তাঁহার হাতে কাহারও নিস্তার ছিল না। তিনি নিজ হস্তে তাহাদিগকে বধ করিতেন। এই ভাবে তিনি স্বয়ং যে সকল লোকের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন ঐতিহাসিকগণ-প্রদত্ত তাহাদের সংখ্যা এত বেশী যে তাহা সহসা বিশ্বাস করা যায় না। অবশেষে প্রধান মন্ত্রী সৈয়দ হুসেন বিদ্রোহী হইয়া গৌড় অবরোধ করেন। রাজা ৫,০০০ উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী হাবিসী সৈন্য এবং বাঙ্গালী ও পাঠান ২৫,০০০ সৈন্যসহ বহুকাল দুর্গরক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে বাহির হইয়া আসিয়া যুদ্ধ করেন। ২৫,০০০ লোক যুদ্ধে নিহত হয়, স্বয়ং মুজাফর সাহ নিহতদিগের একজন। কাহারও কাহারও মতে মন্ত্রী সৈয়দ হুসেন মুজাফর সাহের পদাতিক সৈন্য-নায়ককে উৎকোচ-দ্বারা হাত করিয়া লইয়া ১৬ জন গুপ্তঘাতকসহ রাজার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন।

পরবর্ত্তী বাদসাহ হুসেন সাহ বঙ্গের ইতিহাসে বিখ্যাত ব্যক্তি। ইনি ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে

আলাউদ্দিন হুসেন সাহ—১৪৯৩-১৫১৯ খৃঃ।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৫১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহারই রাজত্বকালে চৈতন্য দেব বঙ্গদেশ প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সে প্রসঙ্গ পরে হইবে।

হুসেন সাহ জীবনের প্রথম সময়টা সুবুদ্ধি রায় নামক গৌড়ের সর্ব্বপ্রধান ভূম্যধিকারীর ভৃত্য ছিলেন। একদা পুষ্করিণী খনন করিতে যাইয়া কার্য্যে শিথিলতার জন্য সুবুদ্ধি রায় তাঁহার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠে সেই বেত্রাঘাতের চিহ্ন অনেক দিন ছিল।

হুসেন সাহ প্রথমতঃ দুঃস্থ অবস্থায় থাকিলেও তিনি সৈয়দবংশজাত ছিলেন। চাঁদপুরের কাজি এই সংবাদ প্রথম জানিতে পারিয়া তাঁহার দুর্দ্দশা মোচন করিলেন।

এখন যেমন হজরত মহম্মদের বংশধর 'সৈয়দ' বাঙ্গলায় অনেক দেখা যায়, তখন তাহা না এজন্য এদেশে সেই সময়ে একজন সৈয়দের আবির্ভাব মুসলমান সমাজে খুব বড় কথা ছিল। কাজি সৈয়দ হুসেনকে রাজদরবারে প্রবেশ করাইয়া দিলেন, শুধু তাহাই নহে, তাঁহার নিজ কন্যাকে এই যুবকের হস্তে সম্প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইলেন। ক্রমে সৈয়দ হুসেন তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্য দেখাইয়া গৌড়ে খুব পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন এবং মুজাফর সাহকে হত্যা করিয়া বাঙ্গলার গদি দখল করিয়া লইলেন। তাঁহার বংশগৌরব এবং রাজোচিত নানাগুণে মুগ্ধ হইয়া আমীরগণ এক বাক্যে তাঁহাকে রাজপদে বরণ করিয়া লইলেন। পূর্ব্ব নৃপতিকে হত্যা করার পর তিনি যুদ্ধরীতি অনুসারে গৌড় লুণ্ঠন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যেরা তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে লুণ্ঠন করিবার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি স্বীয় সৈন্যগণের ১২,০০০ লোককে হত্যা করিয়া লুণ্ঠিত সমস্ত বহুমূল্য সামগ্রী আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন।

হুসেন সাহ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের খুব আদর করিতেন, পণ্ডিতদিগকে বৃত্তি দিতেন এবং বহু বিদ্যালয়, চিকিৎসাগার ও আতিথিশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি আসাম, কামরূপ ও হিমালয়ের উপত্যকা পর্য্যন্ত স্বীয় বিজয়ী সৈন্যসহ অভিযান করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সকল পার্ব্বত্য দেশবাসীকে জয় করিয়া তথা হইতে মধ্যে মধ্যে ধনরত্ন লুণ্ঠন করিলেও তাহাদের দেশগুলি তাঁহার অধিকারভুক্ত করিতে পারেন নাই, বর্ষাগমে তাহারা তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত ও তাড়িত করিয়া দিয়াছে। হিমালয়ের দক্ষিণ উপত্যকায় ভুটান দেশ হইতে হুসেন সাহের পুত্র অনেক লাঞ্ছনা পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি পণ্ডিত সাধু-ব্যক্তিদিগকে এতদূর সম্মান করিতেন যে সুপ্রসিদ্ধ সাধু কুতব উল আলমের সমাধি দেখিবার জন্য তাঁহার জন্মতিথিতে প্রতি বৎসর পায়ে হাঁটিয়া পাণ্ডুয়ায় যাইতেন।

হুসেন সাহ হাবসী ও নিগ্রোদিগের ক্ষমতা একেবারে খর্ব্ব করেন, তাঁহারা বাঙ্গলাদেশে খুব পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন কিন্তু ইহারা প্রায় বিশ্বাসঘাতকতা করিতেন। হুসেন সাহের দৃষ্টান্তে আর্য্যাবর্ত্তের অপরাপর স্থানের রাজারা ইহাদিগকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দেন—ইহারা পরিশেষে "সিদ্দি" নামে দাক্ষিণাত্যে আবার প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সৈয়দ হুসেনের দরবারে জৌনপুরের বাদসাহ সাহ হোসেন লোদি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আশ্রয় ভিক্ষা করেন। গৌড়েশ্বর এই সম্মানিত অতিথিকে বিশেষভাবে আপ্যায়ন করিয়া তাঁহাকে রাজযোগ্য বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। মৃত্যু পর্য্যন্ত সাহ হোসেন সৈয়দ হুসেনের বৃত্তিভোগী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর গৌড়েশ্বর একটি সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা এখন সুরক্ষিত অবস্থায় গৌড়ে আছে।

রাজা হইবার পরে তাঁহার রাজ্ঞী স্বামীর পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত চিহ্ন দেখিয়া জানিতে পারিলেন কে ইহা করিয়াছে। সুবুদ্ধি রায় যোড়শ উপর হুসেনকে পিতৃস্নেহে পালন করিয়াছিলেন, ভৃত্যকে দুই এক ঘা বেত মারা তখন একটা ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য ছিল না। হুসেন সাহ

সুবুদ্ধি রায়কে খুবই ভালবাসিতেন, কিন্তু রাজ্ঞী তাঁহাকে সমুচিত শাস্তি দিতে প্ররোচিত করেন; রাজা অনেক বুঝাইলেও রাজ্ঞী কিছুতেই সুবুদ্ধি রায়কে ক্ষমা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। হুসেন সাহ অগত্যা তাঁহার মুখে গোমাংস দিয়া তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিলেন। পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা চাহিয়া সুবুদ্ধি রায় জানিতে পারিলেন যে তাঁহার তুষানলে প্রাণত্যাগ করা উচিত। সুবুদ্ধি রায় সম্বন্ধে আমরা শেষে লিখিব। এই বিষয়টি চৈতন্য-চরিতামৃতে উল্লিখিত আছে এবং ঘটনাটি ঐ পুস্তক রচনার বেশী পরবর্ত্তী নহে, এজন্য উহা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয় না। তিনি যে তরুণ বয়সে এক হিন্দু ভূম্যধিকারীর ভৃত্য ছিলেন, একথা অনেক ঐতিহাসিকই লিখিয়াছেন।

পুরীর রাজা প্রতাপ রুদ্র যখন দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, তখন হুসেন সাহ অতর্কিতভাবে যাইয়া উড়িষ্যার অনেক দেবালয় ও বিগ্রহ ভগ্ন করেন, প্রতাপ রুদ্র বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য গৌড়বিজয়ের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব বহু লোকক্ষয় ও দেশের দুঃখ বৃদ্ধি হইবে, এই হেতু দেখাইয়া উক্ত সঙ্কল্প হইতে তাঁহাকে নিরস্ত করেন। কবি কর্ণপুর লিখিয়াছেন—প্রতাপ রুদ্রের বক্ষ লৌহকবাটের ন্যায় দৃঢ় ছিল, এবং প্রসিদ্ধ পাঠান মল্লগণ তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ভয় পাইতেন। ষ্টুয়ার্ট সাহেব মুসলমান লেখকদের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া লিখিয়াছেন, হুসেন সাহ পুরীর রাজাকে জয় করিয়া তাঁহাকে সামন্ত রাজার শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন। মুসলমান-প্রদত্ত এই বিবরণ অলীক।

দিল্লীশ্বর সেকেন্দর জৈনপুর দখল করিয়া বঙ্গবিজয়ার্থ অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু আলাউদ্দিন হুসেন সাহ তৎপুত্র দানিয়ালকে বহু উপঢৌকনসহ সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন। সেকেন্দর সাহ প্রীত হইয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। এই সন্ধিতে হুসেন সাহ স্বাধীন নৃপতি বলিয়া স্বীকৃত হন। তাঁহার সহিত ত্রিপুরারাজের যুদ্ধবিগ্রহাদি হইয়াছিল এবং তিনি চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরাবিজয়ার্থ পরাগল খাঁ নামক সেনাপতিকে ও তৎপুত্র ছুটি খাঁকে নিযুক্ত করেন। তাঁহার অন্যতম সেনাপতি মমারক খাঁকে ত্রিপুরেশ্বর যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া উদয়পুরের রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন কালীমন্দিরে বলি দিয়াছিলেন। ত্রিপুরাপ্রসঙ্গে সে সকল কথা পুনরায় উল্লেখ করা হইবে। ১৫২০ খৃঃ অব্দে (কাহারও কাহারও মতে ১৫১৯ খৃঃ), হুসেন সাহের মৃত্যু হয়। গৌড়ে তাঁহার সুচারু কারুলেখাঙ্কিত সমাধি-মন্দিরে সিংহদ্বারের দুই দিক্ ঘিরিয়া যে বটবৃক্ষ উত্থিত হইয়াছে, তাহার জটিল, স্থূল ও দীর্ঘ শিকড়গুলি মহাদেবের বক্ষোলম্বিত জটাজুটের মত দেখায়।

হুসেন সাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র নসরত সাহ পাঠান রাজাদের নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার ভ্রাতাদিগকে হত্যা বা শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন নাই,—বরঞ্চ তাঁহার ১৭ ভাইয়ের প্রত্যেককে রাজোচিত মর্য্যাদা ও উচ্চ শাসনকার্য্যভার দিয়াছিলেন। নসরত সাহের সময়ে দিল্লীতে অত্যন্ত রাজনৈতিক গোলযোগ উপস্থিত হয়, সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করিয়া বাবর ১৫২৬ খৃঃ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। ইব্রাহিমের ভ্রাতা মহম্মদ পলাইয়া নসরত সাহের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ইব্রাহিম লোডির এক কন্যাকে মহম্মদ সাহ লইয়া গিয়াছিলেন। নসরত সাহ এই কন্যাকে জাঁকজমকের সহিত বিবাহ করেন এবং মহম্মদকে রাজোচিত বৃত্তি দিয়

নাসির উদ্দীন নসরত সাহ—১৫১৯-১৫৩২ খৃঃ।

গৌড়ে থাকিতে সুবিধা করিয়া দেন। বাবর দেখিলেন, বঙ্গদেশকে নসরত সাহ পলায়িত আফগান আমির ও সেনাপতিদের একটা আড্ডায় পরিণত করিয়াছেন, সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া তিনি বঙ্গেশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া আসেন। নসরত সাহ তাঁহাকে অনেক উপঢৌকনাদি দিয়া নিরস্ত ও বশীভূত করেন। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হয়, তখন মহম্মদ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মোগলদের হস্ত হইতে জোয়ানপুর রাজ্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। সৈয়দ-বংশোদ্ভূত হইলেও নসরত সাহের প্রকৃতি অতি নিষ্ঠুর ছিল। কোন খোজাকে তিনি গুরুতর শাস্তি প্রদর্শনের ভয় দেখাইয়াছিলেন। একদিন যখন তিনি পিতার সমাধি-মন্দিরে উপাসনা করিতে গিয়াছিলেন, সেই খোজা তাঁহাকে সুবিধা পাইয়া হত্যা করে (১৫৩২-১৫৩৩ খৃঃ)। এই ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয়, কারণ ঐ বৎসর চৈতন্যদেবের লীলাবসান হইয়াছিল।

নসরত সাহের হত্যার পর তাঁহার পুত্র ফিরোজ সাহ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিন মাসের মধ্যে তাঁহার খুল্লতাত (নসরত সাহের ভ্রাতা) মহম্মদ সাহ তাঁহাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই নিষ্ঠুর কার্য্যের জন্য হাজিপুরের শাসনকর্ত্তা মকদুম আদম বিদ্রোহী হইয়া শের সাহের সঙ্গে মিলিত হন। শের সাহ উত্তরকালে হিন্দুস্থানের অধিপতি হইয়াছিলেন, এখন হইতেই সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। এদিকে বেহারাধিপতি তরুণবয়স্ক জেলাপ শের সাহের উপর বিরক্ত হইয়া মহম্মদের সহিত মিলিত হয়। শের সাহ বিহারের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জেলাপ এই দুর্গ অবরোধ করেন। এখানে পাঠান ও বাঙ্গালীদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। জেলাপের অধীনে গৌড়সৈন্য শের সাহের কৌশল বুঝিতে না পারিয়া পরাস্ত হইল (১৫৩৫ খৃঃ)। শের সাহ চুনার অধিকার করিয়া সমস্ত বিহার দেশ দখল করিয়া লইলেন এবং গৌড়ের দিকে অভিযান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গৌড়েশ্বর মহম্মদ বিপদে পড়িয়া হুমায়ুনের নিকট উপস্থিত হইয়া সাহায্যপ্রার্থী হইলেন; তখন বঙ্গদেশ শের সাহের করায়ত্ত।

আলাউদ্দিন ফিরোজ-সাহ—তিন মাস মাত্র, গিয়াসুদ্দিন মহম্মদ সাহ—১৫৩২-১৫৩৮ খৃঃ।

চুনার দুর্গ দখল করিয়া হুমায়ুন বঙ্গদেশটা শের সাহের হাত হইতে উদ্ধার করিতে মনঃস্থ করিলেন। কিন্তু তাহার গতি ও কার্য্যনীতি অতি মন্থর ছিল, সুবিধাগুলি হারাইয়া তিনি বঙ্গে উপস্থিত হইলেন। শের সাহ প্রাচীর তুলিয়া নিজের বাসস্থান শত্রুর অনধিগম্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। মোগল-সৈন্য বাঙ্গলার আবহাওয়া সহ্য করিতে না পারিয়া এখান হইতে চলিয়া যাইতে ব্যস্ত হইল। তিনমাস কালের মধ্যে কোন যুদ্ধবিগ্রহাদি হইল না। হুমায়ুনের মোগল-সৈন্য ক্রমশঃ অসন্তুষ্ট ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। শের সাহ একটা সন্ধির উদ্যোগ করিলেন, হুমায়ুন এই প্রস্তাব ভগবানের দান মনে করিয়া খুসী হইলেন। মোগল-সৈন্যদের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। শের সাহের গুরু দরবেশ খিলিলের যত্নে ও চেষ্টায় সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। হুমায়ুন শের সাহকে বঙ্গ ও বিহারের স্বাধীন নৃপতি বলিয়া স্বীকার

করিয়া লইলেন। হুমায়ুনের রাজ্যে শের সাহ উৎপাত করিবেন না এবং সম্রাটের গতিবিধির বিরুদ্ধে যাইবেন না, এই সর্তে কোরান স্পর্শ করিয়া শের সাহ অঙ্গীকার করিলেন। রাত্রে তখন মোগল-সৈন্যের আনন্দোৎসব চলিল।

শের সাহ কর্তৃক হুমায়ুনের পরাজয়— ১৫৩৯ খৃঃ।

কিন্তু শেষ রাত্রে শের সাহ কোরানের অবমাননা করিয়া ও সন্ধি-ভঙ্গপূর্ব্বক অতর্কিতভাবে হুমায়ুনের শিবির আক্রমণ করিয়া আট হাজার মোগল-সৈন্য হত্যা করিলেন। হুমায়ুন স্বয়ং অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক সন্তরণ করিয়া গঙ্গা পার হইলেন। এই ঘটনা ১৫৩৯ খৃঃ অব্দে ঘটিয়াছিল।

শের সাহের পিতার নাম হুসেন সুর। জোয়ানপুরের শাসনকর্ত্তা যুবক হুসেনকে সুদক্ষ ও পরিশ্রমী দেখিয়া সাসারাম ও তাণ্ড্রাতে কতকটা জমিদারী প্রদান করেন। হুসেনের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মে, ফরিদ এবং নিজাম। কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী হিন্দু ঘরের মেয়ে ছিলেন, তাঁহার অনেকগুলি পুত্রকন্যা হইয়াছিল। ফরিদ জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন।

শের সাহ—১৫৩২-১৫৪৫ খৃঃ।

হুসেন তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন, তজ্জন্য প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত ফরিদ জ্যেষ্ঠ হইলেও তাঁহার প্রতি স্বাভাবিক স্নেহের কতকটা বাধা উপস্থিত হইয়াছিল। জোয়ানপুরের শাসনকর্ত্তা জেমালের অনুগ্রহে ফরিদ ভাল লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি সাদির সমস্ত কবিতা মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে পারিতেন এবং তৎকাল-প্রচলিত সমস্ত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন; ইতিহাস ও কবিতার দিকেই তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। এই ফরিদ একদা একাকী এক ব্যাঘ্র স্বহস্তে বিনাশ করিয়া 'শের সাহ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শের সাহ কতক কাল জোয়ানপুরে আসিয়া তাঁহার পিতার জায়গীর শাসন-সংরক্ষণ করেন। হুসেন দেখিলেন, পুত্রের অসাধারণ প্রতিভায় কাজ অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। তিনি উঁহাকে ঐ কার্য্যেই বাহাল করিতে সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী, তাঁহার দুই পুত্র সোলেমান ও আহাম্মদের জন্য স্বামী কিছুই করিলেন না, এই আক্ষেপ-বাণী তাঁহার কর্ণে অবিরত গুঞ্জরণ করিতে লাগিলেন। সোলেমান এখন বড় হইয়াছে, তাহাকেই পরগনার শাসন কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হউক তিনি এই আবদার করিয়া হুসেনের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। শের অতি দক্ষতার সহিত কাজ করিতেছিলেন, সুতরাং তাঁহার পিতা প্রিয়তমার অনুরোধ লইয়া সত্যই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

বাল্য ও কৈশোর।

শের সাহ দেখিলেন, অবস্থা বড় জটিল হইয়া তাঁহাদের গার্হস্থ্য স্বচ্ছন্দতা ও শান্তি নষ্ট হইবার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। তখন তিনি স্বয়ং স্বেচ্ছায় ঐ পদ ছাড়িয়া দিয়া দিল্লী চলিয়া গেলেন। রাজধানীতে উপনীত হইয়া দৌলত নামক ইব্রাহিম লোডির এক প্রধান ওমরাহের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই ব্যক্তি শের সাহের কার্য্যদক্ষতা ও নানা গুণে মুগ্ধ হইয়া সম্রাটের সঙ্গে শেরের আলাপ-পরিচয় করাইয়া দিলেন। দৌলতের মারফত শের তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি দাবী করিয়া এক আবেদন

দরবারে পেশ করিলেন। তাহাতে তিনি বলিলেন, তিনি তাঁহার পিতার পদোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া যাহাতে জীবনযাপন করিতে পারেন তদুচিত ব্যবস্থা তিনি করিবেন। উত্তরে সম্রাট্ বলিলেন, শের ভাল লোক নহেন, যেহেতু তিনি পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই শেরের পিতৃবিয়োগ হইল এবং শের পৈতৃক বিষয়ের অধিকার-প্রাপ্ত হইলেন।

দিল্লীর বহুদর্শিতা।

বিষয়সম্পত্তির অধিকার লইয়া শেরের সঙ্গে তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতার কলহ চলিতে লাগিল—এসম্বন্ধে বেহারের অধিপতি সুলতান মহম্মদের মধ্যস্থতায় কোন ফলোদয় হয় নাই। সুলতান মহম্মদ বিরক্ত হইয়া সাদি নামক এক সেনাপতিকে সৈন্যসহ যাইয়া শেরের অধিকৃত সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া সোলেমানকে দিতে আদেশ করিলেন। সের সাহ সহসা আক্রান্ত হইয়া পরাস্ত হইলেন। এই দুর্ঘটনার পর শের সাহ কুড়া ও মাণিকপুরের শাসনকর্ত্তা জুনৈদ্ বরলাসের নিকট বহুমূল্য উপঢৌকন পাঠাইয়া তাঁহার সাহায্যলাভে সমর্থ হইলেন। বরলাস নূতন মোগল বাদসাহ বাবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্যে তিনি সুলতান মহম্মদকে পরাস্ত করিলেন এবং আগ্রা যাইয়া সম্রাটের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিলেন। বাবর শেরের দক্ষতাসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইলেও তাঁহার অকপটতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ ছিলেন। কথিত আছে, তিনি একদিন ওমরাহদের সঙ্গে শেরকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। একটা শক্ত মাংসখণ্ড শেরের পাতে পড়িয়াছিল, কিন্তু সম্রাটের গোপনীয় আদেশ অনুসারে তাঁহাকে একখানি মাত্র চামচ দেওয়া হইয়াছিল, ছুরি দেওয়া হয় নাই। মাংসখণ্ড শের আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হইয়া ভৃত্যদিগের নিকট একখানি ছুরি চাহিলেন, কিন্তু সম্রাটের গুপ্ত আদেশে তাহারা ছুরি দিতে বিলম্ব করিতে লাগিল। শের বিলম্বে অসহিষ্ণু হইয়া কোষ হইতে তরবারি খুলিয়া তাহা দিয়া অনায়াসে মাংস কাটিয়া খাইতে লাগিলেন। সম্রাট্ আমির খলিফা নামক এক মন্ত্রীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"এই শের খাঁ আফগান তুচ্ছ করিবার মত লোক নহেন। ইনি কালে বড়লোক হইবেন।"

খড়্গদ্বারা কাটিয়া মাংস-ভক্ষণ।

কিন্তু শের খাঁ বুঝিলেন, সম্রাট্-দরবারে থাকা তাঁহার পক্ষে নিরাপদ নহে। তিনি জোয়ানপুরে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে সুলতান মহম্মদের মৃত্যু হওয়াতে তিনি তরুণ রাজকুমার জেলালের অভিভাবক স্বরূপ সেই রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। জেলাল বড় হইয়া শেরকে আর পূর্ব্বের মত শ্রদ্ধাভক্তির চক্ষে দেখিতে পারিলেন না; এক সময় তিনি শের সাহের কাছে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, এখন শেরের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু ক্ষমতায় আতঙ্কিত হইয়া তাঁহার হত্যা পর্য্যন্ত কল্পনা করিতে লাগিলেন। এই ষড়যন্ত্র ধরা পড়িল, জেলাল পলাইয়া গৌড়ে যাইয়া মহম্মদ সাহের নিকট সেরকে পিতৃরাজ্য হইতে দূর করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন।

জেলালের পলায়নের পর শের সমস্ত বিহার দখল করিয়া ফেলিলেন, এই সময় চুনারের শাসনকর্ত্তা তাজি অতি পরাক্রান্ত লোক ছিলেন।* তাঁহার স্ত্রী লোদি মেল্লিকি পরমা সুন্দরী

ও গুণবতী রমণী ছিলেন, তাজ ইঁহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। ইহার কোন সন্তানাদি ছিল না, কিন্তু তাঁহার সপত্নীগণের অনেক পুত্র ছিল। তাহারা বিমাতার প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া একদা তাঁহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে অস্ত্রাঘাত করে;—আঘাত গুরুতর হয় নাই; কিন্তু তাঁহার চীৎকারে তাজ উপস্থিত হইয়া পুত্রদের কার্য্য ধরিয়া ফেলিলেন। পুত্রেরা এই অবস্থায় পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র চালাইয়া তাঁহাকে হত্যা করিল। লোদি মেল্লিকি এই বিপদে শের সাহের আশ্রয় যাচ্ঞা করিলেন। শের চুনারে আসিয়া সেই তরুণ ছেলেদিগকে নিরস্ত করিলেন। তাহারা সকলেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও শাসন কার্য্যের অযোগ্য ছিল। সুতরাং সমস্ত ক্ষমতাই শের সাহের হস্তগত হইল। লোদি মেল্লিকি শের সাহকে বিবাহ করিয়া যেটুকু বাকী ছিল তাহা পূর্ণ করিয়াছিলেন। বিহারের ন্যায় চুনারও শের সাহের অধিকার ভুক্ত হইয়া গেল।

বেহার অধিকার।

লোদি মেল্লিকি।

এদিকে গৌড়েশ্বর মহম্মদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে বঙ্গ বিজয়ে হুমায়ুন আসিতে ছিলেন। হুমায়ুন চুনার অধিকার ছাড়িয়া দিতে শের সাহকে আদেশ করিলেন, কিন্তু শের কাকুতি মিনতি করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। হুমায়ুন সন্ধিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু হুমায়ুন পূর্ব্বাঞ্চল ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার পর শের সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিলেন।

শের এখন শাশারামে ফিরিয়া রোটাস দুর্গের মালিক রাজা বর্কিসের সঙ্গে মৈত্রীর চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার অভিসন্ধি ছিল এই দুর্গ অধিকার করা, কিন্তু বাহিরে তিনি সৌহৃদ্য দেখাইয়া রাজা বর্কিসকে হস্ত গত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজা সেই সকল মৈত্রীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। শের সাহ উপায়ান্তর না দেখিয়া দূত-দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন "মোগল সম্রাট্ তাঁহার বিরুদ্ধে, এমতাবস্থায় তাঁহার ধনরাশি ও পরিবারের মহিলা-দিগকে রক্ষার উপায় কি? সুতরাং যদি তিনি দয়া করিয়া তাঁহার মহিলাবর্গকে ও ধনগুলি রোটাস দুর্গে স্থান দেন তবে শের নিশ্চিন্ত হইয়া মোগলদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারেন। যদি তিনি যুদ্ধে নিহত হন, তথাপি মোগলের হাতে তাঁহার পরিবারবর্গ ও ভাণ্ডার পড়ার অপেক্ষা রোটাস রাজের হাতে তাহা দেওয়া সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ মনে করেন, যেহেতু রাজা অতি উদার ও মোগলেরা নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন রাজা বাহাদুর লোভে পড়িয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন। তিনি শের সাহের ভাণ্ডার সহজে করায়ত্ত করিবার সুবিধা পাইয়া অতি দ্রুত সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। শের সাহ কতকগুলি চৌদলায় কতিপয় বৃদ্ধ স্ত্রীলোক, সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রধারী কয়েকটি সৈন্য এবং অপর কতকগুলি চৌদলায় বহু অস্ত্রধারী সৈন্য—এই ভাবে বাহকের সঙ্গে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া সিসার গুলিতে বহু বস্তা ভর্ত্তি করিয়া সেগুলিও দোলায় চড়াইয়া দিয়া বাহকের সঙ্গে পাঠাইলেন। দ্বাররক্ষীরা প্রথম দুই একটি দোলা খুলিয়া বৃদ্ধ স্ত্রীলোক ও শেষের বস্তাটি খুব শক্ত ধাতব পদার্থ শক্তরূপে আবদ্ধ দেখিয়া আর কোন সন্দেহ করিল না। রোটাস রাজা যখন গোঁফে চাড়া দিয়া এই আগন্তুক সারিবন্দী মহিলা ও ধন ভাণ্ডার দেখিতে ছিলেন,

রোটাস দুর্গ দখল।

তখন তাঁহার সৃক্কণী ও লেলিহান জিহ্বা হয়ত জলার্দ্র হইয়াছিল। কিন্তু যখন বস্তাগুলি নামানো হইল, তখন তাহা চিরিয়া ফেলিয়া গুলি বাহির করিয়া দোলার সৈনিকগণ গুলি ছুড়িতে আরম্ভ করিল—অকস্মাৎ মহিলা-বেশী শত শত যোদ্ধা ঘোমটা খুলিয়া শাণিত খড়্গ লইয়া ব্যাঘ্রবৎ রোটাস দুর্গের প্রহরীদিগকে বধ করিতে লাগিল—তখন রোটাস-রাজ পলাইতে পথ পাইলেন না। বন্য ব্যাঘ্র শেরের সৈন্যগণের হস্তে ধনলুব্ধ রাজা নিহত হইলেন।

রোটাস দুর্গের মত এরূপ অজেয় দুর্গ ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয়টি ছিল না। একটি পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় এই দুর্গ নির্ম্মিত, অতি বন্ধুর ও দুরারোহ দুই মাইল ব্যাপী এক সরু পথ বাহিয়া এই দুর্গের প্রথম তোরণে প্রবেশ করিতে হয়। তোরণ তিনটি—একটির বহু ঊর্দ্ধে আর একটি—এই ভাবে স্থিত। প্রত্যেকটি তোরণ অনেকগুলি কামান ও বড় বড় প্রস্তর খণ্ড কর্তৃক সুরক্ষিত। সর্ব্বোর্দ্ধে দুর্গের চতুষ্কোণ সীমারেখা দশ মাইলের অধিক স্থান ব্যাপক—তন্মধ্যে নগর, গ্রাম ও শস্যক্ষেত্র আছে, কয়েক ফুট নিচেই সুনির্ম্মল জলধারা। এক দিকে দুরারোহ উচ্চনীচ বন্ধুর একটা দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশের উপান্তে শোণ নদী,—অপর দিকেও অপর একটি নদী—এই দুই নদী সুদীর্ঘ পথ অবতরণ করিয়া নিম্নের দিকে সুগভীর উপত্যকা ভূমিতে মিলিত হইয়াছে। এই ভূমি এরূপ ঘন তরুসঙ্কুল অরণ্যপরিপূরিত যে উহাতে কোন ব্যক্তির প্রবেশ অসম্ভব হইতেও অসম্ভব।

এই একান্ত নিরাপদ্ নিভৃত স্থানে স্বীয় পরিবার ও ধনরাশি সুরক্ষিত করিয়া শের সাহ কর্ম্মনাশা তীরে হুমায়ুনের সঙ্গে কোরান স্পর্শ করিয়া যে সন্ধি করিয়াছিলেন তাহা একটা খেলনার ন্যায় ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অতর্কিত ভাবে সম্রাট্‌কে পরাজিত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে।

সকল দিক্ হইতে দেখিলে শের সাহের তুল্য প্রতিভা-সম্পন্ন কর্ম্মবীর এবং যোদ্ধা ভারতবর্ষে তখনকার দিনে আর ছিল না। তাঁহার কথার কোন মূল্য ছিল না—তাঁহার সন্ধি ভাবী কোন চক্রান্তের অভিসন্ধি ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। তাঁহার কোরান স্পর্শ কতক গুলি কাগজ ছোঁয়া অপেক্ষা গুরুতর কিছু ছিল না। তথাপি তিনি হুমায়ুনকে দিল্লী পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া সমস্ত হিন্দুস্থান অধিকার করার পর যে ন্যায়পরতা, ক্ষমা, ও শাসন-দক্ষতা দেখাইয়া ছিলেন তাহা প্রকৃতই প্রশংসনীয়। শের সাহের ন্যায়পরতা ও বিবিধ গুণরাশি সার্ব্বভৌম রাজপদ পাইবার পর হইতে আরব্ধ হইয়াছিল।

সম্রাট্ হইবার পূর্ব্বে ও পরে।

দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিয়া শের সাহ বাঙ্গলার মসনদে খিজির খাঁ নামক শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। এই ব্যক্তি ভূতপূর্ব্ব বঙ্গেশ্বর মহম্মদ সাহের কন্যাকে বিবাহ করিয়া খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে লাগিলেন, তিনি খুব রাজকীয় ভাবে চলাফেরা করিতে লাগিলেন, এবং মহম্মদ সাহের আত্মীয় ও ওমরাহগণকে বশীভূত করিলেন। লোকে কাণাকাণি করিতে লাগিল যে ইহার অভিসন্ধি ভাল নহে। শের সাহ অত্যন্ত সন্দিগ্ধ প্রকৃতি ছিলেন, তিনি সংবাদ পাইয়া বাঙ্গলায় চলিয়া আসিলেন।

খিজির খাঁ।

খিজির খাঁ তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি শের সাহ খাস ভুক্ত করিলেন।

খিজির খাঁর হাত হইতে শের সাহ শাসন ভার কাড়িয়া লইয়া বাঙ্গলা দেশকে দ্বাদশ মণ্ডলে বিভক্ত করিয়া ইহাদের সকলের উপর কাজি ফজিলৎ নামক এক বিজ্ঞ, রাজনীতি-কুশল ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন। দ্বাদশটি শাসনকর্ত্তার অধিকার সাম্য থাকে এবং কেহ কাহারও উপর মাথা ডিঙ্গাইয়া না উঠেন,—এই সকল পরিদর্শনের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। শের সাহের উপর তাহাদের কোন ভাবান্তর উপস্থিত হয় কি না অথবা কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া তাঁহারা স্বাধীন হইতে চেষ্টা করেন কি না ইত্যাদি সম্বন্ধে কাজি সাহেবকে নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে দিল্লীতে সংবাদ পাঠাইতে হইত। এই সকল ব্যবস্থা করিয়া শের সাহ বাঙ্গলা দেশে সম্পূর্ণ শান্তি স্থাপন করিলেন, তথায় আর পাঁচ বৎসর কোন গোলযোগ হয় নাই। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে শের বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করেন, তথায় বোমাতে আগুন লাগায় তিনি নিহত হন।

শের সাহ অনেক মসজিদ ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি সোনার গাঁ হইতে পঞ্জাবের নীলাভ নামক সিন্ধুর এক শাখা পর্য্যন্ত ১,৫০০ ক্রোশ-ব্যাপী একটি রাস্তা প্রস্তুত করা। এই রাস্তার প্রতি ক্রোশ পরে পরেই পান্থশালা স্থাপিত হইয়াছিল এবং পথিকের শ্রমাপনোদনের জন্য দুই ধারে বৃক্ষ পঙ্‌ক্তি রোপিত ও কূপ খাত হইয়াছিল। তিনি ঘোড়ার ডাক সর্ব্ব প্রথম প্রচলিত করেন এবং রাজ্যের পরিমাণ-নির্ণয় ও রাজস্ব নির্দ্ধারণের জন্য যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সুপ্রসিদ্ধ তোডরমল্ল সেই ভিত্তির উপর তাঁহার বহু বিস্তৃত জরিপ কার্য্য সুসম্পাদিত করিয়াছিলেন।

শের সাহের দ্বিতীয় পুত্র সেলিম সাহ দিল্লীর তক্তে আরোহণ করিয়া মহম্মদ সাহ সুর নামক এক আত্মীয়কে বাঙ্গলার কর্তৃত্ব প্রদান করেন। সেলিম সাহ মহম্মদ আদিল কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলে মহম্মদ সাহ সুর বাঙ্গলার স্বাধীন নৃপতি বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করেন এবং জোয়ানপুর পর্য্যন্ত অধিকার করেন। মহম্মদ আদিলের মন্ত্রী হিমুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইয়া বঙ্গেশ্বর ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে ছাপরা ঘাট নামক স্থানে নিহত হন।

মহম্মদ সাহ—১৫৫৩-১৫৫৫ খৃঃ।

মহম্মদ সাহ সুরের পুত্র খিজির খাঁ 'বাহাদুর সাহ' উপাধি গ্রহণ করিয়া বঙ্গের অধিপতি হইলেন। কিন্তু ইনি প্রবাসে সম্রাটের পরে সঙ্গে সমরক্ষেত্রে লিপ্ত থাকার সময় সাহ বক্স নামক এক ব্যক্তি বাঙ্গলার তক্ত দখল করিয়াছিলেন। বাহাদুর তাঁহাকে নিহত করিয়া অচিরে সম্রাট মহম্মদ আদিলের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিযান করিলেন। মুঙ্গেরের নিকট তোরতর যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। সম্রাট এই যুদ্ধে নিহত হইলেন, এবং বাহাদুর বঙ্গদেশ ছাড়া জোয়ানপুরও স্বাধীকার ভুক্ত করিয়া লইলেন। বাহাদুর সাহ ১৫৬১ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বাহাদুর সাহ—১৫৫৫-১৫৬০ খৃঃ।

বাহাদুরের সন্তান ছিল না। তাঁহার ভ্রাতা জালাল সাহ রাজা হইলেন কিন্তু তিনি তিন বৎসর পরে গৌড়ে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার তরুণ বয়স্ক পুত্র সিংহাসন আরোহণ করেন। গিয়াসুদ্দিন নামক এক হত্যাকারীর হস্তে এই পুত্র নিহত হইলেন। (অতি অল্প সময়ের জন্য হত্যাকারী গিয়াসুদ্দিন সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সুপ্রসিদ্ধ কালাপাহাড়, যাঁহার সম্বন্ধে দেশময় নানারূপ কিংবদন্তী আছে, তিনি জালাল সাহের সময় বিদ্যমান ছিলেন।) আমরা সংক্ষেপে সেই কিংবদন্তীর কতকগুলির উল্লেখ করিব। (দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয় তারিখ-ই শাজেহান, তারিখ-ই শেরসাহী প্রভৃতি পারসী ইতিহাস এবং রাজসাহী জেলার কিংবদন্তী অবলম্বনে কালাপাহাড়ের জীবনচরিত লিখিয়াছেন বলিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

জালাল সাহ—১২৬০-১২৬৩। জালালের এবং তৎপুত্রের হত্যা গিয়াসুদ্দিন—১২৬৩ খৃঃ।

তাঁহার লেখা অনুসারে কালাপাহাড়ের নাম কালাচাঁদ রায়। তাঁহার বাল্যকালে সকলে তাঁহাকে 'রাজু' বলিয়া ডাকিত। রাজসাহীর অন্তর্গত বীরজাওন গ্রামে [illegible] তাঁহার বাড়ী ছিল এবং তিনি প্রসিদ্ধ একটাকিয়া জমিদার-বংশে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের উপাধি ভাহড়ী এবং ইনি জগদানন্দ রায়ের বংশে জাত ("জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের নন্দন"—কৃত্তিবাস)। কালাপাহাড়ের পিতা নয়ানচাঁদ রায় গৌড়েশ্বরের ফৌজদারী বিভাগে উচ্চ কাজ করিতেন, এবং তাঁহার উপাধি ছিল "ভুঁইয়া।" কালাপাহাড়ের মাতৃকুল বৈষ্ণব ছিলেন এবং তিনিও অল্প বয়সে হরিভক্ত ছিলেন। অকালে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে মাতামহই তাঁহার অভিভাবক হইয়াছিলেন। শ্রীপুর গ্রামবাসী রাধামোহন লাহিড়ীর [illegible] কন্তাকে ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন।

কালাপাহাড়।

কালাপাহাড় বলিষ্ঠ, সুদর্শন এবং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন। একটাকিয়ার ভাদুড়ী বংশের রীতি অনুসারে তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গলা প্রভৃতি ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করিয়া অশ্বচালনা ও অস্ত্রব্যবহার প্রভৃতি বীরোচিত গুণেও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তখন নাসের সাহের পুত্র বরাবক সাহ গৌড়ের বাদসাহ। কালাপাহাড় তাঁহার বিবিধ সদ্গুণ-দ্বারা শীঘ্রই বাদসাহের দরবারে উচ্চ চাকুরী পাইলেন এবং গৌড়ে বাদসাহের প্রাসাদের অতি নিকটে উচ্চ হিন্দু আমলাদের সহযোগে রাজকর্ম্মচারীদের জন্য নিয়োজিত গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। কালাপাহাড় রোজ অতি প্রত্যূষে মহানন্দায় স্নান করিতে যাইতেন। নবাব-কুমারী দুলারী বিবি তখন সপ্তদশ বর্ষীয়া পরমা সুন্দরী। তিনি প্রত্যহ প্রাতে এই রূপবান্ যুবককে স্নানান্তে বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে দেখিতেন। একদিন তিনি সহচরীদিগকে বলিলেন, 'এই যুবক ছাড়া আমি অন্য কাহাকেও বিবাহ করিব না।' অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির প্রতি এতাদৃশ অনুরাগ অনুচিত, সহচরীরা এই কথা বলিলে রাজকুমারী উত্তরে বলিলেন 'উঁহার গলায় পৈতা—উনি ব্রাহ্মণ, ইঁহার পশ্চাৎ ছাতা-বরদার এবং হাতে সোণার কোষা সুতরাং ইনি ধনী,—ইনি সুকণ্ঠে স্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে

দুলারী বিবির প্রেম।

যান সুতরাং মূর্খ নহেন। তারপর ইহার মনভুলানো রূপ,—তাহার সাক্ষী—আমার দুটি চক্ষু, আর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।'

বাদসাহ ও বেগম উভয়েই রাজকুমারীর মনের ভাব জানিলেন। অনুসন্ধানে জানিলেন, ইনি একটাকিয়ার ভাদুড়ী বংশজাত। এই বংশের একজন যুবকের সঙ্গেই পাঠান বাদসাহেরা কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, রাজা গণেশও উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং তাঁহাদের আপত্তির কোন কারণ রহিল না। বাদসাহ কালাপাহাড়কে ডাকাইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক কুমারীকে বিবাহ করিবার জন্য জেদ করিলেন, কালাপাহাড় তেজের সহিত এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া বাদসাহ কালাপাহাড়কে শূলে দেওয়ার আদেশ করিলেন। যখন সকল আয়োজন হইয়াছে, তখন অকস্মাৎ ভূতলে পতিত একটি বিদ্যুতের ন্যায় দুলারী বিবি রাজপ্রাসাদ হইতে অবতরণ করিয়া ঘাতককে আদেশ করিলেন, "আগে আমায় হত্যা করিয়া, তারপরে ইহার অঙ্গ স্পর্শ কর।" রাজকুমারীর অসামান্ত রূপ এবং অপূর্ব্ব অনুরাগ দেখিয়া কালাপাহাড়ের গোঁড়ামি ভাঙ্গিয়া গেল, জলন্তের আঘাতে পাষাণবেদী বিদীর্ণ হইল। কালাপাহাড় বিবাহে সম্মত হইলেন, কিন্তু তিনি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিলেন না। তিনি বহু অনুনয় বিনয় এবং অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াও পুরীর পাণ্ডা ও পুরোহিতদের নিকট হইতে ব্যবস্থা পাইলেন না। জগন্নাথে যাইয়া এ অবস্থায় কি করিবেন, প্রত্যাদেশের জন্য সাত দিন অনাহারে ধরা দিয়া রহিলেন, কিন্তু কোন প্রত্যাদেশ পাইলেন না; বরং পাণ্ডারা তাঁহাকে অপমান করিয়া তাঁহাকে শ্রীমন্দির হইতে তাড়াইয়া দিল।

বিবাহ ও ধর্ম্মান্তর।

ইহার পর প্রতিশোধের পালা। সে প্রতিশোধ যে কি ভয়ানক, তাহা সমস্ত পূর্ব্বভারত হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে। মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বাদসাহের সৈন্যের সাহায্যে তিনি হিন্দুধর্ম্ম জগৎ হইতে একেবারে বিলোপ করিবেন, এই সঙ্কল্প করিয়া বসিলেন। ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী হওয়ার পর তাঁহার নাম হইল "মহম্মদ ফর্ম্মূলি", কিন্তু তাঁহার 'কালাপাহাড়' নামই দেশবিশ্রুত। এই নাম অবশ্য হিন্দুরা দিয়াছিলেন; তাঁহার নাম কালাচাঁদ রায় হইতেই সম্ভবতঃ এই নামের উদ্ভব। এই নাম হিন্দুর দেবতা ভক্তদিগের পক্ষে রোগজ্ঞ হইয়া গিয়াছে, কবিরাজ বলিতে যেরূপ বৈদ্যকেই শুধু বুঝায়, কালাপাহাড় বলিতেও সেইরূপ দেবদ্রোহীকে বুঝায়।

প্রতিশোধ।

উড়িষ্যার পাণ্ডাদের কৃত অপমান তিনি ভুলিতে পারেন নাই, সুতরাং প্রথমেই বাদসাহের সৈন্য লইয়া উৎকলবিজয়ার্থ অভিযান করিলেন। কালাপাহাড় উৎকল-পতিকে যুদ্ধে নিহত করিয়া শ্রীক্ষেত্রে যেরূপ রোমহর্ষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার নহে। উড়িষ্যা হইতে গৌড়ে প্রত্যাগমন কালে তিনি শত শত হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া দেবমূর্ত্তিসমূহ অপবিত্র স্থানে ফেলিয়া বহু লোককে অত্যাচার পূর্ব্বক ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া যে অত্যাচারপূর্ব্বক কাণ্ড করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এখনও ভারতীয় চিত্রশালাগুলিতে কালাপাহাড়ের দেব-অঙ্গে এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ মন্দির-স্তম্ভে প্রাপ্ত হওয়া যায়। গৌড়ে ফিরিয়া আসিয়া কালাপাহাড়

ভাহুড়িয়া, সাঁতোড় ও পূর্ব্ববঙ্গের দিকে অগ্রসর হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভাহুড়িয়ার রাজা কালাপাহাড়ের মাতা ও তাঁহার দুই পত্নীকে স্বীয় প্রাসাদে লইয়া আসাতে অগত্যা তিনি তাঁহার অভিযানের মুখ ফিরাইয়া কামরূপ, আসাম, দিনাজপুর, রংপুর ও কোচবেহারের কতকাংশে ঘোর অত্যাচার করিয়াছিলেন ; কথিত আছে তাঁহার নিষ্ঠুরতা দর্শনে অনেক মুসলমানও ব্যথিত হইয়া পলায়নপর হিন্দুগণকে রক্ষা করিবার গোপন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এই সময়ে বেলোল লোদি দিল্লীর সিংহাসনে আসীন, তিনি জোয়ানপুরের নবাবের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। জোয়ানপুরাধিপতি কালাপাহাড়কে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। কালাপাহাড় যুদ্ধে এরূপ দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন যে

কাশী ধ্বংস।

এই সংবাদ পাইয়া বেলোল লোদি চক্রান্তপূর্ব্বক সৈয়দ নামক এক রাজনীতি-কুশল কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া তাঁহাকে কৌশলক্রমে বন্দী করিয়া দিল্লীতে লইয়া আসেন। বিলোল লোদির সেনাপতি হইয়া এবার কালাপাহাড় জোয়ানপুরের বাদসাহের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া চলিলেন। ২৪ বৎসর যাবৎ দিল্লীশ্বরের সঙ্গে জোয়ানপুরের যুদ্ধ চলিয়াছিল, কালাপাহাড় এই যুদ্ধের সমাপ্তিবাক্য উচ্চারণ করিলেন। জোয়ানপুরাধিপ পরাস্ত ও নিহত হইলেন, এবং তাঁহার রাজ্য সম্রাটের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। জোয়ানপুর হইতে আসিবার মুখে তিনি সেই প্রদেশের নিকটবর্ত্তী সমস্ত দেবতা ও দেবমন্দির ভগ্ন করিয়াছিলেন। কাশীধামে এক কেদারেশ্বর-লিঙ্গ ভিন্ন প্রাচীন দেবতা আর একটিও রহিল না। পাণ্ডারা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িল, এবার সেই ডাক মালিকের সিংহাসনের নিকট পৌঁছিল।

কালাপাহাড়ের এক মাতুলানী কাশীবাসিনী ছিলেন। কালাপাহাড়ের দুরাচার সৈন্যেরা তাঁহাকে ধর্ষণ করিল। কালাপাহাড়ের কাছে আসিয়া তিনি কাঁদিয়া সমস্ত কথা বলিয়া

অনুশোচনা।

তৎসাক্ষাতেই বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। কালাপাহাড় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং সেই দিন সমস্ত অত্যাচার বন্ধ করিয়া দিলেন, ফলে কেদারেশ্বর-লিঙ্গ রক্ষা পাইলেন।
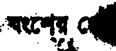
সান্ন্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন, সেই দিবস রাত্রিতে কালাপাহাড় সুরক্ষিত গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরদিন আর তাঁহাকে দেখা গেল না। কেহ বলেন, তিনি মনের

নিরুদ্দেশ।

অনুতাপে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, কেহ বলেন তিনি গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছিলেন, কাহারও মতে কাশীর পাণ্ডারা তাঁহাকে নিদ্রিত অবস্থায় হরণ করিয়া হত্যাপূর্ব্বক শব মাটীতে পুঁতিয়া ফেলিয়াছিল, কেহ কেহ বলেন বেলোল লোদি তাঁহার ক্ষমতাবৃদ্ধি দর্শনে গোপনে গুপ্তচর-দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করাইয়াছিলেন, কেহ কেহ আবার একথাও বলেন যে তিনি বিনাশরূপী রুদ্রের অংশে জন্মিয়াছিলেন, বিশ্বেশ্বরে লীন হইয়া গিয়াছিলেন,—সার কথা এই যে, কাশীতে অত্যাচারের তৃতীয় দিবসে তিনি নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন। তিনি একাদশ বর্ষ হিন্দুধর্ম্ম-নাশে ব্রতী ছিলেন। বারবক সাহের কন্যা দুলারীর গর্ভে তাঁহার এক কন্যা হইয়াছিল—উঁহার নাম 'দুলেমা'।

কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিকদের বর্ণিত বিবরণের সহিত রাজসাহীতে প্রচলিত কিংবদন্তীর কোন কোন বিষয়ে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। এই অনৈক্য রাজাদের নাম সম্বন্ধে হওয়া স্বাভাবিক,—ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞতা-নিবন্ধন জনসাধারণ এক রাজার কথা মাঝে মাঝে অন্য এক রাজার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া থাকে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এবং দুর্গাচরণ সান্যাল উভয়েই কাল-সম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া দুইজন কালাপাহাড় পরিকল্পনা করিয়াছেন। আমার মনে হয় উক্ত দুই গ্রন্থকারই এসম্বন্ধে ভ্রম করিয়াছেন। কালাপাহাড় বাস্তবিক একজন মাত্র ছিলেন, তিনি দ্বিতীয় রূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন নাই। সোলেমান খাঁ ও দাউদ খাঁর রাজত্বকালেই কালাপাহাড়ের সমস্ত সামরিক অভিযান হইয়াছিল। সোলেমান খাঁর রাজত্বকালে (১৫৬৪-১৫৭২ খৃঃ) কালাপাহাড় উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দ দেব ও তাঁহার বিদ্রোহী সামন্তরাজ রঘুভঞ্জ ছোট রায় উভয়কেই পরাস্ত করিয়া নিহত করেন। মনোমোহন চক্রবর্তী লিখিয়াছেন ঐ ঘটনা ১৫৬৮ খৃঃ হইয়াছিল (রাখালদাসবাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় ভাগ—১৩২৪ বাং ৩৬৭ পৃঃ)। তখন সোলেমান কররানী বঙ্গের বাদসাহ। ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে কালাপাহাড় কোচবেহার-রাজভ্রাতা সুপ্রসিদ্ধ চিলারায় (শুক্লধ্বজকেও) পরাস্ত করেন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কাকশালদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন; তখন দাউদ খাঁ বঙ্গেশ্বর। সুতরাং আমরা কালাপাহাড়ের প্রায় সমস্ত সামরিক বিজয় এই দুই নৃপতির রাজত্ব কালে সংঘটিত হইয়াছিল, এরূপ দেখিতে পাইতেছি।

কিন্তু যদি বরাবক খাঁর কন্যাকে কালাপাহাড় বিবাহ করিয়া থাকেন এবং বেলোল লোদির পক্ষ হইয়া জোয়ানপুরের নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া থাকেন, তবে পূর্বোক্ত ঘটনাগুলির সঙ্গে তাঁহার কালের একটা সামঞ্জস্য করা কঠিন হয়। ঐ ঘটনাগুলি সমস্তই ১৫৬৮ হইতে ১৫৭৫—এই সাত বৎসর কাল ব্যাপক। এদিকে বেলোল লোদি দিল্লীর সিংহাসনে ১৪৫১ খৃঃ হইতে ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং বরাবক সাহার বঙ্গের রাজত্ব কাল ১৪৫৯-৭৪ খৃঃ পর্য্যন্ত। উড়িষ্যা ও কোচবেহার রাজ-ঘটিত ব্যাপার এই দুই বাদসাহের রাজত্বের এক শতাধিক কাল পরে সংঘটিত হইয়াছিল। এদিকে আবার সান্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন যে কালাপাহাড় ৩৪ বৎসর বয়সে নিরুদ্দেশ হন, তখন দুলারী বিবির গর্ভে তাঁহার একটি মাত্র কন্যা সন্তান জন্মিয়াছিল। এই প্রশ্নের উত্তর দুরূহ দেখিয়া লেখকগণ দুইজন কালাপাহাড়ের প্রবাদের পরিকল্পনা করিয়াছেন। সান্যাল মহাশয় দ্বিতীয় কালাপাহাড়ের সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ খুঁজিয়া পান নাই। যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহা একই কথার পুনরুক্তির মত শোনায়। দুই ভিন্ন স্থানে একই প্রবাদ প্রচলিত থাকিলে যেটুক প্রভেদ থাকিতে পারে এই পার্থক্য প্রায় সেইরূপ। তিনি লিখিয়াছেন "দ্বিতীয় [illegible]পাহাড়ের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ বলিবার উপায় নাই। তাঁহার পূর্ব্ব নাম কি ছিল এবং শিক্ষা কতদূর হইয়াছিল এবং তাঁহার পিতার নাম কি ছিল কিছুই জানা যায় নাই" (সামাজিক ইতিহাস ১১৩ পৃঃ)। [illegible] কালাপাহাড় প্রথম কালাপাহাড়ের ন্যায় সুন্দরাকৃতি ও বলবান্ পুরুষ ছিলেন। [illegible] প্রথম কালাপাহাড়ের ন্যায় মুসলমান হইয়া মুসলমানী বিবাহ করিয়াছিলেন। উভয়েই

ঘোরতর হিন্দুবিদ্বেষী হইয়াছিলেন এবং হিন্দুধর্ম্মের অনিষ্ট করিয়াছিলেন" (সামাজিক ইতিহাস, ১১৫ পৃঃ)। সুতরাং দেখা যাইতেছে কালের গোলমাল দূর করিতে অসমর্থ হইয়া লেখকেরা দ্বিতীয় কালাপাহাড় নামক এক ব্যক্তির কল্পনাপূর্ব্বক গোঁজামিল দিয়াছেন। কিন্তু অন্য এক স্থান হইতে আমরা যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে অনায়াসে এই গোলযোগের সমাধান হইয়া যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানদের একখানি ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছিল। জেমস্ ওয়াইজ সাহেব তখন ঢাকার সিভিল সার্জ্জান, তিনি তৎকালের জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান শোভান দাদ খাঁকে এতদর্থে অনুরোধ করেন। দেওয়ান সাহেব মুন্সী রাজচন্দ্র ঘোষের উপর এই কার্য্যের ভার দেন। মুন্সী মহাশয় বিশেষ তৎপরতার সহিত এই কার্য্য আরম্ভ করেন। জঙ্গলবাড়ীর দপ্তরের দলিল, কাগজ-পত্র, স্থানীয় প্রবাদ ও জনশ্রুতি প্রভৃতি যাবতীয় উপকরণ এতজ্জন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। মুন্সী মহাশয় কালীকুমার চক্রবর্ত্তী নামক জঙ্গলবাড়ী স্কুলের প্রধান পণ্ডিত, এবং ষ্টেটের প্রধান কর্ম্মচারী ইদ্রিস খাঁর বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় ২০ বৎসর জঙ্গলবাড়ীতে ছিলেন এবং অনেক বিষয় অপর সকল ব্যক্তি হইতে বেশী জানিতেন। অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত এই কার্য্য আরব্ধ হইলেও শোভান দাদ দেওয়ানের আকস্মিক মৃত্যুতে এই কার্য্য কিছু কাল স্থগিত ছিল। কিন্তু নূতন দেওয়ান আজিম দাদ খাঁ স্বয়ং এই কার্য্যে উদ্যোগী হওয়াতে এই ইতিহাস সঙ্কলনে সমস্ত বিঘ্ন দূর হইল। এদিকে ঢাকা ডিভিসনের কমিসনার লাউস সাহেব এবং প্রখ্যাতনামা (তখন তরুণবয়স্ক) রমেশচন্দ্র দত্ত মৈমনসিংহের এ্যাসিষ্টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়দের পুনঃ পুনঃ তাগিদে পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হইল। এই পুস্তক একাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। বইখানি যে অভ্রান্ত তাহা বলা যায় না, তবে ইহার অধিকাংশ ভুল স্বেচ্ছাকৃত। ঈসা খাঁকে দাউদ খাঁর সহোদর প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া লেখকগণ দেওয়ান বংশের রাজকীয় রক্ত ঘোষণা করিবার জন্য যে ঐতিহাসিক গোঁজামিল দিয়াছেন, তাহা আধুনিক ঐতিহাসিকগণের চক্ষে সহজেই ধরা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু দেওয়ানদের বংশ-গৌরব বৃদ্ধির জন্য লেখক যে আয়োজন করিয়াছেন, তাহা ছাড়া আর সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহারা প্রামাণিক ঐতিহাসিক উপকরণের উপর নির্ভর করিয়াছেন ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে যে সকল কথা লিখিয়াছেন তাহা সর্ব্বৈব বিশ্বাস-যোগ্য। এই ইতিহাসে লিখিত আছে, কালাপাহাড় বাদসাহ জালাল সাহের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মুন্সী রাজচন্দ্র ঘোষ প্রামাণিক ঐতিহাসিক সংবাদ পাইয়াই একথা লিখিয়াছিলেন, যেহেতু দেওয়ান বংশের [illegible] সঙ্গে এই কথার কোন সংস্রব নাই।

এখন যদি বাদসাহ জালালের কন্যাকে কালাপাহাড় বিবাহ করিয়া থাকেন—তবে ঐতিহাসিক কাল নির্ণয় সম্বন্ধে সমস্ত গোল চুকিয়া যায়। জালাল সাহের রাজত্ব কাল ১৫৬০-৬৩ খৃঃ অব্দ। কালাপাহাড়ের কর্ম্ম-জীবনের ইতিহাস যাহা প্রামাণিক ইতিবৃত্তে পাওয়া যায়, তাহা ১৫৬৮ হইতে ১৫৭৫ পর্য্যন্ত। বেলোল লোদির নাম সম্বন্ধে ও জনশ্রুতিতে এই

ভাবের কোন গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। এই সকল প্রমাণের পর আমরা অনায়াসে সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, কালাপাহাড় মাত্র একজন ছিলেন এবং তাঁহার বিবাহ ১৫৬০ হইতে ১৫৬৩ এই তিন বৎসরের মধ্যে কোন সময় হইয়াছিল এবং তিনি ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই তাঁহার ধ্বংসলীলা সমাধা করিয়া অনুমান ৩৪ বৎসরে নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে যদি তাঁহার বিবাহ হইয়া থাকে এবং ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে যদি তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার বয়স তখন ৩০ হইতে ৪০ বৎসরের মধ্যে ছিল।)

জালালের পুত্র এবং তাঁহার হত্যা গিয়াসুদ্দিন—১২৬৩ খৃঃ।

কেরানী (বা কররানী) বংশ শের সাহ ও তৎপুত্র সেলিম সাহ কর্ত্তৃক আদৃত হইয়া অনেক স্থানের শাসন কর্ত্তৃত্ব করিয়া ছিলেন। সম্রাট্ মহম্মদ আদিলের আনুগত্য ইহারা করেন নাই। বরাবর শের সাহের উত্তরাধিকারীদের আনুগত্য করিয়া আসিয়াছিলেন।

গিয়াসুদ্দিনের বঙ্গ দখলের সংবাদ শুনিয়া সোলেমান কররানীর ভ্রাতা তাজ খাঁ কররানী অনায়াসে তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া সিংহাসন দখল করেন। তিনি ইহার পরে এক বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। (সোলেমান তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যুর পর ১৫৬৪-৬৫ খৃঃ অব্দে বঙ্গের মসনদ অধিকার করেন। তিনি গৌড়ের নিকটবর্ত্তী তাণ্ডা নামক স্থানে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিয়া সম্রাট্ আকবরকে বহু উপঢৌকনাদি পাঠাইয়া প্রীত করেন। ইনি ১৫৬৭ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যা বিজয় করেন, ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে কোচবিহার অধিকার করেন; ইনি পুনঃ পুনঃ সম্রাট্ আকবরকে ভেট পাঠাইয়া প্রসন্ন রাখিয়াছিলেন। (তাঁহার রাজত্ব মোটের উপর নির্ব্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণ ছিল। সোলেমান কররানী ১৫৭২ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তখন কবিকঙ্কন মুকুন্দ রাম আড়ায়া ব্রাহ্মণ-ভূমিতে থাকিয়া তাঁহার চণ্ডী-কাব্য শেষ করিয়াছিলেন।)

তাজ খাঁ কররানী—১২৬৩-৬৪ খৃঃ; সোলেমান কররানী—১৫৬৪-১৫৭২ খৃঃ।

সোলেমানের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াজিদ সাহ সিংহাসন আরোহণ করেন (১৫৭২ খৃঃ অব্দে)। কিন্তু আফগান ওমরাহগণ তাঁহার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা দাউদ খাঁকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। ইনি রাজা হইয়া দেখিলেন, যে তাঁহার রাজ-ভাণ্ডার অপরিমিত, তাঁহার সৈন্ত নিবাসে ৪০,০০০ অশ্বারোহী, ১,৪০,০০০ পদাতিক সৈন্ত, নানা শ্রেণীর ২০,০০০ কামান, বহুশত যুদ্ধ-জাহাজ এবং ৩,৬০০ হস্তী মজুত। তিনি মনে করিলেন, এই প্রবল শক্তির সাহায্যে তিনি দুনিয়ার মালিক হইতে পারেন। সুতরাং তিনি শ্বেতচ্ছত্র, রাজদণ্ড, এবং অপরাপর রাজচিহ্ন ধারণ করিয়া নিজেকে বাদসাহ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন; শুধু তাহাই নহে, তিনি আকবরের সাম্রাজ্যের কোন কোন স্থান আক্রমণ করিয়া সম্রাটের সহিত যুদ্ধ বাধাইবার সুবিধা খুঁজিতে লাগিলেন। দাউদ প্রথমতঃ জেমিনিয়া দুর্গ (পদ্মার দক্ষিণ পারে, গাজীপুরের কিছু উত্তরে অবস্থিত) আক্রমণ করিবার জন্য একদল সৈন্ত প্রেরণ করিলেন। আকবর সেনাপতি মনিয়মকে দাউদের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। দাউদের প্রধান মন্ত্রী লোদিখাঁয়ের সঙ্গে মনিয়ম পাটনার

দাউদ সাহ—১৫৭২-১৫৭৬ খৃঃ।

নিকটে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইলেন, কিন্তু এই সময়ে লোদিখাঁয়ের সঙ্গে মনিয়মের একটা সন্ধি হইয়া যায়। এই সন্ধির সর্তানুসারে বঙ্গেশ্বর সম্রাটকে নগদ দুই লক্ষ টাকা এবং একলক্ষ টাকার যোগ্য রেশমের কাপড় ও মসলিনাদি দিতে বাধ্য হইলেন এবং মনিয়মও বিহার হইতে সৈন্য ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন, স্থির হইল। সন্ধির কথা শুনিয়া দাউদ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া—"লোদিখাঁ তাঁহার মস্তক হেঁট করিয়া দিয়াছেন" এই অভিযোগ করত তাঁহার মৃত্যুদণ্ড করিয়া তদীয় সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। এদিকে আকবরও মনিয়মের সন্ধি সম্রাটের পক্ষে গৌরবজনক হয় নাই—এই ভাবিয়া তাঁহার উপর বিরক্ত হন, এবং দশ হাজার সৈন্য সহ তোডরমল্লকে বেহারে মনিয়মের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া বেহারে প্রেরণ করেন।

প্রথম সন্ধি।

এদিকে দাউদ সন্ধিতে স্বীকৃত হন নাই এবং লোদিখাঁকে হত্যা করিয়াছেন শুনিয়া মনিয়ম পাটনায় অভিযান করিয়া উপস্থিত হন। দাউদের নিযুক্ত হাজিপুরের শাসনকর্ত্তা ফতে খাঁ অত্যন্ত সাহসিকতা ও কৌশলের সঙ্গে দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং মোগলদিগকে প্রায় নিঃশেষ করিবার মধ্যে আনিয়াছিলেন। সম্রাট্ আকবর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই অবরোধ ও যুদ্ধের ব্যাপার লক্ষ্য করিতে ছিলেন, তিনি মোগল সৈন্যের এই ধ্বংস দেখিয়া বহুসৈন্যপূর্ণ তিনটি জাহাজ পাঠাইয়া দেন। মোগলেরা এই সাহায্য পাইয়া উৎসাহের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের ভীষণ বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া দুর্গস্বামী পরাস্ত হন। ফতে খাঁ ও তাঁহার বহু সৈন্যসামন্তের কর্ত্তিত মস্তক এক নৌকা বোঝাই করিয়া সম্রাট্ আকবর দাউদের নিকট পাঠাইয়া দিয়া জানান যে অচিরে তাঁহারও এই অনুচরদের গতি হইবে। দাউদ ভয় পাইয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ও পরিবারবর্গ লইয়া তেলিয়াগড়িতে উপস্থিত হন। এদিকে মোগলেরা হাজিপুরে আফগানদের উপর অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার সংবাদ পাইয়া দাউদের সৈন্যেরা তেলিয়াগড়িতে অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিল। সুতরাং তেলিয়াগড়ির দুর্গম গিরিপথে থাকিয়া মোগলদিগকে বাধা দেওয়ার আশা তাঁহার বিফল হইল। তিনি ধনসম্পত্তির সহিত পুনরায় পলায়নপর হইলেন, এদিকে বঙ্গ-প্রদেশের একমাত্র দ্বার তেলিয়াগড়ি অনায়াসে মনিয়ম খাঁর হাতে পড়িল।

অস্বীকার।

তেলিয়াগড়িতে পলায়ন।

দাউদ পলাইয়া উড়িষ্যার পথে চলিলেন। এদিকে রাজা তোডরমল্ল গৌড় এবং তাণ্ডা অনায়াসে দখল করিয়া ক্রমাগত দাউদের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। দাউদ এক স্থান হইতে অন্যস্থানে পরিবার ও অর্থাদি লইয়া পলাইতে লাগিলেন। মাঝ পথে দুই এক স্থানে দাউদের সৈন্য কর্ত্তৃক মোগলেরা বিব্রত হইয়াছিল। অবশেষে দাউদ কটকে যাইয়া "মারি কি মরি" এই সঙ্কল্প করিয়া একেবারে মরিয়া হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইলেন। মনিয়ম খাঁ যুদ্ধক্ষেত্রে কতকগুলি ভীষণ কামান গাড়ীতে বহাইয়া আনিয়াছিলেন। দাউদেরও ২০০ অতি দুর্দ্দান্ত বন্য হস্তী সঙ্গে ছিল। দুই পক্ষের সৈন্য-সংখ্যা প্রায় তুল্য ছিল। এই যুদ্ধে আফগানগণ যেরূপ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল,

মোগলেরা সেরূপ বাধা আর এদেশে কখনও পায় নাই। এই মহামারিতে মোগল সেনাপতি গুরুতরভাবে আহত এবং দাউদের প্রধান সামন্তগণ হতাহত হইয়াছিলেন। দাউদ যদিও শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইতে পারেন নাই, তথাপি মোগলেরাও বহু ধ্বংসের পর জয়লাভ করিয়াও কোন উৎসাহ বোধ করিতে পারে নাই। দাউদ কটকে উপস্থিত হইয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। দাউদের দূতের অসাধারণ বিজ্ঞতা ছিল। তিনি যখন এক ধর্ম্মাবলম্বী দুই দলের পরস্পরের এরূপ বিরোধ ও হত্যা ধর্ম্মসঙ্গত নহে, দাউদ আত্মসমর্পণ করিতেছেন, তাঁহার এবং তাঁহার অনুচরবর্গের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্ম যদি সম্রাট্ কিছু স্থান ছাড়িয়া দেন, তবে তাঁহারা তাঁহার চিরানুগত সেবক হইয়া থাকিবেন ইত্যাদি কথা করুণ স্বরে বলিতে লাগিলেন তখন মনিয়ম খাঁর হৃদয় প্রকৃতই আর্দ্র হইল। তিনি বলিলেন, যদি দাউদ স্বয়ং এখানে উপস্থিত হইয়া এই সকল কথা বলেন, তবে তিনি সম্রাটের নিকট তাঁহাদের হইয়া বিশেষ অনুরোধ করিবেন।

মনিয়াম খাঁর দরবারে দাউদ।

কয়েক জন ওমরাহ পরিবৃত হইয়া দাউদ মোগল শিবিরে উপস্থিত হইলেন। মোগলেরা তাঁহাকে যথেষ্ট সংবর্দ্ধনা করিল। দুই দিকে সৈন্যগণ দাঁড়াইয়া তাঁহাকে রাজকীয়ভাবে অভিবাদন করিল এবং শিবিরে উপবিষ্ট মোগল ওমরাহগণ তাঁহার প্রবেশ মাত্র সকলেই সসম্মানে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাইয়া মনিয়ম খাঁয়ের নিকট লইয়া আসিলেন। মনিয়ম স্বয়ং কতকদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। দাউদ খাঁ কটিতট হইতে তরবারি বাহির করিয়া মনিয়ম খাঁয়ের হাতে দিয়া বলিলেন, "এই অসি-দ্বারা আপনার মত বন্ধুর শরীরে আমি অস্ত্রাঘাত করিয়াছি, ইহা ধারণ করিবার আমি যোগ্য নহি, আমি এখন হইতে যোদ্ধার নাম গ্রহণের আর উপযুক্ত নহি, আপনি এই অস্ত্রটি গ্রহণ করুন।" মনিয়ম খাঁ হস্তে ধরিয়া দাউদকে সম্মানিত স্থানে বসাইলেন। দাউদ কোরান এবং অপর সমস্ত পবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়া বলিলেন—"সম্রাট্ যদি দয়া করিয়া আমাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন, তবে আমি চিরদিনের জন্য তাঁহার বিশ্বস্ত সেবক হইয়া থাকিব, তাঁহার কোন শত্রুর সঙ্গে যোগদান করিব না।" এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ হইল এবং দাউদ সেই সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন। মনিয়ম খাঁ তাঁহাকে একখানি বহুমূল্য তরবারি রাজকীয় উপহার স্বরূপ দিয়া বলিলেন—"আজ আপনি আমাদের মহিমান্বিত সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন, আমি আপনাকে এই তরবারিখানি উপহার দিতেছি। আশা করি আপনি ইহা সম্রাটের পক্ষে এবং তাঁহার শত্রুগণের বিপক্ষে আজীবন ধারণ করিবেন। আমি আমার মহামান্য সম্রাটের নামে সমস্ত উড়িষ্যা রাজ্যের অধিকার আপনাকে দিতেছি, আমি অনুমাত্র সন্দেহ করি না, যে আপনি চিরকাল সম্রাটের অনুগত ও বিশ্বস্ত প্রজা স্বরূপ সাম্রাজ্যের সহায়তা করিবেন।"

মনিয়ম খাঁ তাণ্ডায় প্রবেশ করিয়া সমারোহের সহিত বাঙ্গলাদেশ অধিকার করিলেন। গৌড় নগর পরিদর্শন করিয়া উহার বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত হর্ম্ম্য, মসজিদ, মন্দির প্রভৃতি

দেখিয়া তিনি এতই আনন্দ লাভ করিলেন যে তিনি তাণ্ডা হইতে পুনরায় গৌড়ে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তথাকার ভিজামাটী হইতে বিবাক্ত বায়ু বহির্গত হইয়াই হউক অথবা জল বা আবহাওয়ার দোষেই হউক, তথায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এক মহামারী দেখা দিল। সহস্র সহস্র লোক মরিয়া পথে পড়িয়া রহিল, তাহাদিগকে সমাধি দেওয়া বা দাহ করিবার লোক রহিল না। লোকে সেই মহামারীতে ত্রাহি ত্রাহি করিয়া পলাইতে সুরু করিল। স্বয়ং মনিয়ম খাঁ এই নিদারুণ প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, (১৫৭৫ খৃঃ)।

মনিয়ম খাঁর মৃত্যুর পর বাঙ্গলায় আফগানেরা আবার তাহাদের নষ্ট ক্ষমতা লাভের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল এবং গৌড়ের ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্ত্তা সাহেম খাঁ জেলিয়ারকে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। আশ্চর্য্যের বিষয় ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া, কোরান স্পর্শ করিয়া এত প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও দুর্ভাগ্য দাউদ এই বিদ্রোহীর দলে যোগদান করিলেন। তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী হরি রায়, যাঁহাকে দাউদ বিক্রমাদিত্য উপাধি দিয়াছিলেন, তাঁহাকে পুনরায় সম্রাট্‌দ্রোহী হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু পঞ্চাশ হাজার সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সেনা হাতে পাইয়া দাউদ ধরাকে সরা জ্ঞান করিলেন। সম্রাটের সেনাপতি হুসেন কুলি খাঁ (উপাধি খাঁ জাহান) দাউদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তিনি রাজমহলে আসিয়া দাউদের সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। প্রথম প্রথম দাউদের পরাক্রান্ত দলবল বিজয়ী হওয়ার ভরসা করিয়াছিল, কিন্তু যখন মোগল সেনাপতির সাহায্যের জন্য পাটনা, ত্রিহুত এবং অপরাপর স্থান হইতে অগণ্য সৈন্য আসিতে লাগিল, তখন আফগানদের ভরসার স্থল জোনিয়েদ কররানী (দাউদের ভ্রাতুষ্পুত্র) এবং অপরাপর প্রধান সেনাপতিরা মোগলদের কামানের বেগ সহ্য করিতে পারিলেন না, তাঁহাদের অনেকেই রণক্ষেত্রে পতিত হইলেন। দাউদ ধৃত হইয়া মোগল দরবারে আনিত হইলেন। তংকৃত কৃতঘ্নতার ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গের উত্তরে তিনি কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। রাজদ্রোহীর দণ্ড তাঁহাকে দেওয়া হইল, তাঁহার ছিন্নমস্তক একজন বিশেষ দূত সহ আগ্রায় প্রেরিত হইল (১৫৭৬ খৃঃ)। প্রায় চারিশত বৎসর বঙ্গদেশে যে পাঠান প্রাধান্য ছিল, দাউদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহা এ দেশে বিলুপ্ত হইল।

পুনরায় সন্ধি-লঙ্ঘন।

দাউদের মৃত্যু।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাঠান রাজত্বসম্বন্ধে নানা কথা

পাঠান সম্রাটগণের অপমৃত্যু।

মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার খিলজির সময় হইতে ১৫৭৬ খৃঃ পর্য্যন্ত প্রায় চারিশত বৎসর বঙ্গে আফগানদের প্রাধান্য ছিল। এই কিঞ্চিন্ন্যূন চারিশত বৎসর বঙ্গদেশটাকে সুন্দর বনের মধ্যবর্ত্তী ব্যাঘ্র-বাস বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না—বিশেষ বঙ্গের সিংহাসন। এরূপ মাথার উপর ঝুলান খড়্গ লইয়া সিংহাসনে বসায় সুখ কেনই বা বঙ্গেশ্বরগণ খুঁজিয়াছিলেন? ইবন বক্তিয়ার হইতে দাউদ পর্য্যন্ত ৪৩ জন ভূপতি সিংহাসনে ক্ষণিকের জন্য বসিবার সুখ লাভ করিয়াছিলেন। মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার কামরূপের রাজার হাতে লাঞ্ছিত হইয়া এবং সর্ব্ব সৈন্য ক্ষয় করিয়া যখন গৌড়ের নিকট উপস্থিত, তখন তিনি উৎকট রোগশয্যাশায়ী, কিন্তু ভগবান্ মরিবার সময়ও তাঁহাকে শান্তি দিলেন না, প্রিয় সেনাপতি আলিমর্দ্দন তাঁহার পীড়িত অবস্থায় খড়্গাঘাতে তাঁহাকে বধ করিলেন (১৩০৮ খৃঃ)। এই ঘটনার মাত্র দুই বৎসর পরে ইবন বক্তিয়ারের প্রিয় মন্ত্রী বঙ্গেশ্বর মহম্মদ শিরান নিজের দলের একজন লোক কর্ত্তৃক নিহত হন (১৩১০ খৃঃ)। এবার বক্তিয়ারের হত্যাকারী আলিমর্দ্দন খিলজির পালা, তিনি স্বীয় বংশের একজন ষড়যন্ত্রকারীর হাতে প্রাণ হারাইলেন (১২১১ খৃঃ)। বঙ্গের মসনদ পূর্ণ করিলেন গিয়াসুদ্দিন, কিন্তু তিনিও কয়েক বৎসর পরে যুদ্ধে নিহত হইলেন (১২২৭ খৃঃ)। এই চারিটি হতভাগ্য নৃপতির পর নাসিরুদ্দিন বাদসাহের কপাল ভাল, তিনি হেকিম ও কবিরাজদের চিকিৎসাধীন থাকিয়া মরিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা তোগন খাঁ ও তমুর খাঁ যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ে ১২৪৬ খৃঃ অব্দের একই দিনে প্রাণত্যাগ করিলেন। সিংহাসনে বসিয়া তোগন খাঁ বোধ হয় একটি রাত্রিও শান্তিতে ঘুমাইতে পারেন নাই। সুলতান মগীসুদ্দিন (সপ্তম বাদসাহ) ১২৫৮ খৃঃ কামরূপের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন, মরিবার সময় তিনি তাঁহার বিজয়ী শত্রুর নিকট গলদশ্রুনেত্রে প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাঁহার পুত্রের মুখখানি জীবনে শেষবার দেখিতে। পরবর্ত্তী বাদসাহ জালালুদ্দিন কড়ার শাসনকর্ত্তা আর্সলান খাঁ কর্ত্তৃক নিহত হন। একটা অভিসন্ধির ফলে মগীসুদ্দিন (মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার খিলজি হইতে একাদশ) বাদসাহের হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছিল। কাইকোবাদকে খিলজি বংশীয় এক আমীর নিহত করেন (১২৮৯ খৃঃ)। তৎপরবর্ত্তী নবাব রুকনুদ্দিনকে তাঁহার খুল্লতাত হত্যা করেন। সেকেন্দর বাদসাহকে তাঁহার পুত্র গয়াসুদ্দিন যুদ্ধে নিহত করেন (১৩৬৮ খৃঃ)। দ্বিতীয় শামসুদ্দিন বাদসাহকে নৃসিংহ ওঝার বুদ্ধিবলে রাজা গণেশ হত্যা করিয়াছিলেন। হতভাগ্য [illegible] ([illegible] পৌত্র) মাত্র ৮ দিন রাজতক্তে বসিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। নবমদিনে তাঁহাকে ষড়যন্ত্রকারীরা হত্যা করিল। ফতে সাহ ১৪৯৫ খৃঃ অব্দে খোজা

বারেক কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। সাহাজাদা অন্তঃপুরে আমোদ করিতেছিলেন; তিনি ছিলেন খোজা, শুইবার সময় স্ত্রীজনোচিত (খোজাদের অভ্যস্ত) পরিচ্ছদ পরিয়া মদ খাইয়া আমোদ করিতেছিলেন, এমন সময় হাবিসী মন্ত্রিপ্রবর তাঁহার বুকে অসি বসাইয়া দিল, তাঁহার গায়ে ছিল অসুরের বল, খড়্গাঘাত সহ্য করিয়া তিনি মন্ত্রীর সঙ্গে খুব কতক্ষণ ধস্তাধস্তি করিয়াছিলেন। অবশেষে রক্তক্ষয়ে ক্লান্ত হইয়া যখন মড়ার মতন পড়িয়া ছিলেন, তখন হাব্সী মন্ত্রী তাঁহাকে মৃত ভাবিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এই সময় বাদসাহের এক খোজা চাকর তথায় উপস্থিত হইল; তিনি মরেন নাই, তাহাকে দেখিয়া যেন পুনর্জ্জীবন পাইয়া তাহার নিকট মন্ত্রীর কাণ্ডটা বলিতে লাগিলেন। বিনয়ের ভাণ করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বিশ্বস্ত চাকর বাহিরে লোকজন ডাকিতে চলিয়া গেল, কিন্তু সে লইয়া আসিল সেই হাবিসী মন্ত্রিপ্রবরকে। রাজা তখনও মরেন নাই দেখিয়া মন্ত্রী ও বাদসাহের 'বিশ্বস্ত' খোজা চাকর বাকী কাজটুকু সারিয়া ফেলিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না।

অতঃপর ফিরোজসাহ মাত্র একটি বৎসর রাজত্বের পর সিদ্দিবদরের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। সিদ্দিবদর (মুজাফর সাহ) সৈয়দ হুসেনের দ্বারা নিহত হন। হুসেন সাহের পুত্র নসরত সাহ তাঁহার পিতার সমাধি-মন্দিরে ভজন করিতেছিলেন, ইতিপূর্ব্বে তিনি এক খোজাকে গুরুতর অপরাধের জন্য উচিত দণ্ড দিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন, সে দণ্ড আর দিতে হইল না, খোজাই উপাসনা-মন্দিরে তাঁহাকে একা মুদ্রিতনেত্র দেখিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড করিল (১৫৩২ খৃঃ)। মৃত বাদসাহের পুত্র ফিরোজ সাহ তিনটি মাস মাত্র রাজতক্তে বসিয়াছিলেন, তৎপরে তাঁহার খুল্লতাত মহম্মদ সাহ এই অভিশপ্ত বঙ্গ-সিংহাসনের লোভে তাঁহাকে হত্যা করিলেন। মহম্মদ সাহের পরবর্ত্তী বাদসাহ সুপ্রসিদ্ধ সের সাহ বঙ্গের মসনদ তাঁহার এক মন্ত্রীকে দিয়া সমস্ত হিন্দুস্থানের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধের আয়োজন করিতে যাইয়া একটা বোমা ফাটায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। মাঝে এক রাজা স্বাভাবিক কারণে মরিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী বাদসাহ মহম্মদ সাহ ১৫৫৪ খৃঃ অব্দে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। জেলালুদ্দিন বাদসাহের পুত্র অল্পস্থায়ী রাজত্বের পর গায়েসুদ্দিন কর্ত্তৃক নিহত হন। গায়েসুদ্দিনের হত্যাকারক তাজ খাঁ, তাজ খাঁর পুত্র বয়জাদ আমিরদিগের ষড়যন্ত্রে নিহত হন। পরবর্ত্তী রাজা দাউদ এই দুর্ভাগ্য নৃপকুলের শেষ আহুতিস্বরূপ মোগল সম্রাট্ আকবরের সঙ্গে বহু যুদ্ধবিগ্রহ চালাইয়া স্বীয় জীবন সেই সমরানলে প্রদান করেন (১৫৭৬ খৃঃ)।

পাঠান রাজগণের অপমৃত্যু।

সুতরাং এই রাজগণের অধিকাংশই সিংহাসন দখল করিবার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ প্রাণদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আট দিনের মধ্যে, কেহ বা তিন মাস, কেহ বা এক বৎসর পরেই নিহত হন; এক সম্রাট্ তাঁহার প্রিয়তম পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, কেহ বা উপাসনা-মন্দিরে প্রার্থনায় বসিয়া অপরাধী ভৃত্যের হস্তে, কেহ বা রাত্রিকালে শয়নাগারে বিশ্বস্ত মন্ত্রীর

প্রতিপত্তির মূল্য।

খড়্গাঘাতে, কেহবা স্বীয় স্নেহশীল খুল্লতাতকর্তৃক যমমন্দিরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। যাঁহারা এই ভাবে অপঘাতে মরেন নাই, তাঁহারাও দিবারাত্র মৃত্যুর ছায়া চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া হীরকখচিত রাজতক্তে বসিয়াছেন। হতভাগ্য দাউদের মৃত্যুকাহিনী পড়িলে চক্ষু সজল হয়। এই আফগান রাজগণের অনেকেরই ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান কিছুমাত্র ছিল না—কেবল যেমন করিয়া হউক বঙ্গের মসনদে বসিতে পারিলেই হয়। শের সাহ হুমায়ুন বাদসাহের সঙ্গে কোরান ছুঁইয়া শপথ করিলেন, যাহা কিছু পবিত্র সকলের নাম করিয়া শপথ করিলেন, পরক্ষণেই সেই সন্ধি ছেলের হাতের মাটীর পুতুলের মত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তিনি হুমায়ুনের নিশ্চিন্ত, নিদ্রিত শিবির আক্রমণ করিলেন। দাউদ খাঁ মনিয়ম খাঁর নিকট যে প্রতিশ্রুতি-সহকারে শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা হইতে পবিত্রতর দলিল কেহ কল্পনা করিতে পারে না, কিন্তু বঙ্গের তক্তে বসিলে মানুষের বুদ্ধি বিকৃত হয়, এই প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গিয়া তিনি সম্রাট্‌দ্রোহী হইলেন।

অবশ্য রাজপদের মত লোভনীয় কি আছে? কিন্তু মৌর্য্য, গুপ্ত, পাল ও সেনদের রাজত্বকালেও যুদ্ধবিগ্রহের বিরাম ছিল না, তাঁহারাও স্বগণদের সঙ্গে কলহ করিয়াছেন। কিন্তু এই পাঠানদের মত নৃশংসতা হিন্দুর ইতিহাসে খুব বিরল। ক্ষাত্র প্রতিশ্রুতি দুর্লঙ্ঘ্য ছিল—অভিমন্যু-বধ, পাণ্ডবদের পুত্রগণের হত্যা মহাভারতের কলঙ্কস্বরূপ, কিন্তু তাহাতেও প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের উদাহরণ বড় দেখা যায় না।

দিল্লীবিদ্রোহী দুর্দান্ত 'বঙ্গ-ব্যাঘ্র।'

সত্যরক্ষা, প্রতিশ্রুতি-পালন, রাজভক্তি প্রভৃতি গুণের উদাহরণ-স্বরূপ হিন্দুসাহিত্যে যে কত কাহিনী বর্ণিত আছে তাহার অবধি নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে লাউসেনের অনুগত ভৃত্য ও সেনাপতি কালুডোম সত্যরক্ষার্থ নিজের প্রাণ দিয়াছিল। ধর্ম্মাধিকরণে একটি মাত্র মিথ্যা কথা বলিলে হরিহর বাইতি বহু পুরস্কার পাইত—সত্য বলিলে মৃত্যুদণ্ড অবধারিত, কিন্তু দ্বিধাকম্পিতচিত্তে হরিহর মিথ্যা বলিতে অঙ্গীকার করিয়াও সাক্ষীর কাঠাসনে দাঁড়াইয়া মিথ্যা বলিতে পারিল না। তাহার পল্লীর সরল প্রাণ মিথ্যা বলিতে আতঙ্কিত হইয়া উঠিল, জিহ্বায় ভাষা ঠেকিয়া গেল। এই সকল কথা উপাখ্যান মাত্র, কিন্তু হিন্দুর সত্যবাদিতাসম্বন্ধে বিদেশী ভ্রমণকারীরা যে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া এই সকল গল্প পড়িলে মনে হইবে, উপাখ্যানগুলিতে জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে এবং উহা সত্য হইতে দূরবর্ত্তী নহে। এই ধর্ম্মভীরু জাতি রণকুশল সাম্রাজ্যলোভী পাঠানগণের সংস্পর্শে আসিয়া নিতান্ত আতঙ্কিত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কবিকঙ্কণচণ্ডীতে পশু-যুদ্ধের রূপক স্থলে হিন্দু রাজা ও জমিদারবর্গের এই ভয় বর্ণিত হইয়াছে।

এই যুগের বঙ্গেশ্বরগণের ইতিহাসে দেখা যায় ইহারা স্বাধীনতার জন্ম অসাধ্যসাধন-চেষ্টা করিয়াছেন; প্রায় প্রত্যেকটি বাদসাহই দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, হয়ত দায়ে পড়িয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন—আবার সুবিধা পাইলেই বিদ্রোহী হইয়াছেন। ইহারা প্রকৃতই বঙ্গের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজব্যাঘ্র (Royal Tiger)। এই ব্যাঘ্রকে দিল্লীশ্বরগণ

কিছুতেই পোষ মানাইতে পারেন নাই। শের সাহকে দমাইতে যাইয়া হুমায়ুন দিল্লীর তক্ত্ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; সর্ব্ব-শেষ পাঠানব্যাঘ্র দাউদের বিয়োগান্ত জীবন-নাট্য! কি ভীষণ তাঁহার অধ্যবসায়! কতবার হারিয়াছেন, সন্ধিপত্রে দস্তখত করিয়াছেন, সেগুলি তিনি সুবিধা পাইলেই তৃণবৎ নগণ্য মনে করিয়া কোমর বাঁধিয়া যুদ্ধে লাগিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পিতা সোলেমান খাঁ আকবরের নামে মাত্র বশ্যতা স্বীকার করিয়া নির্ব্বিঘ্নে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া গেলেন। দাউদ ইচ্ছা করিয়া একটিবার মাথা নোয়াইলেই তদপেক্ষা বৃহত্তর রাজ্যে স্থায়িভাবে অভিষিক্ত হইয়া পরম নির্ব্বিঘ্নে জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু এই পাঠান-ব্যাঘ্র জীবনে সুখ-শান্তি চান নাই। পুনঃ পুনঃ হারিয়া গিয়া পুনঃ পুনঃ লড়াই করিয়াছেন। প্রায় জীবনব্যাপী যুদ্ধ চালাইয়াও যুদ্ধক্লান্তি হয় নাই; শেষে যে সন্ধি হইল তাহাতে সমস্ত উড়িষ্যার সাম্রাজ্যটা হাতে পাইলেন, হয়ত বা আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিলে আরও অধিকার বাড়াইতে পারিতেন, কিন্তু সে সকল সুবিধা ও ব্যবস্থা লইয়া তিনি সুখী হন নাই। পবিত্র কোরাণ অমান্য করিয়া পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন। এই আফগানদের প্রত্যেকের রক্তে দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বীজ ছিল, এই বীজ জরাসন্ধ, পৌণ্ড্র বাসুদেব, নরক ও সমুদ্র সেন প্রভৃতি হইতে আসিয়াছে—বাঙ্গলাদেশের রাজারা চির-বিদ্রোহী। পাঠান সময়ে আমরা এই সত্য যতটা দেখিতে পাই, এতটা আর কখনও নহে—ইন্দ্রপ্রস্থের অতুল বিজয়পতাকা, মথুরার সমৃদ্ধি, রৈবতকের অভ্রভেদী দুর্গ এবং সর্ব্বশেষে মুস্লিম অধিকৃত দিল্লী—বঙ্গের ব্যাঘ্রদিগকে স্ববশে আনিতে পারে নাই।

বাঙ্গালী-চরিত্রের এক দিকে বিরাগ অপরদিকে রাগ। বিরাগে সে বিদ্রোহী কিন্তু অনুরাগে সে অবহেলায় মৃত্যু বরণ করিয়া লয়। বাঙ্গালীর রাজ-ভক্তি অপূর্ব্ব। লাউসেনের সেনাপতি কালু ডোম, তৎপত্নী লক্ষ্মা ও শাকা-শুকা পুত্র-দ্বয়ের যে রাজভক্তির কথা ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত আছে, তাহার তুলনা নাই। লক্ষ্মা তাঁহার দুই পুত্রকে গভীর নিদ্রা হইতে জাগাইয়া রাজার জন্য নিশ্চিত মৃত্যু বরণ করিতে রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এ যুগেও বাঙ্গালী-পুলিশ অনেক সময় স্বীয় বন্ধুবান্ধবদিগের গঞ্জনা সহ্য করিয়াও রাজার জন্য কথায় কথায় মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেছে।

যদিও আমরা মঃ ইঃ বক্তিয়ারের আগমন হইতে ১৫৭৬ খৃঃ পর্য্যন্ত দীর্ঘ সময়টা 'পাঠান-যুগ' নামে মূলতঃ পরিচিত করিয়াছি, তথাপি এই যুগের রাজগণের মধ্যে সকলেই আফগান ছিলেন না, কেহবা আরব দেশের, কেহবা খোজা, কেহবা হাবসী, এবং কেহবা হিন্দু ছিলেন। মোটামুটি এই সময়টাকে 'পাঠান-প্রাধান্যের যুগ' বলা যাইতে পারে। এই সকল রাজাদের শরীরে প্রচুর পরিমাণে হিন্দুরক্ত বহমান ছিল। সুলতান গায়েসুদ্দিনের বিমাতা, সমসুদ্দিনের নিকা-সূত্রের স্ত্রী, ফুলমতী বেগম—এক সময়ে নুরজাহান দিল্লীতে যাহা করিয়াছিলেন—বঙ্গদেশের শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে সেইরূপ ক্ষমতা দেখাইয়াছিলেন। ফুলমতী ঢাকা জেলার বিক্রমপুর

হিন্দুর সহিত রক্তসম্বন্ধ।

পরগনার সুবিখ্যাত বজ্রযোগিনী গ্রামের এক বিধবা ব্রাহ্মণকন্তা; সমসুদ্দিন সুবর্ণগ্রাম যাওয়ার পথে নদীর ঘাটে এই অসামান্য রূপসী যোড়শীকে দর্শন করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে স্বীয় অন্দরমহলে লইয়া আসেন; সমসুদ্দিনের নিকট তথাকার প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ ও অপরাপর শ্রেণীর বিশুদ্ধ হিন্দুরা উপস্থিত হইয়া এই কার্য্যের প্রতিবাদ করেন। বাদসাহ বলিলেন. "আচ্ছা বেশ! ফুলমতীকে আমি ছাড়িয়া দিতেছি, ইহার সমান ঘরের কোন সৎব্রাহ্মণ ইহাকে বিবাহ করুন,—নতুবা গণিকা-বৃত্তি করিবার জন্ম এবং সমাজচ্যুত হইয়া নিরাশ্রয়া হইয়া থাকিবার জন্ত আমি এমন সুন্দরী মহিলাকে কখনই প্রত্যর্পণ করিব না।" বাদসাহের কথায় কেহ অবশ্য রাজী হইলেন না, তখন তিনি স্বয়ং তাঁহাকে নিকা করিলেন। এই রমণী যেরূপ অপূর্ব্ব সুন্দরী ছিলেন, তেমনই বুদ্ধিমতী ছিলেন, তৎসময়ের আফগান-দরবারে আসিয়া তিনি বিলাসকলা ও কূটনীতি শিখিয়াছিলেন। সমসুদ্দিনের উপর ফুলমতী বিবির প্রভূত ক্ষমতা ছিল, এমন কি তাঁহার মৃত্যুর পর কংসরাম, জুনা খাঁ প্রভৃতি রাজ-দরবারের প্রধান ব্যক্তিগণকে তিনি নিকা করিবেন সেই লোভ দেখাইয়া ক্রীড়াপুত্তলীর মত ব্যবহার করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ হিন্দুপ্রভাবের কোন উল্লেখই করেন নাই—কিন্তু ফুলমতী বেগম যে কতটা শক্তির সহিত বাদসাহের দরবারে শাসনকার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তাহা বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-কুলজীগ্রন্থে বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে। সান্ন্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন—গায়েসুদ্দিনের মৃত্যুর পর ফুলমতীর পুত্র মইজুদ্দিন গৌড়ের বাদসাহ হন। মধু খাঁ ও ফুলমতী—নিতান্ত অলস, বিলাসী ও অকর্ম্মণ্য মইজুদ্দিনকে সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া প্রকৃত শাসনকার্য্য তাঁহারাই সম্পাদন করিতেন। কিন্তু মইজুদ্দিন বাদসাহের অস্তিত্ব অন্য কোন সূত্রে এখনও প্রমাণিত হয় নাই। তাঁহার সময়ে রাজসাহীর একটাকিয়া ও সাঁতড়ার রাজারা বাদসাহের অনুগ্রহে খুব প্রবল হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। তাঁহারা যে ঐ সময়ে প্রভূত শক্তিশালী হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঘটককারিকা ও প্রবাদবাক্যের ভিত্তি অনেক সময়ই সত্যমূলক, কিন্তু সময়ে সময়ে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে পড়িয়া ইতিহাসকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে নানারূপ ভ্রম, প্রমাদ ঘটিয়া থাকিলেও ফুলমতী বিবির অস্তিত্ব ও বাদসাহ-দরবারে তাঁহার প্রভাব কখনই অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয় না, দেশব্যাপী জনরব ও প্রবাদের ভিত্তিতে নিশ্চয়ই সত্য নিহিত আছে।

ফুলমতী বেগম।

ফুলমতীর প্রভাবেই হউক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, এই বাদসাহদের সময়ে হিন্দুরা যে রাজসভার অতি প্রধান ছিলেন—তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। ইহার পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে আমরা দেখাইব, মুসলমান রাজা এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ "সিন্নকী" লাগাইয়া ক্রমাগত সুন্দরী হিন্দুললনাগণকে অপহরণ করিয়াছেন—তাহাদিগকে নিকা করিয়া বহু সন্তান উৎপন্ন করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ময়মনসিংহের জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানগণ এবং শ্রীহট্টের বানিয়াচঙ্গের দেওয়ানেরা এইরূপে যে কত হিন্দু রমণীকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়াছেন, তাহার অবধি নাই। পল্লীগীতিকাগুলিতে সেই সকল করুণ কাহিনী বিবৃত আছে। কোন

এক রাজার কন্যাকে বঙ্গের মুসলমান বাদসাহ বিবাহ করিতে চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে যে অনর্থ ঘটিয়াছিল তদ্বিবরণ ময়মনসিংহ গীতিকার প্রথম খণ্ডে রূপবতী নামক আখ্যায়িকায় বর্ণিত হইয়াছে। আমরা বাধ্য হইয়া নায়ক, নায়িকা, রাজা ও বাদসাহের নাম রূপান্তর করিয়া ছাপাইয়াছি। কিন্তু ঘটনাটি সত্য। পূর্ব্ব হইতে দেশে যে আবহাওয়া বহিতেছিল, হুসেন সাহ সেই দিকে পাল খাটাইয়া বঙ্গের বাদসাহের অন্তঃপুরে হিন্দুপ্রভাবের অনুকূল গতি ক্রততর করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সৈয়দ। এ দেশে তখন কুল-গৌরব অত্যধিক ছিল। আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি এই কুলগৌরবই তাঁহাকে অতি সামান্য অবস্থা হইতে মহোন্নতির সোপানে আরূঢ় করাইয়াছিল। ইনি নিজের কন্যাদিগকে পাঠানদের সঙ্গে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তখন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে ভাদুড়ীবংশ কুলমর্য্যাদায় অগ্রগণ্য—তাঁহাদেরই একজন বঙ্গের রাজা ছিলেন এবং তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষ সকলেই সুদর্শন এবং গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। একদা একটাকিয়ার রাজা মদন খাঁ তাঁহার দুই পুত্র কন্দর্প ও কামদেবকে লইয়া হুসেন সাহের সঙ্গে দেখা করিতে আসেন, তাঁহাদের সুগঠিত গৌরদেহ এবং বিদ্যাবুদ্ধিতে কৃতিত্ব দেখিয়া তিনি মদন খাঁর নিকট ইহাদের সহিত তাঁহার দুই কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, "আমি আপনার দুই পুত্রের ধর্ম্ম নষ্ট করিব না, আপনি যদি গ্রহণ করেন আমার কন্যারা হিন্দু হইবে।" যাহা হইবার নহে, তাহা আর কি করিয়া হইবে? মদন খাঁর দুই পুত্র বাদসাহের কন্যা বিবাহ করিয়া অগত্যা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ইহার পর বাদসাহ মদন খাঁর রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র সর্ব্বসমেত ১১ জনকে ধরিয়া আনিয়া তাঁহার বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়াইলেন। মদনের চতুর্থ পুত্র রতিকান্ত ভিষকৃদিগকে প্রচুর উৎকোচ দিয়া বলাইলেন যে তিনি রাত্রে চোখে দেখেন না, সুতরাং তিনি একটাকিয়ার রাজবংশের ঘৃতের সলিতাটির মত একাকী সেই পরিবারের গৌরব রক্ষা করিলেন। বাদসাহ রতিকান্ত সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "বুঝেছ বেহাই! যে অন্ধ সে হিন্দু থাকুক, যাহার চক্ষু আছে তাহার মুসল- মান হওয়াই উচিত।" সান্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন—"ইহার পর অনেক নবাব ও বাদসাহ একটাকিয়ার যুবক ধরিয়া তৎসহ কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন।" ঘটকদের পুস্তক হইতে জানা যায়, "২৯ জন একটাকিয়ার বংশধর মুসলমান রাজকুমারী বিবাহ করিয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন (১০২ পৃঃ)।" ময়মনসিংহ গীতিকায় কালাপাহাড়ের যে বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তাহা মুসলমানের লেখা, মুসলমান রাজদুহিতা যে কি অদ্ভুত কৌশলে ব্রাহ্মণযুবককে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত অতিরঞ্জিত বর্ণনা এই গীতিকায় আছে (পৃঃ ৬৪০-৬৪২)।

ঘটককারিকায় ব্রাহ্মণবংশের আখ্যায়িকায় এইরূপ উল্লেখ কখনই কল্পনাসম্ভূত হইতে পারে না। তাঁহারা নিজেদের বংশাবলীতে এই কলঙ্কের ছাপ নিজেরা কেন দিতে যাইবেন? পারসীক, যবন (গ্রীক), শক, হুন প্রভৃতি বিদেশীয় জাতিরা হিন্দুসমাজের উচ্চ গণ্ডীতে স্থান পাইবার জন্য চিরদিন লালায়িত ছিলেন, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু

মুসলমানেরা নব আভিজাত্যের ফলে অপরাপর জাতিকে উপেক্ষা করিয়াও হিন্দুর ব্রাহ্মণদিগের প্রতি শ্রদ্ধা হারান নাই। এখনও একজন ব্রাহ্মণকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিলে তাঁহারা বিশেষ গৌরব বোধ করিয়া থাকেন।

হিন্দু ও পাঠান প্রভৃতি মুসলমান শ্রেণীর সহিত রক্তের সম্বন্ধ একটা প্রবাদ-বাক্য নহে, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে, বহুল। আকবর মোগল রক্তের সঙ্গে রাজপুতের রক্ত-সংস্রবের পথ দেখাইয়া দুই জাতিকে মিলনের দিকে টানিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের যেরূপ মেশামেশি হইয়াছিল, বোধ হয় ভারতের আর কোনও দেশে তাদৃশ ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। পল্লীগীতিকায় এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে।

মুসলমান বাদসাহেরা সময়ে সময়ে হিন্দু সাধুদের প্রতি যেরূপ অনুরাগ ও ভক্তি দেখাইতেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, মুসলমান ঐতিহাসিকগণই তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। একটির কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি। বঙ্গাধিপ ইলাইস খাঁ (সামসুদ্দিন—১৩৫৩ খৃঃ) তখন দিল্লীর সম্রাট্ ফিরোজ খাঁর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন। ফিরোজ পাণ্ডুয়া হইতে একডালা দুর্গ অবরোধ করিলেন। সামসুদ্দিন সেই দুর্গে ছিলেন। এই একডালা দুর্গের সন্নিকটে ভবানী নামক এক হিন্দু সাধু ছিলেন, সামসুদ্দিন তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত। তিনি শুনিলেন সাধুবাবার দেহত্যাগ হইয়াছে, তখন সমস্ত বিপদের আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া তিনি ফকিরের বেশে দুর্গ হইতে একাকী বাহির হইয়া সাধুর মৃত দেহের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য সাধুর আশ্রমে উপস্থিত হন। পথে সম্রাটের শিবির। সামসুদ্দিন তাঁহার গুরুদেবের শবের প্রতি শেষ সম্মান দেখাইয়া সেই ছদ্মবেশেই ফিরোজ সার দরবারে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলেন, তৎপরে শনৈঃ শনৈঃ স্বীয় দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সম্রাট্ যখন শুনিলেন তাঁহার প্রবল শত্রু, যাঁহাকে ধরিবার জন্য তিনি ২২ দিবস যাবৎ একডালা দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিয়াছেন, তিনি ফাঁকি দিয়া তাঁহার মৃত গুরু দর্শন করিয়া, এমন কি তাঁহার শিবিরে ঢুকিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া গেলেন, তখন তাঁহার ক্রোধের সীমা-পরিসীমা রহিল না। কিন্তু তিনি সামসুদ্দিনের দুর্দান্ত সাহসিকতা এবং অচলা গুরুভক্তির প্রশংসা না করিয়া পারিলেন না। পূর্ব্ববঙ্গগীতিকায় মুসলমান গায়কগণ যে সৌভ্রাত্রের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমরা বুঝিতে পারি কি করিয়া এই দুই জাতি, মত ও ধর্ম্মের এতটা পার্থক্য থাকা সত্বেও, শতাব্দীর পর শতাব্দী পরস্পরের চালে চালে ঠেকাঠেকি করিয়া বাস করিতেছেন। পীর বাতাসীর মুসলমান গায়েন স্বীয় গুরু জিন্দাগাজীর নিকট বর প্রার্থনাপূর্ব্বক "মক্কা মদিনা কমুনাথ কাশী গয়াধান" ইত্যাদি বন্দনা-গীতে হিন্দুর তীর্থগুলির প্রতি সম্মান দেখাইয়াছেন (৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩৪১-৩৪২)। নেজাম ডাকাইতের গীতিকার মুসলমান কবি স্বদেশীয় (চট্টগ্রামের) সমস্ত গ্রাম্য দেবতাকে পর্য্যন্ত প্রণাম করিয়া গীতি আরম্ভ করিয়াছেন, উপসংহারে তিনি "সীতা শক্তি (সতী) মাকে মানি, রঘুনাথ গোঁসাই" প্রভৃতি পদ গাহিয়া "দুনিয়ার সার" পিতামাতার চরণ

বন্দনা করিয়াছেন (২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩২৫)। চৌধুরীর লড়াই গীতিকার মুসলমান গায়েন পশ্চিমে মক্কা মূল স্থানের উদ্দেশে প্রণাম জানাইয়া 'জগন্নাথ দেউ' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"বন্দি ঠাকুর জগন্নাথ। ভেদ নাই, বিচার নাই, বাজারে বিকায় ভাত। চণ্ডালে রাঁধে ভাত ব্রাহ্মণেতে খায়। এমন সুখের দেশ জাত নাহি যায়। ভাত লইয়া তারা মুণ্ডে মুছে হাত। সে কারণে রাইখাছে নাম ঠাকুর জগন্নাথ" (৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩১০)। শেষের দুইটি ছত্র পড়িয়া পরবর্তী ভারতচন্দ্রের—"চল ভাই নীলাচলে। খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় মুছিব হাত, নাচিব গাহিব কুতূহলে।" প্রভৃতি কবিতার কথা সহজেই মনে হয়। আর একজন মুসলমান পল্লীকবি লিখিয়াছেন—"হিন্দু আর মুসলমান একই পিণ্ডের দড়ি—কেহ বলে আল্লা রসুল কেহ বলে হরি।"

আফগান-প্রাধান্যের সময়ে হিন্দু ও মুসলমান একত্র হইয়া মোগলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, দুই জাতির মধ্যে আত্মীয়তা হইলে যদিও হিন্দুগণ সমাজ-বহির্ভূত হইয়া পড়িতেন, তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের স্বাভাবিক বৃত্তি ও হিন্দুসমাজের প্রতি অনুরাগ বিস্মৃত হইতেন না। হুসেন সাহের পুত্র নসরত সাহ মহাভারত কাব্যের বাঙ্গলা অনুবাদ করাইয়াছিলেন, উক্ত বাদসাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ মহাভারতের আর একখানি অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন; সঙ্কলয়িতার নাম কবীন্দ্র পরমেশ্বর। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁ (চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা) শ্রীকরণ নন্দী নামক কবি দ্বারা মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্বের অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন। বঙ্গেশ্বর সামসুদ্দিন ইউসাফ গুণরাজ খাঁ উপাধিধারী বসুবংশীয় মালাধর নামক কবির (কুলীনগ্রামবাসী) দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। বিদ্যাপতি "প্রভু গায়েসউদ্দিন সুলতান"কে প্রশংসাসূচক এই পদাংশ উপহার দিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই তিনি সুলতানের উৎসাহ পাইয়াছিলেন। এই গায়েসুদ্দিন কবি হাফেজকে পারস্য দেশ হইতে বাঙ্গলায় লইয়া আসিতে লালায়িত ছিলেন। মিথিলার রাজসভার দীর্ঘায়ু কবি একাধিক গৌড়েশ্বরের আনুকূল্য পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—"সে যে নসিরা সাহ জানে, যারে হানিল মদন বাণে, চিরঞ্জীব রহ পঞ্চ গৌড়েশ্বর, কবি বিদ্যাপতি ভানে।" যশোরাজ খাঁ নামক কবি হুসেন সাহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"সাহ হুসেন জগতভূষণ, ভনে যশোরাজ খানে।" সুদূর চট্টগ্রাম হইতে এই সুরে সুর মিলাইয়া কবীন্দ্র পরমেশ্বর হুসেন সাহকে কলিযুগের কৃষ্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এরূপ উদাহরণ অসংখ্য। আমার এ সকল কথা এখানে উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে বাদসাহের পরিবারে হিন্দুললনার আমদানী হওয়াতে এবং এদেশের বহু সম্ভ্রান্ত হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পরে বাদসাহী দরবারে বাঙ্গলা ভাষা আদর লাভ করিয়াছিল। হয়ত হিন্দুরাজত্ব থাকিলে এটি ঘটিতে পারিত না। বিদ্যার অর্ণবযানসদৃশ, দেব-ভাষার প্রতি অতিমাত্রায় শ্রদ্ধাবান্ টুলো পণ্ডিতগণের বাঙ্গলা ভাষার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণার দরুন আমাদের দেশের ভাষা যে কোন কালে রাজদ্বারে প্রবেশ করিতে পারিত, এমন মনে হয় না। পাঠান-

বঙ্গভাষার আদর।

প্রাধান্যকালে বাদসাহগণ একেবারে বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের দলিলপত্রও অনেক সময়ে বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত হইত। শের সাহের কামানের উপর বাঙ্গলা অক্ষরে তাঁহার নাম ও উপাধি পাওয়া গিয়াছে। ২।৩ শত বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুররাজ্যের তাম্রশাসনগুলি বঙ্গভাষায় ও বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ হইত; সে সময়ে মুসলমানেরাই বাঙ্গলার এই বিস্তারের সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা হিন্দুর পুরাণ ও অপরাপর শাস্ত্রের মর্ম্ম জানিবার জন্য আগ্রহশীল ছিলেন। সংস্কৃত সম্পূর্ণ অনধিগম্য এবং বাঙ্গলা তাঁহাদের কথ্য ভাষা ও সুখপাঠ্য ছিল, এজন্য তাঁহারা হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ তর্জ্জমা করিতে উপযুক্ত পণ্ডিতদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হিন্দুর গান ও উৎসবাদি মুসলমান বাদসাহের দরবারে অবিরত উৎসাহ পাইত। এইভাবে কীর্ত্তন শুনিবার স্পৃহাবশতঃ গৌড়ের কোন সম্রাট্ আমাদের কবিসম্রাট্ চণ্ডীদাসের হত্যার কারণ হইয়াছিলেন।

রাজরাজড়ার সতত সংঘর্ষ ও নিরবধি যুদ্ধবিগ্রহাদি—উত্থানপতন প্রভৃতি রাজকীয় পতাকার নিত্য পরিবর্ত্তনশীল অবস্থান্তর পল্লীসমাজকে একেবারেই স্পর্শ করে নাই। ব্রাহ্মণ তাঁহার খড়ো ঘরের মেজেয় মাদুর পাতিয়া খাগের কলম দিয়া তেরেট বা তালপত্রের উপর বেদবেদাঙ্গের ব্যাখ্যা লিখিয়া যাইতেন; বৈয়াকরণ, তার্কিক, ও নৈয়ায়িক যখন স্বীয় স্বীয় গ্রন্থের আলোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন, তখন তাঁহারা মুক্তকচ্ছ হইয়া তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইতেন। বিলাস তাঁহাদের বাড়ীরত্রি সীমানায় প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাঁহাদের খড়ো ঘরের চালার উপর অলাবুলতা দুলিয়া তাঁহাদের একান্ত উপেক্ষিত দারিদ্র্য ও সাংসারিক নিস্পৃহতা প্রমাণ করিত। কোন কোন সময় এক একটা রাজনৈতিক ঝড় বহিয়া যাইত সত্য, কিন্তু তাহার ফল বেশীদিন থাকিত না। দেশের বাণিজ্যাদির উপরও বাদসাহেরা কোনরূপ হাত দিতেন না। পাঠানেরা তরবারি লইয়া এদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এদেশে তরবারি তাঁহারা একদিনও পরিত্যাগ করেন নাই, তাঁহারা বাদসাহের বা তৎপ্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রয়োজনের জন্য শরীরে বর্ম্মচর্ম্ম আটিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের জন্যই উন্মত্ত হইয়া থাকিতেন; ইঁহারা কৃষির কোন ধার ধারিতেন না। সুতরাং ধনশালী হিন্দুরাই তখন কৃষিপ্রধান বাঙ্গলার একরূপ মালিক ছিলেন; শুধু কৃষি নহে, ব্যবসায়-বাণিজ্য যাহা কিছু তাহা সমস্তই হিন্দুদের হাতে ছিল। ষ্টুয়ার্ট সাহেব লিখিয়াছেন, "অধিকাংশ আফগানই তাঁহাদের জায়গীরগুলি ধনবান্ হিন্দুদের হাতে ছাড়িয়া দিতেন; গৃহসুখ তাঁহাদের কপালে বড় থাকিত না, কারণ প্রায়ই তাঁহাদের নেতাদের আহ্বানে তাঁহাদিগকে গৃহ ছাড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে হইত, বিশেষ ইহাদের বাণিজ্যাদি কার্য্যের প্রবৃত্তি আদৌ ছিল না। এই জায়গীরগুলির ইজারা সমস্তই ধনশালী হিন্দুরা লইতেন এবং ইহারাই ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমস্ত সুবিধা ভোগ করিতেন।" (ষ্টুয়ার্টের বাঙ্গালা ইতিহাস, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৯১০ খৃঃ, পৃঃ ১১০।) এই সকল কারণে বঙ্গদেশে কোন স্বর্ণখনি না থাকিলেও মহাসমৃদ্ধির জন্য এদেশ "সোণার বাঙ্গলা" উপাধি পাইবার যোগ্য হইয়াছিল। ষ্টুয়ার্ট সাহেব ১৪৮৯ খৃঃ অব্দের এবং তৎসন্নিহিত সময়ের

পাঠান-রাজত্বকালে হিন্দুদের বাণিজ্য ও অর্থাগম।

বঙ্গদেশসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "এই সময়ে বাঙ্গলার প্রধান ব্যক্তিরা খাওয়ার সময়ে স্বর্ণপাত্রের একটা জবকালো ঘটা দেখাইতেন, ইহা তাঁহাদের একটী রীতিতে দাঁড়াইয়াছিল। নিমন্ত্রণকালে কাহার এরূপ সোণার সরঞ্জাম বেশী তাহা লইয়া একটা গৌরবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত" (১৩৪ পৃঃ)। এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। বাঙ্গলাদেশ কত যুগ ধরিয়া বাণিজ্য ও কৃষিতে জগতে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া এই বিপুল স্বর্ণাগম করিয়াছিল তাহার পরিচয় পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকায় পাঠকেরা পাইবেন। এই গীতিকাগুলি তাম্রশাসন, শিলালেখ বা মুদ্রার ন্যায় 'ইতিহাস' নামে বাচ্য হইবার অধিকারী নহে, তথাপি সমাজের যে প্রতিবিম্ব তাহাতে পড়িয়াছে তাহা নিখুঁত। এই গীতিকবিতার ভাণ্ডারে কত অলঙ্কারের উল্লেখ আছে, তাহা ছাড়া গৃহ ও নৌযানসজ্জায় যে প্রভূত স্বর্ণ ও মুক্তা ব্যবহৃত হইত তাহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ভোজন ও পানীয়ের জন্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহে স্বর্ণের পাত্র ব্যবহৃত হইত। বণিকবধূরা সর্ব্বদাই সোণার জলের কলসী লইয়া দীঘি, পুষ্করিণী বা নদীর পাড়ে জল আনিতে যাইতেন; অর্ণবযানগুলির মাস্তুল স্বর্ণমণ্ডিত, এবং মণিখচিত গুলটুঙ্গি, চৌচালা, আটচালা ঘরে প্রকাণ্ড আয়নার কপাট ও সোণা-রূপার রুয়া প্রযুক্ত হইত।

এ দেশের বাঁশের 'বারদুয়ারী' ঘর যে ঠিক একখানা সাজানো প্রতিমার ন্যায় হইত, তাহা ফরিদপুর জেলার সায়ওয়ারজান মিঞার বাঙ্গালা ঘরখানি-সম্বন্ধীয় দীর্ঘ বর্ণনায় সবিস্তারে বলা হইয়াছে। সে সময়ের যত ইষ্টকালয় প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই বিলুপ্ত, কিন্তু সেইরূপ কয়েকখানি ঘর কতকটা গৌরব বিচ্যুত হইয়াও কালের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অদ্যও কোন কোন স্থানে এখনও টিঁকিয়া আছে। পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকায় দেখা যায় এক বণিক-শ্রেষ্ঠের এইরূপ ঘরে হীরামণির ঝালর শোভা পাইত এবং রুয়া ও থাম সোণারূপায় ঝলমল করিত, সোণার পাত দিয়া চাল ছাওয়া হইত। ময়ূরপুচ্ছ ও মাছরাঙ্গা পাখীর পাখা দিয়া অনেক সময়ে চালের নীচের দিকটা সাজানো হইত। "ভেলুয়া" নামক গীতিতে বণিকরাজ মুরাইএর বাড়ীর কথায় লিখিত আছে—"বড় বড় ঘর, তার আটচালা চৌচালা—আর সোণা দিয়া মুড়াইছে মাথারে। রূপাতে দিয়াছে ঠুনি, সোণার পাতে দিছে ছানি, টুয়ের মধ্যে রত্ন অলঙ্কার, হাজার বাণিজ্য নায় সাগর বহিয়া যায়—দেখিতে অতি চমৎকার রে।" (২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ১৪১-৪২ পৃঃ।) আমরা মনে করিয়াছিলাম এই বর্ণনার সকলই উপকথা, কিন্তু যখন ফরিদপুরের এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ীতে কতকটা এইরূপ ঘর দেখিতেছি, তখন মনে হয় না যে কবি সত্যের উপর খুব জোরসে তুলি চালাইয়া রং অতিরিক্ত পরিমাণে দিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু যখন অজন্তা গুহার পাথরের ছাদের উপর ছবির সহিত এই ঘরের প্রতিচ্ছবিতে হস্তিগ্রাসকারী সিংহ, পরস্পরবদ্ধ নরহস্ত ও বিবিধ ফুল-লতায় একটা পরম ঐক্য দেখাইতেছে এবং যখন আমরাও কলাশিল্পজাত নানারূপ প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছি—(বিশেষতঃ মুকুলবাবু প্রমাণ করিয়াছেন যে, অজন্তার কর্ম্মিগণের মধ্যে অনেক বাঙ্গালী ছিলেন) তখন এরূপ সিদ্ধান্ত করা স্বাভাবিক যে সেই

গুপ্তযুগের অপূর্ব্ব শিল্পী ও কর্ম্মিগণের বংশধরেরা অবস্থার নিদারুণ বিপর্য্যয় সত্ত্বেও তাঁহাদের কারুকার্য্যের পূর্ব্ব সংস্কার ভুলিয়া যান নাই।

এই শিল্পিকুল দেশের আদিম অধিবাসীরা; তাহারা দ্রাবিড়ী হউক বা দস্যুই হউক,—যাহাদের বহুসংখ্যক বক্তি আর্য্যদের সঙ্গে মিশিয়া সমাজের নিম্ন গণ্ডীতে স্থান করিয়াছিল, যাহারা খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০০০ শতাব্দীতে মহেঞ্জদোরো আশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্য দেখাইয়াছিল, তাহারাই কি ভারতীয় লিপিমালার আদিপ্রবর্ত্তক এবং এই যে নমঃশূদ্ররা "চাষা নাগরী" জানিত তাহারা কি সেই আদিম অধিবাসীদের বংশধর এবং বহুযুগ-পূর্ব্বকার শিল্প-সংস্কার বহন করিয়া আসিয়াছে? নতুবা বড় বড় পণ্ডিতগণ যে ভাষা বুঝিতে অক্ষম তাহা বুঝিতে নমঃশূদ্রের নিকট শরণ লইবার হেতু কি? (৩৩-৩৪ পৃঃ।)

শিল্পীরা অনার্য্য।

ইহাও একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা যে কাষ্ঠশিল্পী, সোণার, কর্ম্মকার প্রভৃতি শিল্পী, যাহারা দেবমন্দির, দেববিগ্রহ ইত্যাদি রচনা করে, তাহাদের অনেকের জল হিন্দুসমাজের আচরণীয় নহে, অথচ তাহাদের অপেক্ষা যাহারা নীচকার্য্য করে, যথা কাহার, নাপিত—ইহাদের জল আচরণীয়। এত গুণবত্তা থাকা সত্ত্বেও আদিম অধিবাসিগণ আর্য্যগণ্ডীতে উচ্চস্থান প্রাপ্ত হন নাই, এজন্য ধুরন্ধর শিল্পীদিগের পরিচয় রাক্ষস, দানব প্রভৃতি। ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয় আর্য্যদের সঙ্গে অনার্য্যদের যখন সংঘর্ষ হয়, তখনও সেই সুদূর অতীতকালে এদেশের অধিবাসী অনার্য্যদের বড় বড় প্রস্তর-গৃহ ও দুর্গাদি ছিল। বাৎস্যায়নের মতে সমস্ত কলাশাস্ত্রের মধ্যে চিত্রবিদ্যাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; এবংবিধ চিত্র-বিদ্যা আমরা নিম্নশ্রেণীর হস্তেই পাইতেছি। সখ্ করিয়া বড়লোকেরা চিত্র ও স্থাপত্য-বিদ্যার অনুশীলন না করিতেন, এমন নহে, কিন্তু কলাবিদ্যার মধ্যে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা নিম্নশ্রেণীদেরই একচেটিয়া ছিল।* শুধু চিত্র ও স্থাপত্য নহে—লেখকের বৃত্তিটাও কতক পরিমাণে নিম্নশ্রেণীদেরই হাতে ছিল, যদিও গণদেবতার উপরে এককালে এই বৃত্তি আরোপ করা হইয়াছিল।

পাঠানদের সময়ে শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতিতে হিন্দুদিগেরই প্রধানতঃ অধিকার ছিল, যেহেতু আফগানগণ নিরবধি রণক্ষেত্রে ও পরদেশ আক্রমণে ব্যস্ত থাকিতেন; দুই একজন ব্যতীত এই যুগের মুসলমান সম্রাটগণ দেশের শিল্প বা স্থাপত্যের বিশেষ কোন উন্নতি করেন নাই; যে সকল মুসলমান পশ্চিম হইতে এদেশে আসিতেন, তাঁহারা স্বীয় ভুজবলে খড়্গহস্তে ভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত করিতে আসিতেন, তাঁহাদের অধিকাংশই আফগান, তাহা ছাড়া, হাবসী, নিগ্রো, খোজা, আরবি প্রভৃতি অন্যান্য জাতীয় লোকেরাও এদেশে অনেক আসিয়া পড়িয়াছিলেন। শের সাহ, হুসেন সাহ এবং অপর দুই এক জন বাদসাহ ছাড়া ইহাদের মধ্যে কেহই শিল্পচর্চ্চার সুযোগ পান নাই; পদ্মপত্রের জলের ন্যায় ইহাদের সিংহাসন ভাগ্য-বারিধির

পাঠান রাজারা শিল্পচর্চ্চার তাদৃশ সুযোগ পান নাই।

* [illegible] ব্যাসদেব-কৃত বিশ্বকর্ম্মার প্রতি অভিশাপ এই যে তাঁহার পুত্রক শিল্পিকুল [illegible] পাইয়া মরিবে।

উপর টলমল করিত, এই সকল আবুহোসেন শিল্প ও স্থাপত্যের চিন্তা কখন করিবেন? বরঞ্চ সেই যুগে গুপ্তগৃহ, গুপ্তদ্বার, অনতিদীর্ঘ অল্প প্রশস্ত গৃহ ও অন্দর, কোন কোন স্থানে হঠাৎ পর-আক্রমণকালে পলাইবার উপায়স্বরূপ জলনালী (Tunnel) প্রভৃতি রাজ-প্রাসাদের অঙ্গীয় হইয়াছিল। এমন কি হিন্দুরাও অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের মন্দিরে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই সময়ের অধিকাংশ প্রাচীন মন্দিরেই প্রবেশদ্বার অতি সঙ্কীর্ণ, ত্রিপুরার সপ্তরত্ন মন্দিরের (কুমিল্লার অদূরবর্ত্তী) ঊর্দ্ধে উঠিলে পথিক নীচে নামিতে পারিবেন না। এই উচ্চ মন্দিরের আগম ও নির্গম পথ একটা দুরন্ত হেঁয়ালী। বহুদিন যাতায়াত না করিলে সেই রহস্যের সমাধান হয় না। এইরূপ মন্দির পাঠানাধিকারের সময়ে বহু হইয়াছিল, গৌড়ের "লুকোচুরী" তোরণ দুর্গ, মুসলমানদের কৃত, উহা এইরূপ একটা রহস্য। উহার ঊর্দ্ধস্তরের স্থাপত্য ছত্রপুরের সুবিখ্যাত "রাজগড়" দুর্গের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই সকল মন্তব্য লিখিয়া আমরা বলিতে বাধ্য এখনও এদেশে পাঠান-যুগের শিল্প ও স্থাপত্যের বহু নিদর্শন রহিয়াছে। গুপ্ত, পাল ও সেন-যুগের কথা মনে হইলে পাঠান-যুগের শিল্পের স্বল্পতা তুলনায় শ্রীহীন মনে হইবে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহা কখনই উপেক্ষণীয় নহে।

ইহা নিশ্চয় যে পূর্ব্বকালের দেশীয় স্থপতি ও শিল্পবিশারদগণই গৌড়ের রাজপ্রাসাদ, দুর্গ ও মসজিদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেন। বঙ্গের চিরপ্রসিদ্ধ "বারদুয়ারী ঘর," যাহার কথা পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকায় আমরা বহুবার পাইয়াছি, বঙ্গের দোচালা ঘরের মত ছাদবিশিষ্ট বাঙ্গালা ঘর—যাহা বঙ্গীয় মস্তিষ্ককর্ত্তৃক প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছিল,—গৌড়ের ও পাণ্ডুয়ার নবাবদের কীর্ত্তির মধ্যে তাহারই নমুনা বেশী পাওয়া যায়। গৌড়ের সোণা মসজিদ এখনও বারদুয়ারী মসজিদ নামটি রক্ষা করিয়াছে। ইহা বাঙ্গলার নিজস্ব স্থাপত্য। ইহা ছাড়া রাজসাহীর "বাঘার মসজিদ," গৌড়ের "হুসেন সাহের মসজিদ" এবং "চাঁদ দরওজা", তথাকার "জানজান মিঞার মসজিদ", সাসারামের ইসলাম সাহের সমাধিস্থান প্রভৃতি মসজিদগুলিতে উৎকীর্ণ আরব লিপি ভিন্ন বঙ্গে বিদেশীয় স্থাপত্য-প্রভাব খুব অল্পই দৃষ্ট হয়। গৌড়ের "কদম রসুল" বা "কদম শরীফ"টি ঠিক হিন্দু মন্দিরের মতই, ঊর্দ্ধে একটি গম্বুজ রচনা করিয়া উহাকে মুসলিম ছাপ দেওয়া হইয়াছে। লোটন বা নোটন মসজিদটি গৌড়ের একখানি বাঙ্গালা ঘরেরই অনুকরণে নির্ম্মিত। গৌড়ের ভাস্কর্য্যের নিদর্শনস্বরূপ কলিকাতার চিত্রশালায় যে প্রস্তরখণ্ডের রাখালদাসবাবু তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৭৬ পৃষ্ঠায় স্থান দিয়াছেন তাহার ফুল-পল্লবের সুচারু কার্য্যও বোধ হয় অমরাবতীর শিল্পীদের বংশধরগণ পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। মঙ্গলকোটের নূতন হাটের মসজিদটি হিন্দুর প্রাচীন মন্দিরাদির লক্ষণাক্রান্ত। ত্রিবেণীর জফর খাঁর সুপ্রসিদ্ধ মসজিদ এখনও একটা দর্শনীয় সামগ্রী, এই মসজিদ একটি হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া রচিত হইয়াছিল। দেব-দেবীর চিত্র পশ্চাৎদিগের আস্তর খুলিলেই ধরা পড়ে। এই মসজিদের কোন কোন স্থলে হিন্দু মন্দিরের প্রাচীন অংশ পুনর্নির্ম্মিত হয় নাই, যেমনটি ছিল সেই ভাবেই রক্ষিত আছে।

মসজিদ-রচনায় হিন্দু শিল্পী।
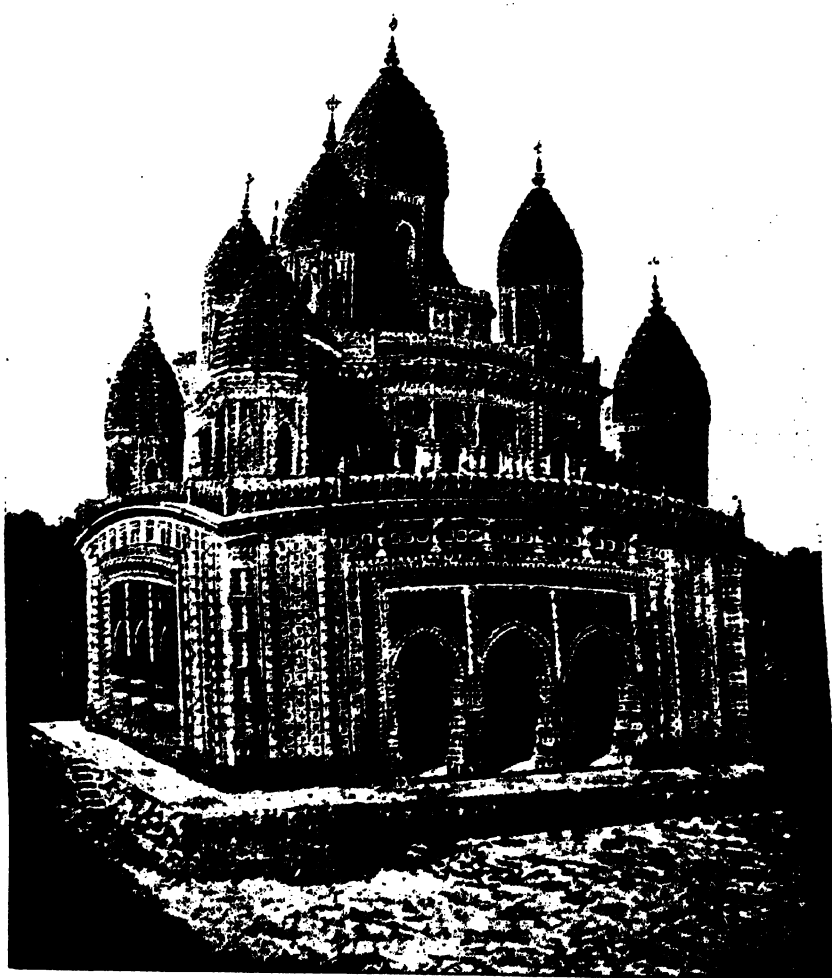
কান্ত নগরের মন্দির (দিনাজপুর)। এই মন্দিরের নবরত্নের মত নয়টি চূড়া বাঙ্গলার অনেক মন্দিরে দৃষ্ট হয়। নবরত্নের নিম্নের ছাদের ঈষৎ গোলাকৃতি ছন্দ এবং খিলানগুলি বাঁশবেড়িয়ার বিষ্ণুমন্দির, বারিপদের মন্দির, মহানাদ, শান্তিপুরের মন্দির এবং গৌড়ের কদম-রসুলের মসজিদ প্রভৃতির প্রণালীতে নির্ম্মিত। এই মন্দির (১৭০৪-১৭২২ খৃঃ) দিনাজপুর সহর হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। মন্দিরগাত্রে পোড়া ইটে যে সকল মূর্ত্তি ও ঘটনা উৎকীর্ণ আছে, তাহা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গীয় সমাজের জীবন্ত আলেখ্যর ন্যায়: ফার্গুসনের ইতিহাস, (জন মারে কোং হইতে গৃহীত)।
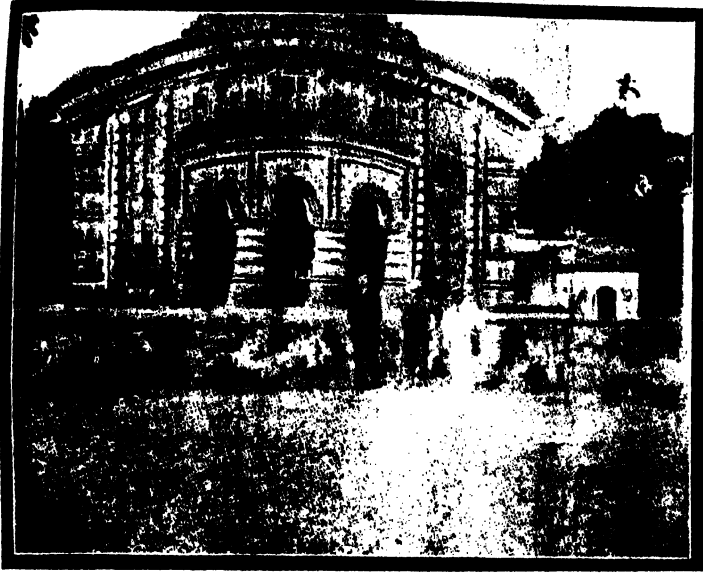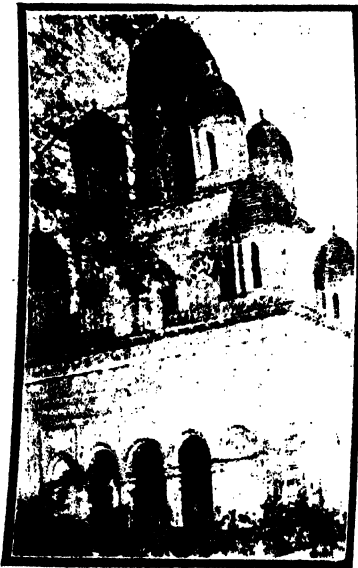
বাঁশবেড়িয়ার বিষ্ণুমন্দির। রাজা রামেশ্বর কর্তৃক (১৬৭৯ খৃঃ) নির্মিত।

রাধা-কৃষ্ণ মন্দির—মহানাদ।

বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দির। (১৭৩৬ শক, ১৮৪১ খৃঃ)
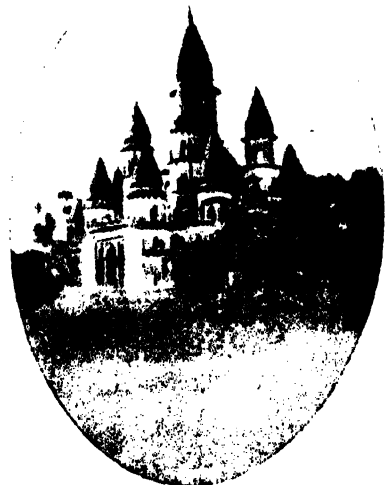
মহানাদের এই দোচালা ঘরের মত মন্দির বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য। কানিংহাম, ফার্গুসন প্রভৃতি স্থাপত্য-সমালোচকগণের মতে বাঙ্গলা হইতে এই আকৃতির ইষ্টক-গৃহ জগতের সর্ব্বত্র অনুকৃত হইয়াছে। ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা জেলার সুবাপুর গ্রামের বর্ত্তমানকালে ভগ্ন রাধা-কান্ত মন্দির নির্ম্মাণের পূর্ব্বে তৎস্থলে এই দোচালা ঘরের মত মন্দির ছিল এবং বঙ্গের বহুস্থানে এই ধরনের মন্দির এখনও ভগ্নাবস্থায় দৃষ্ট হয়।

লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির, বারিপদ (ময়ূরভঞ্জ) চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত।

জটার দেউল—৯৭৫ খৃষ্টাব্দে জয়চন্দ্র নামক নৃপতি কর্ত্তৃক সুন্দরবনের মথুরাপুরে (১১৬ নং লাটে) এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। ইহা ১০০ ফুট উচ্চ। বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্ট ইহার সংস্কার করিয়াছেন। শ্যামে আখুপিয়া-মঠের আকৃতি ঠিক এইরূপ।
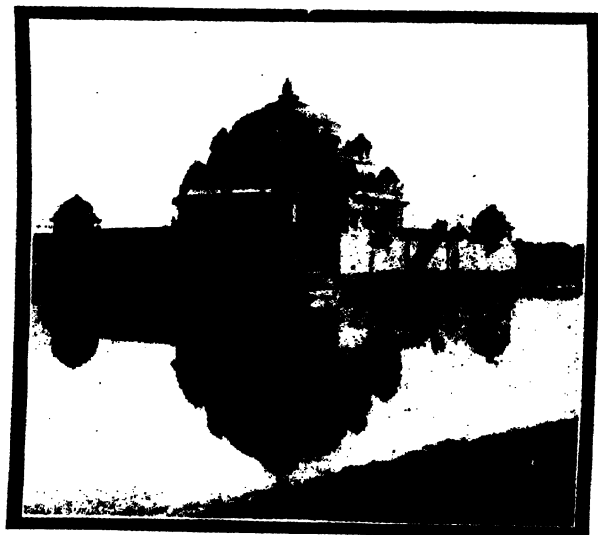
সের সাহের সমাধি।

বঙ্গদেশের অনেক স্থলেই প্রাচীন হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া মুসলমানগণ এইভাবে মসজিদ রচনা করিয়াছিলেন। সেই সকল মসজিদ তো হিন্দু মন্দিরের মালমশলা দিয়াই রচিত হইয়াছিল; পরন্তু সম্ভবতঃ দেশীয় যে সকল শিল্পিগণ ঐ সকল প্রাচীন মন্দির রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই বংশধরগণ অনেক স্থলে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অথবা কোন কোন স্থলে স্বধর্ম্মে থাকিয়াও সেই সকল মসজিদ রচনা করিয়াছিলেন, মোগলেরা পারস্য হইতে যে শিল্পপ্রভাব আনিয়াছিলেন, তাহা তখনও বাঙ্গলায় প্রবেশ করে নাই। ১৫৭৬ খৃঃ অব্দের পরে সেই হাওয়া কিছু কিছু এদেশে ঢুকিয়াছিল, তাহা পরে উল্লেখ করিব। হাভেল সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন—ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধগণ এসিয়ার চিত্র ও স্থাপত্য শিল্পের গুরু। পারস্যের শিল্প ও বিদেশী মসজিদগুলির সূক্ষ্ম কাজ ও গঠনপ্রণালী সমস্তই মুসলমানগণ বৌদ্ধশিল্পীর নিকট পাইয়াছেন। আর্য্য বর্ত্তে এই শিল্প ও স্থাপত্য যেরূপ বিকাশ পাইয়াছে, খাস পারস্য দেশে তাহা হইতে পারে নাই। বৌদ্ধগণের পদ্ম-চিহ্ন লোপ করিয়া মুসলমানেরা যে গম্বুজ রচনা করিয়াছেন, তাহাও এদেশেরই স্থাপত্য হইতে নেওয়া। ভারতবর্ষের বহু শিল্প ও স্থাপত্য-বিশারদ মুসলমানদের বিজিত দাসরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেশে চালান হইতেন। তাঁহারা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে বাধ্য হইলেও তাঁহাদের তুলি ও বাটালি হিন্দু শিল্পের কুশলতা-বিচ্যুত হয় নাই।

পাঠান-প্রাধান্য যুগের মুসলমানী মসজিদ ও প্রাসাদাবলীর মধ্যে শের সাহের সমাধি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। শের সাহের বাল্যলীলা-ক্ষেত্র সাসারামে এই সমাধিটি উত্থিত হইয়াছিল। এই সমাধির ঊর্দ্ধ গম্বুজটি ছাড়িয়া দিলে ইহার অনেকটা একটি হিন্দু রথের অনুকৃতি, তফাৎ এই যে ইহা রথের মত বেমানান দীর্ঘ হইয়া উঠে নাই। দুই দিকে সমতা-সহকারে প্রসারিত করিয়া ইহার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের এমনই একটি সুসামঞ্জস্য রক্ষা করা হইয়াছে যে উহা উত্তর কালে শিল্প-স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ পরিণতির আদর্শ তাজমহল-পরিকল্পনার পূর্ব্বাভাস দেখাইতেছে। এই মন্দিরের চারিদিকে কৃত্রিম হ্রদের বিস্তৃত জলরাশি এক মাইল ব্যাপক, তন্মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর কয়েকটি সমাধি-মন্দির আছে। সেই বিস্তৃত জলরাশির উপর প্লবমান জলযানের মত দূরবর্ত্তী স্বল্পায়তন সমাধিমন্দিরের উর্দ্ধে শ্যামতরুরাজির অবকাশে এই সুবৃহৎ মন্দিরটি তাহার একক রাজত্বের মহিমা দেখাইতেছে। ইহা দেখিয়া একজন ইংরাজ কবি মুগ্ধ হইয়া যে কবিতাটি লিখিয়াছেন (Asiatic Miscellany) তাহার অনুবাদ আমি নিম্নে দিলাম—

স্বচ্ছ নীর হতে ঊর্দ্ধে মহিমা-প্রকাশ
সুবিশাল গৃহচূড় ছুঁইছে আকাশ;
উপকূল ঘেরা ছোট সমাধি-মন্দিরে
বিশ্বস্ত সৈনিক যেন ঘিরে আছে বীরে।
সম্রাট্ একক, তাঁর অখণ্ড বৈভব
মৃত্যুতেও হারায়নি স্বাতন্ত্র্য-গৌরব।

মুসলমান নবাবদের অনেকেই খামখেয়ালী ছিলেন। বাঙ্গলাদেশ অপেক্ষা দিল্লীর অঞ্চলে সময়ে সময়ে দৌরাত্ম্যটা খুব প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল। সম্রাট্ আলাউদ্দিন দুরন্ত পাগল ছিলেন, তাঁহার মস্তিষ্ক হইতে কত যে নূতন নূতন আইন-কানুন উদ্ভাবিত হইত, তাহা কবির কল্পনায়ও আসে না। "সুলতান" তাঁহার রাজধানীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা নিবারণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পরের গৃহে যাতায়াত করিতে পারিতেন না, পরস্পরকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে পারিতেন না; তাঁহাদিগকে সভাসমিতি করিতে দেওয়া হইত না। রাজার অনুমতি ভিন্ন তাঁহাদের মধ্যে কোন বিবাহ হইতে পারিত না। তাঁহারা স্বগৃহে কোন বিদেশী লোককে স্থান দিতে পারিতেন না। চারিদিকে এত গুপ্তচর ছিল যে তাঁহারা পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে ভয় পাইতেন। তাঁহাদের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের কোন সুযোগ ছিল না। যদি তাঁহারা কোন হোটেলে বা সরাইতে একত্র হইতেন, সেখানে তাঁহাদের মুখব্যাদান করিবার ক্ষমতা ছিল না, পরস্পরের দুঃখের কথা বলা অসম্ভব ছিল (তারিকি ফিরোজ সাহী)। যেখানে মুসলমান আমিরদের উপরই এইরূপ আইন জারি হইত, সেখানে হিন্দুরা যে কি কষ্টে ছিলেন তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। "হিন্দুরা বাড়ীতে ঘোড়া রাখিতে পারিত না, তাহাদের ভাল কাপড় পরিতে দেওয়া হইত না—কোন বিলাস সম্ভোগ করিতে পারিত না। কোন হিন্দু মাথা উঁচু করিয়া রাস্তায় হাঁটিতে পারিত না—তাহাদের গৃহে সোণা-রূপার কোন সামগ্রী রাখিতে দেওয়া হইত না।" সুলতান মহম্মদ টোগলকের দৌরাত্ম্য একরূপ অকথ্য। এক সময়ে (১৩৪২ খৃঃ) তিনি আদেশ করিলেন—"তিন দিনের মধ্যে সমস্ত দিল্লীবাসীকে নগর ছাড়িয়া যাইতে হইবে। অবশ্য অনেকেই সম্রাটের ভয়ে দিল্লী ছাড়িয়া দৌলতাবাদে পলাইয়া গেলেন, কিন্তু কয়েকজন রহিয়া গেলেন—তাঁহারা লুকাইয়া গৃহমধ্যে রহিলেন। সম্রাট্ অতি কঠোরভাবে তাঁহাদের সন্ধান লইতে লাগিলেন। সম্রাটের চরেরা একটি পঙ্গু ও একটি অন্ধকে রাস্তায় পাইয়া কুড়াইয়া আনিল। সম্রাট্ সেই পঙ্গুটাকে প্রাসাদশিখর হইতে গুলি করিয়া মারিলেন এবং অন্ধকে হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে দিল্লী হইতে দৌলতাবাদে টানাইয়া আনিলেন। দিল্লী হইতে দৌলতাবাদ ৪০ দিনের পথ। এই সমস্ত রাস্তাটা অন্ধকে টানিয়া আনার ফলে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রাস্তায় কাটিয়া ছিঁড়িয়া পড়িতে পড়িতে চলিল। যখন দৌলতাবাদে এই লোকটার অবশিষ্ট অংশ আনা হইল, তখন দেখা গেল হতভাগ্যের মাত্র একটি পা সেই নগরে পৌছিয়াছে। (ইবন বতুতুর ভ্রমণ)। তাইমুর দিল্লীতে হিন্দুদের উপর যেরূপ হত্যাকাণ্ড করিয়াছিলেন, তাহা লোমহর্ষণ। "তিনি আদেশ করিলেন, যে মুসলমান যতগুলি হিন্দু বন্দী করিয়াছে, সেই সকল বন্দীর সকলটিকে সে আদেশমাত্র হত্যা করিবে, নতুবা তাহাকে হত্যা করা হইবে। ইসলামের বীরপুরুষেরা এই আদেশ শ্রবণমাত্র তাহাদের খড়্গ কোষ হইতে বাহির করিয়া সমস্ত বন্দীদের নির্ম্মূল করিল, একদিনে একলক্ষ কাফের নিহত হইয়াছিল। একটি আমির রাজসভায় তাঁহার পাণ্ডিত্য, চরিত্র ও দয়াদাক্ষিণ্য-গুণে সকলের আদৃত ছিলেন, তিনি জীবনে

খামখেয়ালী সম্রাট্গণের অত্যাচার।

একটি চড়ুই পাখীও মারেন নাই, সেই স্মরণীয় দিবসে তিনিও স্বহস্তে ১৫টি হিন্দু বন্দীর শির কর্ত্তন করিয়াছিলেন (তাইমুরের আত্মবিবরণী)। ভনেয়ারার আকবরের জীবনচরিতে উল্লেখিত আছে, যখন মুসলমান রাজকর্ম্মচারী হিন্দু প্রজার নিকট কর আদায় করিতে যাইতেন তখন সেই কাফেরকে হাঁ করিতে হইত, কারণ রাজকর্ম্মচারীটি যেন তাহার মুখে থুতু নিক্ষেপ করিতে পারেন, এই ছিল আইন; ইহার উদ্দেশ্য "ইসলাম ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি এবং আশ্রিত কাফেরগণের বশ্যতার পরীক্ষা করা।" দিল্লীর বাদসাহগণের যে কতরূপ খামখেয়ালী ছিল তাহার অবধি নাই। একজন (সেকেন্দর লোডি—১৪৮৮-১৫১৮ খৃঃ) তাহার আমির বা অতিথিদিগকে কি কি দ্রব্য খাইতে দিতেন, তাহার ফর্দ্দ নিজে করিয়া দিতেন, একবার যাহা করিলেন তাহা যেন পাথরের দাগ হইত—"হাকিম নড়ে, তো হুকুম নড়ে না।" গ্রীষ্মকালে জোয়ানপুর হইতে এক সম্ভ্রান্ত অতিথি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। সে সময়টা অতি দারুণ গ্রীষ্ম এবং লোকজন সারাদিন তৃষ্ণায় ছটফট করিতেছিল; সুলতান সেই অতিথির সমস্ত খাদ্যের ব্যবস্থা ও বরাদ্দ করিয়া শেষে তাঁহার জন্য ছয় জালা সরবৎ মঞ্জুর করিলেন। তারপর সেই অতিথি শীতকালে আবার আসিলেন, তখনও দেখিলেন তাঁহার জন্য সেই ছয় জালা সরবতের ব্যবস্থা রহিয়া গিয়াছে (তারিকই দাউদি)।

দিল্লীশ্বরগণের এই খামখেয়ালী ও অত্যাচারের হাওয়াটা বাঙ্গলায়ও আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। বিশেষতঃ পাঠান জাতিরা স্বভাবতঃই নির্ম্মম ছিলেন। আমাদের কোন ইতিহাস নাই, সুতরাং সেই সময়ের অত্যাচার-কাহিনী লিপিবদ্ধ হয় নাই। তবে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করিলে মাঝে মাঝে এই অভিশপ্ত দেশের অবস্থার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। যাঁহারা ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া পুস্তক লিখিতেন, তাঁহারাও স্পষ্ট করিয়া এসকল কথা লিখিতে সাহসী হইতেন না। প্রবল শাসনকর্ত্তাদের অত্যাচারের কথা সেই দেশের লোকেরা লিখিতে স্বভাবতঃই ভয় পাইয়া থাকে। ভয় পাইয়াই বোধ হয় বৈষ্ণবগণ আইন করিলেন, কোন নিতান্ত কষ্টকর কথা লিখিতে নাই।

বঙ্গদেশে পাঠান রাজত্বের শেষকাল ও মোগলদের আবির্ভাব—এই সময়টায় প্রজারা কাজীদের হাতে অত্যন্ত বিড়ম্বিত হইত। এই সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে কবি চন্দ্রাবতী যথাযথ চিত্র দিয়াছেন—

"টাকা পয়সা রাখে লোকে মাটিতে পুঁতিয়া।
ডাকাত কাড়িয়া লয় গামছা মোড়া দিয়া॥
ডাকাত দেশের রাজা পাতসায় না মানে।
উজাড় হইল রাজ্য কাজীর শাসনে॥
দোছক পাইয়া সবে ছাড়ে লোকালয়।
ধনেপ্রাণে মরে লোক চন্দ্রাবতী কয়॥"

কাজীদের সঙ্গে সহযোগে ডাকাতেরা দেশ লুটতরাজ করিত। কেনারাম এবং নেজামত প্রভৃতি দস্যুদের যে চিত্র পল্লী-কবিদের হাতে ফুটিয়াছে, তাহা পড়িলে প্রাণ আতঙ্কিত হইয়া উঠে।

পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুরাজত্বের অবসানে ও গাজিদের প্রথম অভ্যুদয়ে দেশে এইরূপ অরাজকতা আরম্ভ হইয়াছিল, বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে তাহার চিত্র দেওয়া হইয়াছে। "যাহার মস্তকে দেখে তুলসীর পাত। হাতে গলায় বাঁধি লয় কাজির সাক্ষাৎ। কক্ষতলে মাথা থুইয়া বজ্র মারে কিল। পাথর প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল। পরেরে মারিতে পরের কিবা লাগে ব্যথা। চড়চাপড় মারে আর ঘাড়ে গোতা॥"—"ব্রাহ্মণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে। কার পৈতা ছিঁড়ে কারো থুথু দেয় মুখে।" "ব্রাহ্মণ সজ্জন তথা বৈসে অতিশয়। ঘরেতে গোময় না দেয় দুর্জ্জনের ভয়।" "বাছিয়া ব্রাহ্মণ লয় পৈতা যার কাঁধে। পেয়াদাগণ লাগ পাইলে হাতে গলায় বাঁধে।" হুসেন সাহ একটা ভবিষ্যৎ বাণী শুনিলেন যে, "নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ আবার রাজা হইবে।" মন্ত্রীরা বলিলেন—পুরাণে ও গন্ধর্ব্বশাস্ত্রে এরূপ কথা লিখিত আছে বটে; বিশেষ নবদ্বীপের লোকেরা বলশালী ও ধনু চালনায় পারদর্শী।" তখন হুসেন সাহ নবদ্বীপ ধ্বংস করিতে আদেশ করিলেন। "পিরুল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন। উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ। বিষম পিরুল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে" ইত্যাদি। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, মুসলমানেরা বাদসাহের আদেশ পাইয়া নবদ্বীপে বিষম অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল। "কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কাঁধে; ঘরদ্বার লোটে আর লৌহপাশে বাঁধে।" অত্যাচারীরা অশ্বত্থ ও মনসা গাছের মূলচ্ছেদ করিয়া ফেলিল ও তুলসী গাছ মূলশুদ্ধ উপাড়িয়া ফেলিতে লাগিল। যে ঘরে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিত, সে ঘরে যাইয়া উৎপাত সুরু করিত। গঙ্গাস্নান নিষিদ্ধ হইল, দেবালয়গুলি চূর্ণ করিল,—পণ্ডিতগুলিকে ধরিয়া জোর করিয়া মুসলমান করা হইতে লাগিল। বাসুদেব সার্ব্বভৌম পলাইয়া পুরীতে আসিলেন, তথায় রাজা প্রতাপ-রুদ্র তাঁহাকে স্বীয় সভায় রত্নসিংহাসনে বসাইয়া সম্মান করিলেন। তাঁহার পিতা বিশারদ কাশীবাসী হইলেন। বাসুদেবের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় গৌড়দেশে চলিয়া গেলেন। কিন্তু এই অত্যাচার বেশী দিন চলে নাই। হুসেন সাহ বুঝিলেন, এরূপ ভবিষ্যৎ বাণীর কোন মূল্য নাই, তখন সেই অত্যাচার নিবারণ করিয়া দিলেন। বিদ্যাবিরিঞ্চি, বিদ্যারণ্য এবং ভট্টাচার্য্য, শিরোমণি ও অপরাপর মহাজনেরা যাঁহারা নবদ্বীপ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা নবদ্বীপে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। খামখেয়ালী নবাবগণের ঔদার্য্যও নিষ্ঠুরতার মতই অত্যধিক ছিল। হুসেন সাহ যে সকল হিন্দুমন্দির ভাঙ্গিয়াছিলেন, তাহা রাজকোষের অর্থদ্বারা পুনরায় সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন।

যখন বাঙ্গলাদেশ প্রথম পাঠানদিগের অধিকৃত হয়, তখন এই ভাবে অত্যাচার কতক দিন চলিয়াছিল। তারপর রাজাদের মধ্যে যাঁহারা খামখেয়ালী তাঁহারাও মাঝে মাঝে এই অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শের সাহের জবরদস্ত শাসনে কতক দিনের জন্য এই অত্যাচার বন্ধ ছিল। কিন্তু মোগলরাজ্য-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার অত্যাচার সুরু

হইয়াছিল। দামুন্যার কবি মুকুন্দ ডিহিদার মামুদ সরিফের যে অত্যাচারের বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে গ্রামগুলি উচ্ছন্ন হইবার মধ্যে আসিয়াছিল। হিন্দু আমলে রাজকর্ম্মচারীরাও যে এরূপ না করিতেন তাহা নহে। রাজা মাণিকচন্দ্রের বাঙ্গালী মন্ত্রীর ক্রিয়াকলাপ ও ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচার প্রায় এক শ্রেণীর। খিলভূমি আবাদি বলিয়া লিখিত হইল, তাহার উপর রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। কৃষকেরা, একদিকে বাজারে জিনিষের মূল্য অত্যন্ত হ্রাস পাওয়াতে এবং প্রত্যেক টাকার মূল্য ৵/১০ আনা হওয়াতে, দুই দিক্ দিয়াই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল। জিনিষের দাম তঙ্কাপ্রতি ৵ কমিয়া গেল। প্রজারা বীজ ধান ও গরু বিক্রয় করিয়া ডিহিদারের দাবী মিটাইতে পারিল না। এদিকে গ্রাম হইতে পালাইয়া যাইবার উপায় নাই। পথে পথে কোটালগণ রাস্তা বন্ধ করিয়া পাহারা দিতে লাগিল এবং প্রত্যেক বিঘা পাঁচ কাঠা কম করিয়া হিসাব করা হইতে লাগিল। যাহার দশ বিঘা জমি ছিল তাহার হইয়া গেল সাড়ে সাত বিঘা; বাকী রাজ-সরকারে জমা হইল। মুকুন্দরামের এই চিত্রের সঙ্গে দ্বাদশ শতাব্দীর মৈমনসিংহ ("ভাটি")-বাসী বাঙ্গালী মন্ত্রীর অত্যাচারের কাহিনী মিলাইয়া পড়ুন। উভয়ের কার্য্যকলাপের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য পাইবেন।

মুসলমানেরা বিলাস-ক্ষেত্রে এবং রাজপ্রাসাদ-সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ই একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন। হিন্দুদের সেই মহাপাত্র, নিশাপতি, মন্ত্রী প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীদের পদবী উঠিয়া গিয়া উজির, নাজির, সেরেস্তাদার, কাজি, ওমরাহ, জমানবিশ, খাসনবিশ, তালুকদার প্রভৃতি নানা পারসী ও আরবী-সম্ভূত নাম রাজসভায় প্রচলিত হইল। গৌড়েশ্বরগণের সভায় সেই অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি, রাজত্রয়াধিপতি, বিবিধবিদ্যা-বিচার-বৃহস্পতি, আর্য্যকুল-কমলভাস্কর, সোম বা সূর্য্যবংশপ্রদীপ, প্রতিপন্ন-কর্ণ, সত্যব্রত গাঙ্গেয়, শরণাগতবজ্রপঞ্জর, পরমেশ্বর-পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি সংস্কৃতাত্মক কোন উপাধির চিহ্নমাত্র রহিল না। এমারত, ঝাড়, দেয়ালগিরি, ফানুস, আতর প্রভৃতি বিদেশী শব্দ সমাজের উচ্চস্তরের বিলাসীদের ভাষা হইল। সহরে হিন্দুর ভাষা ধীরে ধীরে মুসলমানী ছাপ গ্রহণ করিয়া পরাধিকারের প্রভাব সপ্রমাণ করিল। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে হিন্দুদের অবাধ রাজত্ব,—সেখানে আরতির মেটে প্রদীপটি হইতে তুলসীতলা, চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু, আকাশ-ঘেরা কুটিরটি পর্য্যন্ত সমস্ত কথাই বাঙ্গলা রহিয়া গেল। পাঠান আমলে হিন্দু সহর ছাড়িয়া দিয়া এই পল্লীতে রাজত্ব করিয়াছে। পল্লীতে বসিয়া পণ্ডিতেরা মেটে প্রদীপের সাহায্যে বড় বড় ন্যায়দর্শনের টীকা করিয়াছেন। পটুয়ারা অজন্তার শেষ চিহ্ন বজায় রাখিয়াছে, মেয়েরা তাঁহাদের আলপনা ও কাঁথার মধ্যে যে সকল কলা আঁকিয়াছেন তাহা অমরাবতীর চিত্রশিল্পের শেষ নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের পুঁথিতে শিল্পিগণ বিচিত্র ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন, কাঠের মলাটে গালা দিয়া লাল রংএর জমি তৈরী করিয়া তাঁহারা নিপুণভাবে দেবতাদিগের পৌরাণিক লীলা অঙ্কন করিয়াছেন। ছুতোরেরা তাহাদের কর্ম্মে অজন্তা, সাঁচি, অমরাবতী ও মগধের সমস্ত শিল্পের শেষ নমুনা

রাজদরবারে ও বিলাসের কক্ষে বিদেশী ভাষার প্রভাব।

রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইয়াছে এবং মন্দির-নির্ম্মাণকারীরা পোড়া ইটের গায় যে সমস্ত জীবজন্তু, নরনারী ও ফুললতার চিত্র উৎকীর্ণ করিয়াছে, তাহাতে শিল্পলক্ষ্মীর অভয়বাণী শোনা যায়। তিনি যেন বলিতেছেন—"বাঙ্গলার নগর সহর হইয়া গিয়াছে—সেখানে আমার স্থান নাই; কেবল অর্থের ছড়াছড়ি, অর্থে আমাকে পাওয়া যায় না। কিন্তু বাঙ্গলার পল্লীতে এখনও তপস্যা চলিতেছে—আমি সেই তপস্বীদিগকে এখনও ছাড়িতে পারি নাই।" ফুললতার কল্কার বাহাদুরী বাঙ্গলার প্রত্যেক মন্দিরে পাওয়া যায়। তাহার অধিকাংশই মোগলাধিকারের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বের। পাঠান আমলের শেষ দিকে ২০০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন পল্লীতে শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বিগ্রহ বড় বেশী পাওয়া যায় না। বিগ্রহের নাম শুনিলেই বিগ্রহবিরোধী দল আসিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিত, লিঙ্গ ভাঙ্গিতে তাহাদের ততটা উৎসাহ ছিল না। এই জন্য অধিকাংশ মন্দিরেই লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা হইত। এই সকল মন্দিরে দেবলীলা এবং নানাপ্রকার সামাজিক চিত্র অঙ্কিত থাকিত। কিন্তু ইহাদের বাহার ছিল কল্কায়। প্রত্যেকটি মন্দিরে বিভিন্নরূপ কল্কা, এক মন্দিরেই সূক্ষ্ম ও স্থূল বিবিধ প্রকারের কল্কা। এই কল্কার কত আদর্শ যে কারিগরদের মাথায় ছিল, তাহা বলা যায় না। এই অফুরন্ত কল্কার আদর্শ যেমন আমরা মেয়েদের কাঁথায় পাই, তেমনি মন্দিরগাত্রে পাই। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, মন্দির সাজাইবার ভার সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে এমন কি দাক্ষিণাত্যেও বাঙ্গালী শিল্পীরা জোগাইত। এই বাঙ্গালী শিল্পীরাই মগধের প্রসিদ্ধ শিল্পীদের বংশধর। মগধ গৌরব নষ্ট হওয়ার পরে গৌড়ের প্রভুত্বকালে সেই শিল্পীরা বাঙ্গলায় আসিয়া বাস করিয়াছিল। তিন চারি শত বৎসর হইতে দুই শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গলার শত শত মন্দিরগাত্রে যে কল্কার অপূর্ব্ব মৌলিক শোভার ছড়াছড়ি দেখা যায়, তাহাতে মনে হয়, বসোরা যেরূপ গোলাপের জন্মস্থান—বাঙ্গলাদেশ তেমনই চারুশিল্পকলার জন্মস্থান—এখানেই কলালক্ষ্মীর সিংহাসন ছিল। আপনারা মাটী খুঁড়িয়া অশোকস্তম্ভ ও তাহার রাজপ্রাসাদ আবিষ্কার করিয়াছেন, বাঙ্গলার শিল্পলক্ষ্মীর রাজধানী খুঁজিতে আপনাদের মাটী খুঁড়িতে হইবে না। প্রত্যেক বাঙ্গালী মেয়ের পদ্মহস্তে সেই পদ্মাসনার করকমলের সুরভি পাইবেন, প্রত্যেক মন্দির-রচকের বাটালী ও ক্ষুদ্র যন্ত্রিকার অগ্রে তাঁহার চরণকমলের ছাপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, নতুবা এত পদ্ম ফুটিয়া উঠিবে কিরূপে। আমি উৎকৃষ্ট কল্কাগুলির ফটোগ্রাফ পাইলাম না, তাহারা অনেক স্থলেই দূরে অবস্থিত। আমি বৃদ্ধ—সঙ্গতিহীন, চেষ্টা সত্ত্বেও সেগুলি পাইবার উপায় করিতে পারিলাম না। আমার প্রিয়তম দেশবাসীদিগের এ বিষয়ে কৌতূহল উদ্বোধন করিবা আমি বেহালা, বড়িসা প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী স্থানের কয়েকটি মন্দিরগাত্র হইতে কল্কার নমুনা দিতেছি। য়ুরোপীয় শিল্পকারের মত আমাদের দেশের শিল্পকারেরা নকলবাজ নহেন। ঠিক একটি ফুল দেখিয়া ফুল আঁকা;—অল্প কিছু শিল্পবিদ্যার বর্ণপরিচয় জানিলেই এই নকল কার্য্যটি অতি সহজে শেখা যায়। কিন্তু যে শিল্পী সমস্ত পুষ্পজগৎকে হৃদয়ের মধ্যে আনিয়া তাহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে

পল্লী শ্রীর ভাব বজায় রাখিয়াছে

মন্দিরগাত্রে চারুশিল্প।

পারিয়াছেন. তিনি ভগবানের সৃষ্টি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন সৃষ্টি করিবার দক্ষতা লাভ করেন, তখন জগতের বিবিধ বর্ণশোভা তাঁহাকে না আঁকিয়া শেখায়, জগতের যাবতীয় ফুল-লতা তাঁহার নবসৃষ্ট ফুল-লতার মধ্যে অপরূপ মাধুরী দান করিতে শক্তি দেয়। এই মৌলিক সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি লইয়া ভারতীয় শিল্পী অবাধে আঁকিয়া যান। তিনি যে পদ্ম আঁকেন, তাহা জগতের পদ্ম নহে, তাঁহার আঁকা লতা জগতে পাওয়া যায় না, কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা তাঁহার হাতে অবাধ গতি প্রদান করে, বর্ণের বিন্যাস দিয়া কাঁথার শোভা চিত্ত হরণ করে। হয়ত ছবিগুলি একটি একটি করিয়া দেখিলে তেমন কিছু আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইবে না, কিন্তু সমগ্রভাবে এই অপূর্ব্ব কারুকার্য্য দেখিলে মনে হইবে,—একি আশ্চর্য্য রংমহাল, ইহাতে রঙ্গএর বিচিত্র বিন্যাস, কলালক্ষ্মীর কি অপূর্ব্ব ও গৌরবান্বিত মহিমাই না এই অপার্থিব ফুল-লতায় প্রকাশ করিয়া দেখাইতেছে। ভারতীয়, বিশেষতঃ বঙ্গীয়, শিল্পীর যে সহিষ্ণুতা, তাহার উদাহরণ অন্য কোথাও নাই। এই জন্য বাঙ্গালী শিল্পী ছবি আঁকে, মূর্ত্তি গঠন করে—এ বলিলে কথাটা ঠিক বোঝা যাইবে না, বলা উচিত বাটালি, ছুঁচ বা পিঠালী এই সকল সামান্য উপকরণ দিয়া তাহারা তপস্যা করে। প্রত্যেকটি মন্দিরের কারুকার্য্য, প্রত্যেকটি কাঁথা দেখিলেই তপস্যা কথাটাই জিহ্বাগ্রে আসিবে। কারণ এ সকল ঢালাই করা কার্য্য নহে, ইহার প্রত্যেকটি সূক্ষ্ম কাজ, হাতের কাজ।

এই পল্লীলক্ষ্মী বিদ্যা-ধর্ম্ম-জ্ঞান-প্রদায়িনী ; এখানে চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন এবং এই পাঠান আমলেই কত ভক্ত, কত তান্ত্রিক, কত নৈয়ায়িক, কত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন। সত্য বটে মুসলমান-বিজয়ের পর আর কোন রাজকবি পবনদূত বা গীতগোবিন্দ রচনা করিয়া মহারাজাধিরাজ-রাজচক্রবর্ত্তীর মনোরঞ্জন করেন নাই। কিন্তু পল্লীকবিদের সুস্বরলহরী তো থামে নাই, সময়ে সময়ে কোন ক্ষুদ্র জমিদারের নিকট "সাত আড়া" ধান মাপিয়া লইয়া পরম তৃপ্তির সহিত কোন কবিচূড়ামণি কৃতার্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু মোটের মাথায় বাঙ্গলার বিদ্বান্, বাঙ্গলার ভক্ত, বাঙ্গলার শিল্পী এবং বাঙ্গলার ধার্ম্মিক আর রাজানুগ্রহের প্রত্যাশা করে নাই। বাঙ্গলার সভ্যতা পল্লীতে পল্লীতে ছড়াইয়া পড়িয়া গণতন্ত্রতার একটা রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে রাজার কোন স্থান ছিল না,—সমস্ত দেশ পাঠানের অধিকারে থাকিলেও তাহার অধ্যাত্মসাম্রাজ্য বজায় রাখিয়াছিল—তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলার পল্লীর প্রকৃত শাসনকর্ত্তা ছিলেন ব্রাহ্মণ.

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব।

তাঁহাদের ইঙ্গিতে সমস্ত সমাজ চলিত। ব্রাহ্মণের পর ঐ সময়ে আর এক দল প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—বৈষ্ণব। ইঁহারা নূতন আভিজাত্য সৃষ্টি করিয়া দেশের একাংশ জয় করিয়া লইয়াছিলেন। সমাজের উচ্চস্তরে কুলীনেরা একেবারে দৃঢ়রূপে স্বপ্রভাব সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এক এক শ্রেণীর লোক তাঁহাদের কুলীনদিগকে সমাজে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। এই সুদৃঢ় হিন্দু ব্যূহের মধ্যে বিদেশী শাসনকর্ত্তাদের হস্তক্ষেপ করিবার বিশেষ সুবিধা ছিল না, তবে মাঝে মাঝে সুন্দরী হিন্দু ললনাদিগের খোঁজ করিবার জন্য "সিদ্ধকী"রা পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়াইত। পল্লীবাসিনী

রমণীরা অবরোধ কি জানিতেন না। কিন্তু মুসলমান, মগ, পর্ত্তুগীজ, হার্ম্মাদ প্রভৃতি বিদেশী দস্যুদের ভয়ে মোগল রাজত্বের শেষভাগে এদেশে অবরোধ-প্রথা কতক পরিমাণে প্রবর্ত্তিত হয়। "নৃত্যগীতানুরক্তি" হিন্দুললনাগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণের পরিচায়ক ছিল—পদ্মিনী-শ্রেণীর রমণীর লক্ষণের মধ্যে এই "নৃত্যগীতে অনুরক্তি" উল্লিখিত আছে। এদেশের রাজকুমারীরা গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া চিত্রাঙ্কন, নৃত্য ও সঙ্গীতবিদ্যা শিখিতেন, বৃহন্নলাই শুধু একমাত্র শিক্ষক ছিলেন না। চিত্রলেখার সময় হইতে সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ বাঙ্গালী মেয়েরা চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করিতেন। বিদেশীয়দের অত্যাচারে তাঁহারা এই সকল বিদ্যার অনুশীলন ছাড়িয়া দিলেন। ইচ্ছাবর (স্বয়ংবর)-প্রথা এদেশে এখন লুপ্ত; কিন্তু পালরাজগণের সময়েও কতকটা পরিবর্ত্তিত আকারে প্রচলিত ছিল। "পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা"য় এই ইচ্ছাবর-প্রথার অজস্র প্রশংসা কৃষক কবি গাহিয়াছেন। স্বকীয় মনোনয়নে যে রমণী স্বামী লাভ করিতে পারেন তাঁহার মত সৌভাগ্য জগতের কাহারও নাই, এই কথা কবি অকুণ্ঠিত ভাবে বলিয়াছেন।

কিন্তু ষোড়শী কুমারীর বিবাহ হইবে, তিনি স্বয়ংবর মনোনয়ন করিবেন, কিংবা কোন রমণী সুগায়িকা, নৃত্যকলায় পারদর্শিনী, কিংবা চিত্রবিদ্যায় নিপুণা এই সকল সংবাদ দিগ্বর্গীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাহারা বাঘের ন্যায় গুণবতী ও সুন্দরী মহিলাদের খোঁজে পাড়ায় পাড়ায় ওৎ পাতিয়া থাকিত, সুতরাং বাঙ্গলাদেশ হইতে এই সকল গুণ রমণীসমাজে লুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু এখনও কোন কোন পল্লীতে প্রাচীন রীতির শেষ চিহ্ন আছে। ফরিদপুর অঞ্চলের মেয়েরা অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও বিবাহ উপলক্ষে নৃত্য করিতেন। শ্রীহট্টের কোন কোন পল্লীতে বিশ বৎসর পূর্ব্বেও পাকস্পর্শের পূর্ব্বে লাল-চেলী-পরিহিতা কন্যা গুরুজনসমক্ষে নৃত্য করিতেন। যাঁহারা এই ভাবে নৃত্য করিতেন তাঁহাদের অনেকে এখনও জীবিত আছেন।

মেয়েদের নৃত্যগীত।

এখনও ঢাকা ও মৈমনসিংহের মেয়েরা বিবাহ উপলক্ষে গান গাহিয়া থাকেন। বঙ্গের কোন কোন দেশ হইতে এই রীতি লুপ্ত হইয়া থাকিলেও কোথাও কোথাও তাহা এখনও প্রচলিত আছে।

শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও যে সকল রীতি প্রচলিত আছে তাহাতে বাঙ্গালীর গৃহ যে কিরূপ অনাবিল আনন্দনিলয় ছিল তাহার কতকটা ধারণা পাওয়া যায়। কন্যা জন্মিলে মাতা একখানি কাঁথা সেলাই করিতে আরম্ভ করিতেন—খুকুমণির বরের জন্য। সেই একখানি কাঁথা গৃহকর্ম্মের অবসরে প্রত্যহ সেলাই করিয়া তিনি ৮।১০ বৎসরে সমাধা করিতেন, তখন বর তাহা পাইতেন। এত স্নেহের, এত যত্নের শিল্পসামগ্রী জগতে কোন মহারাজাধিরাজও পান নাই। বিবাহের এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে "পীড়িচিত্র" আরম্ভ হইত, সেই চিত্রিত পীড়ির উপর পাতিবার জন্য নানা কারুকার্য্যমণ্ডিত কাগজের ফুল-লতা অঙ্কিত হইত। তাহার দুই একটা নমুনা আমরা দেখিয়াছি। শান্তির জল রাখিবার জন্য ঘট ও বরণডালা হুরবাস ধরিয়া চিত্রিত হইত। কত হাসি কত গল্প ও আনন্দের মধ্যে মেয়েরা এই সকল চিত্রকলা

সম্পাদন করিতেন, তাহা এখনকার মহিলারা বুঝিবেন না—কারণ এখন বিলাতী চকানাদে কর্ম্মকর্ত্তা ও গৃহিণীর আত্মা শুকাইয়া যায়—হয়ত মেয়ের বিবাহের সরঞ্জামের জন্ত ভিটাটি বাঁধা পড়িয়াছে। যে আঙ্গিনায় বরকন্তার "সাতপাক" অর্থাৎ সপ্তবার প্রদক্ষিণ এবং "মুখচন্দ্রিকা" অর্থাৎ মুখদর্শন হইবে তাহার উপর ৪।৫ জন লোক কন্তা ও বরকে লইয়া ঘুরিতে পারে তদুপযোগী আর একখানি আসন মেয়েরাই চিত্রিত করিতেন। এইরূপে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাতদিন পরে 'সাদিনা', দশদিন পরে 'দশা' এবং ত্রিশ দিন পরে 'ত্রিশা' প্রভৃতি নানা উৎসব হইতে আরম্ভ করিয়া কন্তাসম্প্রদান এবং এয়ো-কর্ম্মসম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য মেয়েরা সম্পাদন করিতেন। বাহিরের কোন শিল্পী বা কারিগরের এই অন্তঃপুরের কলাসদনে প্রবেশ নিষেধ। কেবল যখন মেয়েরা নাচিতেন, তখন নিম্নশ্রেণীর ঢুলিরা আস্তে আস্তে ঢোল বাজাইয়া নৃত্যের তাল রক্ষা করিত।

মেয়েদের হাতের কাজ।

পল্লীর বিগ্রহই পল্লীর প্রকৃত রাজা ছিলেন, তাঁহার ভোগের জন্ত রাত্রিদিন খাটিয়া চাষারা অতি সুগন্ধ সরু গোপালভোগ, কৃষ্ণভোগ প্রভৃতি চাউল প্রস্তুত করিত। যাহার বাড়ীতে যে ফলটি জন্মিত, তাহা গৃহস্থ আগে মন্দিরে আনিয়া দিয়া যাইত, কত মালী বাগান হইতে রাশি রাশি ফুল তুলিয়া তাহার মালা গাঁথিত, কত শিল্পী বিগ্রহের অঙ্গরাগ করিত। প্রতি উৎসবে মন্দিরবাড়ীতে যে ধূমধাম হইত রাজার বাড়ীর উৎসব হইতে তাহা কোন অংশে ন্যূন ছিল না। সূত্রধরগণ সারা বৎসর ভরিয়া দেবতার জন্ত রথ তৈরী করিত। বঙ্গের পল্লীগুলি এই ভাবে পল্লীবিগ্রহের অধিকারে বাস করিত, তাহারই আঙ্গিনায় কীর্ত্তন, কথকতা, যাত্রা প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানে পল্লীবাসী নিত্য নূতন আনন্দ পাইত। এমন সুখের রাজ্য, এমন শান্তির রাজ্য কোন রাজা কখনও শাসন করে নাই। সুতরাং বঙ্গপল্লী পাঠান আমলেও হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিশেষ বিঘ্ন করে নাই।

তবে মধ্যে মধ্যে অত্যাচারের স্রোত বহিয়া যাইত, তাহার ফল কি দাঁড়াইত তাহার কিছু কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়। যশোহরে পুকুর কাটিতে কাটিতে একটি বাসুদেব-বিগ্রহ পাওয়া গিয়াছিল, তাঁহার চারিদিক্ অর্দ্ধছিন্ন নরকঙ্কাল-বেষ্টিত—যশোহরের ইতিহাস-লেখক স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় আমাকে ইহা জানাইয়াছিলেন। সহজেই অনুমিত হয়, ঐ সকল কঙ্কাল সেই বিগ্রহের ভক্ত কিংবা পাণ্ডাদের, তাঁহারা তাঁহাকে রক্ষা করিতে যাইয়া প্রাণ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের কেহ মন্দিরসংলগ্ন দীঘিতে বিগ্রহটি লইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন, অপর সকলের কর্ত্তিত দেহ সেই দীঘিতেই ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কোন কোন গৃহস্থ মুসলমান নবাবের ছাড়পত্র পাইতেন, সেই চিহ্ন থাকিলে মুসলমানেরা মন্দির ভাঙ্গিতে অগ্রসর হইত না। একখণ্ড লোহের উপর নবাবের পাঞ্জা মারা থাকিত, এই মন্দির কিরূপ তাহারও ইঙ্গিত থাকিত। আমার নিকট সেইরূপ একটি পাঞ্জা আছে। উহা নারিকেলডাঙ্গার এক ভদ্রলোক আমাকে দিয়াছিলেন সম্ভবতঃ এই লোহখণ্ডটি সিরাজউদ্দৌলার আমলের, উহার একদিকে ত্রিশূলচিহ্ন আছে, তদ্দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে উহা কোন শিবমন্দিরের গায়ে সংলগ্ন ছিল। ইহাতে ইংরাজী ভাষায় তারিখ দেওয়া

আছে, পলাশীর যুদ্ধের পর এই ছাড় চিহ্নটি দেওয়া হইয়াছিল। বৈষ্ণবচূড়ামণি অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, খড়দহের শ্যামসুন্দরের মন্দিরেও একটি ছাড়পত্র বা চিহ্ন ছিল।

পল্লীবাসীরা সময়ে সময়ে মুসলমান নবাবের ক্রোধে পড়িতেন। বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের ইতিহাসে সেই সকল অপ্রিয় কথা লিখেন নাই। যে সমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থ গোস্বামিগণের বিধিসম্মত হইত, তাহাতে নিতান্ত দুঃসংবাদ তাঁহারা প্রকাশ করিতেন না। হয়ত বা নবাব বা অপরাপর শাসনকর্তাদের কোপে পড়িবার ভয়েও রাজনৈতিক দুঃসংবাদগুলি তাঁহারা চাপিয়া যাইতেন। কিন্তু হিন্দুগণ সহজেই সাংসারিক দুঃখ ও বিপদের বিষয় সাহিত্যে প্রবেশ করাইতে অনিচ্ছুক ছিল। এজন্ত সংস্কৃত সাহিত্যে বিয়োগান্ত নাটক লেখার নিয়ম ছিল না, এবং এজন্তই রাধাকৃষ্ণবিষয়ক সমস্ত কীর্ত্তনাদিতে বিরহ, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা প্রভৃতি নায়িকার সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া 'যুগলমিলন' দিয়া গানের উপসংহার করিতে হইত। যে সকল কষ্ট শুধুই কষ্ট—মর্ম্মান্তিক বেদনার সৃষ্টি করে অথচ যাহার বর্ণনায় সাময়িক উত্তেজনা ব্যতীত মনের কোন স্থায়ী উপকার হয় না—সে সকল প্রসঙ্গ সংস্কৃত কবিরা লিখিতেন না। কিন্তু যে দুঃখ আমাদের আত্মার সম্পদ্—যাহার পাবনী শক্তি মানুষের কলুষ নষ্ট করে এবং হৃদয়ের ভাবগুলি উন্নতির পথে লইয়া যায়, যাহার ফল মহৎ ও হিতকারী—সেই সকল দুঃখ তাঁহারা বর্ণনা করিতেন, যথা রামের বনবাস সত্যরক্ষাকে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে, পাণ্ডবদিগের বনবাস, চৈতন্তসন্ন্যাস, এই সমস্ত মহাদুঃখময় ব্যাপার মহাশিক্ষার বিষয়; কিন্তু ডেসডেমনার শোচনীয় মৃত্যু, জনের নিযুক্ত ঘাতককর্ত্তৃক আরথারের চক্ষু উৎপাটন, হ্যামলেট-কর্ত্তৃক নাটকের শেষ অধ্যায়ে হত্যাকাণ্ড—এই সকল দুঃখবর্ণনায় সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি করে, গ্রীক-রীতি-অনুমোদিত পাশ্চাত্য সাহিত্য এই উত্তেজনাটুকু উপভোগ করাইবার জন্ত বিয়োগান্ত নাটকের পক্ষপাতী। হিন্দুগণ অনাবশ্যকভাবে পাঠকের মনে পীড়া দেওয়ার বিরোধী, কতক এই কারণে—কতক রাজনৈতিক আতঙ্কে বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলিতে দুঃসংবাদ প্রকাশ করেন নাই। বৃন্দাবনের ষড়্‌ গোস্বামীদের অনুমোদিত প্রধান গ্রন্থ—চৈতন্ত-চরিতামৃত ও চৈতন্ত-ভাগবত এই বিধি পালন করিয়াছে, এই জন্ত চৈতন্তের তিরোধানের সম্বন্ধে তাঁহারা নীরব। কিন্তু এই গোস্বামিগণের বিধি প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে যে কয়েকজন লেখক গণ্ডীর বাহিরে স্বেচ্ছাকৃত সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে জয়ানন্দ একজন। ইনি চৈতন্তদেবের সমসাময়িক এবং যদিও গোঁড়া বৈষ্ণবেরা গোস্বামিগণের বিধিবহির্ভূত কথা লিপিবদ্ধ করার দরুন জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গলকে তেমন আদর করেন না, তথাপি এই পুস্তকে কতকগুলি মূল্যবান্ ঐতিহাসিক তথ্য আছে—যাহার জন্ত আমরা এ পুস্তকখানির বিশেষ পক্ষপাতী। ইনি চৈতন্তদেবের তিরোধানসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রামাণ্য এবং ইতিহাসসম্মত, নতুবা লৌকিক প্রবাদ অনুসারে মহাপ্রভুর গোপীনাথ অথবা জগন্নাথবিগ্রহের মধ্যে লীন হইয়া যাওয়ার কথাটা আজকালকার দিনে কতজনে

দুঃখান্ত দৃশ্য উদ্ঘাটন করিতে নাই।

বিশ্বাস করিবে? জয়ানন্দ লিখিয়াছেন নৃত্য করিবার সময়ে একটা ইট তাঁহার পদতলে বিদ্ধ হয়, এবং তাহার ফলে সেই জ্বর হইয়া তিনি নিত্যধামে প্রয়াণ করেন। পুত্রের এইরূপ আঘাত পাওয়ার ভয় শচীদেবীর চিরকাল ছিল, তিনি একবার অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে বলিয়াছেন—"তোমরা ইহাকে দেখ, নৃত্যকালে ইহার জ্ঞান থাকে না, কোথায় পড়িয়া চোট লাগিয়া মরিবে তাহার ঠিকানা নাই, আমার হরিবোলা পাগল বেহুঁস হইয়া নাচে-গায়।" শচীর সেই আশঙ্কাই শেষে ফলিয়াছিল।)

যাহা হউক শুধু চৈতন্যদেবের তিরোধানের কথা নহে, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে আরও কতকগুলি বিবাদাত্ম কথা আছে—যাহা বৈষ্ণবসাহিত্যের অপর কোথায়ও নাই। চৈতন্যমঙ্গল গোস্বামিগণের বিধিবহির্ভূত হইলেও এক কালে ইহার প্রচার খুব বেশী ছিল, আমরা এই পুস্তকের অনেক হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি পাইয়াছি ও দেখিয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছেন।

কাজীদের অত্যাচার।

সেই সকল বিয়োগান্ত কথার মধ্যে মুসলমান কাজীদের অত্যাচারের কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ আছে। চন্দ্রাবতী যে সময়কার কথা লিখিয়াছেন, অর্থাৎ পাঠান আমলের শেষভাগের কথা (যখন রাজনৈতিক অবস্থা কতকটা অরাজকতায় দাঁড়াইয়াছিল), জয়ানন্দও সেই সময়কার কথা লিখিয়াছেন, উহা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের কথা। তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে মহাপ্রভুর প্রিয় সখা গদাধর দাস কাজীর সহিত ঝগড়ার ফলে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। অপরাপর বৈষ্ণব লেখকেরা একথা চাপিয়া গিয়াছেন। কি বিষয় লইয়া এই নিদারুণ ঝগড়া হইয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু কাজীগণের একজন ত হরিদাসকে কতই লাঞ্ছনা করিয়াছিল, বাইসটি বাজারের প্রত্যেকটি বাজারে তাঁহাকে লইয়া নির্ম্মমভাবে প্রহার করিয়াছিল। পেয়াদারা ত "তাহার মস্তকে দেখে তুলসীর পাত, হাতে গলে বাঁধি লয় কাজীর সাক্ষাৎ।" নবদ্বীপের গোড়াই কাজী ত মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন বন্ধ করিবার আদেশ দিয়াছিল, সুতরাং বৈষ্ণবেরা যে অনেক সময়ে কাজীগণের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন—তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈষ্ণবেরা সে কথা বলেন নাই। সনাতন মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন—"আপনি রামকেলী ছাড়িয়া যাউন, যদিও হুসেন সাহ এখন পর্য্যন্তও আপনার প্রতি বিপক্ষতা করেন নাই, উঁহাকে বিশ্বাস করিবেন না, কখন কি অত্যাচার করিয়া বসিবেন, তাহার ঠিকানা নাই।" গদাধরকে হয়ত গোমাংসাদি জোর করিয়া খাওয়াইয়া থাকিবে, তখন হয়ত মহাপ্রভুর তিরোধান হইয়াছে—কে তাঁহাকে বাঁচাইবে? তদ্রূপ অবস্থায় তিনি সুবুদ্ধি রায়কে রক্ষা করিয়াছিলেন। গদাধর অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকিবেন। শুধু গদাধর নহে, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে আরও দুইজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবের উপর অত্যাচারের কথা উল্লিখিত আছে; তন্মধ্যে একজন গৌরীদাস পণ্ডিত, ইহার নাম গৌরীদাস সরকেল। ইহার ভ্রাতা সূর্য্যদাসের কন্যা বসুধা ও জাহ্নবীকে নিত্যানন্দ বিবাহ করেন, বাড়ী কালনায়। এই গৌরীদাস চৈতন্যের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন। কাটোয়ায় ইহারই স্থাপিত চৈতন্য ও নিত্যানন্দের মূর্ত্তি অতি

প্রসিদ্ধ, এই বিগ্রহসম্বন্ধে একটি অলৌকিক প্রবাদ আছে, তাহা এখানে বলিবার দরকার নাই। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—"কাজী সনে বাদ করি প্রেমে উন্মাদে, সাতদিন গৌরীদাস ছিলা গঙ্গাহ্রদে।" গৌরীদাস পণ্ডিত কি কারণে কোন্ কাজীর ক্রোধের ভাজন হইয়া গঙ্গার কোন্ নিভৃত কোণে দৈপায়ন হ্রদে দুর্য্যোধনের ন্যায় লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু সেই অরাজকতার সময়ে কাজীদের ক্রোধের খুব গুরুতর কারণ থাকার দরকার ছিল না, অবাধে অত্যাচার চলিয়াছিল; এ সময়ে হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণী সমভাবে অত্যাচার সহ্য করিতেন। মলুয়া গীতিকায় দেখা যায় এক দিকে কাজী যেরূপ নিরপরাধ চাঁদ বিনোদের উপর মারাত্মক অত্যাচার করিতেছেন, অপর দিকে বিচারের প্রতীক্ষা না করিয়াই দেওয়ান জাহাঙ্গীর কাজীকে শূলে দেওয়ার আদেশ প্রচার করিতেছেন। এই সকল গীতি কাল্পনিক হইলেও অনেক সময়ে উহাদের ভিত্তি সত্যঘটনামূলক হইত। গদাধর দাস এবং গৌরীদাস পণ্ডিত ছাড়া এই অত্যাচারিতদের দলে আর এক জনের কথা জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, পুরুষোত্তম দাসকে বিষ ভক্ষণ করিতে হইয়াছিল। প্রাসঙ্গিক ভাবে কবি এই ভাবের কতকগুলি ঐতিহাসিক ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন, তাহা এই যুগের অরাজকতা প্রমাণ করিতেছে।

নবাবদের খেয়ালের অন্ত ছিল না। চণ্ডীদাসকে হাতীর পিঠে বাঁধিয়া কোন্ গৌড়াধিপ নির্ম্মম ভাবে হত্যা করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই, সম্ভবতঃ তিনি জালালুদ্দিন বা যদুনারায়ণ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন রাজা গণেশ যে বাদসাহকে হত্যা করেন সেই দ্বিতীয় সামসুদ্দিনই চণ্ডীদাসের হত্যাকারী।

চণ্ডীদাসের মৃত্যু।

তিনি নিতান্ত অযোগ্য, অত্যাচারী ও বিলাসাসক্ত ছিলেন এবং মাত্র দুইটি বৎসর রাজত্বের পর ১৩৮৪ খৃঃ অব্দে নিহত হন। এই সময়ে বাদসাহদের অন্তঃপুর মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিতা বহু হিন্দু-ললনায় পূর্ণ ছিল। সন্থর প্রথমা স্ত্রী নবকিশোরী তাঁহার ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করেন নাই। তাঁহার প্রধানা মহিষী ছিলেন আসমানতারা। কিন্তু তৎকালে কোন বাদসাহেরই এক স্ত্রী ছিল না, তাঁহাদের অনেক বেগম থাকিত। রাধাকৃষ্ণের সঙ্গীত হিন্দু বেগমদেরই বেশী ভাল লাগিবার কথা। যদুর খুব সম্ভব অনেক হিন্দু বেগম ছিল, তাহাদের মধ্যে কাহারও চণ্ডীদাসের গুণানুরাগিণী হওয়ার বেশী সম্ভব। অবশ্য সামসুদ্দিনের অন্তঃপুরেও যে সেরূপ হিন্দু বেগম ছিল না—তাহা বলা যায় না। এদিকে এই সকল বাদসাহ হিন্দুদের সঙ্গে বৈবাহিক আত্মীয়তা-নিবন্ধন ইরান, তুরান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে সম্বন্ধত্যাগ এবং স্থায়িভাবে বাঙ্গালীর মধ্যে বাঙ্গলায় বাস করিবার ফলে তাঁহারা একেবারে বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গলায় পুস্তক রচনা করাইয়া দরবারে তাহা শুনিতেন। মুসলমান কবিরাও অনেকে রাধাকৃষ্ণের গান এবং পল্লীগীতিকা বাঙ্গলায় রচনা করিয়াছেন। এই সকল কারণে মনে হয় চণ্ডীদাসের গুণানুরাগিণী মুসলমান কোন রাজ্ঞী হইতে পারেন, কিন্তু অধিক সম্ভব যে রাজ্ঞী কোন হিন্দু-ললনা ছিলেন। হাতীর দ্বারা কোন দণ্ডিত ব্যক্তির প্রাণ নাশ করা এই যুগের ইতিহাসে একটি সচরাচর সংঘটিত ব্যাপার।

যাহা হউক, মুসলমান নবাব ও কাজীদের অত্যাচারে যে অনেক বৈষ্ণব বিশেষভাবে নিপীড়িত হইয়া তাহা নীরবে সহ্য করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে প্রমাণিত হইবে। যে দেশে রাজতক্ত্ ক্রমাগত ভিন্ন ভিন্ন লোক অধিকার করিয়াছেন, সে দেশের লোকের ইতিহাস লেখা সম্ভবপর নহে, নিরাপদও নহে; প্রশংসা ও অপ্রশংসা উভয়রূপ লেখারই বিপদ ছিল। বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের সামাজিক ইতিহাস অনেক লিখিয়াছেন, ঘটক-কারিকায় বংশাবলী এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে বোধ হয় জগতের অন্য কোন দেশে এরূপ বিস্তৃত পারিবারিক ইতিহাস লিখিত হয় নাই, অথচ রাজনৈতিক ইতিহাস কেহ লিখিতে সাহসী হন নাই।

বৌদ্ধ-যুগের অবসানে উচ্চশ্রেণীর অল্পসংখ্যক লোক ও জনসাধারণের মধ্যে একটা ব্যবচ্ছেদ-রেখা টানা হইল। মহাভারত ও অপরাপর পুরাণে ব্রাহ্মণ-শূদ্রে যে ব্যবধানের অনুশাসন মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহা প্রক্ষিপ্ত কিনা—তাহা বিবেচনার যোগ্য। সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ সুঙ্গবংশীয় পুষ্যামিত্রের সময়ে শাস্ত্রগুলি ফিরিয়া লেখা হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণকে দেবতাদের তুল্য কিংবা তদপেক্ষাও উচ্চে আসন দেওয়া হইয়াছিল; এই সময়ে প্রাচীন স্মৃতিকারদিগের উপর অবাধভাবে হাত চালাইয়া ব্রাহ্মণদের গৌরবান্বিত করা হইয়াছিল; শ্রীযুক্ত জয়শোয়াল সাহেব তাঁহার 'ঠাকুর-ল লেকচারে' ইহা বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন। শাস্ত্রের নিষেধ-বিধি-সত্ত্বেও প্রতিলোম বিবাহের এত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এবং মাঝে মাঝে দুই একটি স্থলে শূদ্রান্নের নিন্দা থাকিলেও ভোজনাদি-ব্যাপারে এত শিথিলতার দৃষ্টান্ত আছে যে, মনে হয়, পরবর্ত্তী কালে শাস্ত্রগ্রন্থগুলি ফিরিয়া, কতকাংশ বাদ দিয়া এবং কতক কথা সংযোগ করিয়া, লেখা হইয়াছিল এবং ব্যাসদেবের উপর একালের নীতি বহুল পরিমাণে আরোপ করা হইয়াছিল; ইহা অনায়াসে প্রমাণ করা যাইতে পারে। বঙ্গের ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের উপাধি পরিবর্ত্তন করিয়া অপরাপর শ্রেণী হইতে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া দেবতার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। কলিকাতার কোন বিশিষ্ট মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বংশের কিছুদিন পূর্ব্বে উপাধি ছিল 'কর'। ধরবংশীয় ব্রাহ্মণ-পরিবার এখনও চট্টগ্রামে আছেন, তাঁহারা উপাধি পরিবর্ত্তন করেন নাই।

নবসৃষ্ট সমাজে শূদ্রশ্রেণী দুই ভাগে বিভক্ত হইল। আচরণীয় এবং অনাচরণীয়—এই দুই থাক করা হইল। বড় থাক, যথা—নমঃশূদ্র, জেলে-কৈবর্ত্ত, পোদ প্রভৃতি পতিত হইল। দ্বিতীয় থাকে কতকগুলি জাতিকে দয়া করিয়া আচরণীয় বলিয়া স্বীকার করা হইল—ইহাদের নাম হইল নবশাখ—অর্থাৎ নব শাখা। কিন্তু শূদ্রমাত্রেরই উচ্চশ্রেণীর লেখাপড়ার অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইল। ব্রাহ্মণগণ শূদ্রগণের সম্পূর্ণ বশ্যতা পাইবার জন্যই জনসাধারণকে এই ভাবে উচ্চ-শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিলেন; ফল এই দাঁড়াইল যে হিন্দুজাতির সুবৃহৎ অংশ—এই জনসাধারণ—অজ্ঞ ও মূর্খ হইয়া রহিল। ইহাদেরই রক্তসম্বন্ধ গৌরবান্বিত করিয়া এক কালে ব্যাস, বশিষ্ঠ, নারদ, সত্যকামাদি

জন্মিয়াছিলেন এই ঋষিদের জন্ম হীন-কুলে। নবব্রাহ্মণ্য এক সহস্র বৎসর যাবৎ বাঙ্গলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই সময়ের মধ্যে যদি শিক্ষার দ্বার উদ্ঘাটিত থাকিত তবে জন-সাধারণের মধ্য হইতে কত মনীষী ও জ্ঞানী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের গৌরব বাড়াইয়া দিতেন। ব্রাহ্মণ্যস্বতন্ত্রতায় আমাদের জাতীয় সম্পদের উপর কত বড় হানা পড়িয়াছে। লোক-সংখ্যাই জাতির প্রধান সম্পত্তি, এই সম্পত্তির সুবৃহৎ অংশের প্রতিভা আমরা নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি। মূর্খতা-নিবন্ধন অত্যাচার, কুসংস্কার ও উচ্চজাতির নিগ্রহের জন্য ইহারা যে সময়ে সময়ে বিদ্রোহী হইয়া ভিন্নধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ক্ষীণকায় হিন্দু জাতিকে আরও সংখ্যালঘিষ্ঠ করিয়া দিতেছে—তজ্জন্য অপরাধী কে? এত প্রতিকূলতা-সত্ত্বেও ভারতবর্ষে দাদূ (চর্ম্মকার), কবীর (জোলা, তাঁতি), আসামের শঙ্করদেব (শূদ্র) প্রভৃতি মহাপুরুষ ইহাদের মধ্যে জন্মিয়াছেন,—এই বৃহৎ জনসংখ্যা আজ ফুলফলে পল্লবিত হইয়া উঠিত, নানাদিক্ দিয়া ইহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখিয়া আমাদের আধুনিক শাস্ত্রকারেরা হিন্দু জাতিকে একান্ত ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন।

গোঁড়া ব্রাহ্মণগণ এই ভাবে আমাদের সমাজের ক্ষতি করিয়াছেন সত্য—কিন্তু অপর একদিক্ হইতে দেখিলে তাঁহারা তাঁহাদের গণ্ডীর মধ্যে ভারতীয় ধর্ম্মকে বিশেষ ঔজ্জ্বল্য দিয়াছেন। বিশাল ব্রাহ্মণ-সমাজের মধ্যে গোঁড়ামীর গণ্ডীর বাহিরে যে অপূর্ব্ব উদারতা, সৎসাহস, নিষ্ঠা ও প্রেম ছিল তাহার ফলে আমরা চৈতন্যকে পাইয়াছি। এই অনিষ্টকর গোঁড়ামীর অচলায়তন ভাঙ্গিতে যে সকল বিশালবাহু সংস্কারক জন্মিয়াছেন, যাঁহাদের পুণ্যকর্ম্ম, ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার পাবনী ধারায় বঙ্গদেশের অনেক আবর্জ্জনা ভাসিয়া গিয়াছে, তাঁহাদের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণের মত উপবাস কে করিবে? ব্রাহ্মণের মত ভোগবঞ্চিত কোন্ জাতি? ব্রাহ্মণের মত নিঃস্পৃহ কে? ব্রাহ্মণের মত দারিদ্র্য-দুঃখ বরণ করিবে কোন্ জাতি? এই সকল গুণ থাকার দরুনই তাঁহারা সমাজে শিরোভূষণ হইয়াছিলেন। জগতের যখন সর্ব্বত্র জড়বাদে তমসাচ্ছন্ন, তখন একমাত্র ব্রাহ্মণই নিবৃত্তির হোমাগ্নি জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন—ইহাই হিন্দুর বৈশিষ্ট্য। ব্রাহ্মণ না থাকিলে জড়বাদী জগতে সেই সুরটি নীরব হইয়া যাইত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হিন্দুসমাজ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম

এইবার আমরা বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস-সম্বন্ধে লিখিব। বাঙ্গলাদেশে পাঠান-প্রাবল্যের যুগ এক বিষয়ে বাঙ্গলার ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান যুগ। আশ্চর্য্যের বিষয় হিন্দু-স্বাধীনতার সময়ে বঙ্গদেশের সভ্যতার যে শ্রী ফুটিয়াছিল এই পরাধীন যুগে সেই শ্রী

কাগজে অঙ্কিত (২'৬" × ২' ফিট) অপূর্ব্ব ছবি। শ্রীযুক্ত বলাইলাল মল্লিক মহাশয়ের কোন পূর্ব্বপুরুষকে তাঁহার [illegible] [illegible]
দিয়াছিলেন। একসময়ে ছবিখানি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশধরগণের গৃহে ছিল হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ছবিখানি সপ্তদশ
শতাব্দীর মধ্যভাগের। এখন ছবিখানি দক্ষিণেশ্বরের অদূরবর্ত্তী এঁড়েদহে মল্লিক মহাশয়ের ঠাকুরবাড়ীতে আছে। পরমহংসদেব এই
ছবিখানি দেখিতে প্রায়ই এঁড়েদহে যাইতেন ও করজোড়ে দাঁড়াইয়া অশ্রুচক্ষে ছবিখানি দেখিতেন।

শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সময়ে উহা কতকগুলি বীভৎস তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। বৌদ্ধাধিকারে ধর্ম্ম সঙ্ঘের গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী পৌরোহিত্যের ভার লওয়ায় নরনারীর অবাধ সংমিশ্রণের ফলে বিহারগুলি হীন বিলাসের ক্ষেত্র হইয়াছিল। এমন কি বুদ্ধ কে ছিলেন, তাহা পর্য্যন্ত জনসাধারণ ভুলিয়া গিয়াছিল। এখন যেমন হিন্দুরা বেদপন্থী বলিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করেন কিন্তু বেদ কি জনসাধারণে তাহার কিছুই বিদিত নহে—বৈদিক আচার কতিপয় ব্রাহ্মণের পুঁথিগত বিদ্যার অঙ্গীয় হইয়াছে এবং জনসাধারণ কিছুই না বুঝিয়া না শুনিয়া শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে কতকগুলি দুর্ব্বোধ মন্ত্র আওড়াইয়া যায়, দুর্ব্বাদলের গ্রন্থি তৈরী করিয়া করাঙ্গুলীতে পরে এবং হস্তের নানারূপ ভঙ্গিমা করিয়া কখনও গালে কখনও অঙ্গের অন্যান্য স্থান স্পর্শ করিয়া যোগের কসরৎ করে, বৌদ্ধধর্ম্ম তেমনই কতকগুলি দুর্ব্বোধ এবং বাহ্য অনুষ্ঠানে দাঁড়াইয়াছিল। শূন্য-পুরাণ ও ধর্ম্মপূজা-পদ্ধতি জনসাধারণের আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের কতকগুলি দুর্ব্বোধ ভেল্কি,—বুদ্ধের সরল নীতিমার্গের বিকৃত পরিণতি।

শূন্যপুরাণ ও ধর্ম্মপূজা-পদ্ধতি।

ধর্ম্মজগতের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে নৃতত্ত্ববিদের নিকট এই দুই পুস্তকের একটা স্থান হইতে পারে। কোন বিলুপ্ত পশুর কঙ্কাল হইতে পণ্ডিতগণ যুগবিশেষের জীবতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ফেলেন, এই দুই পুস্তকও তদ্রূপ মনুষ্য-সমাজের প্রাচীন আধ্যাত্মিক তত্ত্বের জীর্ণ কঙ্কাল ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। "ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে" কিংবা "সিংহলে শ্রীধর্ম্মরাজের বহুত সম্মান" প্রভৃতি দুই একটি বচন দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে এই পুস্তকগুলির লক্ষ্য ভুবনপাবন বৌদ্ধ ধর্ম্ম। পাঠান-নেতা দ্বারা কাশীরাজ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলে তাঁহার দেহ ও মুখমণ্ডল এরূপভাবে বিকৃত হইয়াছিল যে তাঁহাকে চিনিবার কোনই উপায় ছিল না, শুধু তাঁহার সোণাবাঁধা দাঁত কয়েকটি তাঁহাকে চিনাইয়া দিয়াছিল; শূন্যপুরাণের বিহারগুলিতেও তেমনই দ্বার-পণ্ডিতদের প্রসঙ্গে দুই একটি পদমাহাত্ম্য এবং সঙ্ঘের উদ্ভট বিকৃতি "শঙ্খের" উল্লেখে এই পুরাণকে সাবেকী বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্গীয় বলিয়া মনে হইতে পারে, নতুবা বৌদ্ধধর্ম্মের কোন নীতি বা জ্ঞান এই দুইখানি পুস্তকে পাওয়া যায় না। এই দুই পুস্তক মূলতঃ অবলম্বন করিয়া বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে "ধর্ম্মতলায়" কচ্ছপরূপী ধর্ম্মঠাকুরের খুব জোরে ঢাক পিটিয়া পূজা দেওয়া হইয়াছে মাত্র। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলির যাহা সার কথা তাহা হিন্দু শাস্ত্র সমস্তই আত্মস্থ করিয়া ঐ ধর্ম্মকে ভারতবর্ষের ত্রিসীমানা হইতে দূর করিয়া দিয়াছিল, জনসাধারণের মধ্যে যে ধর্ম্ম শৈব ও বৌদ্ধধর্ম্ম এই উভয়ের প্রতীকস্বরূপ গৃহীত হইয়াছিল তাহা 'নাথধর্ম্ম'—তাহা উদ্ভট রকমের সিদ্ধপুরুষ ও নারীদিগের অলৌকিক লীলা ও আজগুবী গল্পপূর্ণ। এই আকারে বঙ্গদেশের নাথধর্ম্মও জনসাধারণের উন্নতির জন্য কিছু দিয়া যায় নাই। শুধু বুদ্ধের সংযমের ভাবটা গোরক্ষ যোগীর চরিত্রে আভাসে পাওয়া যায় ও ত্যাগের আদর্শটা গীতিকথাগুলির মধ্যে পূর্ণভাবে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। এই গীতিকথাগুলিই বৌদ্ধযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। মালঞ্চমালার মত একটি

গ্রন্থে যে মহানীতি ও স্বর্গীয় ত্যাগ প্রেম-মহিমায় মণ্ডিত হইয়া দেখা দিয়াছে, তাহা বহু ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যাইবার নহে।)

কিন্তু মোটের উপর ব্যভিচারী ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর এমন কোন গুণই ছিল না, যাহাতে সমাজ আর তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিবে। এদিকে রাজশাসন সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইল, ফলে সংস্কৃতের প্রভুত্ব নষ্ট হইয়া গেল। বিলাসের দিকে পতনোন্মুখ সেন রাজারা যে রুচি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন তাহার গতি অন্য দিকে ফিরিল। মুসলমান সম্রাট্ ও বাদসাহেরা আসিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের দ্বারাই সংস্কৃত শাস্ত্র অনুবাদ করাইতে আরম্ভ করাইয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কালে সেই ভাবে অনিচ্ছাসত্বেও মহাপণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়কে কেরি সাহেব এই যুগের বাঙ্গলায় গদ্য লেখার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা তাঁহাদের অন্তরের বিদ্বেষ ও ঘৃণা চাপিয়া রাখিয়া বাঙ্গলা পয়ার লিখিতে আরম্ভ করিলেন, এমন কি যে ধর্ম্মঠাকুরের আঙ্গিনা মাড়াইলে পাপ হইত, তাঁহার সম্বন্ধে এক মহাকাব্য ব্রাহ্মণ-কুলজাত মাণিক গাঙ্গুলী লিখিয়া ফেলিলেন। স্বপ্নে তিনি ধর্ম্মঠাকুরের প্রত্যাদেশ পাইয়া একবার ঘাড় নাড়িয়া বলিয়াছিলেন, "পারিব না"—"জাতি যায় যদি প্রভু ইহা করি গান।" কিন্তু বাস্তবিক স্বপ্নের প্রত্যাদেশবশতঃই হউক অথবা অর্থলোভেই হউক গাঙ্গুলী মহাশয়কে ডোম ও 'যোগী'-পূজিত এই কচ্ছপ দেবতার প্রশংসাসূচক কাব্য রচনা করিতে হইয়াছিল।

এদিকে মুসলমান-আগমনে প্রশ্ন উঠিল, এই যে দেবদেবী আমরা পূজা করি, এগুলি কি ভুল? শিব কি ভুল? দুর্গা, বিষ্ণু, সূর্য্য, গণেশ ইহারা কি ভুল? ব্রাহ্মণ-শূদ্র কি ভুল? ডোমের হাতে ভাত খাইলে কি পরকাল নষ্ট হয়? সকলেই কি একখানে বসিয়া ঈশ্বরের নাম লইতে পারে? ঈশ্বর তো আমাদের নিজের মধ্যেই আছেন তবে আর ডাকিব কাহাকে? (চৈ. ভা.) 'সোঽহম্' বাদ কি ভুল? সত্যই কি ঈশ্বর যুদ্ধক্ষেত্রে—কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষকে সহায়তা করেন? আমরা পাপপুণ্য দ্বারা কি সত্যই শাস্তি ও পুরস্কার অর্জ্জন করি? স্বকর্ম্মের দ্বারা কি সুখদুঃখ উৎপন্ন হয়? সত্যই কি নিজ কর্ম্ম ব্যতীত আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা আর কেহ আছেন?

মুসলমানগণের সঙ্গে মিলনের ফলে প্রশ্ন।

এই সকল প্রশ্ন বেদ-বেদান্তের সময় হইতে এ দেশের পণ্ডিতগণের মাথায় আসিয়াছে। তারপর মহাযান-পন্থী বৌদ্ধগণও এই সকল প্রশ্ন লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন। সহজিয়ারা গুরু-শিষ্য-সংবাদে এ সকল বিষয়ে তাঁহাদের মতামত আশ্চর্য্য স্বাধীনতা ও মৌলিকতার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড—ভূমিকা)।

কিন্তু হিন্দু জনসাধারণের মনে এ সকল প্রশ্ন উদিত হয় নাই। সেন-রাজত্ব-কাল হইতে তাঁহারা ব্রাহ্মণের অনুশাসন একান্ত মূর্খতার সহিত মানিয়া আসিয়াছে; যে যাহা সংস্কৃত অক্ষরে লিখিয়াছে তাহাই বেদ ও ঈশ্বরবাক্য হইয়া গিয়াছে। মাঘে মূলা খাইলে ঘোর নরকে পড়িতে হইবে, ইহাই তাহারা বিশ্বাস করিয়াছে। বাসুকীর মাথা নাড়ায় ভূমিকম্প,

দিক্‌-হস্তীর কাঁধে পৃথিবী, আকাশে চাঁদ বুড়ী চরকা কাটিতেছে, এ সকল মহাসত্য সম্বন্ধে তাঁহারা প্রশ্ন করিতে সাহসী হন নাই। এমন কি যে মহা হিন্দু জ্যোতিষিগণ আকাশে গ্রহনক্ষত্রের সূক্ষ্মতম গতি এবং বহু শতাব্দী পূর্ব্বে সূর্য্যের চতুর্দ্দিক পৃথিবীর ভ্রমণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন সেই হিন্দুর বংশধরের রাহু রাক্ষস বিষ্ণু-চক্র-দ্বারা কর্ত্তিত হইয়া চাঁদকে গ্রাস করিতে চেষ্টা পায়,—এই সকল কথা পরম ভক্তিসহকারে বিশ্বাস করিতেছিল। য়ুরোপে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হইলে সে দেশের প্রত্যেক নরনারী সেই সত্য শিখিয়া ফেলে কিন্তু আমাদের দেশে সেন-রাজত্বের সময় হইতে ব্রাহ্মণগণ্ডী ও শূদ্রের গৃহভেদ করিয়া কোন বৈজ্ঞানিক সত্য সমাজের নিম্নস্তরে যাইতে পারে নাই; তাঁহাদের রন্ধনের হাঁড়ির মত ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের জ্ঞানের ভাণ্ড অন্তের স্পর্শের অনধিগম্য করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সেন-রাজত্বে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বিদ্যাকে স্বীয় গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা।

কিন্তু এই পাঠান-যুগে সর্ব্বপ্রথম হিন্দু-সমাজে নূতন বিক্ষোভ দৃষ্ট হইল। জনসাধারণের মধ্যে শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ প্রচারিত হওয়াতে তাহারা গরুড় পক্ষী হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট করজোড়ে থাকিতে ঘৃণা বোধ করিল। ব্রাহ্মণেরা বাধ্য হইয়া শাস্ত্রগ্রন্থ বাঙ্গলায় প্রচার করিলেন, তাঁহারা ঘোর অনিচ্ছায় ইহা করিয়াছিলেন, এই অনুবাদকার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাঁহারা শাস্ত্রের অনুবাদ ও শ্রোতাদিগের বাপান্ত করিয়া অভিশাপ দিতে লাগিলেন। "অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।" এদিকে মুসলমান-ধর্ম্মের প্রভাব, অপর দিকে বাঙ্গলা ভাষায় ধর্ম্ম প্রচার, এই দুই কারণে বঙ্গীয় জনসাধারণের মন নব ভাবে জাগ্রৎ হইল।

জনসাধারণের জাগরণের দুইটি কারণ।

শাসন ও রুচি হইতে মুক্ত হইয়া চিন্তা-জগতে হিন্দুরা গণতান্ত্রিক হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণেরাও রাজশাসন হইতে মুক্তি পাইয়া অবাধে স্বীয় মত সমাজে চালাইতে লাগিলেন। এই পাঠান-প্রাধান্যযুগে চিন্তা-জগতে সর্ব্বত্র অভূতপূর্ব্ব স্বাধীনতার খেলা দৃষ্ট হইল। এই স্বাধীনতার ফলে বাঙ্গলার প্রতিভার যেরূপ অদ্ভুত বিকাশ পাইয়াছিল, এদেশের ইতিহাসে অন্য কোনও সময়ে তদ্রূপ বিকাশ সচরাচর দেখা যায় নাই। শুষ্ক জ্ঞান-যুগ তখন অবসানপ্রায়, সেই সময়ে ভক্তিগগনে শুকতারার ন্যায় মাধবেন্দ্র পুরীর অভ্যুদয় হইল। তিনি অদ্বৈত প্রভু ও ঈশ্বর পুরীর গুরু ছিলেন এবং নিত্যানন্দের সঙ্গে শ্রী পর্ব্বতে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অনুমান ১৪০০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে তাঁহার জন্ম হইয়া থাকিবে।

মাধবেন্দ্র পুরী।

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ইতিপূর্ব্বেই দেশে প্রচারিত ছিল। নারদ, শুক, প্রহ্লাদ প্রভৃতি বৈষ্ণব-শিরোমণিগণ ইতিহাসপূর্ব্ব যুগে বিষ্ণু-ভক্তির মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন। মধ্যযুগে রামানুজ (জন্ম ১০৭০ খৃঃ) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে চেঙ্গলাট পরগনার পেরামভুদুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পিতার নাম

রামানুজ—১০৭০ খৃঃ।

কেশব, মাতার নাম কান্তিমতী দেবী। ইনি শ্রীসম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি। একাদশ শতাব্দীতে ভক্তিবাদ প্রচার ছাড়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের আরো দুইটি গৌণ উদ্দেশ্য ছিল, একটি শঙ্করের মায়াবাদ-নিরসন এবং দ্বিতীয় শৈব ধর্ম্মকে দলন করা।) রামানুজের শিষ্য গোবিন্দ শৈব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব হইয়া নিম্নলিখিত ভাবের শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন—

"হে বিষ্ণু! আমি তোমার শরণ লইলাম, আমাকে পাপ হইতে ত্রাণ কর, আমি বৈকুণ্ঠনাথকে ত্যাগ করিয়া বিষকণ্ঠকে আশ্রয় করিয়াছিলাম। আমি পুণ্ডরীকাক্ষকে ত্যাগ করিয়া বিরূপাক্ষকে ভজনা করিয়াছি। আমি পীতাম্বরকে ছাড়িয়া দিগম্বরের পিছনে পিছনে ঘুরিয়াছি। আমি বগার তুলসী-কানন ত্যাগ করিয়া হরীতকীর জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছিলাম।"

শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই ঝগড়ার রেশটা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলা সাহিত্যে পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র ব্যাসদেবের বৈষ্ণবসাধনা ত্যাগ করিয়া শৈবধর্ম্ম-গ্রহণ উপলক্ষে এই দ্বন্দ্বের আভাস দিয়াছেন—"ব্যাস হরিমন্দির-তিলক কপাল হইতে মুছিয়া ফেলিয়া তৎস্থলে অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন আঁকিলেন, গলা হইতে তুলসীমালা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া রুদ্রাক্ষমালা পরিলেন। তুলসীপত্র ফেলিয়া দিয়া বিল্বপত্র লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। শালগ্রাম টানিয়া ফেলিয়া দিয়া শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিলেন।" (ভারতচন্দ্রের ব্যাসের—শিবনিন্দা, গদ্যানুবাদ)। এখনও বঙ্গদেশে শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব আছেন।

(শ্রীসম্প্রদায় ছাড়া সনক, রুদ্র প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবও চৈতন্যদেবের বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষে নানা স্থানে বিদ্যমান ছিলেন। সনক-সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি নিম্বাদিত্য।

সনক-সম্প্রদায়—নিম্বাচার্য্য।

ইহার নাম ভাস্করাচার্য্য, কথিত আছে সূর্য্যদেব নিম্বগাছের আড়াল হইতে ইহাকে দর্শন দিয়া ইহার প্রায়োপবেশনের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন, তদবধি ইহার উপাধি "নিম্বাচার্য্য" হইয়াছিল। এই সনক-সম্প্রদায়ের মতামত-সম্বন্ধে মথুরার ইতিহাসলেখক গ্রাউস সাহেব লিখিয়াছেন,—"সনক-সম্প্রদায়ের অনেকে অতি সরল ও সাধুচরিত্র, তাঁহাদের জীবন ও মতামত আলোচনা করিলে ধারণা হয় যে যদিও ইহারা খৃষ্টীয় দীক্ষা পান নাই, তথাপি তাঁহাদের চরিত্রে সেই দীক্ষার ফল ফলিয়াছে, তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উৎকর্ষের দরুন তাঁহারা ঈশ্বরের চক্ষে প্রকৃত খৃষ্টান বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য" (অনুবাদ)। কথিত আছে—আরঙ্গজেব সনক-সম্প্রদায়ের বহু সংস্কৃত ও হিন্দী গ্রন্থ দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

রুদ্রসম্প্রদায়—বিষ্ণুস্বামী, বল্লভাচার্য্য ও চৈতন্য।

রুদ্র-সম্প্রদায়ের বিষ্ণুস্বামী অতি বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার শিষ্য বল্লভাচার্য্য ষোড়শ শতাব্দীতে বৃন্দাবন অঞ্চলে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীমদ্ভাগবতের নূতন একখানি টীকা করিয়া তাহা পুরীতে চৈতন্যদেবকে দেখাইতে আসিয়াছিলেন। এই টীকা সুপ্রসিদ্ধ শ্রীধর স্বামীর টীকার প্রতিকূল হওয়াতে চৈতন্য বিরক্ত হইয়া তাহা শুনিতে চান না, বরং মিষ্ট কথায় এড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বল্লভাচার্য্য নাছোড়বান্দা হওয়াতে তিনি বলিয়াছিলেন—"আপনার টীকা স্বামি-পরিত্যাগিনী, সুতরাং

দ্রষ্টা।" চৈতন্য-চরিতামৃতে বল্লভাচার্য্যের সঙ্গে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎকারের বিস্তৃত বিবরণ আছে। কথিত আছে বল্লভাচার্য্য চৈতন্যের পার্শ্বচর জগদানন্দ, স্বরূপ, দামোদর প্রভৃতি পণ্ডিতের অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। বল্লভাচার্য্য চৈতন্যদেবকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি বহুদিন আপনার সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আজ আপনাকে দেখিয়া আমার চক্ষু সার্থক হইল। মহাশয়, জগতে আপনার ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, কারণ আপনার দর্শন পাওয়া মাত্রই অন্তঃকরণে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়।" চৈতন্যদেব বলিলেন, "মহাশয়, আমার যে সকল প্রশংসা করিলেন, আমি তাহার একান্তই অযোগ্য। যদি আপনার প্রশংসার কণামাত্রেরও উপর আমার কিঞ্চিৎ দাবী থাকে তবে সেই দাবীর কণিকা-প্রসাদ আমি পাইয়াছি অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট, যিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত; আর পাইয়াছি এই নিত্যানন্দের নিকট যিনি ষড়্দর্শনে ব্যুৎপন্ন এবং যাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি ভারতবর্ষে নাই; আমার যদি কিঞ্চিৎ ভক্তি লাভ হইয়া থাকে তবে ইহারই স্বর্গীয় অতি পবিত্র সংসর্গের দরুন। ইহাদের ছাড়া আমি পণ্ডিত গদাধর, বক্রেশ্বর ও জগদানন্দ প্রভৃতি সুধী মহাজনের নিকট অনেক শিখিয়াছি এবং আরও শিখিব এরূপ আশা করি। যদি আপনি শাস্ত্রালোচনা করিতে চান, তবে ইঁহাদের সহিত করুন।" জগদানন্দের সহিত দীর্ঘকাল আলোচনা করার ফলে বল্লভাচার্য্যকে তাঁহার অনেক মত পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল (চৈঃ চঃ, অন্ত্য খণ্ড, ৭ম অঃ)। বল্লভাচার্য্যের শিষ্যের দল এখন আর্য্যাবর্ত্তে বিশেষ পুষ্ট। বৃন্দাবনে ইঁহারা "গোকুল গোঁসাই" নামে পরিচিত। শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রি-প্রণীত রামানুজচরিতে ইঁহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, তাহার কতটা বিশ্বাসযোগ্য তাহা জানি না, তবে ইঁহাদের মধ্যে গুরুভক্তি অতীব প্রবল। গুরুকে দেখার অধিকার পাইতে হইলে না কি শিষ্যকে ২৲ টাকা দক্ষিণা দিতে হয়, তাঁহাকে স্পর্শ করার অধিকারের জন্য ২০৲ টাকা, তাঁহার পা ছুঁইতে হইলে ৩৫৲ টাকা, তাঁহার পদাঘাতের মূল্য ১১৲ টাকা, তাঁহার নিকট বেত্রাঘাত পাইবার অধিকারের জন্য ১৩৲ টাকা এবং তাঁহার সঙ্গে একাসনে বসিতে হইলে ৬০৲ টাকা দিতে হয়। শিষ্যেরা এইভাবে গুরু-প্রণামী স্বেচ্ছায় দেয় কিংবা এ বিষয়ে অপরিহার্য্য নিয়ম আছে, তাহা জানি না। এই সকল কথা শরৎবাবুর পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছি, কত দূর সত্য বলিতে পারি না।

বল্লভী সম্প্রদায়ের গুরুভক্তি।

কথিত আছে চৈতন্যদেব মাধ্বী-সম্প্রদায়ভুক্ত। মাধবেন্দ্র পুরী, ঈশ্বর পুরী, কেশব ভারতী ইঁহারাই বঙ্গে ভক্তির প্রবাহ প্রথম আনয়ন করেন এবং ইঁহারা মাধ্বী-সম্প্রদায়ের লোক। কিন্তু চৈতন্যদেবের মতামত ঠিক মাধ্বী-সম্পদায়ের অনুকূল নহে, তাঁহার ধর্ম্ম কতকটা তাঁহারই নিজের, এজন্য তিনি বার বার তাঁহার শ্রেণীর সন্ন্যাসীদের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া স্বরূপ দামোদরের নিকট তাড়া খাইতেন। অনেকের মতে চৈতন্যদেবের ধর্ম্মমতের সঙ্গে মাধ্বী-মতের ঐক্য নাই, তথাপি বঙ্গের বৈষ্ণব-জগতের প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে আমরা তাঁহাকে মাধ্বী-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়াই ধরিয়া লইতেছি। মাধ্বাচার্য্য ১১৯১ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন, ইনি মধ্যগের নায়ক জনৈক ব্রাহ্মণের পুত্র।

মাধ্বাচার্য্য—১১৯১ খৃঃ।

ইঁহাদের নিবাস দাক্ষিণাত্যে তুলভ পরগনায় উদিপী নগরের নিকটবর্ত্তী তাজিকক্ষেত্র নামক গ্রামে। মাধ্বাচার্য্যের শৈশবে নাম ছিল বাসুদেব, ৯ বৎসর বয়সে ইঁহাকে অচ্যুতপ্রচ্য নামক এক সন্ন্যাসী শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া আনন্দতীর্থ উপাধি দেন। দাক্ষিণাত্যের অনন্তেশ্বর মন্দিরে ইঁহার প্রথম শিক্ষা-দীক্ষা হয়। মাধ্বাচার্য্যের ব্রহ্মসূত্রের টীকা অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ ছাড়া "পুরাণপ্রজ্ঞা-দর্শন" নামক একখানি পুস্তকে তিনি বৈষ্ণব দর্শনের উচ্চাঙ্গের মত প্রচার করেন। মাধ্বাচার্য্য হইতে পঞ্চমস্থানীয় জয়তীর্থ বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। জয়তীর্থ অল্প বয়সে ১২৪৫ খৃঃ অব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইঁহার রচিত তত্ত্বপ্রকাশিকা, উপাধিখণ্ডন, স্যায়দীপিকা, উপাধিখণ্ডন টীকা, তত্ত্বনির্ণয়-টীকা প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত পুস্তক মাধ্বীশ্রেণীর অবশ্যপাঠ্য পুস্তকের তালিকায় দৃষ্ট হয়। (মাধ্বী সম্প্রদায়ের সমস্ত আচার্য্যের নাম ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি পুস্তকে পাওয়া যায়, তাহাতে মাধ্বাচার্য্য হইতে চৈতন্যদেব পর্য্যন্ত সকলের নামই আছে। কিন্তু চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃতের মত দার্শনিক চরিতগ্রন্থেও মাধ্বী সম্প্রদায়ের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না, এমন কি কেশব ভারতী কিংবা ঈশ্বর পুরী যে ঐ শ্রেণীভুক্ত তাহাও উল্লিখিত হয় নাই।)

বৈষ্ণবদিগের এই বিবিধ শ্রেণীর মধ্যে ভাবের অনুশীলনই প্রধান লক্ষ্য ছিল। যদিও প্রাচীন শাস্ত্রে 'রাগানুগা' ভক্তির উল্লেখ মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায় তথাপি চৈতন্যের পূর্ব্বে এই ভক্তির পূর্ণ বিকাশ আর কোথাও ছিল না। (বহু যুগ ধরিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম ঐশ্বর্য্যের গণ্ডী এড়াইতে পারে নাই। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্ত্তা—এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল। চৈতন্য ভগবানের বিভূতির দিকে লক্ষ্য করেন নাই। উপনিষদের "আনন্দস্বরূপ" ভগবান্ই তাঁহার আরাধনীয় ছিলেন। তিনি ভগবানের ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি গুণ দেখিতে চান নাই, অথচ চৈতন্য-ভাগবতকার বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি সমস্ত চরিত-লেখকই তাঁহার জীবনে ঐশ্বর্য্যের লীলা দেখাইতে চেষ্টিত হইয়াছেন। কেহ তাঁহার ষড়্ভুজ, কেহ তাঁহার বরাহমূর্ত্তি, কেহ তাঁহার দামোদরত্ব পরিকল্পনা করিয়া তাঁহার জীবনে ঐশ্বরিক বিভূতি আরোপ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। চৈতন্য-ভাগবত তাঁহাকে ভগবানের অবতার প্রমাণ করিবার জন্য কখনও তাঁহাকে কচ্ছপরূপে বর্ণনা করিয়াছেন; কখনও তাঁহাকে বরাহরূপী করিয়া তাঁহার মুখে ভীষণ গর্জ্জন করাইয়াছেন; কখনও বা অতি-শৈশবে তাঁহাকে অনন্তশায়ী নারায়ণ পরিকল্পনা করিয়া এক ভীষণ সর্পের উপর শায়িত করিয়াছেন; কেহ কেহ বা তাঁহাকে রামের অবতার প্রমাণ করিবার জন্য লঙ্কা হইতে অমর বিভীষণকে আনাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার ও সংবর্দ্ধনাদি করাইয়াছেন; কেহ বা তাঁহার ভক্ত মুরারি গুপ্তকে হনুমানের অবতার বানাইয়া তাঁহার দেহ হইতে একটি দীর্ঘ লাঙ্গুল বাহির করাইয়াছেন। প্রেমের সম্পূর্ণ জটিলতাশূন্য অনাবিল পবিত্র দেবচরিত্রকে লইয়া গোঁড়া শ্রেণীর চরিতকারগণ বৈষ্ণব-বিভূতির ছাই ভাসরূপে মাখাইয়া তাঁহাকে যে ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, সেই বিকৃত রূপ এখনকার দিনে গ্রাহ্য হইবার নহে। শুধু তাঁহাকে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের অবতার পরিকল্পনা করিয়াই তাঁহারা

ক্ষান্ত হন নাই, পূর্ণ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্ত্তা ভগবানের পার্শ্বচর হিসাবে নিজেরাও যে সেই ঐশ্বর্য্যের অংশীদার তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্ম "গৌরগণোদ্দেশ" প্রভৃতি অসংখ্য পুস্তিকা লিখিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় তাহার এক রাশ পুস্তিকা বিদ্যমান, তাহাতে চৈতন্যের পার্ষদের মধ্যে কে কাহার অবতার তাহার একটা পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইয়াছে। অদ্বৈত মহাদেবের, হরিদাস ব্রহ্মার, নিত্যানন্দ অনন্তদেবের অবতার তো আছেনই, তাহা ছাড়া কেহ হনুমানের, কেহ অঙ্গদের, কেহ রাধিকার সখী বিশাখা, ললিতা, বা মধুমতীর অবতার এইরূপ পরিকল্পিত হইয়াছেন। এই গৌরগণোদ্দেশের এতগুলি পুঁথি পাওয়া যাইতেছে যে তাহাতে মনে হয় প্রত্যেক বৈষ্ণব বালককে ইহা মুখস্থ করিতে হইত। বৈষ্ণব গুরুগণ এইরূপে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের দেবতা বা দেবতাস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া শিষ্যমণ্ডলীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। গুরুতর স্বার্থের সঙ্গে সংশ্রব থাকায় এই সকল পুস্তকের কোন একটা পংক্তির সত্যতাসম্বন্ধে যদি কেহ প্রশ্ন করেন, তবে সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজে যে ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত হয় তাহাতে সমালোচক দগ্ধ হইয়া যাইবার পথে দাঁড়ান। যখন গোবিন্দ দাসের করচার আমি একটা সংস্করণ প্রকাশ করি, তখন এক বিশিষ্ট বৈষ্ণব গোস্বামী আমাকে বলিয়াছিলেন—"আপনি চৈতন্য-চরিতামৃত ও চৈতন্য-ভাগবতের অলৌকিক অংশ গ্রহণ করুন, আমরা তাহা হইলে গোবিন্দদাসের করচার প্রতিকূলতা করিতে বিরত হইব।" চৈতন্যের এই সকল চরিত-কথা নানা দিক্ দিয়া অতি মূল্যবান্। ইহারা চৈতন্যেতিহাসের প্রধান অবলম্বন, বিদ্যাবত্তা, সাধুতা ও সহিষ্ণুতা, শ্রম ও জীবনব্যাপী তপস্যার ফলস্বরূপ ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই; কিন্তু কোথায় বৃন্দাবনের দ্বাদশ বনের গরুর রাখাল, কিংবা মথুরার নরক-বিনাশী কালীয়, বক, পূতনা, তৃণাবর্ত্ত, কংস প্রভৃতি দানবধ্বংসকারী মহাবীর আর কোথায় নবদ্বীপের টোলের শাস্ত্রামোদী শেষে ভক্তিপ্রেমের অবতার নিরীহ টুলো তরুণ ব্রাহ্মণ যুবক—ইহাদিগকে এক পংক্তিতে আনিয়া এক করিয়া দেখাইবার চেষ্টা বাতুলতা। বৃন্দাবন দাস এতদর্থে না করিয়াছেন এমন কার্য্য নাই। টোলে বসিয়া চৈতন্য শিষ্যদিগকে পড়াইতেছেন ইহার বর্ণনা উপলক্ষে বদরিকাশ্রমে কিংবা নৈমিষারণ্যে কৃষ্ণ ঋষিদিগকে উপদেশ দিতেছেন—সেই প্রাচীন কাহিনী স্মরণ করিয়াছেন। কৃষ্ণ গর্গমুনির নিবেদিত অন্ন খাইয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন, এখানেও অতিথি ব্রাহ্মণের নিবেদিত অন্ন শিশু চৈতন্য খাইয়া লুকাইয়া পড়িতেছেন। পাঁচ বৎসরের শিশু চৈতন্য গঙ্গার তীরে ক্রীড়া-লীলা, অতি শিশু মেয়েদের সঙ্গে খেলা ও কলহ করিতেছেন, এখানেও বৃন্দাবন দাস "পূর্ব্বে শুনিলাম যেন নন্দের কুমার। তেমনই দেখিয়ে তোমার পুত্রের ব্যবহার" লিখিয়া কৃষ্ণের গোপীদের সঙ্গে লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, চৈতন্যের বাল্যকালের গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের অধ্যাপক সান্দীপনি মুনির সঙ্গে উপমিত হইয়াছেন। এই সকল চেষ্টার এত বাড়াবাড়ি চৈতন্য-ভাগবতে দৃষ্ট হয় যে, চৈতন্য যে শ্রীকৃষ্ণের অবতার তাহা বৃন্দাবন দাস যেমন প্রমাণ করিয়াছেন এমন আর কেহ পারেন নাই—এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া পরম পরিতোষসহকারে বৃন্দাবনের

চৈতন্য-ভাগবত প্রভৃতি পুস্তকে চৈতন্যকে কৃষ্ণ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা।

গোস্বামীরা চৈতন্যমঙ্গল নাম কাটিয়া ঐ পুস্তকের চৈতন্য-ভাগবত নাম দিয়াছিলেন। ভাগবতের কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্য-ভাগবতের চৈতন্যলীলা একই বস্তু, ইহাই দেখাইবার জন্য এই নাম।

অথচ যে ব্যক্তিকে লইয়া এই দেবব্যূহ পরিকল্পিত হইয়াছিল তিনি দীনের দীন ছিলেন, কেহ তাঁহার পা ছুঁইতে গেলে তিনি বিরক্ত হইতেন। পুরীতে পাছে কেহ তাঁহার পাদোদক পান করে এই ভয়ে তিনি একটি বৃক্ষের তলে অতি সঙ্গোপনে স্নানের একটা যায়গা করিয়া লইয়াছিলেন। একবার 'কৃষ্ণজয়' স্থানে 'চৈতন্যজয়' বলিয়া কোন বিশিষ্ট ভক্ত তাঁহারই নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তিনি অত্যন্ত বিরক্তিসহকারে তাহা থামাইয়া দিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে পুরী-প্রত্যাগমনের পর বাসুদেব সার্ব্বভৌম তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া সংবর্দ্ধনা করিতে গিয়াছিলেন, তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সার্ব্বভৌমকে এজন্য গঞ্জনা করিয়াছিলেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত বহু পাওয়া যাইবে।

চৈতন্যের বিনয়।

সুতরাং এখন এমন একটা সময় আসিয়াছে, যখন ক্ষুদ্র গোঁড়া বৈষ্ণবসমাজে প্রতিষ্ঠিত চৈতন্য-জীবনীগুলির ঐতিহাসিকতা আলোচনা করিয়া গ্রহণ ও বর্জ্জননীতি অবলম্বন করিতে হইবে। গোঁসাইদের ভ্রূকুটির ভয় করিলে চলিবে না। এই ভাবে সত্যের ভিত্তির উপর চৈতন্যচরিত দাঁড় করাইলে তাহার স্বরূপ দেখিবার ও দেখাইবার সুবিধা হইবে। নিজের বাড়ীটি লোকের প্রিয় হইলেও তথাকার আবর্জ্জনা কোন্‌গুলি তাহা দেখাইলে গৃহের মহিমা বাড়িবে ভিন্ন কমিবে না। এখন উহারা চৈতন্যগণ্ডীর বাহিরে কতকটা অবিশ্বাস্য হইয়া আছে। উপযুক্ত ভূমিকায় ঐতিহাসিক কারণ দেখাইয়া সেই আবর্জ্জনা কিভাবে আসিল তাহা বুঝাইয়া দিলে পুস্তকগুলির দর কমিবে না, বরঞ্চ ইহা সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইবে। মধ্য-যুগের জগতের সর্ব্বত্রই সাধু পুরুষদের চরিতাখ্যানগুলি এইরূপ অলৌকিক গল্পময়, অথচ তাহারা সর্ব্বত্র সম্মান পাইতেছে। তাহার কারণ এই যে সেই পুস্তকগুলির গুণাগুণ বিচারের দিগ্‌দর্শনীর আলোতে দেখান হইতেছে না। বিচারহীন অন্ধ বিশ্বাসে উদ্দিষ্ট দ্রব্যের মূল্য কমিয়া যায় মাত্র। ভক্তদের নিজ ভক্তি অতি দুর্লভ সামগ্রী, কিন্তু ঐতিহাসিকদেরও একটা কর্ত্তব্য আছে।

চৈতন্যদেব ভারতীয় ধর্ম্মের কি উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহাই এখন আমাদের বিবেচ্য। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রধানতঃ ভাবমূলক। চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্যও তাই, কিন্তু এ ক্ষেত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা উহার নাম দিয়াছেন "মহাভাব", এই মহাভাবই এদেশের বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ এবং চৈতন্যদেব 'মহাভাবের' জীবন্ত প্রতীক।

"মহাভাব"।

এই ভাব কি?—মহাভাব তো দূরের কথা—অপর দেশের লোকেরা এখনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। আমি চৈতন্যদেবকে বুদ্ধ হইতে কোন কোন গুণে শ্রেষ্ঠ বলাতে ডাঃ সিল্‌ভান লেভি মহাশয় আমাকে অনুযোগ দিয়াছিলেন (মৎকৃত Chaitanya and

his age" পুস্তকের Dr. Sylvan Levia ভূমিকা)। ভগবানের অস্তিত্ব খৃষ্টান প্রভৃতি অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরাও বিশ্বাস করেন। যদি তাঁহার সত্তা স্বীকৃত হয়, তবে তাঁহাকে ভালবাসা যায়—এ কথাটা অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না। অনেক দেশের সাধু ও মহাজনেরা ভগবানের প্রত্যাদেশের কথা বিশ্বাস করেন, কারণ জগতের বড় বড় ধর্ম্ম-গ্রন্থের অনেকগুলিই এই প্রত্যাদেশের উপর স্থাপিত। যাঁহার প্রত্যাদেশ শোনা যায়, তাঁহার রূপদর্শন কেনই বা অসম্ভব হইবে? একমাত্র চৈতন্যদেব তাঁহার জীবনে প্রমাণ করিয়াছেন, তাঁহার রূপদর্শন সম্ভবপর। ঋষিরা কখনও কখনও তাঁহাকে বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মত আভাসে মাত্র দেখিয়া থাকেন; যে মুহূর্ত্তে সেই আভাসে দর্শন লাভ হয় সেই মুহূর্ত্তে ধ্যানীর ধ্যানের সার্থকতা। শুক, প্রহ্লাদ ও ধ্রুবের ভগবদ্দর্শন এত উপগল্পে জড়িত যে তাহা ঐতিহাসিক যুগের প্রামাণিক কথা বলিয়া অনেকে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইবেন না। কিন্তু জীবনে এই দর্শনটি সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা এবং ইহার ফল তাঁহার জীবনব্যাপী হইয়াছিল। গয়ায় যাইয়া তিনি কিছু দেখিয়াছিলেন; কি দেখিয়াছিলেন, তাহা অনেকবার বলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। সেই অবধি "অবাঙ্মানসগোচরে"র কথা বলিতে যাইয়া তিনি একবার গদাধর আর একবার শ্রীমান্ পণ্ডিতের কাঁধে ঢলিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। (একবার তিনি বলিয়াছিলেন—"সর্ব্বত্র তাঁহার রূপ করে ঝলমল। সে দেখিতে পারে যার আঁখি নিরমল।" (গোবিন্দদাসের করচা)। তিনি কি দেখিয়াছেন বলিতে পারেন নাই, বলিতে গেলে আনন্দাধিক্যে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়াছেন। কিন্তু যাহাই দেখুন না কেন, তাহার ফলসম্বন্ধে দ্বিধার কোন কারণ নাই। এই দেখার ফলে তিনি কৃষ্ণকেলী ধুতি ছাড়িলেন; আমলকী দিয়া যে দীর্ঘ বক্রাগ্র সুকেশ মার্জ্জনাপূর্ব্বক ফুলমালার জড়াইয়া রাখিতেন, সে কেশসজ্জা দূর হইল; পালঙ্ক ছাড়িয়া ভূমিশয্যা লইয়াছিলেন, তাঁহার যে শরীর চন্দন, অগুরু, কস্তুরী দ্বারা সুবাসিত হইত, তাহা ধূলায় ধূসর হইল। সে কণ্ঠে আর সুবর্ণ মাদুলী স্থান পাইল না, এমন কি তিনি সন্ধ্যা, আহ্নিক, শালগ্রাম-সেবা প্রভৃতি ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্ম সকলই ছাড়িয়া দিলেন। কোন শব্দ শুনিলে 'কে এল, কে এল' বলিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিতেন, চক্ষে অবিরল অশ্রুধারা; একবার ঘরে আর একবার বাহিরে যাতায়াত করেন—"পুনঃ পুনঃ গতাগতি কর ঘর পন্থ। ক্ষণে ক্ষণে ফুলবনে চলহ একান্ত।" মাথার চুল আলুলায়িত, শ্লথ বসনে শচী দেবী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেন, কিন্তু মাতার দিকে আর তাঁহার দৃষ্টি নাই। "না করে স্নান গোরা না করে ভোজন, না করে শ্রী অঙ্গে বেশ তৈল উদ্বর্ত্তন।" যিনি জীবন-মরণের সখা, জীবের অনন্তশরণ, যাঁহার সৌন্দর্য্যের কণিকা-প্রসাদ পাইয়া জগৎ সুন্দর—তাঁহার প্রথম রূপদর্শনে চৈতন্যদেবের এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল। এই ভাব ক্ষণিক নহে—ইহা তাঁহার জীবনব্যাপী ছিল।) চণ্ডীদাস চৈতন্য জন্মিবার পূর্ব্বে তাঁহার আগমনী গাহিয়াছিলেন—শ্রেষ্ঠ কবিদের চিত্ত মুকুর-স্বরূপ, তাহাতে আগন্তুক দৃশ্য প্রতিবিম্বিত হয়। এ সকল কি গূঢ় আধ্যাত্মিক নিয়মে ঘটিয়া থাকে, তাহা কে বলিবে? তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা আমরা দেখি না কেন?

রূপদর্শন।

সে কথা পরে হইবে—কিন্তু এই যে তিনি রূপ দেখিয়াছিলেন, সে দেখাটা ত ঠিক,—তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কারণ (সেই দর্শনের ফলে তাঁহার জীবনের রূপ উল্টাইয়া গিয়াছিল। চণ্ডীদাসের রাধার মত "বিরতি আহারে,—রাঙ্গাবাস পরে, যেমন যোগিনী পারা"—ভাব তাঁহার হইয়াছিল; তিনিও মেঘের মধ্যে সেই লুকানো রূপ দেখিয়া ধ্যানীর মত নিষ্পন্দ চক্ষে উর্দ্ধদিকে তাকাইয়া থাকিতেন, "সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে, না চলে নয়নের তারা।")

তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহা আর কেহ দেখে না কেন? আমাদের বাহিরের ইন্দ্রিয়ের অতীত সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয় আছে—এ সম্বন্ধে আমি কোন জটিল দার্শনিক প্রসঙ্গের অবতারণা করিব না। গবাদি পশুকে ফুলবনে ছাড়িয়া দিলে দেখা যায়—সৌন্দর্য্য দেখিবার যে চক্ষু, যাহা মানুষের আছে—তাহা তাহাদের নাই। যাহা আমরা চক্ষুর দ্বারা দেখিয়া পরম তৃপ্তি উপভোগ করি, তাহারা সেইগুলি তখনই খাইয়া ফেলে। ক্ষুধার তাড়নায় সৌন্দর্য্যদর্শনাক্ষম চক্ষুর উপর তাহাদের একটা আচ্ছাদন পড়িয়াছে—তাহাদের সেই দৃষ্টি ফোটে নাই। আমরাও বহিরিন্দ্রিয়তাড়নায় আসক্তিবশতঃ জগতের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি অনুভব করিবার শক্তি যেমনই হারাইয়াছি, কিংবা আমাদের সেই স্বর্গীয় দৃষ্টির এখনও উন্মেষ হয় নাই।

(রূপদর্শনের ফল পূর্ব্বরাগ—জগতে সৌন্দর্য্যের জন্য মানুষ পাগল, এই উন্মত্ততার মত সুখকর আর কিছু নাই, এই রূপদর্শনজাত অনুরাগের ভিত্তিতে পৃথিবীর যাবতীয় মহাকাব্য দাঁড়াইয়া। নায়ক-নায়িকার প্রেম সেই কাব্যের উপাদান, প্রত্যেকে যদি অকপটে তাঁহার মনের কথা বলেন তবে অবশ্যই স্বীকার করিবেন—জীবনে প্রথম যে ভালবাসা আস্বাদন করিয়াছিলেন, অনাবিল স্বার্থশূন্য ত্যাগপূর্ণ হৃদয়ের আবেগে প্রথম যে ভালবাসা হইয়াছিল, তদপেক্ষা বড় সুখ তিনি পান নাই।)

(যদি ঈশ্বরসৃষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে মানুষ এরূপ অপূর্ব্ব সুখের আস্বাদন পায়, তবে যিনি সৌন্দর্য্যের কেন্দ্র, আত্মার একমাত্র কাম্য,—রূপের উৎস, তাঁহাকে দেখা যদি সম্ভবপর হয় তবে মানুষের মনের অবস্থা কি হইতে পারে, চৈতন্যের জীবন তাহাই প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছে।) আর কোন সাধু মহাজন জগতে তাহা পারিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না। (স্ত্রী, পুত্র, প্রণয়ী, প্রণয়িনীর জন্য যেরূপ কেহ কাঁদিয়া মরে, পাগল হয়, কাব্য লেখে, গান গায়, কত কি করে, চৈতন্য ভগবানের জন্য তদপেক্ষা শতগুণ উন্মাদনা দেখাইয়াছেন। ভগবানের প্রেম যে সত্য বস্তু, তাহা কাল্পনিক নহে, তাহা মানুষ লাভ করিতে পারে, তাহা চৈতন্য যেরূপ দেখিয়াছেন অপর কেহ তেমন পারে নাই।)

কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে কোন বড়লোকের বাড়ীতে যাইয়া দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া আসা কত কঠিন, আর যিনি রাজাধিরাজ তাঁহার দর্শন লাভ কি সহজ? কত যুগের তপস্যা থাকিলে তবে এই সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে।

ভারতবর্ষ এই তপস্যার পথ দিয়া যুগ-যুগান্তর যাবৎ চলিয়া আসিয়াছিল। যিশুর শিক্ষা মনুষ্যের সঙ্গে সৌভ্রাত্র-স্থাপন—"তুমি মন্দিরে যাইবার পূর্ব্বে স্মরণ করিয়া আইস কাহারও সঙ্গে তোমার কলহ আছে কিনা, যদি থাকে, তবে মিটাইয়া এস—নতুবা তোমার নৈবেদ্য গৃহীত হইবে না। যে তোমাকে প্রহার করিয়াছে, তাহার নিকট পুনরায় যাও প্রহৃত হইতে; যে তোমাকে এক ক্রোশ বেগার খাটাইয়াছে, তাহার দুই ক্রোশের বেগার খাটিয়া আইস; যে তোমার জামা লইয়াছে, তাহাকে তোমার কাপড়খানিও দিয়া আইস।"—এই ক্ষমাশীল ভ্রাতৃভাব যিশু শিখাইয়াছিলেন, তোমার মনে কলুষলেশ থাকিলে তুমি রাজার দ্বারে ঢুকিতে পারিবে না। তীর্থঙ্করগণ ও বুদ্ধ জীবে দয়া শিখাইয়াছিলেন। শুধু মানুষ নহে একটি সামান্য পশু ও পাখীর জন্য প্রাণ দিয়া ঐ সার্ব্বজনীন প্রেম দেওয়ার শিক্ষা তাঁহারা দিয়াছিলেন। গল্পে কথিত আছে, এক জন্মে বুদ্ধ একটি ব্যাঘ্রীর জীবনরক্ষার জন্য নিজ প্রাণ দিয়াছিলেন, সেই জাতকটির কথা আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এরূপ আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

যখন এইভাবে মানুষের সঙ্গে এবং সমস্ত জগতের সঙ্গে সৌভ্রাত্র ও দয়ার সম্বন্ধ সুদৃঢ় হইল—তখন ভগবৎপ্রেমলাভের উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল। বহু যুগ যাবৎ ভারতবর্ষ হোমকুণ্ডে যজ্ঞাগ্নি জ্বালিয়া পুনরায় তাহা নির্ব্বাণ করিয়া অতি দুশ্চর তপস্যা করিয়া যে সিদ্ধি চাহিয়াছিল, চৈতন্যদেবই সেই সিদ্ধি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম।

অপরাপর সাধুদের জীবনে তপস্যা আছে—কিন্তু চৈতন্য সাক্ষাৎ তপঃসিদ্ধি, অতি সহজ, বাল্মীকির কাব্য, চণ্ডীদাসের গান, রবীন্দ্রের গীতাবলী যেমন সহজ—ইহা তেমনই সহজ। শ্রমজাত একটি বিন্দুও তাহার নাই, ধর্ম্মজগতের সম্যক্ বিকশিত পদ্ম, ইহা সৃষ্টি করিতে যে জাতীয় কত যুগের তপস্যার দরকার হইয়াছে, তাহার চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই। তিনি খুব কমই উপদেশ দিয়াছেন, তিনি কোন কঠিন পন্থা দেখান নাই—তাঁহাকে দেখা মাত্র লোকে ভুলিয়াছে। কোন সুন্দরীকে দেখিলে যেরূপ নায়ক ভুলিয়া যায়—তাঁহার মুখে প্রেমের বক্তৃতা না শুনিয়াও সে তাঁহাকে পাগলের মত ভালবাসিয়া ফেলে, চৈতন্যকে লোকেরা তেমনই সহজে ভালবাসিয়াছিল, কারণ তিনি যে রূপ দর্শন করিয়াছিলেন সেই রূপের ছাপ তাঁহার মুখে আঁকা ছিল—তাঁহার সে অপূর্ব্ব রূপ যাহার উদ্দেশে শত শত কবি গানের উৎস বহাইয়াছেন, শত শত বীণাবাদক বীণার সুরলহরীতে আকাশ ভাসাইয়া দিয়াছেন, সেই রূপ তিনি ভগবদ্রূপ-দর্শনের ফলে পাইয়াছিলেন, রাজার মোহরাঙ্কিত সে রূপ-আকর্ষণ কে এড়াইবে? চণ্ডীদাসের রাধিকার মুখে এই তত্ত্বটি একটি ছত্রে লিখিত হইয়াছে—

"তোমার গরবে, গরবিণী হাম—রূপসী তোমার রূপে।"

(তাঁহার ধর্ম্মের পঞ্চ শাখা—ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ছাড়া আর কাহারও শাখে নাই, রায় রামানন্দ তাহা চৈতন্যের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।)

প্রথম শান্তভাব—বুদ্ধদেব যাহার উপর জোর দিয়াছেন, সমস্ত কামনা দূর করিতে

হইবে। এই কামনা নির্ব্বাপিত করা দরকার—তাহা না হইলে অত্যন্তদুঃখ-নিবৃত্তির উপায় নাই। বুদ্ধদেব ছন্দককে বলিয়াছিলেন—"আমাকে অগ্নি-শলাকা-দ্বারা দগ্ধ কর—অতল জলে নিমজ্জিত কর,—কিছুতেই আমি দুঃখের সংসারে প্রবেশ করিব না।" এই জগতের ত্রিবিধ তাপে যখন মানুষ আর্ত্ত হইয়া 'ত্রাহি, ত্রাহি' রব করিতে থাকে, তখন তাহা হইতে পলাইয়া সে অরণ্য আশ্রয় করে, বুদ্ধ-শিষ্য আনন্দ এইভাবে বুদ্ধের শরণ লইয়াছিলেন। সুতরাং বুদ্ধ অমৃতের সন্ধানে বনবাসী হন নাই—তিনি দুঃখ হইতে জগৎকে রক্ষা করিবার উপায়ের অন্বেষণে গিয়াছিলেন। জপের দ্বারা শান্তভাব পাওয়া যায়। যিনি জপের পথে প্রথম ব্রতী, তিনি বুঝিবেন এ পথ কত কষ্টকর। ভগবানের নামই হউক, রূপই হউক বা বৌদ্ধযুগের মহাযান-সম্প্রদায়ের মতানুসারে শূন্য বা মহাশূন্যই হউক, একটা কেন্দ্র মনে আবদ্ধ করিয়া জপ সুরু করিলে দেখা যায় পৃথিবী সাধনার পথের পথিককে কিরূপ শত বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। জপের সময়ে পুনঃ পুনঃ সাংসারিক বিষয়ে মন প্রধাবিত হইবে। যাহা প্রথমতঃ অতি সহজ মনে হইয়াছিল, জপের ব্রতী দেখিবেন তাহা কত কঠিন, পদ্মপত্রে জলের মতন মন টলটলায়মান, কিছুতেই তাহাকে কেন্দ্রে আটকাইয়া রাখিতে পারা যাইতেছে না। কিন্তু কয়েক বৎসরের দৃঢ়সঙ্কল্পিত অমোঘ চেষ্টার ফলে মনকে বশীভূত করা যায়। তখন সংসারের যত বিপদ্ই আসুক না কেন, মনকে তাহাদের ঊর্দ্ধে লইয়া গিয়া সেই কেন্দ্রটিতে আবদ্ধ করা যাইতে পারে। জপে যখন এইভাবে মনে শান্তি আইসে তখন বুঝিতে হইবে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে—উহাতে আগাছা বা আবর্জ্জনা নাই। তখনকার প্রশ্ন—আমার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে, এখন ভগবানের সঙ্গে একটা সম্বন্ধের বীজ বপন করিতে হইবে।

শান্তভাব।

প্রথম সম্বন্ধ তুমি প্রভু—আমি দাস। তোমার আজ্ঞা পালন করা আমার কর্ত্তব্য। এই স্থানে নীতিবাদ সুরু হইল। দাস্যভাবটা নৈতিক রাজ্য। কি ভাল কি মন্দ মনের মধ্যে বিচারপূর্ব্বক সর্ব্বদা তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। দাস্যভাবের সঙ্গে কর্ম্মকাণ্ড জড়িত। সর্ব্বদা কর্ম্ম করা—ভগবানের নিয়ম বুঝিয়া শুনিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা—ইহাই দাস্যের লক্ষণ। অধুনা য়ুরোপ-প্রচলিত খৃষ্ট-ধর্ম্ম—এই দাস্য,—নীতিজ্ঞান ইহার ভিত্তি।

দাস্য।

কিন্তু কর্ম্মী কর্ম্ম করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, তিনি ভগবানের সঙ্গে নিকটতর সম্বন্ধের জন্য ইচ্ছুক হইলেন। নীতিজ্ঞান নীরস ও শুষ্ক। তাহাতে ভগবানের সঙ্গে আনন্দের সম্বন্ধ নাই। সারাজীবন বিবেক-সম্মতভাবে অহোরাত্র কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মী দেখিলেন, কি পাপ কি পুণ্য তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। এক শ্রেণীর জীবের ধ্বংসের উপর অন্য শ্রেণীর আহার চলিতেছে, যাহা কিছু শুভ, আলোর পশ্চাতে ছায়ার ন্যায় তাহার পশ্চাৎ অশুভ আছে। জগতের একদিকে হিতসাধন করিলে, অন্যদিক্ আহত হয়। পাপ-পুণ্যের কথা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। তখন

সখ্য।

ভক্ত ক্রমে ক্রমে নীতির সীমার ঊর্দ্ধে লীলার জগৎ পাইয়া রসের সন্ধান পাইলেন। তিনি বলিলেন, আমি ভালমন্দ কিছুই বুঝি না, আমি তোমাকে আত্মসমর্পণ করিলাম, তোমার এই খেলায় আমাকে টানিয়া লও। এই স্থানে সখ্য। দাস্যের মধ্যে শান্তভাব আছে—কারণ প্রথমতঃ মন স্থির করা দরকার—মন স্থির না করিলে ভগবানের প্রত্যাদেশ শোনা যাইবে না। ঘোলা জলে সূর্য্যকিরণ বিম্বিত হয় না। শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, অনাসক্ত মন প্রস্তুত হইলে তাহাতে কি প্রেয়ঃ কি শ্রেয়ঃ, তাঁহার কি আদেশ তাহা বুঝা যায়। আর সখ্যের মধ্যে শান্ত ত আছেই, দাস্যও আছে—সখ্য দাস্য হইতে আর একটু অগ্রসর। জগৎ লীলাময়ের লীলা, আমি তাঁহার সঙ্গী, সহচর ও খেলার সাথী। যাহা কিছু করি সর্ব্বদা তিনি আছেন, আমি তাঁহারই সঙ্গে আছি, আমি তাঁহাকে ছাড়া কিছু জানি না। বিপদে পড়িলে বক, তৃণাবর্ত্ত প্রভৃতি দানবের দ্বারা উৎপীড়িত হইলে, আমি তাঁহাকে জড়াইয়া ধরি, তিনি আমাকে রক্ষা করেন। এই সখ্যের মধ্যে দাস্যভাব আছে, কৃষ্ণ-সখারা দিনরাত্র তাঁহার সেবা করিতেছে, তাঁহার জন্য ফল কুড়াইতেছে; যে ফলটি মিষ্ট লাগিল তাহা তাঁহার মুখে আনিয়া দিল, তাঁহাকে কাঁধে করিল, তাঁহার কাঁধে চড়িল; এখানে উচ্ছিষ্টজ্ঞান নাই, প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ নাই, তথাপি রাখালেরা কৃষ্ণকে বলিতেছে—"বিনি কড়িতে হেন নফর কোথা পাবি।" এখানে ভক্ত কৃষ্ণের বাহির আঙ্গিনা ছাড়িয়া—দাস্যের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া—তাঁহার গৃহের ভিতরে ক্রীড়াক্ষেত্রে ঢুকিয়াছে। এখানে কর্ত্তব্যজ্ঞান, নৈতিক বিচার নাই, এত ঘণ্টা খাটিতে হইবে, এত ঘণ্টা বিশ্রাম করিতে হইবে, ঘড়ি ধরিয়া কর্ত্তব্যের সেরূপ কোন সীমা নির্দ্ধারণ করা নাই। বৃন্দাবনে সখাদের নিত্যলীলা চলিতেছে। সখ্য হইতে ভগবানের সঙ্গে রসের সম্বন্ধ—আনন্দের সম্বন্ধ।

তদূর্দ্ধে আনন্দ ঘনীভূত হইয়াছে। প্রত্যেক নবসৃষ্ট জীবের মধ্যে ভগবান্ তাঁহার সমস্ত সৌন্দর্য্য লইয়া প্রকাশ পাইতেছেন। নতুবা কালো কুৎসিত ছেলেটা তাহার মায়ের কাছে রূপের ডালি বলিয়া বোধ হইত না। রাত্রি জাগিয়া দীপ উস্কাইয়া মাতা ছেলের অধরপ্রান্তে হাসিটুকু ফুটিতে দেখেন এবং আনন্দে আত্মহারা হন। প্রত্যেক জননীকে ভগবান শিশুরূপে দেখা দেন; নতুবা কুৎসিত ছেলেটার মধ্যে তিনি অনন্তরূপ আবিষ্কার করিবেন কিরূপে? প্রত্যেক মায়ের ধারণা তাঁহার ছেলের মত এমন সুন্দর কেহ হাত-পা নাড়িতে জানে না, এমন সুন্দর আধ-আধ বুলি কেহ বলিতে পারে না। এত রূপ, এত সৌন্দর্য্য কালো ছেলেটার মধ্যে প্রকাশ পায় কিরূপে? বাৎসল্যের মধ্যে শান্তভাব আছে, দাস্য আছে—কারণ মাতার মত [illegible] কর্ম্মী দাসী আর কে আছে? এখানে দাস্য কর্ত্তব্য-জ্ঞানমূলক নহে, এ দাস্য অনুরাগের। এখানে কর্ম্ম কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ নহে। সেই অসীম অনন্ত রূপের [illegible] ক্ষুদ্র শিশুটিকে অবলম্বন করিয়া মাতৃবক্ষে ধরা দিয়া তাঁহার নিঃস্বার্থ, অযাচিত, অ[illegible] করুণা ও কর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবুদ্ধ করে। বাৎসল্যে সখ্য আছে, সমানে সমানে না হইলে স[illegible] হয় না। মাতা শিশুর সঙ্গে যখন খেলা করেন, তখন শিশুর সঙ্গে শিশু [illegible]

বাৎসল্য

লৌকিক ভাষায় তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেন না, এজন্য ছেলে-ভুলানো ছড়ার মত অর্থহীন কাকলীর সৃষ্টি করিয়া তিনি তাহার সঙ্গে কথা বলেন। একদা রোমের সিনেট-সভাপতির নিকট বিদেশী এক রাজদূত আসিয়াছিলেন, ভুলক্রমে তিনি তাঁহার একটা গোপন-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখেন, রোমের এত বড় সভাপতি ঘোটক সাজিয়াছেন ও তাঁহার শিশুপুত্র তাঁহার পিঠে চাপিয়া তাঁহাকে চাবুক মারিয়া চালাইতেছে। সভাপতি মাঝে মাঝে চিঁহিঁ রব করিতেছেন। বস্তুতঃ বাৎসল্যে শান্ত, দাস্ত ও সখ্য আছে—তার উপর আরো কিছু আছে। অত তন্ময় হইয়া কি সখা অনুরাগী হইতে পারে? কিন্তু কৃষ্ণসখা শ্রীদাম সুদাম তাহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা ঘুমাইলেও স্বপ্নে কৃষ্ণের সঙ্গে আলাপ করিতেন—শ্রীদাম বলিতেছে—"আমরা মায়ের কোলে ঘুমায়া থাকি। স্বপনে তোর চাঁদ মুখখানি দেখি।" সুতরাং সখ্য বড় কি বাৎসল্য বড় তাহা লইয়া তর্ক আছে। সখার নিকট যাহা বলা যায়, তাহা মায়ের নিকট বলা যায় না। শিশু একটু বড় হইলেই মাতৃস্নেহ তাহাকে সম্যক্ রূপে ধরিতে পারে না, সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে পারে না, পেটের ক্ষুধা হইতে হৃদয়ের ক্ষুধা বড়, মাতা তাহা বুঝিতে পারেন না। এই হিসাবে সখ্য বড় হইতে পারে, যেহেতু সখার নিকট মনের সকল কথা ব্যক্ত করা চলে। শ্রীকৃষ্ণের সুবল-সখার নিকট তিনি মনের নিগূঢ় কথা ব্যক্ত করিতেন। সুতরাং সখ্য হইতে যে বাৎসল্য বড় এ কথা শ্রীকৃষ্ণ-সখারা স্বীকার করিতেন না—শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিতেছেন "কি করিব ওরে সুবল, করিব আমি কি? চূড়া বাঁধি ধড়া পরি ব'সে রয়েছি। মায়ে না বলিয়া আমি যাই রে গোঠে, মরিবে আমার মা, পড়িব সঙ্কটে॥ একদিন নবনীত খেয়ে ছিলেম লুকাইয়া। মরিতে গেছিলেন মা, আমায় না দেখিয়া॥" উত্তরে সুবল বলিতেছে, "জানি রে তোর মায়ের প্রেম—কত ভালবাসে। সামান্য ননীর তরে বেঁধেছিল গাছে॥ যমল অর্জ্জুন যেদিন পড়েছিল গায়। সেদিন তোর মা নন্দরাণী আছিলা কোথায়?"

যে পুত্র মরিয়া যায়, সন্তান-শোকে বিধুরা মাতা অপর একটিকে ক্রোড়ে পাইয়া তাহাকে ভুলিয়া যান। কিন্তু মাধুর্য্য, একনিষ্ঠ প্রেম,—ইহা আনন্দের নিত্য প্রস্রবণ, কৃষ্ণ কাছে থাকুন বা না থাকুন—রাধার মন সর্ব্বদা কৃষ্ণময়—"গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি সদা ছলছল আঁখি। পুলকে আকুল দিক্ নেহারিতে সব শ্যামময় দেখি।" (চণ্ডীদাস) প্রতি পত্রমর্ম্মরে কৃষ্ণ-পদধ্বনি, প্রতি বায়ুহিল্লোলে বাঁশীর তান, রাধিকার আর কোন জ্ঞান নাই। চোখে কৃষ্ণরূপের অঞ্জন, কর্ণে অমৃতময় বেণু-শ্রবণ; এই প্রেম রাগানুরাগা। ইন্দ্রিয় তখন অন্তর্মুখী, তাঁহার পাদপদ্ম হইতে তাড়াইয়া অন্যদিকে চালাইতে চাহিলে তাহারা বাগ মানে না। রাধিকা বলিতেছেন—"যত নিবারিয়ে তায়, নিবার না যায়, আন পথে ধাই, তবু কানুপথে ধায়"—মনকে যত নিবারণ করিতে চেষ্টা করি, কিছুতেই নিবারণ করিতে পারি না, আমি অন্য পথে যাইতে চাই, কিন্তু পদ আমার অতর্কিতে কানুর পথেই চলিয়া যায়। "এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম। যার নাম নাহি লব, লয় তার

নাম। এ ছার নাসিকা মুঞি কত করু বন্ধ। তবু তো দারুণ নাসা পায় শ্যামগন্ধ॥ সে কথা না শুনিব করি অনুমান। পরসঙ্গে শুনিয়ে আপনি যায় কাণ॥ ধিক্ রহুঁ আমার ইন্দ্রিয় আদি সব। সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥" কখনও কখনও রাধা সেই বিশ্বসুন্দর পরম দেবতার আদরের কথা বলিতে যাইয়া আত্মহারা হইতেছেন :—"এ কথা কহিবে সই—এ কথা কহিবে। অবলা এমন তপ করিয়াছে কবে॥ পুরুষ পরশমণি নন্দের কুমার। কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে আমার॥" তিনি ত স্পর্শমণিতুল্য, তিনি যাহা স্পর্শ করেন, তাহাই সোনা হইয়া যায়—তবে আমার নিকট কি ধন চান যে আমার পা ধরিয়া থাকেন? "আমি যাই যাই যাই—বলে তিন বোল। কত না চুম্বন দেই, কত দেই কোল॥" যাইতে চাহিয়াও যাইতে পা উঠে না। চিবুক ধরিয়া "আমি যাই, যাই, যাই" বলিয়া বারংবার সজলচোখে বিদায় গ্রহণ করেন। কত চুম্বন ও নিবিড় আলিঙ্গনে বিদায় লওয়ার পালার পরিসমাপ্তি। কিন্তু এত করিয়াও পালা শেষ হয় না। "পদ আধ যায় পিয়া চায় পালটিয়া। বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া॥ করে কর ধরি পিয়া শপথি দেয় মোরে। পুনঃ দরশন লাগি কত চাটু বোলে॥" এক পা যাইয়া আবার ফিরিয়া কত কাতরভাবে আমার মুখখানি দেখেন, এবং আমার হাতে নিজ হাত দিয়া বলেন, "আমার শপথ, আবার যেন দেখা পাই।" পুনরায় দর্শনের জন্য কত মিষ্ট কথা বলেন, কত খোসামুদি করেন। এহেন কৃষ্ণের প্রসঙ্গ যেখানে হয়, সেখানেই তিনি পুলকে আত্মহারা হইয়া যান—"দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে,—পুলকে পুরয় তনু শ্যাম পরসঙ্গে।" কৃষ্ণের প্রসঙ্গে শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হয়, অন্তরের সেই আনন্দ ঢাকিতে গেলে "পুলক ঢাকিতে কত করি পরকার। নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥" সে কথা শুনিলেই চক্ষে পুলকাশ্রু দেখা দেয়। যাহা কিছু করি, যত দূরেই যাই না কেন—তাঁহার মুখের হাসিটি মনে জাগে, তখন সর্ব্বজ্বালার অবসান হয়। "যথা তথা যাই আমি—যত দূর চাই। চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলেকে জুড়াই॥"

আমরা এই রাগানুগ প্রেমের কথা পুনরায় উত্থাপন করিব। বুদ্ধদেব মানুষের সঙ্গে—সমস্ত জীবজগতের সঙ্গে একমাত্র করুণার সম্বন্ধ রাখিয়া অপর সমস্ত সম্পর্ক বাদ দিয়াছিলেন।

দুঃখবাদ ও আনন্দ।

তাঁহার মূর্ত্তি স্বতন্ত্র, একক—তিনি জীবের সঙ্গে যে পারিবারিক বন্ধন তাহা অস্বীকার করিয়া সমস্ত কামনার ঊর্দ্ধে আসন লইয়াছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মমতের ভিত্তি দুঃখবাদ। কিন্তু মহাপ্রভু মানুষের সমস্তগুলি সম্বন্ধ গরীয়ান্ করিয়া উহা আনন্দময়ের সঙ্গে আনন্দের সম্বন্ধের প্রতীক স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধগুলির দ্বারা আমরা পরিবারে আবদ্ধ—ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে ভগবদারাধনার উপাদান আছে। দারা, পুত্র, পরিবার মিথ্যা নহে—ইহাদের পশ্চাৎ সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন,—যিনি বেদান্তের কথায় বলিতে গেলে "আমাদের পিতা, মাতা ও পিতামহ।" এই সম্বন্ধগুলিকে তুচ্ছ করিলে—আনন্দস্বরূপের দ্বারে পৌঁছান সহজ হয় না।

সুতরাং মহাপ্রভু মানুষের পারিবারিক সম্বন্ধগুলির উপর ভগবৎপ্রেমের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন দেবাদিদেবের প্রেমের ইঙ্গিত আমরা গৃহে পাইতেছি—বনবাসী তাহা পাইতে পারে না। বৈষ্ণব সন্ন্যাসী গৃহী না হইয়াও গৃহী, কারণ গার্হস্থ্য জীবনের শিক্ষা দিয়া তিনি তাঁহার উদ্দিষ্ট দেবতার পূজোপকরণ প্রস্তুত করিয়াছেন।

পারিবারিক সম্বন্ধ।

এই পঞ্চরস—গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলকথা। বৈষ্ণবেরা নীতিশাস্ত্র, জ্ঞান ও কর্ম্ম মানেন না। তাঁহারা বলেন রসই সর্ব্বপ্রধান—যাঁহার চিত্তে সেই অনুরাগ জন্মিয়াছে তাঁহার চিত্তে নীতিকথা স্বতঃসিদ্ধ। ভগবানে যাঁহার প্রেম জন্মিয়াছে, তিনি নীতিবিগর্হিত কোন কর্ম্ম করিতে পারেন না, তাঁহার পক্ষে তাহা অসম্ভব—সুতরাং নীতিকথা নীচেকার কথা। ইহা কি কখনও কেহ মনে করিতে পারে যে চৈতন্যদেব মিথ্যা কথা বলিবেন,—পরের অপকার করিবেন? বৈষ্ণবধর্ম্মের উচ্চাঙ্গের রস-শাস্ত্রের নিকট নৈতিক ধারাপাতের বুলি আওড়ান বাতুলতামাত্র।

নীতিশাস্ত্র

চৈতন্যদেব ঈশ্বরপ্রেমের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন তাহা জগতে অতুলনীয়,—"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মনভোর। প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।" ঈশ্বরের সত্তা, তাঁহার প্রতি অনুরাগ—কল্পনার বস্তু নহে। এই অলৌকিক রস আস্বাদনযোগ্য ও আস্বাদিত হইয়াছে—ইহাই তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রেমে আজ বাঙ্গলা দেশ ভরপুর। বাঙ্গলার দূরদূরান্তরে, নগরে ও পল্লীতে ঘরে ঘরে গৌরাঙ্গের নাম কীর্ত্তিত। চাষা লাঙ্গল ফেলিয়া, কামার হাতুড়ী ছাড়িয়া, তাঁতি বস্ত্রবয়ন রাখিয়া সন্ধ্যায় মাদল লইয়া বসে, বাঙ্গলায় এমন পল্লী নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—যেখানে গৌরাঙ্গের নাম কীর্ত্তিত হয় না। সমস্ত বাঙ্গলা ও উড়িষ্যায় তিনি বাস্তিক। তিনি খুব বড় পণ্ডিত বা তার্কিক ছিলেন, কিংবা কোন অলৌকিক কাণ্ড করিয়াছেন, চাষাদের গানে তাহার উল্লেখ নাই, এমন কি তাঁহার দিগ্বিজয়ী জয় (কি ষড়্‌ভুজদর্শন প্রভৃতির কথা একবারও তাহারা বলে নাই। তাহারা যে নিত্য সন্ধ্যায় তাঁহার জন্ত ভক্তিফুলের মালায় অর্ঘ্য সাজায়—তাহা সহজ সরল কথার সুরভিমাখা।) "আমার গোরা জাতের বিচার মানে নারে—দেখ্‌বি যদি আয় সকলে।" "দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোণা, তারে ধরি ধরি মনে করি ধরতে গিয়ে আর পেলাম না। সে মানুষ চেয়ে চেয়ে, ফিরতেছি পাগল হয়ে—মরমে জলছে আগুন আর নিবে না, আমায় বলে বলুক লোকে মন্দ, বিরহে তার প্রাণ বাঁচে না।" (যিনি আমাদের অন্তরঙ্গ হইতে অন্তরঙ্গ চিরসুহৃদ, একমাত্র অবলম্বন, দুঃখের দিনের অবসানে যাঁহার চরণকমল পাইব বলিয়াই জীবন-ধারণ, সেই পরম আশ্রয়, রূপেশ্বর প্রিয়বন্ধুর যিনি সন্ধান দিয়েছেন, সেই সোণার মানুষটির জন্ত জাতীয় ব্যাকুলতা বাঙ্গলার শত শত চাষার গানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহাকে ইহারা কত ভালবাসে এই দুইটি চরণ, যাহা বাঙ্গলার হাটে মাঠে শোনা যায়, তাহা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে—"ভজ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গের নাম। যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেজন

গানে গানে চৈতন্যের ইতিহাস-রচনা।
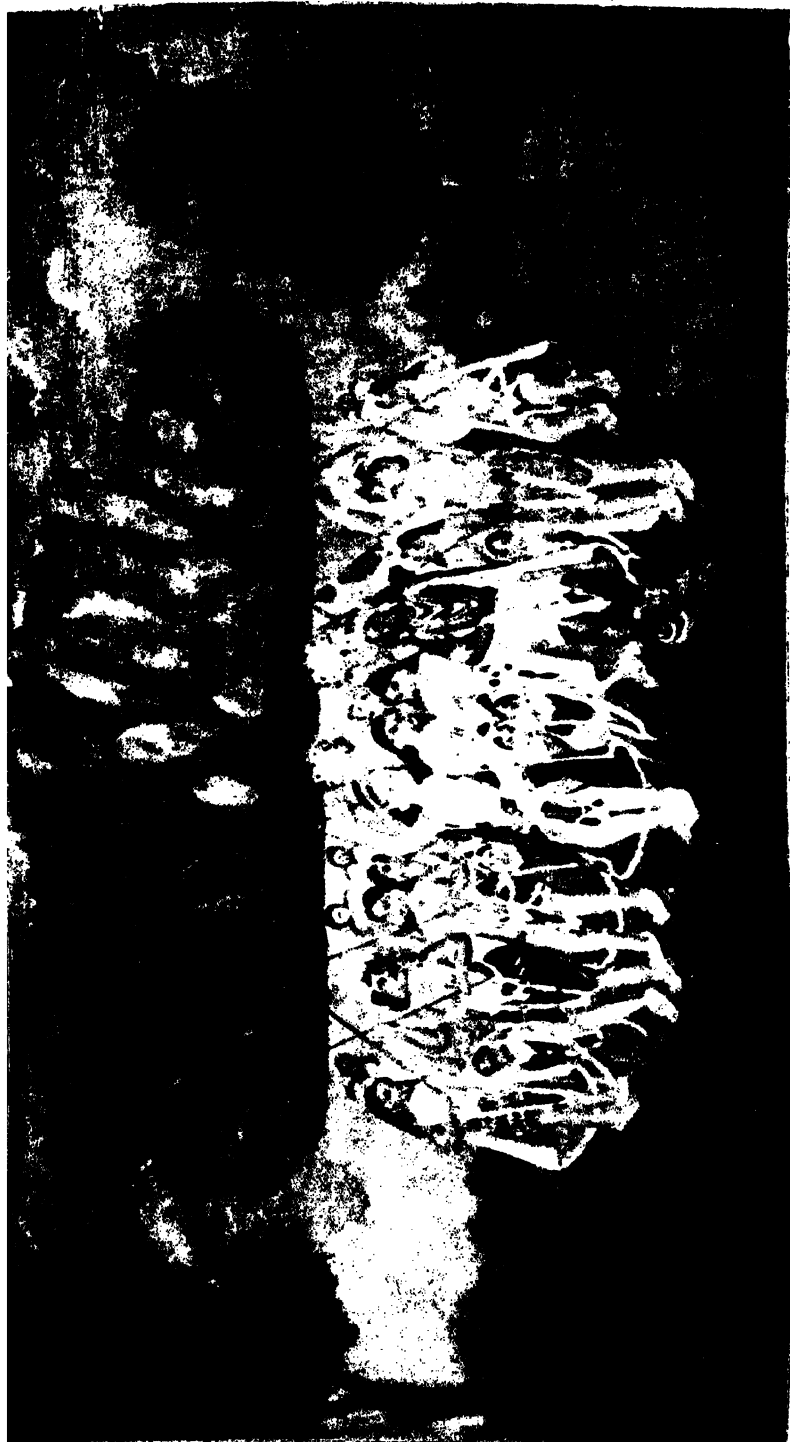
আমার প্রাণ।" শত শত গানে এই ভাবটি আছে,—"দেখ এসে এক সোণার মানুষ পতিতের গলা ধরিয়া কাঁদিতেছেন।" গৌরাঙ্গদেব জাতীয় গানের যত উপহার পাইয়াছেন, বোধ হয় জগতে আর কেহ তেমন পান নাই। তাঁহার নিজের জীবনটি ছিল একটি গানেরই মত। এই রূপ জগতের কোন জটিল কথা তাঁহাতে ছিল না। দুইটি অশ্রুময় পদ্মচক্ষু, "ঢল ঢল অঙ্গের লাবণী", কৃষ্ণপ্রেমে দীপ্তদেহ—এই ছিল তাঁহার সম্বল। জনম ভরিয়া এই রূপের কথা বলিয়া বঙ্গীয় জনসাধারণের তৃষ্ণা মিটে নাই। জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় যে এক সহস্র গৌরাঙ্গপদ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা সেই অফুরন্ত ভাণ্ডারের অতি নগণ্য অংশ। তাঁহার যে সমস্ত বড় বড় জীবন-চরিত লেখা হইয়াছে—তাহার মধ্যে চৈতন্যকে যত না পাওয়া যায়, এই সকল গানের মধ্যে তাঁহার জীবন্ত রূপ তদধিক পাওয়া যায়—সুরধুনীর তীরে তাঁহার কীর্ত্তনের যে খোল বাজিয়া উঠিয়াছিল, অদ্যাবধি সেই সুরতরঙ্গ এখানে আকাশে-বাতাসে খেলিতেছে। গৌরাঙ্গের বিশিষ্টদ্বৈতাদ্বৈতবাদ তাহাতে নাই, কিন্তু তিনি পতিতকে কোল দিয়াছিলেন, তিনি যে শ্রবণামৃত কৃষ্ণকথা শুনাইয়াছিলেন—কত ভঙ্গীতে কত ছন্দে কত সুস্বরূপে বাঙ্গলার জনসাধারণ তাহাই গাইয়া আসিতেছে। তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তন মনোহরসাই, গড়েনহাটি, রেনেটি প্রভৃতি সুরে—ভাবের মদিরা ঢালিয়া বাঙ্গালী-কুটিরের সর্ব্বদুঃখের জ্বালা ভুলাইয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী এমন করিয়া কোন সমগ্র জাতি জগতে গুণের পূজা করে নাই। গৌরাঙ্গ প্রকৃতই বাঙ্গালীর চোখের অঞ্জন, কণ্ঠের আভরণ, হস্তের দর্পণ, মুখের তাম্বূল, হৃদয়সর্ব্বস্ব, গৃহের সার। তিনি ভগবানের রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া পাগল হইয়াছিলেন। বাঙ্গলার জনসাধারণ 'রূপাভিসার' গাহিয়া সেই স্মৃতি এখনও উপভোগ করিতেছে। নব-বিবাহিতা বধূ পিত্রালয়ে গেলে যেমন নূতন বরটি ঘুরিয়া ফিরিয়া শ্বশুরালয় হইতে আগত কোন লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে ভালবাসে—সেই প্রাণের মানুষটি যে স্বর্গলোক তাহাদিগকে দেখাইয়াছিলেন সেই স্বর্গের স্মৃতি সম্বল করিয়া বাঙ্গালীচিত্ত তেমনি মহাজন-পদাবলী বুকের ধন করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহা শুনিতে এত ভালবাসে।

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির কীর্ত্তনকে 'মহাজন'-পদাবলী আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। বাঙ্গালী আর কোন জাতীয় গানকে এইরূপ সম্মান দেখায় নাই। রামপ্রসাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সঙ্গীত, রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীত, ফকির ও বাউলদের গান এবং আগমনী গান—ইহারা সত্যসত্যই ধর্ম্মের কথা শুনাইতেছে, কিন্তু ইহার কোনটিই 'মহাজনপদ' নহে। চৈতন্যের পরিকরগণ কিংবা চৈতন্য যাঁহাদের নিকট প্রেমের প্রেরণা পাইয়াছেন এবং চৈতন্যের পরবর্ত্তী একটি নির্দ্দিষ্ট কবির দল, যাঁহারা রাধাকৃষ্ণ-সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন—তাঁহারাই 'মহাজন'; চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত একটি নির্দ্দিষ্ট বৈষ্ণব কবির দল—'মহাজন'। রূপজীবীরাও কীর্ত্তন গাহিয়া থাকে, তাহারা রামপ্রসাদের গান,

কীর্ত্তনের সঙ্গে চৈতন্যের সম্বন্ধ।

মহাজনী গান।

আগমনী গান, কিংবা শাক্ত-সঙ্গীত, ব্রাহ্ম গান, ফকিরের দেহতত্ত্বের গান—এ সমস্তই গাহিয়া থাকে—কিন্তু কীর্ত্তন গাহিতে হইলে তাহাদের ভাব অন্য প্রকার হইয়া যায়, তখন তাহারা বলিবে "মহাশয়, বাসি কাপড়ে, হাত মুখ না ধুইয়া কীর্ত্তন গান করিব কিরূপে?" অথচ এই কীর্ত্তনের মধ্যে শীলতার হানিকর অনেক আপত্তিজনক বিষয় আছে। তথাপি কীর্ত্তনগানও অপরাপর গান এক পাঙ্‌ক্তেয় নহে। কীর্ত্তনগান চৈতন্যের ছাপ মারা—মোহরাঙ্কিত। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্র যখন তাঁহার সঙ্গী পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এমন অমৃতবর্ষী সুরতো কখনও শুনি নাই, শুধু সুরেই যে প্রাণ কাড়িয়া লইল, এই আশ্চর্য্য সঙ্গীত, এই আশ্চর্য্য সুর কাহার সৃষ্টি?" সঙ্গী বলিলেন, "এই কীর্ত্তন-সুর ঠাকুর চৈতন্যের সৃষ্টি (চৈ. চ. অন্ত্য)। মোট কথা সুরুচি-কুরুচির কথা ছাড়িয়া দিয়া অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির পক্ষে কীর্ত্তনের আসরটি দেখা উচিত। যাঁহার বৈষ্ণব ভক্তির দীক্ষা নাই, যিনি চৈতন্যের জীবনী সুষ্ঠুরূপে পড়েন নাই তিনি যেন বটতলা-প্রকাশিত পুস্তকগুলি হইতে কীর্ত্তনের পদ না পড়েন। চালি ও কাঠামো বাদ দিয়া অসুর-সিংহ-কার্ত্তিক-গণেশ-লক্ষ্মী ও উর্দ্ধদিকে শম্ভু এই সমস্ত আসবাব ছাড়িয়া দিয়া যদি দুর্গা ঠাকরুণকে নামাইয়া আনা যায়, তবে দুর্গা প্রতিমার সে মহিমান্বিত রূপ আর থাকে কি? সেইরূপ যাঁহারা কীর্ত্তন বুঝিতে চাহিবেন তাঁহারা ভাল কীর্ত্তনিয়ার মুখে আসরে আসিয়া একবার কীর্ত্তন শুনুন। দেখিবেন খণ্ডিতার কলুষ কাটিয়া গিয়াছে, বিপ্রলব্ধার উদ্দাম ভাব আর নাই—কলহান্তরিতার মান—এ সমস্তই অনাবিল, অপাপবিদ্ধ। যে সম্ভোগ-মিলন শুধু পুস্তকে পড়িলে বিদ্যাসুন্দরী তোটকের মতই শুনাইবে—আসরে ভাই-ভগিনী, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে একত্র বসিয়া শুনিয়া বুঝিবেন—সম্ভোগ-মিলনে ভোগের লেশ নাই—যে ভোগ আছে তাহা দেবভোগ। অধিকাংশ বৈষ্ণবপদই চৈতন্যের চরিত্র স্মরণ করিয়া লেখা হইয়াছে, তাহা পার্থিব মোড়কে আঁটা একখানি স্বর্গের চিঠি। কীর্ত্তনীয়া সেই পৃথিবীর মোড়কটি ভাঙ্গিয়া যে সংবাদটি দিবেন, তাহা স্বর্গের। এজন্য প্রথমেই "তৎকালোচিত গৌরচন্দ্রিকা" দিয়া গান সুরু হইয়া থাকে। অর্থাৎ পূর্ব্বরাগ, মান, মাথুর প্রভৃতি যে বিষয়ই লইয়া গান হইবে, তাহার পূর্ব্বে চৈতন্যদেবের তদ্রূপ অবস্থাসূচক একটি গান গাহিয়া নেওয়া হয়—ইহাই 'গৌরচন্দ্রিকা।'

পার্থিব মোড়কে আঁটা স্বর্গের চিঠি।

যেমন ধরুন, পূর্ব্বরাগের পদ গাওয়া হইবে, তাহার পূর্ব্বে রাধামোহন ঠাকুরের গৌরাঙ্গলীলার এই পদটি গাওয়া হইল, "আজু হাম কি পেখিলু নবদ্বীপচন্দ্র। করতলে করই বয়ান অবলম্ব। পুনঃ পুনঃ গতাগতি করু ঘর পথ। ক্ষণে ক্ষণে ফুলবনে চলই একান্ত। ছল ছল নয়নে কমল সুবিলাস। নব নব ভাব করত পরকাশ। পুলক মুকুল-বর ভরু সব দেহ। রাধামোহন কছু না পাওল থেহ" (পদকল্পতরু, প্রথম অং, ৬৪ পদ)।

গৌরচন্দ্রিকা।

খুব জোরে মৃদঙ্গ বাজাইয়া খোল-করতালের সুরে, তাণ্ডব নৃত্যে দূর দূরান্তরের পল্লীগুলিকে যেন আসরে আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়া গায়কেরা এই "গৌরচন্দ্রিকা" (গৌরবিষয়ক গান বা মুখবন্ধ) গাহিল। এই ডঙ্কানিনাদ ও

চীৎকারের মধ্যে বড় একটা পটে চৈতন্যদেবের ভুবনপূজ্য মূর্ত্তিখানি আঁকা হইল—তাহা প্রথম অনুরাগের। তিনি করতলে বদন অবলম্বন করিয়া কি ভাবে বিভোর হইয়া ধ্যান করিতেছেন? হঠাৎ উঠিয়া একবার বাহিরে একবার ঘরে যাতায়াত করিতেছেন। কখনও বা ফুলবনের দিকে চাহিয়া প্রফুল্ল ফুলদাম দেখিয়া কাহাকে মনে পড়াতে তাঁহার পদ্মচক্ষু বারংবার সজল হইতেছে এবং কি এক আনন্দে শরীর পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে—রাধামোহন তাঁহার এই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল ভাবগুলির তাৎপর্য্য ঠিক ধরিতে পারিতেছেন না। চৈতন্যের এই মূর্ত্তি প্রথমে পটে আঁকা হইল, তাহা শ্রোতার মনে মুদ্রিত করিয়া—রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের অবতারণা করা হইবে। এইভাবে মহাপ্রভুর লীলার ভিত্তির উপর রাধাকৃষ্ণের লীলা দাঁড় করান হইল। চৈতন্যলীলার এই গানের পরেই পূর্ব্বরাগ। প্রথম গানটি হয়ত চণ্ডীদাসের "ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার, তিল তিল আসে যায়। মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদম্ব-কাননে চায়। রাই এমন কেনই বা হৈল? গুরু দুরুজন ভয় নাই মনে কোথা বা কি দেব পাইল। সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল সম্বরণ নাহি করে। বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, ভূষণ খসিয়া পড়ে।" এই গান কীর্ত্তনীয়া "আখর" দিয়া আসরে বুঝাইয়া যান। শ্রোতার মনের তার যাহাতে সর্ব্বোচ্চ গ্রামে আঁটা থাকিতে পারে, ভূতলের পঙ্কে নামিয়া না পড়ে—এই জন্য কীর্ত্তনীয়া 'গৌরচন্দ্রিকা'র সঙ্গে সুর মিশাইয়া ভাবের পবিত্রতা বজায় রাখেন, "কোথাবা কি দেব পাইল।" গাহিয়া কোন্ দেবতা রাধিকাকে পাইয়াছে—তাহার আধ্যাত্মিক সন্ধান অঙ্গুলীসঙ্কেতে প্রদান করেন। আগাগোড়া "আখর" দিয়া গায়ক কীর্ত্তন গানের মহিমা অব্যাহত রাখেন। এমন কি খণ্ডিতার মত ভাবদুষ্ট গান আমি কীর্ত্তনীয়ার মুখে রাম্ভিকাগণের সঙ্গে বসিয়া শুনিয়াছি; কীর্ত্তনীয়া এমনই উচ্চগ্রামে শ্রোতার মনকে লইয়া গিয়াছেন যাহাতে কোন দোষের কথা দূরে থাকুক, অনাবিল শুভ্র পবিত্রতায় চিত্ত ভরপূর হইয়া গিয়াছে। ভাল গায়ক না হইলে "আখর" দিতে পারে না, অল্পদরের কীর্ত্তনীয়া "আখর" দিতে চেষ্টা করিলে কীর্ত্তন মাটী হইয়া যায়, আসর ভাঙ্গিয়া যায়। সুকণ্ঠ বা সুগায়ক হইলেই যে কীর্ত্তন জমিবে তাহা নহে, কীর্ত্তনীয়া ভগবৎ-রসের রসিক হওয়া চাই, শুধু তাহাই নহে, শ্রোতা-দিগেরও আসরে একটা বিশেষ মনোবৃত্তি লইয়া বসিতে হইবে। কিরূপে যে নিতান্ত পার্থিব বিষয়গুলি স্বর্গের উপাদানে পরিণত করা হয় তাহা কতকটা আশ্চর্য্য। অভিসার গানে রাধিকা গোপনে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইতে যাইতেছেন। জয়দেব ঠাকুর রাধিকাকে উপদেশ দিতেছেন—"মুখর মঞ্জীর ত্যাগ কর, নীলশাড়ী পর।" যেহেতু পথে নূপুরের শব্দ হইতে পারে,—অন্য রঙ্গের শাড়ী আঁধারেও দেখা যাইতে পারে। যথাসাধ্য গোপন রাখার ব্যবস্থা,—ইহাই ত অভিসারের কথা। আলঙ্কারিকেরা ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু পরবর্ত্তী কবিরা রূপাভিসার বলিতে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে গৌরের যাত্রা, অর্থাৎ তাঁহার সংকীর্ত্তনের অভিযান বুঝিতেন। তাঁহারা রাধিকাকে সাজাইয়া বাহির করিতেছেন। যিনি রূপেশ্বরের নিকট রূপের সন্ধানে যাইতেছেন, তাঁহার মত রূপ কাহার? তাঁহার "পিঠে দোলে

হেমচাঁপা, রঙ্গিয়া পাটের থোপা",—"ভালে সে তরুণ ইন্দু, মলয়জ বিন্দু বিন্দু, তদুপরি কস্তুরি তিলক", তাঁহার গতি "অতি মন্দাবলী", তিনি সখীর স্কন্ধ অবলম্বন করিয়া যাইতেছেন। "কুন্তলে বকুলমালা গুঞ্জরে ভ্রমরী।" রাজনন্দিনীর দ্রুত হাঁটিবার অভ্যাস নাই, "রাই যাইতে যাইতে পুছে, কেলিকুঞ্জবন, কদম্বকানন, আর কতদূরে আছে?" এইভাবে রাধিকা যাইতেছেন—ইনি জয়দেবের অভিসারিকা নহেন, ইনি সগর্ব্বে বলিয়াছেন—"কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সবলোকে, তাহাতে নাহিক দুখ, তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ।" ইনি কুল শীল জাতি সমস্ত 'কৃষ্ণায় নমঃ' বলিয়া তাঁহার পদে সমর্পণ করিয়াছেন, ইনি বলিয়াছেন "ননদিনী বল্ গিয়ে নগরে, ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী, কৃষ্ণপ্রেম-কলঙ্ক-সাগরে।" কানে কানে কথা বলিয়া চাপা সুরে নিন্দা প্রচার করিবার দরকার নাই। (বল্ গিয়ে নগরে—অর্থাৎ ঢাক বাজাইয়া প্রচার কর্ আমি নিখিলভয়হরণের পায়ে শরণ লইয়াছি—আজ আমি নির্ভয়।) কবি অনন্তদাস মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন বা অভিসারযাত্রা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি সুন্দরী রাধিকাকে সাজাইয়া বাহির করিলেন এবং লিখিলেন—"কঙ্কণ রণরণি, মঞ্জীরঝনঝনি, চলইতে সুমধুর বাজে। চৌদিকে রমণী সাজে, ডম্ফ রবাব বাজে;" শুধু কঙ্কণের রুণু রুণু বা কিঙ্কিণীর সুমধুর ধ্বনি নহে, উচ্চৈঃস্বরে মধ্যে মধ্যে ভেঁপু বাজিয়া উঠিতেছে—ডম্ফ ও রবাবের শব্দ শুনিয়া অভিসারিকাকে দেখিবার জন্য গ্রামপথে ভিড় জমিয়া গিয়াছে। (ইহা অভিসারের নামে সংকীর্ত্তন। চৈতন্যদেব যে এই রাধাকৃষ্ণ-লীলা গানের প্রাণ, তাহা কি এখনও বলিতে হইবে? অথচ এই সকল গানের আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতগুলি কবিদিগের অপূর্ব্ব কবিত্বের হানিকর হয় নাই। এই পদটিতেই আছে, রাধিকা চলিতেছেন, তাঁহার পায়ের আলতার ছোপ মাটিতে পড়িয়া রাঙ্গা দাগ রাখিয়া যাইতেছে। তাঁহার অঙ্গ-গন্ধে ভ্রমরেরা অন্ধের মত তাঁহার পায়ে পায়ে চলিতেছে এবং যেখানে যেখানে তাঁহার রাঙ্গাচরণচিহ্ন পড়িয়াছে, তাহাই পদ্ম বলিয়া ভ্রম করিয়া চুম্বন করিতেছে—"চলইতে চরণের—সঙ্গে চলে মধুকর—মকরন্দ পান কি লোভে। সৌরভে উনমত, ধরণী চুম্বয়ে কত, যাহা যাহা পদচিহ্ন শোভে।")

সন্ন্যাসের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

শ্রীকৃষ্ণের পায়ে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণই এই শিক্ষা, ইহা অতি কঠিন। মধুময় জীবনে অভ্যস্ত, চিরদেহে পালিত তরুণকে তপস্যার ব্রত করিতে হইবে। রাধিকা বলিতেছেন—"নিজের আঙ্গিনায় কাঁটা পুঁতিয়া—কলসী কলসী জল ঢালিয়া তাহা পিছল করিয়াছি। তদুপরি রাত্রি জাগিয়া আঙ্গুল চাপিয়া যাতায়াত করিয়াছি—যেহেতু "আমার যেতে যে হবে গো, রাই বাঁশী বাজিলে বাঁশী, বঁধুর লাগি পিছল পথে" অন্ধকারে বন-জঙ্গলে ঘুরিতে হইবে এজন্য "করযুগে যদি চক্ষু ঝাঁপিনি, তিমির পয়ান কি লাগে।" তিমিরে প্রয়াণ করিবার আশায় আঙ্গিনী হাতের দ্বারা চক্ষু চাপিয়া রাখিয়া যাতায়াত করা শিখিতেছেন। আর পথে পথে ভয়ঙ্কর বিষাক্ত সাপ, এজন্য "মণিকঙ্কণপণ, ফণিমুখবন্ধন, শিখয়ে ভুজগ-গুরু পাশে।" মণিবিনিময়ে, কঙ্কণপণ (পুরস্কার) দিয়া, সিদ্ধ 'ভুজগ-গুরু' (সাপের ওঝার) নিকট ফণি-

দস্যু কর্ত্তৃক রমণী-হরণ, ২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র (পুথির মলাট) হইতে, বাঁকুড়া।
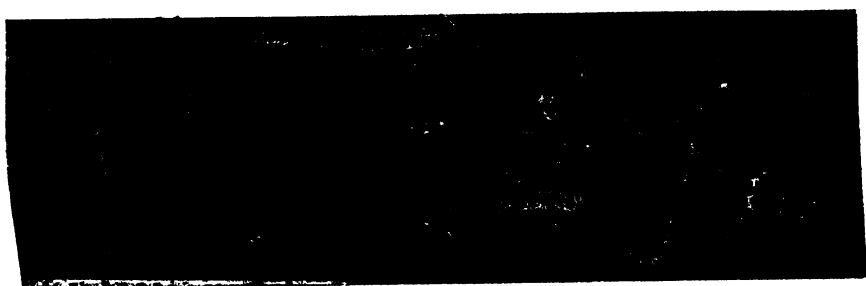
রাইমানিনী, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ, বর্দ্ধমান। বীণাবাদিনীর ছদ্মবেশে কৃষ্ণ।
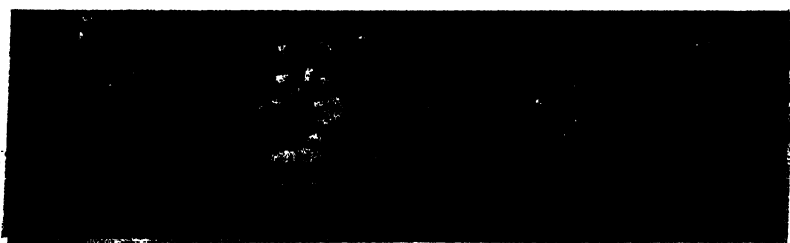
হাজারমুখো রথে কৃষ্ণের মথুরা-যাত্রা। বাঙ্গালীর সমুদ্রযাত্রা এক সময়ে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল, রথও তাহারা নৌকার ছন্দে নির্ম্মাণ করিত। সপ্তদশ শতাব্দী, বীরভূম।

রাধাকৃষ্ণ ও গোপীগণ, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ, ২৪শ-পরগনা।

কৃষ্ণের মথুরা-যাত্রা, বাঁকুড়া, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ।
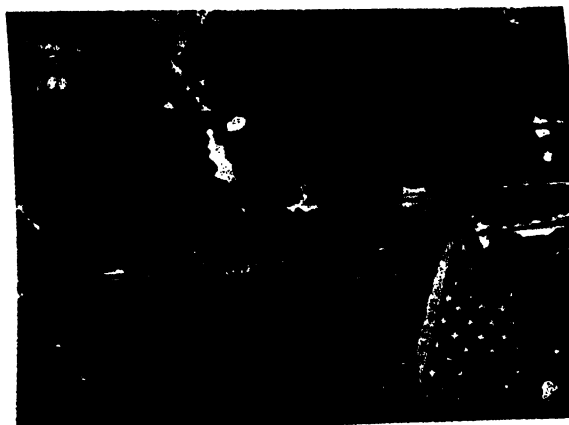
চারটি গোপী, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ, বাঁকুড়া। পোষাক-পরিচ্ছদ, অজন্তার ধরণে।

মুখবন্ধন, (সাপের মুখ কি উপায়ে বন্ধ করা যায়) তাহা শিখিয়াছি। সন্ন্যাস-গ্রহণকালে গুরুজনের গঞ্জনা শুনিতে হইবে—পরিজনেরা বাধা দিয়া উপদেশ দিবেন—তজ্জন্ত এখন হইতেই প্রস্তুত হইতেছেন, "গুরুজন বচন বধির সম মানই আন শুনই কহ আন। পরিজন বচনে মুগধি সম হাসই গোবিন্দ দাস পরমাণ।" গুরুজনের কথা শুনিলে বধির হওয়ার ভান করেন—এক কথা শুনিয়া আর কথার উত্তর দেন। পরিজনের কথা শুনিলে মুগ্ধার (পাগলের) ন্যায় হাসেন—গোবিন্দ দাস ইহার সাক্ষী। বর্ষার অভিসারের গোবিন্দদাসের কি বর্ণনা! শব্দের ললিত ঝঙ্কার ও ভাবের গুরুত্বে তাহাদের তুলনা নাই। পঙ্কিল বাট (কর্দ্দমাক্ত পথ), মন্দির-বাহিরে কঠিন কপাট, তাহার উপর দুরন্তর আকাশ বাহিয়া বাদলের ধারা আসিতেছে, হে সুন্দরি, তোমার একখানি নীল শাড়ীর আঁচল দিয়া কি এই দুর্য্যোগ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে? আবার পরক্ষণেই বিদ্যুৎ যেরূপ এক মুহূর্ত্ত চমক দিয়া মর্ত্ত্যবাসীকে স্বর্গ দেখাইয়া দেয়, সেইরূপ একটি মাত্র পূর্ণ সঙ্কেতে কবি আধ্যাত্মিক রাজ্যের ইঙ্গিত দিয়াছেন "হরিরহ মানস সুরধুনী পার। সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার?" কি ভাবে এই দুর্য্যোগে অভিসারে যাইবে, হরি মন-গঙ্গার অপর পারে—ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে। এই যে সৌন্দর্য্য, এই যে দুশ্চর তপস্যার কথা—এ সমস্তেরই প্রেরণা দিয়াছিলেন চৈতন্যদেব। তাঁহার জীবনের অলৌকিক প্রেমের লীলা, অশ্রুর একটি সুরধুনীর ন্যায়, কিন্তু সে বেগশালী স্রোত দুশ্চর তপস্যার শৈলভেদ করিয়া আসিয়াছিল। তাঁহার জীবনের কৃচ্ছ্র ঢাকা পড়িয়াছিল, তাঁহার দুইটি বিকশিত—শতদলপ্রভ সজল চক্ষুর অন্তরালে; লোকে তাহাই দেখিয়া ভুলিয়াছে। কিন্তু শতদলের নীচে ভুজঙ্গশয্যা-পঙ্কের ভিত, তাহা কে দেখিয়াছে? কত উপবাস, কত অনিদ্রা, কত দুর্গম ভ্রমণ, কত বিপদ্—সেগুলি তাঁহার জীবনে রসের উৎস ও প্রফুল্লতার হানি করিতে পারে নাই।

প্রেমের সাগর-সঙ্গম।

(এই পদাবলী ও কীর্ত্তন-সাহিত্য একটি খরস্রোতা নদীর ন্যায় ছুটিয়াছে। ইহার দুইকূলে কত উপবন, কত লোকালয়, কত মধুর প্রাকৃতিক দৃশ্য,—কিন্তু ইহা যেখানে যাইয়া পড়িয়াছে—সেখানে আর কলরব নাই, তরঙ্গের তান নাই—সে নিশ্চল প্রশান্ত চিররহস্যময় মহাসমুদ্র। ইহার প্রত্যেক তরঙ্গ সেই আধ্যাত্মিক অভিযানের ইঙ্গিত দিয়া ছুটিয়াছে—ইহাতে যদি কিছু মলিনতা থাকে, তাহা ইহার চির-অমল প্রেমের উৎসের ঘূর্ণপাকে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—তাহার ঠিকানা নাই।) বিদ্যাপতির রাধা বলিয়াছিলেন, কৃষ্ণ, আমি তোমাকে আমার সর্ব্বস্ব দিয়াছি। তোমাকে ভিন্ন আমি মুহূর্ত্ত বাঁচিতে পারি না। কত উপমায় কত সুন্দর সুন্দর কথায় এই আত্মসমর্পণের কথা বলিয়া শেষে কবি বলিয়াছেন "মাধব তুহু কৈছে কহবি মোয়"—আমি সর্ব্বস্ব দিয়াছি সত্য, কিন্তু কাহাকে দিয়াছি তাহা জানি না। তুমি কেমন তাহা আমাকে বল। সাধনার এই দুশ্চর তপস্যার পর একি প্রশ্ন? ব্রহ্মের স্বরূপ-জিজ্ঞাসা। বিদ্যাপতির ভাব-[illegible] পদে কৃষ্ণ আর দেহী নহেন, তিনি চিন্ময়, রাধিকা তাঁহাকে

মঙ্গলাচরণ করিয়া আনিতেছেন। সেই মঙ্গল-উপচারও সমস্ত মনের, বাহিরের উপকরণ তাহাতে কিছুই নাই।

"পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে,
মঙ্গল আচার করব নিজ দেহে,
বেদী করব হাম আপন অঙ্গমে,
ঝাড়ু করব হাম চিকুর বিছানে,
আলিপন দেওব মোতিম-হার
মঙ্গল-কলস করব কুচভার।"

যখন তিনি আসিবেন, তখন আমার দেহ দিয়াই সমস্ত মঙ্গল-আচরণ করিব। আমার অঙ্গই বেদী হইবে এবং আমর সুদীর্ঘ কুন্তলের দ্বারা ঝাঁটা তৈরী করিয়া তাহা পরিষ্কার করিব। আমার বক্ষের লম্বিত মণিমালা আলিপনার কার্য্য করিবে এবং আমার পীনবক্ষ মঙ্গল-কলসী স্বরূপ হইবে।

মনুষ্যদেহই ভগবৎ-মন্দির। ইহাই এই পদের অর্থ। সুতরাং চৈতন্তের জীবন-চ্ছটায় এই পদাবলীর অর্থ ফুটিয়াছে এবং তাঁহার প্রসাদে সমস্ত বাঙ্গলার জনসাধারণ এই পদাবলীর আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার যোগ্য হইয়াছে।

এখন আমরা তাঁহার জীবন ও কার্য্যাবলীর সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া যাইব। ৮।১০ বৎসর হইল গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যেন বঙ্গীয় নিকুঞ্জবনের শত শত কোকিলকণ্ঠ থামিয়া গিয়াছে। তাঁহার গোষ্ঠ ও মাথুর যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তম্বুর ও নারদকে স্মরণ করাইত; তাঁহার ব্যাখ্যার কাছে ভাগবতের শ্রীধর স্বামীর ভাষ্য ম্লান হইত। এই অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোকটির ভিতরে দেবী ভারতী যে প্রেরণা দিয়াছিলেন, তাহাতে গৌরীদাসের কণ্ঠে যেন দেবীর বীণাই বাজিতে থাকিত। পৃথিবীতে থাকিয়া তিনি স্বর্গের সংবাদ দিয়া গিয়াছেন, কোন ধর্ম্ম-মন্দির বা বেদী হইতে সেরূপ সংবাদ আমরা শুনি নাই। আজ গৌরীদাস নাই, তাঁহার অগ্রজ আসর-বিজয়ী রসিক নাই, আজ শিবুও পরলোকগত, এখন গণেশ সাঁঝের বাতি জ্বালাইয়া রাখিয়াছে, কিন্তু উক্ত কীর্ত্তনীয়াদের কূলপ্লাবী ভক্তিবন্যার আসর যদিও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তথাপি নূতনভাবে ভাবিত, নবমন্ত্রে দীক্ষিত খগেন্দ্রনাথ ও অপর্ণা দেবী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য যে আসর বাঁধিতেছেন তাহা কালে দুর্জ্জয় হইবে বলিয়া মনে হয়।

পদাবলীর অশ্লীলতা-সম্বন্ধে যাঁহারা বিদ্রূপ করেন, তাঁহারা গঙ্গার একগ্লাস ঘোলা জল দেখিয়া বিরক্ত হইয়া থাকেন, পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর বিশ্ববন্দিত প্রবাহের শুভ্রতা ও পবিত্রতা অনুমান করিবার শক্তি তাঁহাদের নাই।
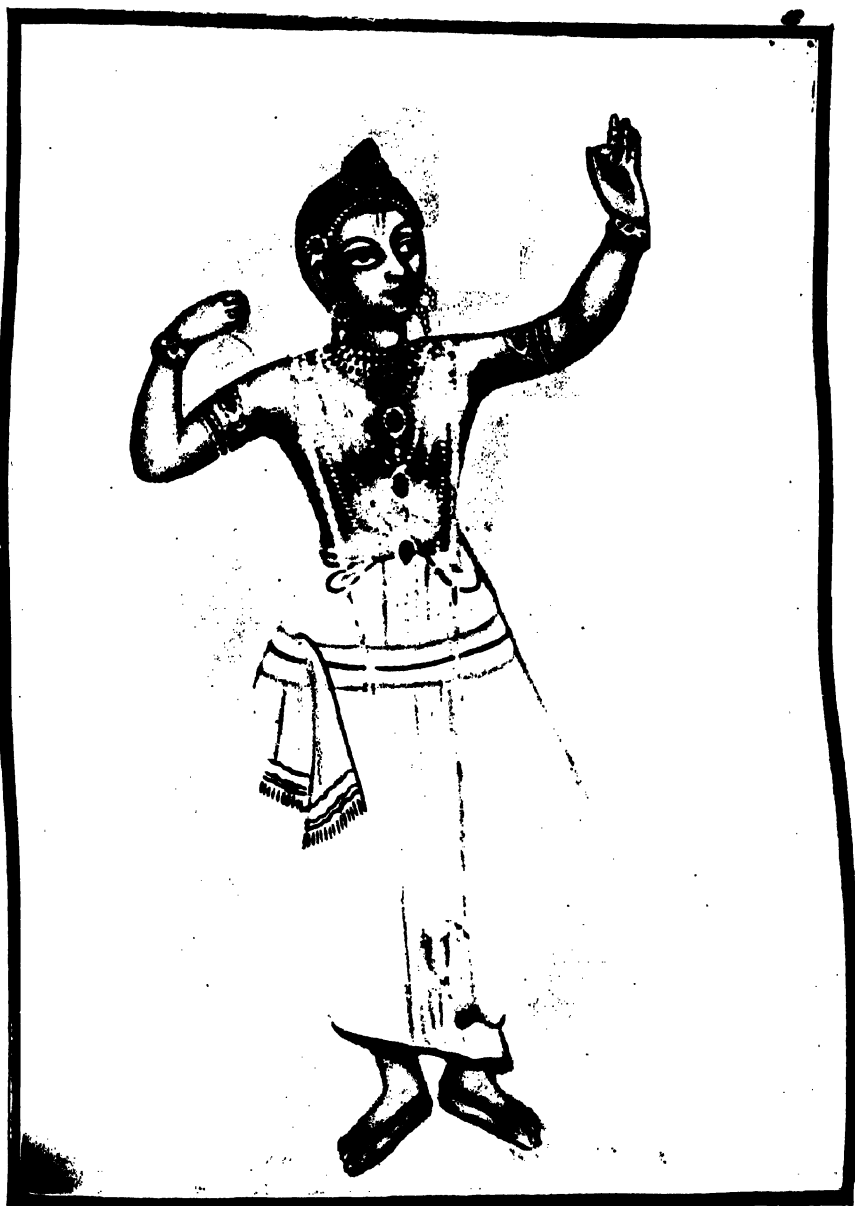
চৈতন্য, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অঙ্কিত রঞ্জিত চিত্রপট হইতে, (২৪শ পরগণা)।
মূল ছবি কলিকাতার বলাইলাল মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীর।

চৈতন্য, আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বের রঞ্জিত চিত্রপট হইতে মৎসংগৃহীত (২৪শ পরগণা)।

মহাপ্রভু, প্রতাপরুদ্র ও রঘুনাথ পণ্ডিত। মুর্সিদাবাদ কুঞ্জঘাটার মহারাজ নন্দকুমারের গৃহের চিত্র। ছবি মহাপ্রভুর সমসাময়িক বলিয়া কথিত।
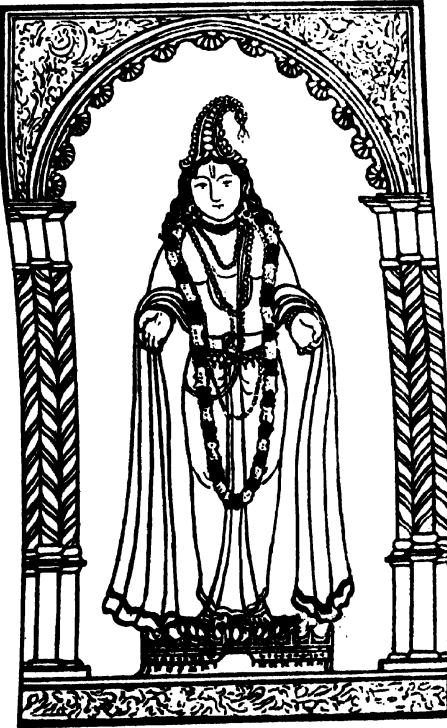
মহাপ্রভু, নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ দারু-মূর্ত্তির ছবি। ইহা ঠিক মূলের অনুরূপ হয় নাই। কথিত আছে, ঐ মূল মূর্ত্তি চৈতন্য প্রভুর সময়ের।
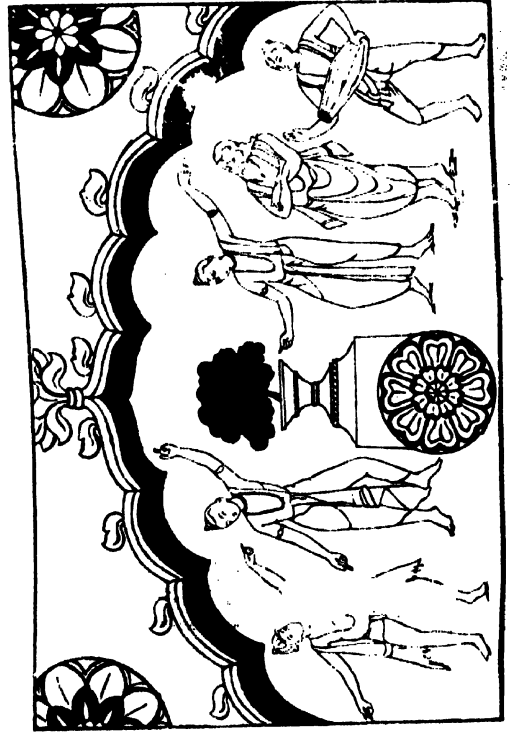
বহড় গ্রামের (২৪শ পরগণা) রায় সাহেব দেবেন্দ্র বসুর মন্দির গাত্রের ছবি, দুর্গারাম ভাস্কর কর্ত্তৃক ১৮১৫ খৃঃ অব্দে অঙ্কিত। চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাস ও শ্রীবাস

চৈতন্য ও রাজা প্রতাপরুদ্র, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লিখিত পুঁথির কাঠের মলাটে অঙ্কিত ছবি (বীরভূম হইতে মৎ সংগৃহীত), [illegible] পৃঃ।

হরিদাস ও অদ্বৈত, ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে বাগবাজারের পটুয়া অঙ্কিত এবং মৎসংগৃহীত, ৭১০ পৃঃ।
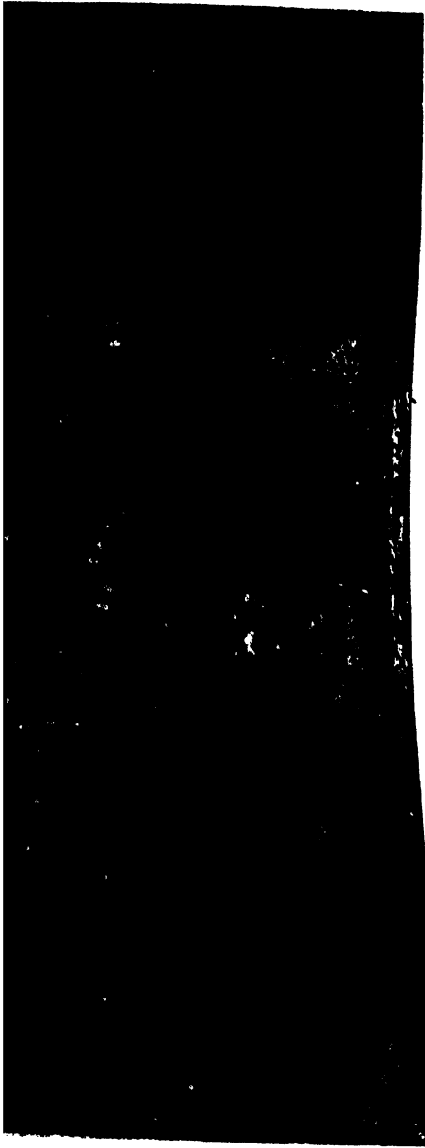
হরিদাস, ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত বনবিষ্ণুপুরের পুঁথির কাঠের মলাটের ছবি হইতে গৃহীত, মৎসংগৃহীত, ৭১৪ পৃঃ।

ষড়্‌ভুজ গৌরাঙ্গ—বহরু গ্রামের (২৪শ পরগণা) রায় সাহেব নরেন্দ্র বসুর মন্দির গাত্রের ছবি, দুর্গারাম ভাস্কর কর্তৃক ৮১৫ খৃঃ অব্দে অঙ্কিত।

অদ্বৈত, সপ্তদশ শতাব্দীর ছবি হইতে গৃহীত। (২৪শ পরগণা।)

নিত্যানন্দ, ২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র (২৪শ পরগণায়) হইতে মৎকর্তৃক সংগৃহীত।

অদ্বৈত, যুবাবস্থা—২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র (২৪শ পরগণা) হইতে মৎকর্তৃক সংগৃহীত।

হরিদাস—সপ্তদশ শতাব্দীর ছবি হইতে গৃহীত। (২৪শ পরগণা)।

রূপ গোস্বামী—২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে মৎকর্তৃক সংগৃহীত (২৪শ পরগণা), ১১৭ পৃঃ।

গদাধর—২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে মৎ কর্তৃক সংগৃহীত (২৪শ পরগণা, ৭০৩ পৃঃ)।
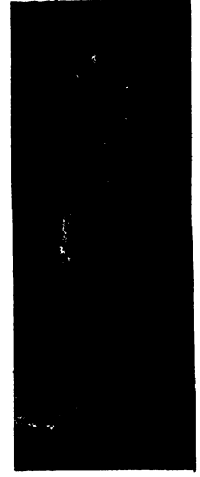
রায় রামানন্দ ২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে মৎকর্তৃক সংগৃহীত। (২৪শ পরগণা ৭২৫ পৃঃ)।
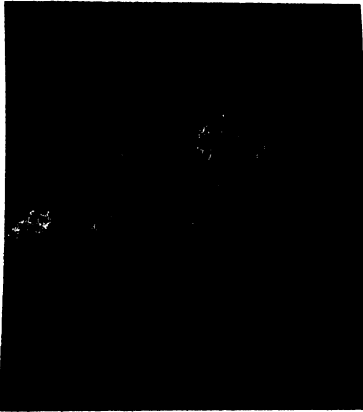
শ্রীগোবিন্দ—২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে মৎ-কর্তৃক সংগৃহীত। (২৪শ পরগণা)

সনাতন—২৫০ বৎসরের প্রাচীন, চিত্র হইতে মৎকর্তৃক সংগৃহীত (২৪শ পরগণা, ৭১৭-১৮ পৃঃ)।

রাজা প্রতাপ রুদ্র ২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে মৎকর্তৃক সংগৃহীত (২৪শ পরগণা, ৭৩৪ পৃঃ)।

জীব গোস্বামী—২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে মৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত, (২৪শ পরগণা ৭৫২ পৃঃ।)

রঘুনাথ দাস—২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে মৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত (২৪শ পরগণা ৭৪৭-৫২ পৃঃ।)

গোপাল ভট্ট—২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে মৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত (২৪ পরগণা, ৭৪৭ পৃঃ।)

রঘুনাথ ভট্ট—২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে মৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত (২৪শ পরগণা)।

স্বরূপ দামোদর ২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে মৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত (২৪শ পরগণা)।

শ্রীজগদানন্দ—২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে মৎকর্তৃক সংগৃহীত (২৪শ পরগণা) ৭৩৪ পৃঃ।

গদাধর পণ্ডিত, সপ্তদশ শতাব্দীর ২৪শ পরগণার চিত্র হইতে ৭০২ পৃঃ।

শুক্লাম্বর—সপ্তদশ শতাব্দীর রঞ্জিত চিত্র হইতে (২৪শ পরগণা) ৭০৪ পৃঃ।

উদ্ধারণ দত্ত,—২।৩ শত বৎসর পূর্ব্বের ভগ্ন কাষ্ঠ-মূর্ত্তি হইতে মৎসংগৃহীত ৭৩৬ পৃঃ।

শ্রীবাস, ২৫০ বৎসরের প্রাচীন চিত্র হইতে ৭১২ পৃঃ।

রামচন্দ্র কবিরাজ। পুথির রঞ্জিত মলাট, সপ্তদশ শতাব্দী ৭৬০ পৃঃ।

মূর্চ্ছাপন্ন শ্রীনিবাস ও কবিরাজ। পুথির রঞ্জিত মলাট, সপ্তদশ শতাব্দী ৭৪৭ পৃঃ।

হে বজ্র। ভূমিকা ৩,—৩/০।

বীর হাম্বীর। [illegible] ৩ বোধ) ২৫০ বৎসরের প্রাচীন পুঁ প[illegible] ট হইতে। ৭৪০-৬০ পৃঃ।

হরিদাসের আশ্রম, পুরী। ইতিহাস প্রসিদ্ধ বকুল গাছ, ৫০০ বৎসরের
উর্দ্ধকালের গাছ, মূল কাণ্ডটি নাই, গাছটি একটি বাকলের
উপর দাঁড়াইয়া আছে। আশ্রম স্বামী দীন বলভদ্রের আনুকূল্যে।
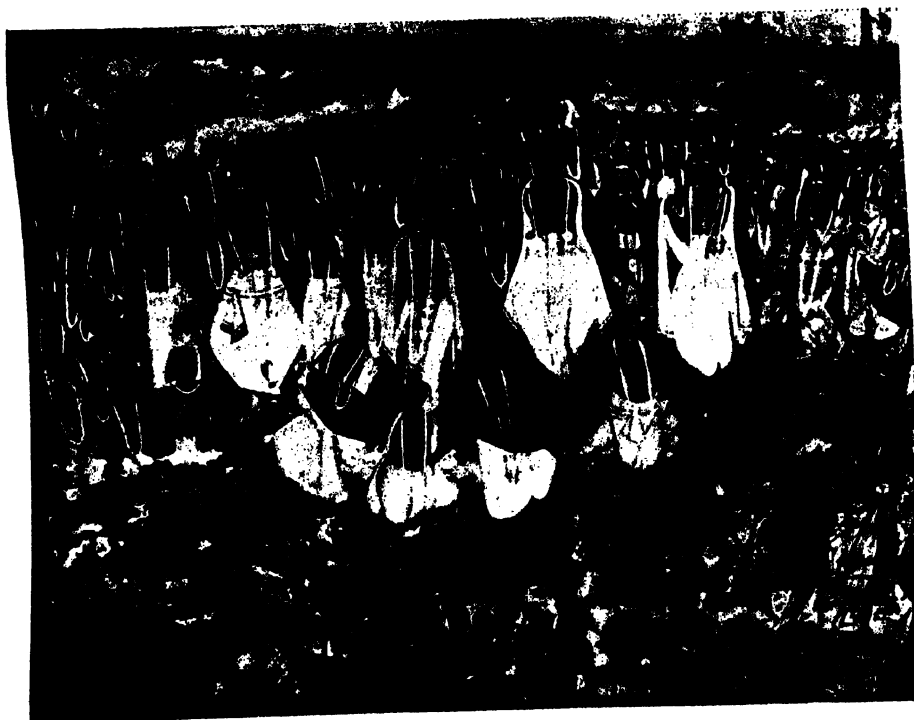
চৈতন্য-সংকীর্ত্তণ। ইহার রঞ্জিত প্রতিলিপির (৬৭৪ পৃঃ) পাদটীকা দেখুন

বাসুদেব সার্ব্বভৌম,—পুরীর বাসুদেব-বাটীর দেয়ালে অঙ্কিত সুপ্রাচীন ছবি হইতে ৭২৬ পৃঃ।

মহারাজা প্রতাপরুদ্র। ৭৩৪ পৃঃ।

ন আচার্য্য—সপ্তদশ শতাব্দীর চিত্র হইতে।

শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ। বনবিষ্ণুপুরের রাধাশ্যাম মন্দির গাত্রে পোড়া ইটের উপর অঙ্কিত চিত্র। (১৭৫৮ খৃঃ) ৭৪৭-৬৯ পৃঃ।
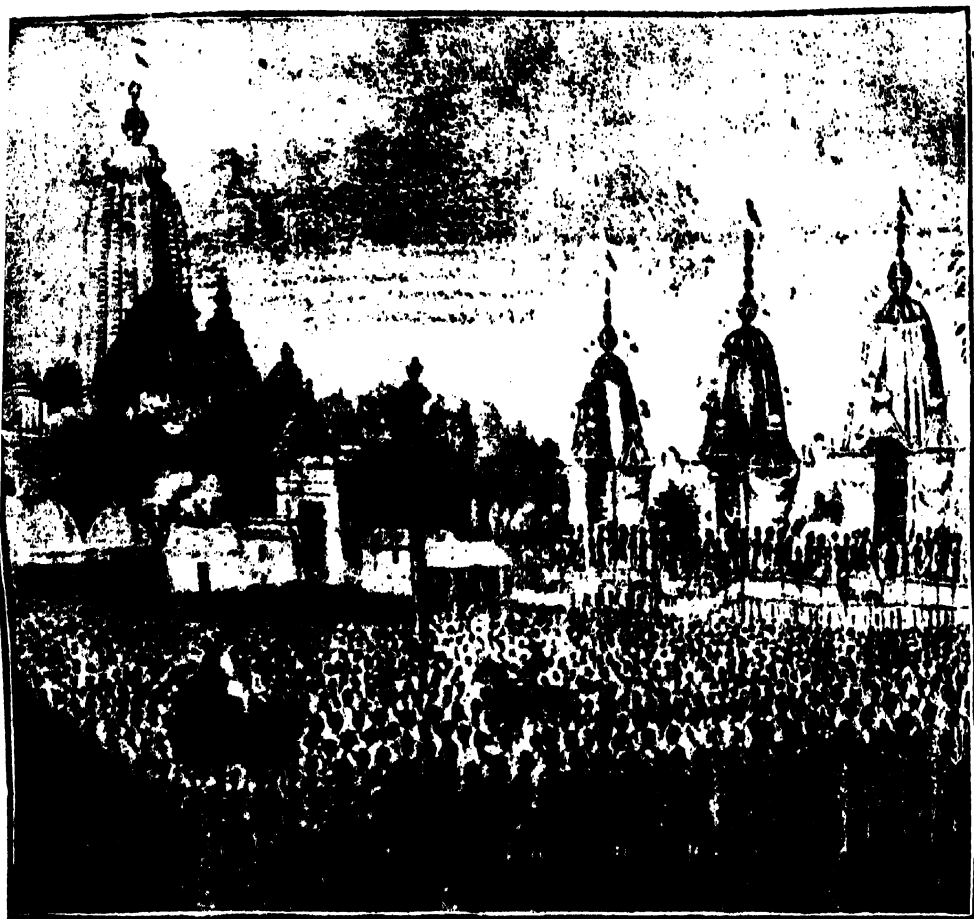
এক শত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার রথের মিছিল (সাময়িক পত্রিকা হইতে) 'আনন্দবাজার' হইতে প্রাপ্ত

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গৌরাঙ্গ ও তাঁহার পরিকরবর্গ

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে হুসেন সাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া "নবদ্বীপে পুনরায় ব্রাহ্মণ রাজা হইবেন," এই ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনিয়াছিলেন। নবদ্বীপের প্রজারা ধনু চালনায় সুদক্ষ ছিল। এই প্রবল জনশ্রুতিতে আতঙ্কিত হইয়া তিনি নবদ্বীপ উৎসন্ন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। নবদ্বীপের অনতিদূরে পিরুল্যা গ্রামে শিবিরস্থাপনপূর্ব্বক মুসলমানেরা নানাবিধ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক, (জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, কালী তাঁহাকে স্বপ্নে ভীতি প্রদর্শন করেন) রাজার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তখন রাজদরবারেও সম্ভ্রান্ত ও সুপণ্ডিত সভাসদ্ ছিলেন; আর এদিকে তখন নবদ্বীপের খ্যাতি সমস্ত ভারতব্যাপী ছিল, মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রের প্রতিপত্তি-বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপের নাম ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্ররূপে পরিচিত হইয়াছিল। বোধ হয় বিদ্যোৎসাহী হুসেন সাহ তাঁহার সভার পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুরোধে এই অত্যাচার শেষে থামাইয়া দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, টুলো বামুন-পণ্ডিতেরা নিতান্ত নিরীহ, ইঁহাদিগকে নিপীড়ন করা ভাল নহে। চৈতন্যমঙ্গলে লিখিত আছে, হুসেন সাহ অনুতপ্ত হইয়া নবদ্বীপের ভগ্ন দেবালয়গুলির পুনঃসংস্কারের আদেশ প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন। এই শুভ সংবাদে নবদ্বীপত্যাগী বহু ব্রাহ্মণ আবার স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। যখন দেশের অবস্থা এইরূপ, তখন চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

চৈতন্যের পূর্ব্বে দেশের অবস্থা।

চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষ মধুকর মিশ্র উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্রদেবের অত্যাচারে যাজপুর হইতে পলাইয়া শ্রীহট্টে বাস করেন। কপিলেন্দ্রদেবের উপাধি ছিল "ভ্রমরবর," মধুকর মিশ্রের পিতার নাম বিশুদ্ধ মিশ্র—ইঁহারা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ—বাৎস্যায়নগোত্রীয়। মধুকরের ৪ পুত্র:—উপেন্দ্র, রজদানাথ, কীর্ত্তিদানাথ, কৃত্তিবাস। উপেন্দ্র মিশ্রের স্ত্রীর নাম কমলাবতী, তাঁহাদের ৭ পুত্র—কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্ব্বেশ্বর, জগন্নাথ, জনার্দ্দন, ত্রৈলোক্যনাথ। জগন্নাথ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করেন।

বংশাবলী।

যখন জগন্নাথ মিশ্র তরুণবয়স্ক, তখন শ্রীহট্টে দুর্ভিক্ষ ও ঘোর অরাজকতা ঘটিয়াছিল। জগন্নাথ নবদ্বীপে শিক্ষাসমাপ্তির জন্য আসিয়াছিলেন, সেইখানেই রহিয়া গেলেন, আর ঢাকা-দক্ষিণেই এই পরিবার বংশপরম্পরায় বাস করিয়াছেন। শ্রীহট্টের আর একটি পল্লীও এইরূপ দাবী উত্থাপন করিয়াছেন—কিন্তু তাহা গ্রাহ্য বলিয়া মনে হয় না। যাঁহারা শ্রীহট্ট হইতে এই বিপৎকালে নবদ্বীপে পলাইয়া আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী (অপর একজন বৈদিক) ছিলেন। তিনি নবদ্বীপের বেলপুকুরিয়া গ্রামে বাসস্থাপন করেন।

জগন্নাথ মিশ্র বল্লাল রাজার বাড়ীর নিকট বাস করিয়াছিলেন—ইহা তখন নবদ্বীপের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত ছিল, এবং এই স্থানটি সম্ভবতঃ নগরের শ্রেষ্ঠ স্থান ছিল। মুসলমানেরা এই স্থান অধিকার করার পর এই স্থানের নাম দিয়াছিল "মেঞাপুর," কারণ অনেক মুসলমান এখানে বাস করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর জন্মস্থানটিকে মুসলমানী নামে অভিহিত করিতে ভক্তচরিতকারেরা স্বভাবতঃই কুণ্ঠাবোধ করিতেন। সুতরাং বৃন্দাবন দাস, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি আদি-লেখকেরা পল্লীর নাম উল্লেখ না করিয়া মহাপ্রভুর জন্মস্থান শুধু নবদ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী লেখকেরা (তন্মধ্যে ভক্তিরত্নাকর-রচয়িতা নরহরি চক্রবর্ত্তীর নাম উল্লেখযোগ্য) "মেঞাপুর" শব্দটি হিন্দুভাবাপন্ন করিয়া উহাকে "মায়াপুর" নাম দিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন মুসলমানদের দলিলপত্রে এবং চলিতকথায় মিঞাপুর বা মেঞাপুর নাম এখনও প্রচলিত দেখা যায়। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে হিন্দুরা উহাকে মায়াপুর নামে অভিহিত করিয়া আসিয়াছেন। নবদ্বীপে দ্বিতীয় মায়াপুর নাই। যেখানে বহু শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতে রামচন্দ্রের পূজা হইত এবং রামের রথোৎসব অনুষ্ঠিত হইত সেখানে বাঙ্গলার কোন প্রতাপশালী ব্যক্তি রামচন্দ্রের একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহা ঠিকই করিয়াছিলেন, যেহেতু ঐ স্থানটি রামের লীলার একটি প্রাচীন তীর্থ ছিল। সেই মন্দির এখন নদীগর্ভে কিন্তু, সেই রামচন্দ্রের মন্দির কখনই চৈতন্যমন্দির হইতে পারে না, এবং সে স্থানের নামও মায়াপুর নহে। জোর করিয়া কেহ কেহ নিজেরা উহার নাম 'মায়াপুর' দিয়াছেন।

জগন্নাথ মিশ্র সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার হাতের লেখা একখানি সংস্কৃত মহাভারতের আদিপর্ব্ব এখনও পণ্ডিত ৺ মহামহোপাধ্যায় অজিত ন্যায়রত্নের বাড়ীতে আছে, উহা ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দের লেখা। একটি বর্ণাশুদ্ধি নাই, হাতের অক্ষর মুক্তার ন্যায়। এই মহাভারতের পুঁথিখানি অতিযত্নে রাখা উচিত। আমি উহা দেখিয়াছি। এই পুঁথি লেখার ১৭ বৎসর পরে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। জগন্নাথ মিশ্রকে তাঁহার পত্নী শচীদেবী অর্থাগমের জন্য মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি দেবপূজার পৌরোহিত্য করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, "তুমি পণ্ডিত অথচ তোমার চিরদারিদ্র্য।" এই অনুযোগ দেওয়াতে জগন্নাথ বলিয়াছিলেন, "ঐ দেখ আকাশের পাখীগুলি; উহাদিগকে কে খাইতে দেয়? আমরা সত্যপথে থাকিব, তুচ্ছ অর্থের জন্য অনুচিত আগ্রহ আমার নাই।" (চৈতন্য-ভাগবত)

জগন্নাথ মিশ্র।

জগন্নাথ মিশ্রের আটটি মেয়ে হইয়াছিল, তাহারা আঁতুড়ে অথবা অপোগণ্ড বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তৎপরে বিশ্বরূপ নামক পুত্র জন্মে এবং বিশ্বরূপ জন্মিবার ১১ বৎসর পরে একদিন অতিক্রান্ত সন্ধ্যায় (১৪০৭ শকে, ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী) যখন সম্পূর্ণ গ্রাস হইতে পূর্ণচন্দ্র সবেমাত্র মুক্ত হইয়া আকাশে ঝলমল করিয়া উঠিয়াছেন, সেই শুভক্ষণে সমস্ত নবদ্বীপবাসী গঙ্গাস্নানান্তে "হরিবোল" শব্দে আকাশ মুখরিত করিতেছিলেন—ঠিক সেই সময়ে চৈতন্যদেব মায়াপুরে একটি নিমগাছের নীচে

আঁতুড়ঘরে ভূমিষ্ঠ হইলেন, এ জন্য চৈতন্যকে 'নিমাই' নাম দেওয়া হইয়াছে। পূর্ণচন্দ্র হইতেও তিনি প্রিয়দর্শন, এজন্য লোকে তাঁহাকে নবদ্বীপচন্দ্র নাম দিয়াও সুখী হন নাই, কবি গাহিয়াছেন—"চাঁদে যে কলঙ্ক আছে, ছি ছি চাঁদ কি গোরাচাঁদের কাছে।"

বিশ্বরূপ ও নিমাই উভয়েই বড় সুদর্শন ছিলেন,—বিশেষ নিমাই, যাঁহার রূপের কথা লিখিতে যাইয়া কত লেখক কবি হইয়া গিয়াছেন। বিশ্বরূপ যখন ষোড়শবর্ষবয়স্ক এবং নিমাই সবে পঞ্চমবর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন, তখন তিনি অদ্বৈতের কাছে পড়িতে যাইতেন এবং আহারের সময় হইলে কনিষ্ঠ তাঁহাকে ডাকিয়া আনিত। দুইটি ভাই হাত ধরাধরি করিয়া বাড়ী ফিরিতেন, নিমাইয়ের মুখখানি ফুল্লপদ্মের ন্যায়, তন্মধ্যে বিন্দু বিন্দু কালি, কারণ তিনি বিশ্বরূপের দোয়াত ও কলম লইয়া ঘাঁটাঘাটি করিয়াছেন, সেই কালির বিন্দুতে তাঁহার মুখ ভ্রমরবেষ্টিত শতদলের মত ঢলঢল করিত, পায়ে নূপুর বাজিত, কত মধুর কথা বলিতে বলিতে দুইটি ভাই শচীদেবীর কাছে আসিতেন। বিশ্বরূপের বিবাহ স্থির হইল—তখন তাঁহার ১৬ বর্ষ বয়স—কিন্তু বিশ্বরূপ বিবাহ করিয়া সংসারী হইবেন না, অথচ যদি প্রতিবাদ করেন তবে "জননী দুঃখ পাবে বিপরীত।" এ দিকে নহবৎ বাজিতেছিল, পুরনারীরা শুভ বিবাহের উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন এক প্রদোষে বিশ্বরূপ জ্বালাময় সংসার হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য সাঁতারিয়া গঙ্গা পার হইলেন। কোথায় গেলেন কে জানে? সে কথা এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে—এইটুকু জানা গিয়াছিল যে কোন সিদ্ধ পুরুষের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তরুণ যোগী "শঙ্করারণ্য পুরী" নাম লইয়া বনবাসী সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। শচীদেবীর অভিযোগ "অদ্বৈত আচার্য্যই তাঁহার পুত্রকে সন্ন্যাস-বুদ্ধি দিয়াছিলেন।" ইহার পরে যখন নিমাই বড় হইয়া অদ্বৈতের নিকট যাতায়াত করিতেন, শচীদেবীর তাহা ভাল লাগিত না। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "কে বলে এই বুড়র নাম অদ্বৈত, ইনি একটি দৈত্য। আমার চাঁদের মত ছেলেটাকে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া কণিকা-প্রসাদের মত এই শিশুটির কাণে আবার কি মন্ত্রণা দিতেছেন, কে জানে?" শচীদেবী অদ্বৈতকে দৈত্য নামেই অভিহিত করিতেন। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের পর জগন্নাথ মিশ্র পঞ্চবর্ষ বয়স্ক নিমাইয়ের পড়াশুনা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কারণ "এই যদি সর্ব্বশাস্ত্রে লভিবেক জ্ঞান। ছাড়িয়া সংসারসুখ করিবে প্রয়াণ॥ অতএব ইহার পড়িয়া কার্য্য নাই। মূর্খ হইয়া ঘরে মোর থাকুক নিমাই॥"

বিশ্বরূপ ও নিমাই।

কিন্তু ছেলেটি বড় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। তাঁহার পায়ে নূপুর, পরনে নীল ধুতি, মাথায় চুল বেণী করিয়া বাঁধা, তাহাতে সোণার ঝাঁপা, কটিতে কিঙ্কিণী—মূর্ত্তি অতি সুন্দর, কিন্তু কাজগুলি আদৌ সেরূপ সুন্দর নহে। সন্ধ্যাকালে বালক কোন দেবমন্দিরে ঢুকিয়া বিগ্রহের নিকটবর্ত্তী আরতির পঞ্চপ্রদীপ নিবাইয়া আসিত; কখনও কোনও ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীরে চক্ষু বুজিয়া গীতাখানি সম্মুখে রাখিয়া ধ্যান করিতেছেন, নিমাই গীতাটি লইয়া ছুটিয়া পলাইত; কোন ব্রাহ্মণ স্নানার্থ গঙ্গায়

দুরন্তপনা।

নামিয়াছেন, তাঁহার উত্তরীয় ও শিবলিঙ্গ চুরি করিত; কখনও জলে ডুবিয়া কাহারও একটা পা ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইত; কখনও কোন বালকের কাণে জল প্রবেশ করাইয়া তাহার বিপদে আনন্দ অনুভব করিত; কখনও কোন বালিকার চুলে ওকড়ার বীচি ফেলিয়া দিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার ভয় দেখাইত (তখন বালকের বয়স পঞ্চবর্ষমাত্র); অপেক্ষাকৃত কম অনিষ্টকর খেলার মধ্যে—গঙ্গার বালুচরে বকের পিছনে ছোটা কিংবা কোন বালকের উপর চড়িয়া শিব হইয়া নাচা। হয়ত কাহারও কলাবনে ঢুকিয়া নিমাই গায়ে কৃষ্ণ কম্বল দিয়া বৃষ সাজিয়াছে, তার পরে সেই কদলী চুরি করিয়া পলায়ন। এই সকল উৎপাতে নবদ্বীপের লোকদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলাতে গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ-সজ্জনেরা জগন্নাথ মিশ্রকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন; বাধ্য হইয়া কয়েকমাস পাঠ-বন্ধের পরে জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে পুনরায় টোলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

অধ্যয়ন।

নিমাই বিষ্ণুদাস, সুদর্শন এবং গঙ্গাদাস—এই তিনজন পণ্ডিতের নিকট পড়িয়াছিলেন, ইঁহাদিগের মধ্যে গঙ্গাদাস খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন। যে আগ্রহে তিনি বালকোচিত দুরন্তপনা করিতেছিলেন সেই আগ্রহে পড়িতে সুরু করিয়া দিলেন। তিনি সতীর্থদের একজনকে প্রতিপক্ষ করিয়া বিচার করিতেন এবং তাঁহাকে পরাজয় করিয়া পুনরায় তাঁহাকে তাঁহারই পূর্ব্বকার মতের পক্ষে বিচার করিতে নিযুক্ত করিতেন, এবারও তাঁহার জয় হইত। বিদ্যোৎসাহী বালক নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদিগের পথ আগলাইয়া তাঁহাদের সহিত বিচার করিতে আগ্রহান্বিত হইতেন। মুরারি গুপ্তের মত প্রাচীন পণ্ডিতকে "মুক্তির" লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে একদিন খাল করিয়া শাসাইয়া বলিয়াছিলেন, "প্রভু কহে বৈদ্য তুমি ইহা কেন পড়। লতাপাতা নিয়া গিয়া রোগ দূর কর।" তাঁহার এইরূপ রূঢ় ব্যবহারে পণ্ডিতেরা মনে মনে খুব চটিয়া থাকিতেন; তথাপি তাঁহার তরুণ সুদর্শন মূর্ত্তি ও নবোন্মেষিত প্রতিভার জ্যোতিতে সকলে মুগ্ধ না হইয়া পারিত না। তাঁহার দুরন্তপনার তখনও বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। অবকাশ পাইলেই যার তার উপর দৌরাত্ম্য করিতেন। শ্রীহট্টবাসিগণের ভাষা লইয়া তিনি তাহাদিগকে ক্ষেপাইতেন, তাহারা সহজেই চটিয়া যাইত, এবং বলিত "তুমি কত দিনের নদেবাসী হে? তোমার পিতামাতা সকলের জন্মস্থানই ত শ্রীহট্টে—এ কথাটি কি ভুলিয়াছ?" কিন্তু কে সেই তর্ক করিতে যায়, তিনি এরূপ তীব্র ব্যঙ্গ দ্বারা তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতেন যে তাহাদের কেহ কেহ লগুড় লইয়া তাঁহাকে মারিতে যাইত, কেহ বা কাজির কাছে নালিশ পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হইত।

বিবাহ ও পত্নীবিয়োগ।

বল্লভাচার্য্যের মেয়ে লক্ষ্মী বড় সুন্দরী ছিলেন, তিনি গঙ্গার ঘাটে যাইতেন, নিমাই তাঁহাকে দেখিতেন এবং তিনিও তাঁহাকে তরুণ হৃদয়ের স্নেহঢালা দৃষ্টি ফিরাইয়া দিতেন। একদিন নিমাই বনমালী ঘটককে বিবাহের প্রস্তাব করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন জগন্নাথ মিশ্র স্বর্গগত, এবং নিমাই গঙ্গাতীরে মুকুন্দসঞ্জয়ের বাড়ীতে টোল স্থাপন করিয়াছিলেন। বল্লভও আনন্দের সহিত

প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। নিমাই বনমালী ঘটককে তাঁহার মাতা শচীদেবীর নিকট পাঠাইলেন, শচীদেবী ঘোর আপত্তি করিলেন—"এতটুকু ছেলে লেখাপড়া করিতেছে, এখনই বিবাহের কথা কেন?" এই কথা শুনিয়া ঘটক মহাশয় ফিরিয়া যাইতেছিলেন—পথে তাঁহার মুখে সমস্ত শুনিয়া নিমাই মাকে যাইয়া বলিলেন, "তুমি কি বলিয়াছ যাহাতে ঘটক মহাশয় এত দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া গেলেন? তোমার এরূপ করা ভাল হয় নাই, তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হন, তাহাই কর।" (চৈ. ভা.) এখন শচীদেবী বুঝিলেন, তাঁহার পুত্রই এই ঘটককে নিযুক্ত করিয়াছিল এবং তখনই তিনি বিবাহে সম্মতি দান করিলেন। এই বিবাহ বর ও কন্যার পরস্পরের মনোনয়নের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। যখন নিমাই পূর্ব্ববঙ্গ গিয়াছিলেন তখন তিনি তাঁহার পৈতা ও পাদুকা স্মরণচিহ্নস্বরূপ লক্ষ্মীকে দিয়া গিয়াছিলেন। লক্ষ্মী অতি নিপুণ চিত্রকরী ছিলেন, তিনি স্বহস্তে তাঁহার স্বামীর মূর্ত্তি আঁকিয়াছিলেন। যখন সর্পাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন সেই চিত্র ও পাদুকার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সাধ্বী মৃত্যুর জ্বালা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

এদিকে নিমাইয়ের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সমস্ত বঙ্গদেশের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি "বিদ্যাসাগর" উপাধি পাইয়াছিলেন, তাঁহার ভাল নাম ছিল "বিশ্বম্ভর মিশ্র।" তিনি ব্যাকরণের একখানি টীকা করিয়াছিলেন। উহা পূর্ব্ববঙ্গের টোলগুলিতে অধীত হইত, এই টীকার নামও ছিল "বিদ্যাসাগর-টিপ্পনী"। ক্রমে তাঁহার অর্থ ও খ্যাতি উভয়ই লাভ হইয়াছিল। তিনি পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ করিয়া পণ্ডিত-বিদায় হিসাবে বহু অর্থ লইয়া গৃহে আসিয়াছিলেন; গঙ্গার উপরে পাঁচখানি সুন্দর বড় ঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেখানে এই নিরামিশ-ভোজী বৈষ্ণব পরিবার অতি সুখে দিন যাপন করিতেছিলেন। শচীদেবী নিজ হস্তে পরমান্ন, পিষ্টক, বেতো শাক, করলা ভাজা প্রভৃতি রন্ধন করিয়া বিষ্ণুর ভোগ দিতেন। শচীদেবীর মূর্ত্তি শান্ত ছিল কিন্তু তিনি অতি খর্ব্বাকৃতি ছিলেন। "শান্ত মূর্ত্তি শচীদেবী অতি ক্ষুদ্রকায়" (গোবিন্দদাসের করচা)।

এই সময়ে কেশব কাশ্মীরী নামক এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আর্য্যাবর্ত্তের বহু স্থানের পণ্ডিতদিগকে জয় করিয়া নবদ্বীপ পরাজয় করিতে আসিয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা ভাবিলেন, "এই দুষ্ট ছেলেটা কেবলই 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া তর্ক করিবার জন্য লালায়িত। প্রবীণদের টিকি ধরিয়া টানিতে চায়—আমরা বয়স্থ, ইহার উপরই দিগ্বিজয়ীকে লেলিয়া দেওয়া যাক্।" সুতরাং তাঁহারা বলিলেন, গঙ্গাতীরে অতি অল্পবয়স্ক একটি মহাপণ্ডিত আছেন, আপনি তাঁহার সহিত বিচার করুন। চৈতন্য-ভাগবতে সবিস্তারে এই বিচারের কথা বর্ণিত আছে—দিগ্বিজয়ী হারিয়া গেলেন। সেদিন "নবদ্বীপের মুখ রক্ষা হইল"—এই বলিয়া সমস্ত পণ্ডিত একত্র হইয়া এক সভা করিলেন এবং নিমাইকে উপাধি দিলেন "বাদিসিংহ", সুতরাং নিমাই পণ্ডিতের পুরো নাম হইল "শ্রীবিশ্বম্ভর মিশ্র বিদ্যাসাগর বাদিসিংহ।"

ব্যঙ্গ কলাই ছিল নিমাইয়ের রীতি ও স্বভাব, যৌবনের প্রারম্ভেও এই বৃত্তি হ্রাস পায় নাই। কেবল বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তিনি একটি বিষয়ে সতর্ক হইয়া উঠিয়াছিলেন। কৈশোরে

পদার্পণ করিয়াই স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গ পরিহার করিয়া চলিতেন, "সবে মাত্র পরস্ত্রী প্রতি নাহি উপহাস। স্ত্রী দেখি প্রভু হন এক পাশ।" ঈশ্বর পুরীর বাড়ী ছিল হালিসহর, তিনি বয়স্থ সন্ন্যাসী, ভক্তিপন্থী, সুপণ্ডিত, মাঝে মাঝে নবদ্বীপে আসিতেন। তাঁহাকে দেখিতে নবদ্বীপের লোকের ভিড় হইত। নিমাইয়ের সতীর্থ পরম পণ্ডিত গদাধরের চিরকালই ধর্ম্মের দিকে ঝোঁক ছিল, তিনি ঈশ্বর পুরীর বড় প্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। অপর কেহ কোন বিষয়ে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে শুনিলে নিমাইয়ের হিংসা হইত। ঈশ্বর পুরী কেন গদাধরকে ভালবাসেন, এজন্য নিমাই মাঝে মাঝে তাঁহার আশ্রমে যাইয়া গদাধরের পার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন। ঈশ্বর পুরী এই সুলক্ষণ বালকটীকে দেখিয়া বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করিতেন এবং স্বপ্রণীত ধর্ম্মপুস্তক হইতে শ্লোক তুলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। কিন্তু একদিন যখন পুরী গোঁসাই সোৎসাহে একটি শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছিলেন তখন নিমাই বলিয়া উঠিলেন—"এ ধাতু আত্মনেপদী নহে।" ঈশ্বর-পুরীর ধর্ম্মের আগ্রহ জুড়াইয়া গেল, এ বালককে বাগে আনা তাঁহার কর্ম্ম নহে, তিনি বুঝিতে পারিলেন।

নিমাই ও ঈশ্বর পুরী।

পূর্ব্ববঙ্গ-ভ্রমণের পর যখন নিমাই শুনিতে পাইলেন, তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, তখনই তাঁহার ভাবান্তর হইল। পথে গদাধর, শ্রীমান্ পণ্ডিত প্রভৃতি সহচরের সঙ্গে দেখা, পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা ব্যঙ্গ করিয়া নিমাই হাসিমুখে কথা বলিতে লাগিলেন—কিন্তু সহচরেরা সেই ব্যঙ্গের সায় দিলেন না। মাতা কাঁদিয়া ফেলিলেন। নিমাই বুঝিলেন, লক্ষ্মী নাই,—যে লক্ষ্মীকে তিনি ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, যিনি গুণশীলা ও সাধ্বী—এবং কৈশোর-সঙ্গিনী, নবযৌবনের নব অনুরাগ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জন্মিয়াছিল, সেই লক্ষ্মীর অভাবে তাঁহার যে ভাবান্তর হইল তাহা পরবর্ত্তী জীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, বলা যায় না। এদিকে নিমাই পণ্ডিতের খ্যাতি-প্রতিপত্তি বাড়িয়াছে—তাঁহার সঙ্গে বিবাহ দিবার জন্য নবদ্বীপের ধনশালী রাজসভা-পণ্ডিত সনাতন মিশ্র আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শচী পুত্রের ইচ্ছা না জানিয়াই বিবাহ ঠিক করিয়া ফেলিলেন। বিবাহের দিন নিমাই শুনিলেন, তাঁহাকে বিবাহ করিতে হইবে। তিনি বিরক্ত হইলেন, বিবাহ করিবেন না, বলিলেন। অগত্যা শচী সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু চৈতন্য বুঝিলেন এরূপ করিলে তাঁহার মায়ের মুখখানি ছোট হইয়া যায়—সনাতন মিশ্র অনেক আয়োজন করিয়াছেন—তাহা পণ্ড হইয়া যায়, সুতরাং অনিচ্ছাক্রমে শেষে স্বীকৃত হইলেন; বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল। ইহার পর নিমাই পিতৃপিণ্ড প্রদান করিতে গয়ায় যাত্রা করিলেন। পথে কুমারহট্টে তিনি ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বর পুরীকে দেখিতে ছুটিলেন, আজ তাঁহার চক্ষু ছল ছল—আজ ঈশ্বর পুরীকে তাঁহার এত ভাল লাগিল কেন? সাধুসঙ্গে মুহুর্মুহুঃ চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইতে লাগিল, মনে হইল ঈশ্বর পুরীর দেবচরিত্র, তাঁহার মত অন্তরঙ্গ তাঁহার কেহ নাই। ঈশ্বর পুরী বলিলেন, "তুমি গয়ায় যাও, আমিও সেখানে যাব—তথায় আমার সঙ্গে তোমার দেখা হইবে।" ঈশ্বর পুরীকে ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার আজ বড় কষ্ট হইল। কুমারহট্টের কতকগুলি ধূলি

তিনি কোঁচার খুঁটে বাঁধিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "ঈশ্বর পুরীর জন্মস্থান, এ মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ," উন্মত্তের মত সাশ্রুনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিলেন, এবং কুমারহট্টকে করজোড়ে প্রণাম করিয়া "প্রভু কহে কুমারহট্টের নমস্কার, শ্রীঈশ্বরপুরীর যে গ্রামে অবতার।"

সঙ্গীরা দেখিল সে নিমাই আর নাই। সে ব্যঙ্গপ্রিয় সততরহস্যময় নিত্যপ্রফুল্ল তরুণ নিমাই,—দিগ্বিজয়ী জয়দর্পিত পণ্ডিত নিমাইয়ের জীবনের চাঞ্চল্যপূর্ণ অধ্যায় শেষ হইয়াছে। তিনি কেন কাঁদিতেছেন, কেন সজল চক্ষে ঊর্দ্ধে তাকাইয়া আছেন, কেন মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না; তাঁহার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ইহার পর পিণ্ড দেওয়ার পালা। (শ্রীপাদপদ্মে দাঁড়াইয়া নিমাই দেখিলেন, পাদপদ্মের উপর পাহাড় সমান উচ্চ ফুলরাশি পড়িতেছে! কত বস্ত্র-অলঙ্কার, চারিদিক্ হইতে পুষ্পস্তবকের সঙ্গে সঙ্গে কত নয়নাশ্রু! পাণ্ডারা শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বলিতেছে "সংসারের দুঃখী তাপী জীব, তোমরা এই পাদপদ্ম দেখ,—যোগী ঋষি মহর্ষিরা এই পাদপদ্ম ধ্যান করেন, এই পাদপদ্ম হইতে গঙ্গা নিঃসৃতা হইয়াছেন, ইহা যোগেশ্বর শিব ধ্যান করেন, ত্রিতাপদগ্ধ মানুষ—তোমাদের আর গতি নাই, এই পাদপদ্ম আশ্রয় কর।" নিমাই কি শুনিলেন, কি দেখিলেন, কি বুঝিলেন, তিনিই জানেন, পাদপদ্মের উদ্দেশে তাঁহার পদ্মচক্ষে যে ধারা ছুটিল, তাহার শেষ নাই, বিরাম নাই! সেই বহুপদ্মের মধ্যে তাঁহার মুখপদ্ম অশ্রু-গঙ্গার প্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছে—দেখিতে দেখিতে সেই পাদপদ্মের কাছে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।)

পাদপদ্ম।

সঙ্গীরা তাঁহাকে ধরিয়া কোনোরূপে বাসায় লইয়া আসিল—তখন ঈশ্বর পুরী আসিয়াছেন। নিমাইয়ের জ্ঞান নাই, কেবল অশ্রু, ঊর্দ্ধে তাকাইয়া কি দেখেন, আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। কোনও প্রকারে তাঁহাকে সহচরেরা বাড়ী ফিরাইয়া আনিল—কিন্তু পথে পথে তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমার বাড়ী নাই, আমার বাড়ী বৃন্দাবন, তোমরা আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি প্রাণেশ্বরকে দেখিতে বৃন্দাবন চলিলাম।" কতকটা বলপূর্ব্বকই সঙ্গীরা তাঁহাকে বাড়ীতে আনিলেন।

বাড়ী ফিরিয়া আসিবার পর কাহারও সঙ্গে কথা নাই, চুপটি করিয়া ঘরে বসিয়া থাকেন, আর কাঁদিতে থাকেন। প্রিয় গদাধর আসিল, তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"আমি গয়ায় কি দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা তোমায় বলিব," কিন্তু বলিতে যাইয়া অশ্রুপূর্ণ চক্ষু ও গদ্‌গদকণ্ঠ হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। কি দেখিয়াছেন আর বলা হইল না। শচী দেবীর অবস্থা সহজেই অনুমেয়. প্রতিবেশিনীরা বলিলেন—"পাগল হইয়াছে, এর আর কথা কি? চিকিৎসা করাও।" ভিষক্ শিবাদিঘৃতের ব্যবস্থা করিয়া গেল? কোথায় গেল সেই কৃষ্ণকেলী সৌখীন ধুতি, সেই চন্দন, অগুরু, গন্ধদ্রব্য. সেই সখের পুষ্পমাল্য। বিষ্ণুপ্রিয়াকে সাজাইয়া আনিয়া শচীদেবী পুত্রের নিকট বসাইয়া রাখেন। কিন্তু "দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়। কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলে অনুক্ষণ. দিবানিশি শ্লোক পড়ি করয়ে ক্রন্দন।"

পূর্ব্বরাগ।

শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে এক ঝাড় কুন্দফুলের গাছ ছিল—তথায় দিবারাত্র ফুল ফুটিত। প্রাতে ব্রাহ্মণেরা ফুল তুলিবার জন্য বেতের সাজি লইয়া তথায় যাইতেন এবং পল্লীর সমস্ত কথার আলোচনা করিতেন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন শুক্লাম্বর, গদাধর, শ্রীমান্ পণ্ডিত প্রভৃতি, শ্রীবাস তো অবশ্যই ছিলেন। ইহারা সকলেই বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন, জগতে ভক্তির অভাব দেখিয়া আক্ষেপ করিতেন। তাঁহারা নিমাই পণ্ডিত সম্বন্ধে নানা কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিলেন "সে পাগল নয়, এ যে কি তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না;—এত জলও মানুষের চোখে থাকে! কৃষ্ণনাম বলিলেই উন্মত্ততা বৃদ্ধি পায়—কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া আছাড় খাইয়া মাটীতে পড়ে।" শ্রীমান্ পণ্ডিত বলিলেন, "আজ আমার বাড়ী নিমাই আসিয়াছিল, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'তোমার কি হইয়াছে?' সে বলিল আমি তোমার বাড়ী যাইয়া আমার কথা শুনাইব। আজই তার আমার এখানে আসার কথা।" সকলেই এ সম্বন্ধে কুতূহলী হইলেন। এই সময়ে একটি লোক ছুটিয়া আসিয়া শ্রীবাসকে বলিল, "চলুন, শচী দেবী বড় বিপন্ন, নিমাই বড় বাড়াবাড়ি করিতেছেন, শচী ঠাকুরাণী বিপদে পড়িয়া আপনাকে ডাকিতেছেন।" শ্রীবাস চলিয়া গেলেন, শচী দেবী বলিলেন "আপনারা আমার ছেলের একটা উপায় করিয়া দিন, আমি কি করিব? নিমাই যে আমার সর্ব্বস্ব, আমার সর্ব্বস্ব যাইবার পথে।" যে ঘরে নিমাই ছিলেন, শচী শ্রীবাসকে সেই ঘর দেখাইয়া দিলেন। শ্রীবাস যাইয়া সেই ঘরে খিল দিলেন। তারপর প্রায় চারি দণ্ড পরে শ্রীবাস বাহির হইলেন, তাঁহার চক্ষু অশ্রুপ্লুত। তিনি শচীকে বলিলেন, "মা তোমার ছেলে পাগল হয় নাই। উহাকে বিরক্ত করিও না। ধ্রুব, শুক, প্রহ্লাদের কথা আমরা শুনিয়াছিলাম, আমাদের ভাগ্যবশে তেমনই একজন নবদ্বীপে আসিয়াছেন! এই সময়টুকুর মধ্যে নিমাই আমাকে পাগল করিয়া ফেলিয়াছে, অচিরে সমস্ত দেশটা পাগল করিবে।"

এইবার শচী আশ্বস্ত হইলেন। এদিকে দিনের বেলায় নিমাই পণ্ডিত গঙ্গাতীরে যান, সেখানে কাহারও বস্ত্র ধুইয়া নিঙড়াইয়া শুকাইতেছেন, কাহারও ধুতি প্রভৃতি কাঁধে করিয়া বাড়ীতে পৌছাইয়া দেন, কাহারও পা ধোয়াইয়া দেন। লোকে আপত্তি করিলে তিনি বিনীতভাবে বলেন—"তোমাদের সেবা করিলে আমি কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ-ভক্তি পাই, এই সেবা হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না।" (রাত্রে শ্রীবাসের ইতিহাস-বিশ্রুত আঙ্গিনায় সংকীর্ত্তন। নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি লোকের সঙ্গে এই সংকীর্ত্তন। দলের প্রধান ৭২ বৎসরের বৃদ্ধ অদ্বৈত আচার্য্য "পক্ক কেশ পক্ক দাড়ি বড় মোহনীয়। দাড়ি পড়িয়াছে, তার হৃদয় ছাইয়া;" এইদলে শ্রীবাস স্বয়ং, গদাধর, শুক্লাম্বর, শ্রীমান্ পণ্ডিত, গঙ্গাদাস প্রভৃতি আরও কয়েকজন ছিলেন। এই দলে ছিলেন বক্রেশ্বর পণ্ডিত, "প্রভুর মতন যার নর্ত্তন সুন্দর।" সারারাত্রি কি ভাবে কাটিয়া যাইত তাহা তাঁহারা জানিতেন না। এই ৫০০ বৎসর যাবৎ কীর্ত্তনে গোটা বাঙ্গলা দেশটা মাতাইয়া রাখিয়াছে। এখনও ভাল কীর্ত্তন শুনিলে লোক ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা সমস্ত ভুলিয়া যায়—আর যিনি কীর্ত্তনানন্দের হরিদ্বার, যাঁহার শ্রীমুখে এই সুর প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল,

পূর্ব্বরাগের আবেগে সম্পূর্ণ ভগবানের প্রেমে আত্মহারা প্রেমিক পাগলের সেই নৃত্য—সেই গান যে কি প্রেরণা দিয়াছিল, তাহা কি করিয়া বুঝাইব? পৃথিবীর অন্যান্য দেবকল্প ব্যক্তিরা ধর্ম্মসম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন, ধর্ম্মজীবনের উজ্জ্বল আদর্শ ও নীতির শুভ্রতা দ্বারা জগতে পূজ্য হইয়া আছেন—কিন্তু ভগবৎপ্রেম লোকচক্ষে এরূপ সুস্পষ্ট করিয়া আর কে দেখাইয়াছেন? সেই যে মৃদঙ্গ বাজিয়া উঠিয়াছিল তাহার বোল এখনও নীরব হয় নাই, সেই শতকণ্ঠ-উচ্চারিত বাণী, যাহা শ্রীবাসের আঙ্গিনায় প্রথম আকাশে উঠিয়াছিল—তাহা এখনও আমাদিগের প্রাণ হরণ করিতেছে। যে রাত্রে নিমাই রুক্মিণী সাজিয়া অভিনয় করিয়াছিলেন, সেই রাত্রে তাঁহাকে দেখিয়া লোকে বলিয়াছিল—"ইনি কি মূর্ত্তিমতী ভক্তি? ইনি কি ভূতলে আবির্ভূতা পদ্মাসনা কমলা, না মানবদেহধারিণী ভারতী,—রাগিণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী?" স্বয়ং সেদিন রুক্মিণী কৃষ্ণকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা সত্যিকার কৃষ্ণ-প্রেমের অশ্রুতে মাখা; রঙ্গমঞ্চে এমন সত্যিকার অভিনয় জগতে কেহ কখনও দেখে নাই। সেদিন নবদ্বীপে স্বয়ং কৃষ্ণভক্তি আসরে নামিয়া আসিয়া মানুষকে ভগবৎপ্রেম শিখাইয়া দিয়াছিল। প্রাতঃকাল হইল, দর্শকমণ্ডলী বলিল "এমন রাত্রিও প্রভাত হয়!"

ঈশ্বর পুরী নবদ্বীপে আসিলে নিমাই আহার-নিদ্রা ছাড়িয়া তাঁহার কাছে পড়িয়া থাকিতেন। একদিন শচী দেবী নির্জ্জনে নিমাইকে বলিলেন, "নিমাই, আমার বড় ভয় হইতেছে, আমাকে অভয় দাও, আমার বুকটা বড় অস্থির হইয়াছে।" নিমাই বলিলেন, "মা, সে কি কথা? তুমি যাহা আদেশ করিবে তাহাই করিব। কি হইয়াছে বল।" তখন শচী দেবী চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "তুমি সন্ন্যাসী পাইলে এত খুসী হও কেন? মনে হয় যেন তোমার কোন প্রাণের অন্তরঙ্গের সঙ্গে দেখা হইয়াছে, তোমার আহার-নিদ্রা-জ্ঞান থাকে না, আমাদিগকে ভুলিয়া যাও। নিমাই, আমাকে ছুঁইয়া শপথ কর, তুমি সন্ন্যাসী হইবে না। বিশ্বরূপ প্রাণে বড় দাগা দিয়া গিয়াছে, তুমি ছাড়া আমার কেহ নাই, আমাকে ছাড়িয়া যাইও না।" নিমাই মাকে নানারূপ প্রবোধ দিয়া আশ্বস্ত করিলেন। শচী দেবী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—"আমি তোমার নিকট বড় অপরাধ করিয়াছি, তুমি বল আমাকে ক্ষমা করিলে।" নিমাই বলিলেন—"কি করিয়াছ? তুমি মা, ছেলের কাছে মা কি কোন অপরাধ করিতে পারে? ওরূপ বলিলে যে মা আমি অপরাধী হই।" শচী দেবী বলিলেন—"বিশ্বরূপ নিজহাতে একখানি বই লিখিয়াছিল, সে তাহা আমার কাছে রাখিয়া দিয়া বলিয়াছিল—নিমাই বড় হইলে এই বই পড়িবে। আমি সেই বই ছিঁড়িয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দিয়াছি, পাছে সেই বই পড়িয়া তুমি সন্ন্যাসী হও।" নিমাই বলিলেন—"দাদার চিহ্ন নষ্ট করিয়া ভাল কর নাই, কিন্তু আমার কাছে ক্ষমা চাওয়া তোমার সঙ্গত নহে—আমি যে তোমার একান্ত স্নেহের অনুগত ছেলে—এরূপ ক্ষমা চাহিলে আমার অকল্যাণ করা হয়।" পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কথাই আমি চৈতন্য-ভাগবত এবং অপরাপর প্রামাণ্য পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছি:

ঈশ্বর পুরী সম্বন্ধে শচী-দেবীর ভয়।

এদিকে টোল বন্ধ হইয়া গেল, হরিকথা ভিন্ন নিমাই আর কিছু বলেন না, ব্যাকরণের সূত্র পড়াইতে যাইয়া হরিভক্তির ব্যাখ্যা করেন; ছাত্রেরা মুগ্ধ হইয়া শোনে—কারণ নিমাইয়ের মুখে হরিকথা—সে যে অমৃত হইতেও অমৃত। কিন্তু তাহারা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের (নিমাইয়ের শিক্ষক) কাছে যাইয়া নালিশ করিল, "নিমাই পণ্ডিত আর পড়ান না, কেবল কৃষ্ণকথা বলেন আর কাঁদিতে থাকেন।" গঙ্গাদাস যাইয়া বলিলেন, "দেখ নিমাই, তোমার পিতা জগন্নাথ মিশ্র, মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ইহারা সকলেই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা ধার্ম্মিক ও ভক্তিপরায়ণ বলিয়াও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তুমি হরিভক্তি প্রচার কর, ভাল,—কিন্তু ছেলেদের পড়াশুনা বন্ধ করা কি ঠিক?" নিমাই বলিলেন, সেদিন হইতে তিনি পড়াইবেন। নিমাই টোলে গেলেন, খানিকটা মনোযোগের সহিত পড়াইলেন, তখন ভূগর্ভ জয়দেবের গান করিতেছিলেন, গঙ্গাতীরে তাঁহার মধুর সুরলহরী কাঁপিয়া নাচিয়া আকাশে উঠিতেছিল—নিমাই সেই গান শুনিয়া পাগল হইয়া গেলেন। "আবার গাও" "আবার গাও" বলিয়া ভূগর্ভের পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন, দুই চক্ষু অশ্রুতে প্লাবিত হইল, সেদিন আর পড়ান হইল না।

টোল-ত্যাগ।

তিনি বুঝিলেন, আর পড়াইতে পারিবেন না। তখন পুনরায় আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "ভাইসব! তোমরা দেখিতেছ, আমি কিছুতেই মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেছি না, আমার মন তাঁহার পাদপদ্মে বিলাইয়াছি, তিনি যে সর্ব্বক্ষণ আমার সামনে দাঁড়াইয়া তাঁহার ভুবনভুলানো হাসি হাসিতেছেন, আমি কি করিয়া পড়াইব?—আজ হইতে আমি আর পড়াইতে পারিব না, আমার শত শত অপরাধ তোমরা ক্ষমা করিও। আমি জীবনে যদি কোন ভালকাজ করিয়া থাকি সেই পুণ্যের ফল তোমাদিগকে দিলাম, তোমরা আমাকে ক্ষমা কর।" অশ্রুতে চক্ষু ভরিয়া আসিল; এইভাবে তিনি পুঁথিতে ডুরি বাঁধিলেন। নদের চাঁদের টোল এইখানে সমাপ্ত হইল।

এদিকে নবদ্বীপে মাঝে মাঝে চৈতন্যের দল সংকীর্ত্তন করিতে বাহির হন; দলের লোক কম নয়। তাঁহারা যেন প্রেমাশ্রুর হার গাঁথিয়া পরেন, কৃষ্ণ-প্রেম-গর্ব্বের ধ্বজা তুলিয়া উচ্চরবে নাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে চলেন। নদীয়ার ভট্টাচার্য্যদের এই সকল অশ্রু, উচ্চৈঃস্বরে ভগবান্‌কে ডাকা, ভাল লাগিত না। তাঁহারা কেহ বলিলেন, "খাসা ছেলেটা ছিল, একেবারে মাটী হইল।

ভট্টাচার্য্যের দল ও গোরাই কাজির আদেশ।

ব্যাকরণ ও অলঙ্কার এমনই বিদ্যা যে একদিন অভ্যাস না থাকিলে সূত্রগুলি ভুলিয়া যাইতে হয়—নিমাইয়ের কি আর বিদ্যাবুদ্ধি কিছু থাকিবে?" একজন বলিলেন, "আমরাও তো ভাই ভাগবত পড়িয়াছি, এরূপ হরিনাম লইয়া নর্ত্তনকুর্দ্দনের কথাতো কোথাও দেখি নাই, ভগবান্‌কে চীৎকার করিয়া না ডাকিলে বুঝি তিনি শুনিতে পান না!" অপর একজন বলিলেন, "আমিই তো ঈশ্বর; জীবাত্মা ও পরমাত্মায় প্রভেদ কি? তবে কে কাহাকে ডাকিবে?" অনেকে বলিলেন—"রাত্রে ইহাদের চীৎকারে ঘুম হয় না, বাদসাহ এসকল কথা শুনিলে নিশ্চয়ই সৈন্য পাঠাইয়া নবদ্বীপ উৎসন্ন করিবেন।"

আবার কেহ বলিল, "শ্রীবাস পণ্ডিতের আঙ্গিনায় ইহারা নিশ্চয়ই মধুমতী-পরী সাধনা করে" (চৈ. ভা.)। ইহারা যাইয়া নবদ্বীপের গোরাই কাজির কাছে আরজী করিয়া রাজপথে সংকীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিলেন।

মহাসংকীর্ত্তন।

সেইদিন নবদ্বীপের একটী স্মরণীয় দিন। কাজির আদেশ-প্রচারের সংবাদ শুনিয়া নিমাই বলিলেন, "আজ আমরা সকলে প্রকাশ্যভাবে সংকীর্ত্তন করিব। এতদিন শ্রীবাসের আঙ্গিনায় আমাদের কীর্ত্তন আবদ্ধ ছিল, মাঝে মাঝে দুই একটি মাত্র দল রাজপথে কীর্ত্তন করিত, আজ আমি সকলকে আহ্বান করিতেছি, আপনারা রাত্রে রাজপথে একত্র হইয়া বাহির হউন।" সেদিন দেখা গেল, নিমাইয়ের বিরুদ্ধ দল কত নগণ্য! নিমাই রাজপথে বাহির হইবেন, বিদ্যুতের মত এই সংবাদ প্রচারিত হইল। শত শত, সহস্র সহস্র নরনারী সে রাত্রে রাজপথে বাহির হইল; নানাবর্ণ-রচিত পতাকায় এবং সুগন্ধ তৈল-নিষেবিত সহস্র মশালের আলোকে মনে হইল নবদ্বীপে সে রাত্রে কোন রাজাধিরাজের অভ্যর্থনা হইবে। জন-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। নবদ্বীপের পরডাঙ্গা, গড়িগাছা প্রভৃতি পাড়াগুলি তাঁহারা পরিক্রমণ করিয়া কাজির বাড়ীর কাছে আসিলেন; যে যে পথ দিয়া এই সংকীর্ত্তনের দল চলিয়াছিল, তাহার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ চৈতন্য-ভাগবত, ভক্তি-রত্নাকর ও প্রেম-বিলাসে পাওয়া যাইবে। গোরাই কাজি এত বড় বিপুল জনতা প্রত্যাশা করেন নাই, বিশেষ জনতা নেহাৎ ভাল মানুষ হইয়া থাকে নাই, কিছু কিছু আক্রমণের ভাবও দেখাইতেছিল। কতকটা ভয়ে, কতকটা নিমাইয়ের মূর্ত্তিদর্শনে কাজির ভাবান্তর হইল। তিনি দেখিলেন—লোকে লোকারণ্য, তাহারা নিমাইকে কেন্দ্র করিয়া উচ্ছ্বসিত বন্যার মত ছুটিয়াছে—তাহাদের আনন্দধ্বনিতে বোধ হয় স্বর্গ হইতে দেবতারা সাড়া দিতেছেন, কুলবধূরা পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছেন—নিষেধ করিবার কেহ নাই, নিষেধ-বিধি মানিবার কেহ নাই। মশালের আলোকে প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে, কপোলে সকলেরই অশ্রু টল টল করিতেছে, এই বৃহৎ জনতা শুধু অশ্রু উপহারে কৃষ্ণের পূজা করিতেছে। যে দিকে বিভোর হইয়া পরম সুন্দর কুঞ্চিত-কেশদামপূর্ণ মস্তক দোলাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গোরা হরিনাম গাহিয়া চলিতেছেন, শত শত

কাজির প্রীতি।

মশাল তাঁহার রূপদর্শনেচ্ছু শত শত ভ্রমরপঙ্ক্তির ন্যায় সেই দিক্ উজ্জ্বল করিয়া চলিয়াছে, কি অপূর্ব্ব রূপ! কাজি মুগ্ধ হইলেন, তিনি গৃহ হইতে নামিয়া আসিয়া নিমাইকে আলিঙ্গন করিয়া অনেক মিষ্ট কথা বলিলেন।

নিতাইয়ের আবির্ভাব।

এই সময়ে নিমাই পণ্ডিতের বাড়ীতে আর একটি সম্মানিত অতিথি উপস্থিত হইলেন। ইঁহার নাম **নিত্যানন্দ**, ইনি হড়াই ওঝার পুত্র—বাড়ী বীরভূম, একচাকা গ্রাম। ইনি নিমাই হইতে নয় বৎসরের বড়, সুতরাং ইনি ১৪৭৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অল্পবয়স হইতেই ইঁহার কৃষ্ণপ্রেম জন্মিয়াছিল। বাল্যকালে শকটভঞ্জন, পূতনাবধ, কালীয়দমন প্রভৃতি কৃষ্ণের নানারূপ লীলার অভিনয় করিয়া বাল্যসঙ্গীদের অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কৈশোর অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং দ্বাদশ বৎসরকাল ভারতবর্ষের সর্ব্বতীর্থ ঘুরিয়া বেড়ান। কথিত

আছে শ্রীপর্ব্বতে ইঁহার সঙ্গে মাধবেন্দ্র পুরীর সাক্ষাৎ হয়। এই মাধবেন্দ্র পুরীই বঙ্গদেশে প্রথম কৃষ্ণপ্রেমের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। নানাকারণে মনে হয় পুরী বাঙ্গালী ছিলেন। ইনি অযাচক-বৃত্তি সন্ন্যাসী ছিলেন, কেহ কিছু স্বেচ্ছায় দিলে খাইতেন—নতুবা উপবাসী থাকিতেন। চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে, ইনি একদা বৃন্দাবনে যাইয়া গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতদর্শনে কৃষ্ণলীলা স্মরণ করিয়া তথায় বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। তিন দিন কিছু খাওয়া হয় নাই, তথাপি দৈহিক কোন কষ্ট হয় নাই, শতদলের মত মুখখানি প্রেমে ঢলঢল করিতেছে। সায়াহ্নে কৃষ্ণবর্ণ পরম সুন্দর একটি কিশোরবয়স্ক বালক এক ভাঁড় দুধ মাথায় করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, "আপনি এই দুগ্ধ পান করিয়া তৃপ্ত হউন। সম্মুখে ঐ যমুনার জল—উহাতে ভাণ্ডটি পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া দিবেন,—আমি খানিক পরে আসিয়া লইয়া যাইব।" মাধবেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কে তোমাকে এই দুধ দিয়া পাঠাইয়াছে?" বালক বলিল, "ব্রজমায়েরা তোমার উপবাসের কথা জানেন, তাঁহারাই আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন, এখানে যত সাধুসন্ন্যাসী আসেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের কাছে আহার্য্য ভিক্ষা করেন, কেহ যব, ছাতু, দুগ্ধ, রুটি, কেহ বা ফল-মূল ভিক্ষা করেন, কিন্তু তুমি তাঁহাদের কাছে কিছুই চাও নাই। তাঁহারাই আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। যিনি কাহারও কাছে কিছু চান না, আমিই তাঁহার খাবার যোগাইয়া থাকি।" এই বলিয়া বালক চলিয়া গেল, তাহার পরমসুন্দর মুখশ্রী, উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ এবং সুন্দর রূপ সন্ন্যাসীর মন মুগ্ধ করিল।

মাধবেন্দ্র পুরী।

মাধব সেই দুগ্ধ পান করিলেন, তাহা অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু, ভাণ্ডটি ধুইয়া মুছিয়া একধারে রাখিয়া দিয়া সন্ন্যাসী পুনরায় তপস্যায় বসিলেন। কৃষ্ণের করুণা-স্মরণে তাঁহার চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় জল পড়িতে লাগিল। শেষরাত্রে তন্দ্রার অবস্থায় ধ্যানের বশে তিনি দেখিতে পাইলেন, সেই তরুণবয়স্ক বালক তাঁহার কাছে দাঁড়াইয়া, বড় মধুর তাঁহার মূর্ত্তি, কিন্তু বড় বিষণ্ণ। গদ্‌গদকণ্ঠে বালক যেন বলিতেছে, "মাধব! আমি বহুদিন যাবৎ তোমার অপেক্ষা করিয়া আছি, মৃত্তিকার নীচে শীতাতপে আমার বড় কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। তুমি আমাকে উদ্ধার করিবে, এই প্রত্যাশায় আমি কত বর্ষ কাটাইয়া দিয়াছি—কারণ জগতে তুমি আমাকে যেরূপ ভালবাস, এরূপ কেহ আমাকে ভালবাসে না।" এই বলিয়া স্থান-নির্দ্দেশ করিয়া বালক অন্তর্হিত হইল। তখন গোবর্দ্ধনের শৃঙ্গে রাঙ্গা মাণিকের মত সূর্য্যকিরণের প্রথম ঝলক ঝিকিমিকি করিতেছিল—সন্ন্যাসী সাশ্রুনেত্রে বৃন্দাবনের পল্লীতে ছুটিলেন। বহু লোক কোদাল ও শাবল লইয়া তাঁহার পিছনে পিছনে গোবর্দ্ধন পাহাড়ে ছুটিল। নির্দ্দিষ্ট স্থান খুঁড়িয়া তাঁহারা এক বিশাল প্রস্তরমূর্ত্তি পাইলেন, এই গোপালমূর্ত্তি মাধবাচার্য্য বৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠা করিলেন, তিনি বাঙ্গালী পুরোহিত আনিয়া সেই মূর্ত্তির পূজার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি আবার স্বপ্ন দেখিলেন যেন সেই বালক তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন—"মাধব! বহুদিন লুকিয়ে থাকিয়া আমার শরীরের তাপ দূর হয় নাই—উড়িষ্যাতে খুব উৎকৃষ্ট চন্দন আছে, তুমি যদি

তাহা আমার অঙ্গে লেপন কর, তবে এই জ্বালা জুড়াইবে। মাধব উড়িষ্যার অভিমুখে চলিলেন, তখন পথে রাজ্যায় রাজ্যায় বিরোধ, পথ অতি দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল। মাধবের মাত্র কটিবাস সম্বল, বিপদ্ সম্পদ্ তাঁহার জ্ঞান নাই—তিনি রেমুনা নগরীতে উপস্থিত হইয়া গোপীনাথ-বিগ্রহ দর্শন করিলেন, এই বিগ্রহকে ক্ষীরভোগ দেওয়া হয়—গোপীনাথের ক্ষীরভোগ অতি প্রসিদ্ধ। মাধব ভাবিলেন, "যদি এই ক্ষীরের একটু আস্বাদ পাইতাম তবে আমি বৃন্দাবনে যাইয়া গোপালকে এইরূপ ক্ষীরভোগ দিতে পারিতাম।" কিন্তু পরক্ষণেই মনে বিরাগ উপস্থিত হইল, "ছিঃ, আমার ক্ষীর খাইবার জন্য জিহ্বার লালসা হইয়াছে!" অনুতপ্ত হইয়া তিনি বাজারের অনতিদূরে একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হইলেন।

"যার জন্য গোপীনাথ ক্ষীর করিলেন চুরি।"

তখন বেলা পড়িয়া গিয়াছে। গোপীনাথ-মন্দিরের প্রধান পাণ্ডা দেবতাকে ভোগ দেওয়ার পর আহারাদি সমাপ্ত করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময়ে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গার পর তিনি চমকিয়া উঠিলেন, এবং দ্রুতগতিতে মন্দিরে যাইয়া দেখিলেন—গোপীনাথের পৃষ্ঠে তাঁহার উত্তরীয়ের সঙ্গে কতকটা ক্ষীর বাঁধা আছে। তখন পাণ্ডার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "গোপীনাথ আমায় বলিতেছেন, 'আজ আমি ভোগ খাই নাই, আমা ভিন্ন যে জানে না সেই মাধব না খাইয়া বাজারে উপবাসী হইয়া পড়িয়া আছে, তাহার জন্য আঁচলে কতকটা ক্ষীর রাখিয়াছি, মাধবকে ক্ষীর খাওয়াইয়া এস, তবে আমি ভোগ পাইব।'" সেই ক্ষীরখণ্ড হাতে করিয়া পাগলের মত পাণ্ডা বাজারে ছুটিলেন, "এমন ভাগ্যবান্ কে যাহার জন্য স্বয়ং গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করিয়াছেন, তাঁহার দর্শনের পুণ্য কবে পাইব? কোন্ সন্ন্যাসীর নাম মাধব?" এই চীৎকারে মাধবের ধ্যানভঙ্গ হইল, তিনি ধরা দিলেন। ইহার মধ্যেই সমুদ্র-তরঙ্গের মত বিপুল জনতা তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তিনি সমস্ত শুনিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে ক্ষীরপ্রসাদ পাইলেন এবং আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, সেই সঙ্গে সমস্ত রেমুনাবাসী লোক নৃত্য করিতে লাগিল—তাহারা তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতে চায় না। কিন্তু প্রতিষ্ঠা বৈষ্ণবদের চক্ষে অতি ঘৃণার বিষয়, এই প্রতিষ্ঠায় ভয় পাইয়া সন্ন্যাসী রেমুনা হইতে উদ্ধার পাইবার পথ খুঁজিতে লাগিলেন; রাত্রে তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইয়া বহুদূরে চলিয়া গেলেন।—এখনও বৃন্দাবনের পাণ্ডারা বাঙ্গলায় রচিত এই দুইটি চরণ আবৃত্তি করিয়া থাকে—"ধন্য ধন্য মহাভক্ত মাধবেন্দ্র পুরী। যার জন্য গোপীনাথ ক্ষীর করিলেন চুরি।" এই চুরির অখ্যাতি উক্ত বিগ্রহের এখনও যায় নাই—এখনও রেমুনার গোপীনাথ "ক্ষীর-চোরা গোপীনাথ" নামে পরিচিত। পুরী হইতে চন্দন লইয়া মাধবেন্দ্র বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন।

দাক্ষিণাত্যে শ্রীপর্ব্বতে মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে নিত্যানন্দের দেখা হইয়াছিল। মাধবেন্দ্রের ভক্তি অসাধারণ—আকাশে মেঘোদয় হইলেই তিনি কৃষ্ণভ্রমে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। "মাধবেন্দ্র পুরীর কথা অকথ্য কথন! মেঘদরশনমাত্র হয় অচেতন।" এই মাধবেন্দ্র পুরীর রচিত শ্লোকগুলি চৈতন্য আগ্রহসহকারে আবৃত্তি করিতেন।

তন্মধ্যে একটি শ্লোক—"অয়ি দীন-দয়ার্দ্র-নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে। হৃদয়ং ত্বদালোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্"—চৈতন্যের অতি প্রিয় ছিল; তিনি বলিতেন, "এই শ্লোকচন্দ্র জগৎ আলোকিত করিতেছে, ঘষিতে ঘষিতে যেরূপ চন্দনের গন্ধ বাড়ে, এই শ্লোক পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি ও আলোচনা করিলে ইহার উৎকর্ষ তেমনই উপলব্ধ হয়। রত্নগণমধ্যে শোভে কৌস্তভমণি। রসকাব্যমধ্যে এই শ্লোক গণি।" (চৈ. চ. মধ্য, ৪র্থ পঃ।) এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে তিনি কতবার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন, এবং মূর্চ্ছাভঙ্গের পর সাশ্রুনেত্রে গদগদকণ্ঠে শুধু "অয়ি দীন, অয়ি দীন" বলিতে বলিতে আর বলিতে পারেন নাই, পুনরায় সংজ্ঞাহারা হইয়াছেন। নিত্যানন্দ বহু তীর্থ ভ্রমণের পর মাধবেন্দ্রের উদ্দাম ভক্তিদর্শনে বলিয়াছিলেন, "যত তীর্থ দর্শন করিয়াছি—তাহার সর্ব্বপ্রধান এই মাধবেন্দ্র-পুরী-সঙ্গমস্থান, তুমি সর্ব্বতীর্থের সার, যেহেতু তোমার মধ্যে যেরূপ আর কোথাও এরূপ কৃষ্ণভক্তির বিকাশ দেখিতে পাই না। তীর্থগুলি পড়িয়া আছে—সিংহাসন শূন্য, কোথাও ঠাকুরকে পাইলাম না।" তখন নিত্যানন্দ শুনিলেন—কেহ বলিতেছেন, "তুমি গৌড়ে ফিরিয়া যাও, সেইখানে কৃষ্ণের দর্শন পাইবে, নবদ্বীপে তাঁহার লীলা দেখিবে।" এই বাণী কোন দুর্জ্ঞেয় অলক্ষ্য শক্তিতে তাঁহাকে নিমাই পণ্ডিতের বাড়ীতে টানিয়া আনিল।

মাধবেন্দ্র পুরীই ভক্তিরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা—ইহার উপাধি ছিল "ভক্তিচন্দ্রোদয়।" ইহার স্থাপিত গোপালের অদৃষ্ট নানারূপ বিপদ্‌জালে জড়িত। বজ্রনামক কোন ব্যক্তি এই বিগ্রহ গোবর্দ্ধনে স্থাপন করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা উঁহাকে ধ্বংস করিতে আসিয়াছে, এই সংবাদে ইহার মন্দিরের পরবর্ত্তী এক মালিক ইহাকে মৃত্তিকার নীচে পুঁতিয়া পালাইয়া যান, তথা হইতে মাধবেন্দ্র ইহাকে উদ্ধার করিয়া দুইজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে ইহার সেবায়েত নিযুক্ত করিয়া যান। সেখানে পুনরায় মুসলমানেরা হানা দেয়, তথায় একমাস কাল ইনি বিট্ঠলেশ্বরের গৃহে বাস করেন, তৎপরে বহু ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর ইনি এখন জয়পুরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মাধবেন্দ্র পুরী মহাপ্রভুর জন্মের কিছু পূর্ব্বে বা পরে স্বর্গগত হন, অনুমান ১৪০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন—ইহার শিষ্যগণের মধ্যে অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ, কেশবভারতী ও ঈশ্বর পুরী প্রধান। এই বৈষ্ণবচক্র শেষে চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়াছিল।

(চৈতন্যের নামের সঙ্গে নিত্যানন্দের ন্যায় আর একজনের নাম অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত, ইনি অদ্বৈতাচার্য্য। ইনি শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউর নগরে ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি চৈতন্য হইতে ৫২ বৎসরের বড় ছিলেন। রাজা গণেশের প্রধানমন্ত্রী নৃসিংহ নাড়িয়াল ইহার পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। (যাঁহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা, গৌড়ের বাৎসাহে মারি নিজে হৈল রাজা—অদ্বৈতপ্রকাশ।) লাউয়ের রাজা কৃষ্ণদাসের সভায় অদ্বৈতের পিতা কুবের তর্কপঞ্চানন মন্ত্রী ছিলেন। উত্তরকালে এই কৃষ্ণদাস অদ্বৈতের নিকট বৈষ্ণব দীক্ষা লইয়া "বাল্যলীলাসূত্র" নামক একখানি অদ্বৈতজীবন সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন। কথিত আছে অদ্বৈত লোকের নাস্তিকতা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত অন্তঃকরণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেন, সেই প্রার্থনার ফলে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। শান্তিপুরের শান্তাচার্য্য নামক এক বিখ্যাত পণ্ডিতের

নিকট পাঠ সমাপন করিয়া ইনি শান্তিপুরেই উপনিবিষ্ট হন। ইনি যেরূপ পণ্ডিত ছিলেন তেমনি ধনশালী হইয়াছিলেন। শান্তিপুরে ইঁহার রাজপ্রাসাদের ন্যায় অট্টালিকার নাম ছিল "উপকারিকা।" মুসলমান হরিদাসের সঙ্গে ইঁহার একান্ত অন্তরঙ্গতা ছিল; ইঁহার দুই স্ত্রী সীতা ও শ্রী বৈষ্ণব-সমাজে সুবিদিতা। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর চৈতন্য একবার শান্তিপুরে ইঁহার বাড়ীতে যাইয়া "উপকারিকায়," দশদিন আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন,—যখন তিনি শান্তিপুর ছাড়িয়া চলিয়া যান, তখন বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াছিলেন। চৈতন্য বলিয়াছিলেন, "তুমি নিজেই যদি এরূপ ব্যাকুল হও, তবে আমার বৃদ্ধ মাতাকে কে প্রবোধ দিবে?" কথিত আছে একদা জ্ঞানের দিকে বেশী ঝোঁক দেওয়াতে ভক্তিবাদীরা পুরীতে চৈতন্যের নিকট ইঁহার কুৎসা করিয়াছিলেন। চৈতন্য চিঠি লিখিয়া উত্তর আনাইয়া দেখাইলেন—ইনি যে প্রেমিক সেই প্রেমিকই রহিয়াছেন, শুষ্ক জ্ঞানবাদ গ্রহণ করেন নাই। অদ্বৈতের টোলে বঙ্গদেশ ছাড়াও ভারতের নানাস্থল হইতে ছাত্র পড়িতে আসিত। প্রেমবিলাসে লিখিত আছে, তাঁহার প্রেমের ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার এক মহারাষ্ট্রীয় শিষ্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যান। "অদ্বৈতাচার্য্য" তাঁহার উপাধি,—নাম ছিল—কমলাকর ভট্টাচার্য্য। শান্তিপুরে অদ্বৈতের বংশধরেরা এখনও বাস করিতেছেন। ১৪৩৪ খৃঃ অব্দে ইঁহার জন্ম এবং প্রেমবিলাসের মতে ১৫৩৯ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু। ঈশান নাগরকৃত অদ্বৈত-প্রকাশে ইঁহার মৃত্যু ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে ঘটিয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে।)

চৈতন্যের সহচর অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ ছাড়া আরও কয়েকজন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আমরা অল্পসংখ্যক কয়েকজনের উল্লেখ করিব—শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার, শ্রীবাস, রূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস, হরিদাস, প্রতাপরুদ্র, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, বাসু ঘোষ, লোকনাথ শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ, রামানন্দ রায় এবং উদ্ধরণ দত্ত।

নরহরি সরকার।

(নরহরি সরকার শ্রীখণ্ড গ্রামের পদ্মদাসবংশীয়। পদ্মদাস বল্লালসেনের প্রধান সেনাপতি ছিলেন, ইঁহার আদি নিবাস ছিল সপ্তগ্রামের নিকটবর্ত্তী বালিনছি গ্রামে; উত্তরকালে ইঁহারা শ্রীখণ্ড, মৌড়েশ্বর ও অপরাপর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইঁহাদের এক প্রধান শাখা—নীলাম্বর, দিগম্বর ও বিষ্ণুদাস ফৌজদার অনুমান ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গের এক বিস্তৃত স্থানের অধিকার পাইয়া ঢাকা জেলার সুয়াপুর গ্রামে বাস করেন। অধ্যাপক ডাঃ তমোনাশ দাশ-গুপ্ত এই বংশের বংশধর। (নরহরির পিতার নাম নারায়ণ, এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ হুসেন সাহার গৃহচিকিৎসক ছিলেন। নরহরি ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চৈতন্যদেবের গণ্ডীতে পা দিবার পূর্ব্বে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ লিখিয়া কবিযশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—তাঁহার একটি পদ এইরূপ—"আঙ্গিনায় রহিল আমার এই হিয়ার হেম হার। পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার। রোপিণু মল্লিকা নিজকরে, গাঁথিয়া ফুলের মালা পরাইও তারে…। এ বনে আসিতে তারে কইও। নরহরি ক'র এই কাম, সে সময়ে কাণে শুনাও কৃষ্ণনাম।" ইহা দশম দশা অর্থাৎ অন্তিম অবস্থার

রাধার উক্তি। চৈতন্যের প্রতি অনুরাগ হওয়ার পরে, তিনি আর রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ রচনা করেন নাই, সমস্ত পদই গৌরাঙ্গ-বিষয়ে রচনা করিয়াছেন। এই সকল পদে গৌরাঙ্গকে কৃষ্ণরূপে বর্ণনা করিয়া সহচরদিগকে গোপী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; এই গোপীভাবের ভজনা চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবন দাসের ভাল লাগে নাই—সে কথা তিনি নরহরির নাম উল্লেখ না করিয়া ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন। কিন্তু নরহরি আর একটি কাজ করিযাছেন, যাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে একটি নূতন অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দিল—ইনি শাস্ত্রবিধিমতে চৈতন্যপূজার মন্ত্র রচনা করিয়াছেন—সেই বিধি সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। নরহরিরচিত গৌরাঙ্গলীলার বহু পদ আছে—তন্মধ্যে জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় তাঁহার গৌরলীলাতরঙ্গিণীতে প্রায় একশত গান উদ্ধৃত করিয়াছেন। নরহরির বংশধরেরা শ্রীখণ্ডে "বৈষ্ণব গোঁসাই" বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের ব্রাহ্মণাদি শ্রেণীর মধ্যে বহু শিষ্য আছে। নরহরি ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে স্বর্গগত হন। চৈতন্য নরহরিকে এত ভালবাসিতেন যে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ-সময়ে প্রলাপের মধ্যে পর্য্যন্ত তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। "কখন বলেন এস প্রাণ নরহরি। হরিনাম শুনি তোরে আলিঙ্গন করি।" নরহরি-কৃত অনেক সংস্কৃত পুস্তক আছে।

শ্রীবাস।

শ্রীবাস চৈতন্য হইতে অন্ততঃ ৪০ বৎসরের বড় ছিলেন, ইঁহার মাতা মালিনী দেবী শচীর বন্ধু ছিলেন। ইঁহারা শ্রীহট্টবাসী ছিলেন, অদ্বৈত এবং শ্রীবাস একত্র হইয়া মাতৃভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীবাসের আরও তিন ভ্রাতা ছিলেন, শ্রীনিধি (শ্রীকণ্ঠ), শ্রীরাম এবং শ্রীপতি। এই ব্রাহ্মণপরিবার সঙ্গতিপন্ন ছিলেন। সেকালে ব্রাহ্মণেরা সেলাই কাপড়—অর্থাৎ জামা প্রভৃতি প্রায়ই ব্যবহার করিতেন না, কিন্তু সে সময়েও শ্রীবাসের বাড়ীতে একজন মুসলমান দরজি বারমাস নিযুক্ত ছিল। ১৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শ্রীবাস উদ্দামপ্রকৃতি ছিলেন—কুসঙ্গে মিশিতেন এবং উচ্ছৃঙ্খল হইবার পথে আসিয়াছিলেন। সেই বৎসর এক সন্ন্যাসী তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন, "শ্রীবাস, তুমি কি করিতেছ? তোমার আয়ু আর একবৎসর মাত্র আছে।" প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, শ্রীবাস দেখিলেন স্বপ্নে দৃষ্ট সেই সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া আছেন এবং তিনিও তাঁহাকে সেই সতর্কতাসূচক উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। তদবধি শ্রীবাসের সমস্ত আনন্দ ও উচ্ছৃঙ্খলতার অবসান হইল। এমন সময়ে তিনি পথে এক টুকরা কাগজ কুড়াইয়া পাইলেন, তাহাতে বৃহন্নারদীয়পুরাণোক্ত এই শ্লোকটি লিখিত ছিল—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" জলে নিমজ্জিত ব্যক্তি যেরূপ একটি তৃণ পাইলেও তাহা আঁকড়াইয়া ধরে, তিনি ঐ শ্লোকটি সেই ভাবে গ্রহণ করিলেন এবং নিরন্তর নাম জপ করিতে লাগিলেন, তাহাতে ক্রমশঃ তাঁহার মনে আধ্যাত্মিক শক্তির সঞ্চার হইল। তাঁহার কণ্ঠ অতি মিষ্ট ছিল, যখন রাস্তায় দাঁড়াইয়া তিনি ভক্তির আবেগে নাম কীর্ত্তন করিতেন, তখন তথায় ভিড় জমিয়া যাইত। দেবানন্দ পণ্ডিতের বাড়ী রোজ শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা হইত, শ্রীবাস ভক্তির উচ্ছ্বাসে চীৎকার

করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন। এই অপরাধে পণ্ডিতেরা তাঁহাকে একদিন সভা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন; পণ্ডিত-সমাজে এই উচ্ছ্বাস ও ভাবুকতা, অনুমোদিত হয় নাই। যেদিন সর্ব্বপ্রথম শচী দেবীর গৃহে যাইয়া তিনি চৈতন্যের ভক্তি দেখিলেন, সেইদিন তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় দিন। ইহার বহুপূর্ব্বে একদিন তিনি যথারীতি দেবানন্দ পণ্ডিতের গৃহে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিতে গিয়াছিলেন, সেইদিন সন্ন্যাসীর নির্দ্দিষ্ট একবৎসরের শেষ দিন, হঠাৎ তিনি মূর্চ্ছিত ও নিস্পন্দ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া সকলে তাঁহাকে বাহিরে লইয়া আসিল, এমন সময়ে কোথা হইতে সেই সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে চাপড় মারিয়া বলিলেন, "শ্রীবাস উঠ, জগতে তোমার আরও অনেক কাজ করিবার আছে—তুমি নব জন্ম পাইলে।"

চৈতন্যের ভক্তি-লীলা প্রকাশ হইবার পরেই শ্রীবাসের বিস্তৃত কুন্দ-কুসুমাকীর্ণ আঙ্গিনায় রাত্রিকালে প্রত্যহ একটি বিশিষ্ট ভক্তদল লইয়া কীর্ত্তন হইত। গঙ্গাদাস পণ্ডিত বাহির দ্বারে পাহারা দিতেন, আর কোন লোক ঢুকিতে পারিতেন না। চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই আঙ্গিনায় যে লীলা হইত, তাহা দেবলীলা। সে লীলার কথা এখনও লোকে ভুলিতে পারে নাই। সেই আঙ্গিনা এখন গঙ্গাগর্ভে, কিন্তু অদূরবর্ত্তী একটা স্থানকে "শ্রীবাসের আঙ্গিনা" নাম দিয়া গোস্বামীরা এখনও সেই পবিত্র স্মৃতি বজায় রাখিয়াছেন। এই আঙ্গিনায় একদিন কীর্ত্তন হইতেছিল, তখন শ্রীবাসের একমাত্র পুত্র মারা যায়। কিন্তু শ্রীবাসের বাড়ীর মেয়েরা ফুকরিয়া কাঁদেন নাই। শ্রীবাস যথারীতি কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহার মুখে, গলার স্বরে এবং ব্যবহারে কোনও বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই। সংকীর্ত্তনের শেষে মৃত শিশুকে পোড়াইবার জন্য বাহির করা হইল, তখন চৈতন্য এবং তাঁহার সহচরগণ সেই দুর্ঘটনার কথা প্রথম জানিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিয়াছিলেন, "পুত্রশোক না জানিল যে আমার প্রেমে। হেন তব সঙ্গ মুই ত্যজিব কেমনে" (চৈ. ভা. মধ্য, ২৫ অ)। একদা পুরীতে চৈতন্য-সংকীর্ত্তনে শ্রীবাস মহারাজ প্রতাপরুদ্রের গা ঠেলিয়া চৈতন্যের দিকে যাইতেছিলেন, তাহাতে রাজমন্ত্রী হরিচন্দন তাঁহাকে ভর্ৎসনা করাতে তিনি মন্ত্রীর গণ্ডে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন, মন্ত্রী ক্রুদ্ধ হওয়াতে রাজা তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিয়াছিলেন,—"তুমি রাগ করিও না, প্রভুর প্রতি উঁহার ভক্তির কণিকা প্রসাদ পাইলে আমরা ধন্য হইতাম।"

শ্রীবাসের আঙ্গিনায় কীর্ত্তন হইত; তিনি হরিদাস (মুসলমান) ও জাতিচ্যুত নিত্যানন্দকে দুইবৎসরকাল তাঁহার বাড়ীতে স্থান দিয়াছিলেন। এই কারণে ভট্টাচার্য্যগণ সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে শত্রুতা করিতেন। হুসেন সাহার নৌসৈন্য আসিয়া যাহাতে শ্রীবাসের আঙ্গিনা ও গৃহাদি ধ্বংস করিয়া ফেলে, এইরূপ একটা ষড়যন্ত্রও তাঁহারা করিতেছিলেন। শ্রীবাস ও তাঁহার পরিবারবর্গ চৈতন্যগতপ্রাণ ছিলেন, তাঁহারা ঐসকল কথা গ্রাহ্য করিতেন না। চৈতন্য-ভাগবতকার লিখিয়াছেন, "সপরিবারে করে তারা চৈতন্যের সেবা। শ্রীচৈতন্য বিনা নাহি মানে দেবীসেবা।" নবদ্বীপ ছাড়া শ্রীবাসের কুমারহট্টে এক বিশাল প্রাসাদ ছিল,

তথায় ভগ্ন অট্টালিকা এখনও আছে। চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন, "লক্ষীকেও যদি ভিক্ষাভাণ্ড হাতে লইতে হয়, তথাপি শ্রীবাসের সন্তানেরা দরিদ্র হইবেন না।" যখন চৈতন্য শিশু ছিলেন, তখন শ্রীবাস প্রবীণবয়স্ক, তিনি শিশু চৈতন্যকে প্রায়ই একাজ সেকাজ করিতে ফরমাইস দিতেন, একদিন চৈতন্যের হাত ধরিয়া তিনি ধমকাইয়া বলিয়াছিলেন, "কোথায় চলেছ উদ্ধতের শিরোমণি।" চৈতন্য অবশ্য কোন অন্যায় কার্য্যের দিকে অভিযান করিতেছিলেন। শ্রীবাস অনুমান ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চৈতন্য নবদ্বীপে যে অভিনয় করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীবাস নারদ সাজিয়া তাঁহার স্বরলহরীতে শ্রোতৃবর্গকে মাতাইয়াছিলেন।)

হরিদাসকে কেহ কেহ ব্রাহ্মণের পুত্র প্রমাণ করিতে চাহিয়া তাঁহার পিতামাতার নাম-ধাম সমস্ত কল্পনা করিয়াছেন, তিনি মুসলমানের গৃহে পালিত এইজন্য "যবন হরিদাস" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, এই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। এমন কি প্রাচীন লেখক জয়ানন্দও এই মত প্রচার করিয়াছেন। পরিণামে হরিদাস ব্রাহ্মণ-সমাজে গৃহীত হন, এমন কি বহু ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্য হন। মহাপ্রভুর বিয়োগের পর হিন্দুয়ানী ও জাতিভেদ আবার উদার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে, তখন তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে মুসলমান বলিয়া পরিচিত করিতে লজ্জা বোধ করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ এই জন্যই এই গল্পের উৎপত্তি, আমরা এই দেশের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা আরো অনেক জানি। যখনই কোন মুসলমান বা নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ক্ষমতাশালী হইয়া উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন, তখনই এই সকল গল্পের উৎপত্তি হইয়াছে। কুচবেহার, বনবিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানের ইতিহাসে এইরূপ প্রচেষ্টার উদাহরণ আছে। সুতরাং হরিদাস এ বিষয়ে একা নহেন।

"হরিদাস।"

(বৈষ্ণব ইতিহাসে অলৌকিক অংশ বাদ দিলে চৈতন্যভাগবতের তুল্য বিশ্বাসযোগ্য পুস্তক আর নাই। বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের সঙ্গে অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুস্তক-খানিও নিত্যানন্দের প্রেরণা ও তাঁহার সাক্ষাৎ উপদেশাদির ফলে রচিত হইয়াছিল। হরিদাস ও নিত্যানন্দ দুইজন একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং বহুদিন একগৃহে বাস করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় চৈতন্যভাগবতের প্রমাণই সর্ব্বথা গ্রাহ্য। চৈতন্যভাগবত স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন যে, কাজি হরিদাসকে বলিতেছেন, "তুমি বহুভাগ্যে মুসলমানকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমার পক্ষে কাফেরদের সঙ্গে মেশার মত অপরাধ আর নাই।" তিনি যদি ব্রাহ্মণের পুত্র হইতেন, তাহা হইলে কাজি এবং অপরাপর মুসলমানের তাঁহার প্রতি এরূপ জাতক্রোধ হইতে পারিত না। চৈতন্য-ভাগবত কিংবা চৈতন্য-চরিতামৃত এই দুই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থে হরিদাসের ব্রাহ্মণকুলে জন্মিবার গল্প নাই। হরিদাসের পিতার নাম মলয় কাজি, অম্বরা অঞ্চলে ইহাদের বিস্তৃত জমিদারী ছিল। যশোহর জেলার বনগ্রামের নিকট বুড়ন পল্লীতে হরিদাসের জন্ম হয়। ১৪৭৪ খৃঃ অব্দে শান্তিপুরে আসিয়া ইনি সংস্কৃতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন এবং অদ্বৈত কর্তৃক বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। একজন মুসলমান বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, এই সংবাদে ঘোর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, এবং ফুলিয়া গ্রামের গোরাই কাজি এবং আরও বার জন কাজি একত্র হইয়া হরিদাসের বিচার করেন।) যদি হরিনাম ত্যাগ না করেন

তবে তাঁহাকে এক একটি করিয়া ২২ বাজারে দাঁড় করাইয়া বেত্রাঘাত করিতে হইবে, এই আদেশ প্রচারিত হয়; উদ্দেশ্য—যেন এই শাস্তির ভীষণতা মুসলমানসমাজে দৃষ্টান্তস্থানীয় হয়। এই বেত্রাঘাতের ফলে হরিদাস মৃতপ্রায় হইলে তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

বেনেপোলের জমিদার রামচন্দ্র খাঁ মুসলমানদিগের শিক্ষামত ইহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করেন। যে গুম্ফায় বসিয়া হরিদাস তপস্যা করিতেন, সেইখানে তিনি এক পরমা সুন্দরী গণিকাকে পাঠাইয়া দেন। হরিদাসের নিকট গণিকা উপযাচিকা হইয়া প্রণয় প্রার্থনা করে। তিনি উত্তরে বলেন, "বেশ, আমি জপ শেষ করিয়া লই, শেষে তোমার কথা শুনিব।" সন্ধ্যা হইতে জপ সুরু করিয়া সেই জপ প্রভাতে শেষ হয়। কারণ তিনি প্রত্যহ তিন লক্ষ বার নাম জপ করিতেন। প্রভাত হওয়ার পরে তিনি গণিকাকে বলিলেন, "কাল আসিও।" কারণ প্রাতঃকাল হইতে বহু ভক্ত তাঁহার দর্শনকামী হইয়া আসিয়া গুম্ফায় ভিড় করিয়াছিল। পরদিন এবং তার পরদিনও সেইরূপ;—জপ সাঙ্গ হইতে সারারাত্রি কাটিয়া যায়— গণিকা কোন সুবিধা পাইল না। তাহার চক্ষে আর একটি জগৎ প্রকাশিত হইল, সেই ভক্তিরাজ্যের দেবোপম ইন্দ্রিয়জয়ী সংযমী পুরুষের হরিনামের প্রতি অনুরাগ, গলদশ্রু চক্ষু এবং সমাধির প্রশান্তি দেখিয়া সেই রমণী দৈহিক সৌন্দর্য্য একান্ত তুচ্ছ বলিয়া মনে করিল। হরিদাসের চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইল।

পুরীতে যথাকালে চৈতন্যদেব প্রত্যহ হরিদাসকে দেখিতে তাঁহার নিভৃত আশ্রমে যাইতেন। এই আশ্রমে কতকদিন সনাতন বাস করিয়াছিলেন। সনাতন হরিদাসকে বলিয়াছিলেন, "এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা ধর্ম্মের উপদেশ দেন, কিন্তু নিজেরা সে পথে চলেন না, আবার এমন লোকও আছেন যাঁহারা জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ কাটিয়া ফেলিয়া নিজেরা ধ্যান-ধারণায় প্রমত্ত আছেন, কিন্তু এমন লোকতো তোমার মত দেখিলাম না, যিনি ধর্ম্ম শিক্ষা দেন এবং স্বয়ং ধর্ম্মের পথে অটল, যিনি একাধারে সন্ন্যাসী ও জগতের হিতে রত।" (চৈ. চ. অন্ত্য, ৪র্থ অ.) চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন, "তোমার চিন্তাগুলি গঙ্গাধারার ন্যায় পবিত্র, তোমার আত্মা নিয়ত তাহাতে অবগাহন করে। ধর্ম্মের যে সকল শাস্ত্রসঙ্গত অনুষ্ঠান সকলে করিয়া থাকে, তোমার জীবনের প্রত্যেকটি কার্য্যই তদ্রূপ পবিত্র। তোমার নিত্য আচরিত আদর্শ বেদপাঠের পুণ্যময়। জগতে তোমার মত সাধু ও প্রকৃত ব্রাহ্মণ কোথায় পাইব?"

হরিদাস একদা চৈতন্যদেবকে বলিলেন—"আমার এ কি হইল? আমি নিত্য তিন লক্ষ নাম জপ করিয়া থাকি, কিন্তু এখন দেহে ক্লান্তি আসিয়াছে, সংকল্পিত নাম জপ করিয়া উঠিতে পারি না।" উত্তরে চৈতন্যদেব বলিলেন, "এখন বৃদ্ধ হইয়াছ, এত নাম জপ করিবার তোমার প্রয়োজন নাই। তুমি নিজে পাবন, নামজপে তোমার পাবনী শক্তি আর কি বাড়াইবে!" ১৫১০-১১ খৃষ্টাব্দে হরিদাস দেহত্যাগ করেন। তখন চৈতন্যদেব তাঁহার সম্মুখে ছিলেন. তিনি তাঁহার সমস্ত উচ্চ ব্রাহ্মণকুলজাত সহচরদিগকে মুমূর্ষু হরিদাসের পাদোদক সেবন করাইলেন এবং তাঁহার সমাধির জন্য নিজ হস্তে প্রথম মাটী খুঁড়িলেন। পুরীতে সেই

সমাধিস্থানটি আছে, তথায় যে বকুলবৃক্ষনিম্নে বসিয়া হরিদাস জপ করিতেন, সেই বৃক্ষটি এখনও আছে, উহার কাণ্ড নাই, মূল ত্বকের উপর গাছটি দাঁড়াইয়া আছে। প্রায় ৪৫০ বৎসরের বৃক্ষটি দেখিলেই তাহার প্রাচীনত্ব প্রতীয়মান হইবে। আমি এমন গাছ আর দেখি নাই।

হরিদাস বৈষ্ণব-সমাজে যে আদর, শ্রদ্ধা ও পূজা পাইয়াছিলেন, তাহা অপূর্ব্ব। এই মুসলমান সাধু বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণদের সঙ্গে শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে এক পঙ্ক্তিতে বসিয়া আহার করিতেন, এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের বিদায় প্রাপ্ত হইতেন। মৃত্যুকালে হরিদাসের বয়স কিঞ্চিন্ন্যূন ৭০ বৎসর হইয়াছিল।

লোকনাথ গোস্বামী চৈতন্যের সতীর্থ ছিলেন। ইঁহার পিতা পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী যশোর জেলায় তালগড়িয়া গ্রামের অধিবাসী, ইঁহার মাতার নাম সীতা। ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। যখন চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন ইনি চৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু চৈতন্য ইঁহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। বৃন্দাবনতীর্থ লুপ্তগৌরব হইয়া একটা অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল, এই তীর্থকে পুনরায় পূর্ব্ব-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চৈতন্য অত্যন্ত প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তদনুসারে রূপ, সনাতন, ভূগর্ভ ও লোকনাথকে তিনি বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। যাত্রাকালে লোকনাথ বলিয়াছিলেন, "তোমার মুখদর্শনের ন্যায় তোমার সঙ্গলাভের ন্যায়—সুখ আমার নাই—তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া তুমি আমাকে এখানে পাঠাইলে" (প্রেমবিলাস)। চৈতন্যদেব বলিলেন—"তোমার ও আমার ভাগ্যে বিধাতা সংসারের সুখ লেখেন নাই।" যখন লোকনাথ বৃন্দাবন গমন করেন, তখন পথ অতীব বিঘ্নসঙ্কুল ছিল। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে বাদসাহদের লড়াই চলিতেছিল। ভূগর্ভ ও লোকনাথ তাজপুরের পথ ধরিয়া পূর্ণিয়া গিয়াছিলেন। তথা হইতে লক্ষ্ণৌ দিয়া নবদ্বীপ হইতে ২৩ দিন ভ্রমণের পর তিনি বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াছিলেন। লোকনাথ মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্যে যাত্রা শুনিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন, পথে শুনিলেন তিনি বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিয়াছেন; বৃন্দাবনে গিয়া শুনিলেন, তিনি তথা হইতে চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সঙ্গে আর লোকনাথের দেখা হয় নাই; বাঙ্গলা ও উড়িষ্যায় তাঁহার আসা নিষিদ্ধ হইয়াছিল, কারণ তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। লোকনাথের মত নীরব কর্ম্মী এবং নির্লোভ সাধু বৈষ্ণব ইতিহাসে খুব বেশী নাই। তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজকে চৈতন্যচরিতামৃত লেখায় অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু কবিরাজকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছিল যে তিনি তাঁহার পুস্তকে তাঁহার নামোল্লেখ করিতে পারিবেন না। তিনি একান্তভাবে প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন, এজন্য কোন শিষ্য গ্রহণ করেন নাই। শেষকালে নরোত্তমের গভীর অনুরাগ, দৈন্য ও মিনতি এড়াইতে না পারিয়া সেই একটি মাত্র লোককে তিনি মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছিলেন। লোকনাথ দীর্ঘজীবন বৃন্দাবনে কাটাইয়াছিলেন, তথায় তাঁহার স্মৃতি এখনও বিশেষভাবে পূজিত।

লোকনাথ গোস্বামী।

দাক্ষিণাত্যের কোন রাজকুলে **রূপ, সনাতন ও অনুপম** (অপর নাম বল্লভ)

এই তিন ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের অবস্থার অবনতি হওয়াতে ইহারা ইহাদের পিতৃবন্ধু বাঙ্গলার পাঠান নৃপতিদিগের সভায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। সনাতন ছিলেন পরম পণ্ডিত, সংস্কৃত, পারসী ও আরবীতে তাঁহার মত সুপণ্ডিত সেকালে দুর্লভ ছিল। রূপের অসামান্য কবিত্বশক্তি ছিল এবং তিনিও নানাশাস্ত্রবিৎ ছিলেন। অধিকন্তু রূপের হাতের লেখা ঠিক মুক্তার মত ছিল। চৈতন্য কতবার তাঁহার সুন্দর হস্তলিপির প্রশংসা করিয়া বলিতেন, "রূপের আখর যেন মুকুতার পাঁতি।" দুই ভ্রাতাই ব্রাহ্মণকুলে জন্মিলেও কতকটা মুসলমান-ধর্ম্মানুরাগী এবং আচার-ব্যবহারে ঠিক মুসলমানের মত হইয়া গিয়াছিলেন। ইঁহারা হিন্দু নাম ত্যাগ করিয়া মুসলমান উপাধিতে পরিচিত হইয়াছিলেন। সনাতন ছিলেন হুসেন সাহের প্রধান মন্ত্রী এবং রূপ সম্রাটের লেখা-পড়ার দপ্তরে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। সনাতনের উপাধি ছিল "সাকর মল্লিক" এবং রূপ "দবির খাস" নামে পরিচিত ছিলেন। ইঁহাদের হিন্দু নাম ছিল অমর ও সন্তোষ। তৃতীয় ভ্রাতা অনুপম একটি মাত্র পুত্র (জীব গোস্বামী) রাখিয়া অকালে প্রাণত্যাগ করেন। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে চৈতন্য বৃন্দাবনের পথে গৌড়ের নিকটবর্ত্তী রামকেলী নগরে উপস্থিত হন, তখন রূপ ও সনাতন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। উভয় ভ্রাতারই জীবনে এই স্মরণীয় দিনে যে মহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা বৈষ্ণব-সমাজের একটা গুরুতর ঘটনা। চৈতন্য সনাতনের সঙ্গে আলাপ করিয়া মুগ্ধ হন, যদিও সেই দিনই সনাতন তাঁহাকে মনুষ্য-দেবতা বলিয়া গ্রহণ করেন, তথাপি তাঁহাকে তিনি সুস্পষ্ট ভাবে উপদেশ দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। এদিকে রামকেলীতে চৈতন্যদর্শনের জন্য লক্ষাধিক লোকের ভিড় হওয়াতে হুসেন সাহ কেশব ক্ষেত্রী নামক এক রাজকর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া দেন। একজন তরুণবয়স্ক সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য এত লোক জমিয়াছে কেন—এই বিষয়ে বিস্তারিত সংবাদ জানিবার ভার কেশবের উপর ছিল। কেশব ফিরিয়া গেলে হুসেন সাহ তাঁহাকে চৈতন্যসম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেন, চৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিত আছে যে, এই সকল প্রশ্নের উত্তরে সম্রাট্ যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে চৈতন্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, ইহাই বুঝা যায়। এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া সনাতন চৈতন্যকে বলিলেন, "আপনি সন্ন্যাসী, তীর্থদর্শনে যাইবেন, অথচ সহস্র সহস্র লোক উৎসবানন্দ করিয়া আপনার পিছনে পিছনে ছুটিয়াছে—মনে হইতেছে যেন কোন রাজাধিরাজ সমারোহপূর্ব্বক যাইতেছেন, ইহা আপনার যোগ্য নহে। দ্বিতীয়তঃ হুসেন সাহ অতি খামখেয়ালী সম্রাট্, সেদিনও উড়িষ্যায় কতকগুলি দেবমন্দির ও বিগ্রহ ভাঙ্গিয়া আসিয়াছেন। যদিও এখন আপনার উপর তাঁহার ভাল ভাব—কিন্তু ইহার ভাবান্তর হইতে এক মুহূর্ত্ত লাগে না। এত সমারোহ যদি তিনি প্রীতির চক্ষে না দেখেন এবং কেহ যদি কুপরামর্শ দেয়, তবে আপনার প্রতি অত্যাচার হইতে পারে—সুতরাং আপনি ফিরিয়া যাউন।" চৈতন্যের সঙ্গে যে লক্ষাধিক লোক চলিয়াছিল, কীর্ত্তনানন্দে যে দিঙ্মণ্ডল নিরবধি প্রতিধ্বনিত হইতেছিল—চৈতন্যের সে দিকে মোটেই লক্ষ্য ছিল না, অনেক সময়েই তিনি এ রাজ্যে থাকিয়াও অপররাজ্যে বাস করিতেন। সনাতনের কথায় তাঁহার এদিকে দৃষ্টি পড়িল, তিনি পুরী ফিরিয়া চলিলেন।

সনাতন ও রূপ।

যাইবার পূর্ব্বে তিনি সনাতনের "সাকর মল্লিক" নাম ঘুচাইয়া তাঁহার "সনাতন" নাম দিয়া গেলেন এবং "দবির খাস"কেও "রূপ" নামে পরিচিত করাইলেন। চৈতন্য বলিয়া গেলেন, যেন পুরীতে ইহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। গৌড়ে ফিরিয়া সেই রাত্রে রূপ রাজকার্য্যাবসানে স্বগৃহে শয়ন করিয়াছেন। মধ্যরাত্রে তাঁহার পায়ে একটা বিষাক্ত কীট দংশন করে। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে জাগাইয়া একটা আলো জালিতে বলেন; ব্যস্তভাবে স্ত্রী জাগিয়া উঠিয়া অন্ধকারে মোমবাতি হাতের কাছে না পাইয়া রূপের বহুমূল্য একটা পরিচ্ছদের মধ্যে আগুন ধরাইয়া ফেলেন। রূপ বলিলেন, "তুমি আমার এত দামের পোষাকটা নষ্ট করিলে?" স্ত্রী বলিলেন, "তোমার ইষ্ট ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা যেখানে, সেখানে এই ঘরবাড়ী, বহুমূল্য পোষাক আমার কাছে অতি তুচ্ছ কথা।" রূপ মনে ভাবিলেন, "ইহার প্রভুর সেবা ত এ সর্ব্বস্ব দিয়া করিতে প্রস্তুত! আমার প্রভুর সেবার জন্য আমি কি করিয়াছি বা করিতেছি? আমি তো ঘরবাড়ী-বিষয় লইয়াই আছি।" চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার পর তাঁহার হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে যে স্বর্গীয় প্রেমের চিঠি লিখিত হইয়াছিল, এই তুচ্ছ ঘটনায় তাহার বার্ত্তা উজ্জ্বল হইয়া তাঁহার মনে পৌঁছিল। তিনি সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার বিপুল বিষয়ের এক-চতুর্থাংশ ব্রাহ্মণদিগকে, এক-চতুর্থাংশ দুঃখিদরিদ্রদিগকে, অপর দুই অংশের একাংশ পরিবারবর্গকে এবং অপরাংশ সনাতনকে লিখিয়া দিলেন; সঙ্গে একটুকরা কাগজে একটি শ্লোক সনাতনকে লিখিয়া গেলেন তাহা সর্ব্বত্র পরিচিত; প্রথম ছত্রটি এইরূপ " যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।"

রূপ পুরী আসিয়া চৈতন্যের সঙ্গে দেখা করিলেন—রূপ সংস্কৃতে যে দুইখানি নাটক লিখিতেছিলেন, তাহার সম্বন্ধে চৈতন্যের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল। রূপ একই নাটকে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা ও মথুরার কাহিনী লিখিতেছিলেন। চৈতন্য ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে মাধুর্য্য জড়াইতে নিষেধ করিয়া রূপের পরিকল্পিত উপাদানে দুইখানি নাটক লিখিতে উপদেশ দিলেন। তাহার ফলে আমরা বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব—মধ্যযুগের সংস্কৃত-সাহিত্যের কোহিনুরসদৃশ এই দুইখানি নাটক পাইয়াছি। ঐশ্বর্য্য হইতে মাধুর্য্য বিচ্যুত হইবার পর হইতে কৃষ্ণলীলায় এক নবভাব আবিষ্কৃত হইয়াছে, বঙ্গদেশ ভিন্ন আর কোথায়ও সেই রস প্রগাঢ়ভাবে আস্বাদিত হয় নাই।

রূপ আরও অনেকগুলি সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন, তন্মধ্যে দানকেলীকৌমুদী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ। বৃন্দাবনে ইনি যে ভাবে জীবনযাপন করেন, তাহা সন্ন্যাসীর আদর্শ জীবন।

সনাতন রূপের চিঠিটুকু লইয়া ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহারও মন হইতে বিষয়তৃষ্ণা দূর হইয়াছিল। চৈতন্যের দর্শনাবধি তিনিও বর্ষণোন্মত্ত মেঘের ন্যায় কোন সুযোগের সন্ধান লইয়া রাজসভায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজকার্য্যে মন নাই, ক্রমে কয়েক দিন রাজসভায় উপস্থিত হন না। রাজার মনে সন্দেহ হইল, হয়ত রূপের মত ইনিও পালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। রাজা তাঁহাকে ডাকাইয়া তাঁহার সঙ্গে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। সনাতন স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন, "আপনি হয়ত কোন দেবমন্দির ভাঙ্গিবেন—হিন্দুর ধর্ম্মে হাত দিবেন, এমন কার্য্যের জন্য আমার সহায়তা চাহিবেন না।

আপনার অনেক মুসলমান মন্ত্রী আছেন, তাঁহাদের কাহাকেও লইয়া যাউন।" হুসেন সাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। এদিকে সনাতনও রাজসভার কাজ প্রায়ই উপেক্ষা করেন, এবং সভায় উপস্থিত হন না। সম্রাট্ রাজবৈদ্য পাঠাইয়া জানিতে চাহিলেন, সত্যসত্য সনাতনের কোন অসুখ হইয়াছে কি না। ভিষক্ জানাইলেন, সনাতন দিব্য সুস্থ দেহে আছেন। হুসেন তাঁহার প্রধান মন্ত্রী সনাতনকে এবার কারাগারে পাঠাইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য গৌড় ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। ১০০০৲ টাকা ঘুষ দিয়া সনাতনের আত্মীয়েরা কারাধ্যক্ষ মীর হাবুলের নিকট হইতে সনাতনের মুক্তিলাভ করাইলেন। বন্দীরা গঙ্গায় স্নানার্থ মাঝে মাঝে নীত হইতেন। সেই সুযোগে সনাতন পলাইলেন, তাঁহার জন্য নৌকা প্রতীক্ষা করিতেছিল। এদিকে মীর হাবুলও খুব সতর্ক অনুসন্ধানের একটা বাহাড়ম্বর করিয়া কিছুতেই তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না। ঈশান নামক একটি ভৃত্যের সঙ্গে সনাতন সন্ন্যাসীর বেশে গৌড় ছাড়িয়া পলাইলেন। ঈশান গোপনে ১৫টি স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে লইয়াছিল। গঙ্গা পার হইয়া সনাতন পাত্র নামক একটি ছোট পাহাড়ের নিকট এক পল্লীতে জনৈক "ভুঁইয়ার" বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। এই ভুঁইয়ার অতিরিক্ত আপ্যায়ন ও ভদ্রতায় সনাতনের মনে সন্দেহ হইল। তিনি ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার সঙ্গে কোন অর্থ আছে কিনা। ঈশান সেই ১৫টি মোহর তাঁহার হাতে দিল। তিনি উহা ভুঁইয়াকে দিলেন। ভুঁইয়া অকপটে বলিল, "ইহা দিয়া ভালই করিয়াছেন, নতুবা আজ রাত্রেই আমরা আপনা-দিগকে হত্যা করিতাম।" দয়ার শিরোমণি ভুঁইয়া ঐ অর্থ হইতে একটি মোহর পথখরচের জন্য সনাতনকে ফিরাইয়া দিল। সনাতন উহা ঈশানকে দিয়া তাহাকে বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিলেন। সমগ্র বাঙ্গলা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী কৌপীন পরিয়া একক ছুটিয়াছেন। পথে এক ময়দানে তিনি কতকগুলি মাটির ডেলা দিয়া শিয়রের বালিশ ও পাশবালিশ প্রস্তুত করিয়া শুইয়াছিলেন। জলের ঘাটের যাত্রী কোন মহিলা তাঁহাকে দেখিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল, "সন্ন্যাসী হইয়াছেন, কিন্তু ভোগের অভ্যাস যায় নাই।" সনাতন বুঝিলেন, বহুদিনের অভ্যাস হইতে মুক্ত হওয়া অতি কঠিন। তিনি সেই মহিলাকে ধন্যবাদ দিয়া চলিলেন। হাজিপুরে একটা খড়ের গাদার নীচে শীতের রাত্রে তিনি উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী একটা বড় বাড়ী সনাতনের ভগ্নীপতি শ্রীকণ্ঠ ভাড়া লইয়াছিলেন। হুসেন সাহ তাঁহাকে সেখান হইতে ঘোড়া কিনিবার জন্য তিন লক্ষ টাকা দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীকণ্ঠ সনাতনের চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন, তিনি তাড়াতাড়ি যাইয়া সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। দেখিলেন গৌড় রাজ্যের সামন্ত রাজারা যাঁহার নিত্য দ্বারস্থ থাকিতেন, সেই রাজচক্রবর্ত্তিসদৃশ মহামন্ত্রীর কটিতে কৌপীন-বাস।

পৌষমাসের শীতে তাঁহার ক্ষীণদেহ কাঁপিতেছে—নগ্নদেহ, অথচ মুখখানি প্রেমসরোবরের শতদলের মত আনন্দে চলচল। শ্রীকণ্ঠ তাঁহাকে ফিরাইতে বহু চেষ্টা করিলেন, পাশে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে সেই দারুণ শীত নিবারণের জন্য শালদোশালা দিতে চাহিলেন, কিন্তু কুসুম হইতেও মৃদু এবং বজ্র হইতেও কঠোর এই লোকোত্তরগণের চরিত্র।

শ্রীকণ্ঠের বহু অনুনয়ে বাধ্য হইয়া তিনি তিনটাকা মূল্যের একখানি ভোট কম্বল গায়ে পরিতে স্বীকৃত হইলেন। সনাতন কাশীতে যাইয়া চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। শীতকাল, তবু সকল সন্ন্যাসীরই নগ্নদেহ, শীতবাত উপেক্ষা করিয়া লতাটির গায়ে শত শত ফুল ফোটে—চৈতন্য সেইরূপ ভক্তি-সরোবরের সরস পদ্মের ন্যায় ফুটিয়া আছেন। সনাতনের লজ্জা বোধ হইল, কারণ "ভোট কম্বলের পানে প্রভু চাহে বার বার।" কম্বলখানি এক ভিক্ষুককে দিয়া সনাতন লজ্জার হাত এড়াইলেন। কাশীতে সনাতন চৈতন্যদেবকে বলিলেন, "আমার এই দেহ-মন আপনাকে সমর্পণ করিলাম।" কাশী হইতে রূপের সঙ্গে দেখা করিতে সনাতন বৃন্দাবনে গেলেন, তথা হইতে চৈতন্যের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছায় পুনরায় পুরীর দিকে রওনা হইলেন। পথে ঝারিখণ্ডের বন, ছোট নাগপুর। জঙ্গলের পথে নিতান্ত অপরিষ্কার ডোবার জলে স্নান করার ফলে সনাতনের সোণার কান্তি ম্লান হইল। গা-ভরিয়া ফোড়া হইল—এই অবস্থায় পুরীতে আসিয়া তিনি হরিদাসের আশ্রমে অতিথি হইলেন। গা-ময় ফোড়া, তিনি চৈতন্যের সঙ্গে দেখা করিতে সাহসী হইলেন না, কিন্তু চৈতন্য তাঁহাকে আবিষ্কার করিয়া টানিয়া আনিয়া বাহির করিলেন এবং ঘন ঘন আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। সনাতনের শরীরের রক্ত-পূঁযে চৈতন্যের শরীর আপ্লুত হইল। সনাতন লজ্জিত হইলেন, তিনি সঙ্কল্প করিলেন, আষাঢ় মাসে জগন্নাথের রথযাত্রার সময়ে তিনি রথের চাকার নীচে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিবেন—কারণ তিনি বিধর্ম্মী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার শরীর ব্যাধিদুষ্ট। একদিন চৈতন্যের নিত্যসহচর জগদানন্দকে সনাতন তাঁহার কলঙ্কিত দেহস্পর্শে চৈতন্যের দেহের গ্লানি হইতেছে, এই কথা অতি দুঃখিত ভাবে বলিলেন। চৈতন্য যে সনাতনকে আলিঙ্গন করেন ইহা জগদানন্দের ভাল লাগিত না। জগদানন্দ বলিলেন, "আপনার মথুরায় যাওয়াই উচিত।"

সেদিন মহাপ্রভু সনাতনকে আবার টানিয়া আনিয়া আলিঙ্গন করাতে সনাতনের মুখ শুকাইয়া গেল। চৈতন্য বলিলেন, "তুমি জগন্নাথের রথের নীচে প্রাণত্যাগ করিবে? আত্মহত্যার পাপসঙ্কল্প করিয়াছ? তুমি তো কাশীতে তোমার দেহ-মন আমাকে দিয়াছ, এই দেহের উপর তোমার কোন অধিকার নাই।" এই বলিয়া তাঁহাকে পুনরায় আলিঙ্গন করায় চৈতন্যের দেহ রক্তাক্ত হইল। সনাতন লজ্জায় মরিয়া গেলেন। চৈতন্য বলিলেন, "তোমার দেহ মন্দির, উহার স্পর্শে আমার পাপ দূর হইল।" সনাতনকে মথুরা যাওয়ার পরামর্শ দেওয়ার জন্য তিনি জগদানন্দকে ভৎর্সনা করিলেন। আর একদিন রাজপথ দিয়া না যাইয়া চৈতন্যের আহ্বানে সনাতন উত্তপ্ত বালুকার পথ দিয়া গিয়াছিলেন; তাঁহার পায়ে ফোস্‌কা পড়িয়াছিল। চৈতন্য বলিলেন, "রাজপথ দিয়া আস নাই কেন?" সনাতন বলিলেন, "ব্রাহ্মণদের হয়ত আপত্তি হইতে পারে।" চৈতন্য বলিলেন, "তোমার স্পর্শে দেবতারাও পবিত্র হইতে পারেন, তথাপি তুমি মন্দিরের আচার-ব্যবহারের প্রতি এরূপ সতর্ক, তোমার দৈন্য জগতে অতুল্য।" সনাতন চৈতন্যের উপদেশ লইয়া "হরিভক্তি-বিলাস" নামক স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন, ইহা এখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একমাত্র অবলম্বন। ধর্ম্মচ্যুত ব্যক্তির রচিত এই পুস্তক পাছে সমাজে গৃহীত না হয়, এজন্য এই পুস্তক সনাতনের ইচ্ছাক্রমে

গোপাল ভট্টের নামে চলিয়াছিল। কিন্তু চৈতন্য-চরিতামৃতের লেখক এবং জীব গোস্বামী তাঁহাদের গ্রন্থে এই পুস্তকের রচনাসম্বন্ধে সকল কথা লিখিয়া জানাইয়াছেন। সনাতন বৃন্দাবনের প্রকৃত উদ্ধারকর্ত্তা। রূপ ও সনাতনের দুশ্চর তপস্যা সে অঞ্চলে সর্ব্বজনবিদিত, ভক্তমাল গ্রন্থে তাহা উল্লিখিত আছে। সম্রাট্ আকবর সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং মহারাজ মানসিংহ বহুব্যয়ে বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর যে মন্দির স্থাপন করেন, তৎসংলগ্ন প্রস্তরফলকে লিখিত আছে যে, ভক্ত রাজা তাঁহার গুরু রূপ ও সনাতনের আদেশে ঐ মন্দির রচনা করেন। রামদাস কাপুরি নামক বণিকের জাহাজ নদীর চড়ায় আটকাইয়া যায়, তিনি সনাতনের বিগ্রহ মদনমোহনের নিকট মানত করেন—জাহাজের উদ্ধার হইলে তিনি একলক্ষ টাকা ব্যয়ে বৃন্দাবনে উক্ত বিগ্রহের মন্দির স্থাপন করিবেন। বণিকের প্রতিশ্রুত অর্থে বিগ্রহের জন্য মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই দুইজন নগ্নদেহ সন্ন্যাসীর কৃপায় বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার হয় এবং উহা শত সৌধমালায় বিভূষিত হয়। চৈতন্য-চরিতামৃত-কার লিখিয়াছেন, দুই ভ্রাতার থাকিবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না। পাছে কোন স্থান-বিশেষের প্রতি আসক্তি জন্মে, এইজন্য "একৈক বৃক্ষের নীচে" এক রাত্রি শয়ন করিতেন, কৌপীন ও কম্বলমাত্র সম্বল ছিল, মুষ্টিভিক্ষা যথেষ্ট ছিল এবং দিনরাত্র কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন ও তৎসঙ্গে নর্ত্তন করিতেন। সনাতনরচিত বহু সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। রাজপুতনার অনেক রাজা সনাতনের শিষ্য হইয়াছিলেন, সে অঞ্চলে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে। ভক্তমালে লিখিত আছে তিনি একটা পরশপাথর পাইয়া তাহা অস্পৃশ্য বলিয়া যমুনার জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, সম্রাট্ আকবর যমুনার জলে হাতী নামাইয়া তাহার খোঁজ করিয়াছিলেন (গ্রাউসের মথুরার ইতিহাস দ্রষ্টব্য)। উত্তরকালে রূপ ও সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামী বৃন্দাবনে বৈষ্ণব-সমাজের কর্ণধার হইয়াছিলেন।

রঘুনাথ দাস।

ষোড়শ শতাব্দীতে সপ্তগ্রাম বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। অতি প্রাচীন কালেও ইহার খ্যাতি য়ুরোপ পর্য্যন্ত প্রচারিত ছিল। রোমানদিগের "গ্যাঙ্গা রিডিয়া" বোধ হয় এই সপ্তগ্রাম-অঞ্চল, সরস্বতী নদী শুকাইয়া যাওয়াতে এই নগর ধ্বংস পাইয়াছে। পুরাকালে কনোজের কোন রাজার সাত পুত্রের নামে এই গ্রামের নাম সপ্তগ্রাম হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ। গৌড়ের পাঠান রাজার অধীন এক শাসনকর্ত্তা সপ্তগ্রাম শাসন করিতেন। কিন্তু এই বাণিজ্যকেন্দ্রের বিপুল আয় থাকার দরুন শাসনকর্ত্তারা প্রায়ই প্রবল হইয়া গৌড়ের বিদ্রোহী হইতেন। এইজন্য বাদশাহ শাসনকর্ত্তা উঠাইয়া দিয়া সপ্তগ্রাম জমিদারীর মত হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন নামক দুই ভ্রাতাকে ইজারা দিয়াছিলেন। দুই ভ্রাতাকে গৌড়ে বাৎসরিক ৮ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতে হইত, ইহা ছাড়াও এই সম্পত্তির আয় অতি বিপুল ছিল। জাহাজের উপর যে কর স্থাপিত হইত তাহাও একটা বড় রকমের আয়ের পথ হইয়াছিল। রাজস্ব ছাড়াও দুই ভ্রাতা প্রায় ১২ লক্ষ টাকা বৎসরে নিজেরা পাইতেন। ষোড়শ শতাব্দীতে বারলক্ষ টাকা একটা সামান্য কথা ছিল না। হিরণ্যের কোন সন্তান ছিল না, গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথই এই বিশাল সম্পত্তির একমাত্র

উত্তরাধিকারী ছিলেন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন উভয়েই সংস্কৃত, আরবী ও পার্শীতে কৃতবিদ্য ছিলেন। গোবর্দ্ধনের মত দাতা এদেশে কেহ ছিল না এরূপ প্রবাদ আছে,—"মর্ত্তে গোবর্দ্ধন দাতা" (সংগীত-মাধব)। বলদেব আচার্য্য নামক এক শিক্ষকের উপর রঘুনাথের শিক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল। বলদেব "যবন হরিদাসে"র প্রিয় শিষ্য ছিলেন এবং সর্ব্বদা চৈতন্যের গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিতেন। এই সময় হইতেই বালক রঘুনাথের মনে চৈতন্যের মূর্ত্তি একখানি দেবমূর্ত্তির ন্যায় অঙ্কিত হইয়া যায়। ১৫১০ খৃঃ অব্দে চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই বার্ত্তা তড়িদ্‌গতিতে সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। ভ্রাতৃদ্বয়ের রাজসভায় চৈতন্যের কথা প্রায়ই হইত, বালক রঘুনাথ গৃহের এককোণে বসিয়া সেই করুণ কাহিনী শুনিয়া অশ্রুপাত করিতেন, তিনি ষোড়শ বৎসর বয়সে একান্ত উন্মনা হইয়া গেলেন, রাজপ্রাসাদ তাঁহার ভাল লাগিত না, একাকী নির্জ্জনে থাকিতেন। পিতা ও খুল্লতাত আশঙ্কা করিলেন, ছেলেটি পাছে চৈতন্যের মত পাগল হইয়া সংসার ত্যাগ করে,—এইজন্য তাঁহারা কয়েকটি সৈনিক ও দুইজন ব্রাহ্মণ তাঁহার কাছে সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখিলেন। ব্রাহ্মণেরা গার্হস্থ্য কর্ত্তব্যনীতি তাঁহাকে ভাল করিয়া শিখাইবেন—এই ভার তাঁহাদের উপর ছিল। চৈতন্যের সন্ন্যাসের পর রঘু পিতাকে বলিলেন, তিনি চৈতন্যদেবকে দেখিতে যাইবেন। বাড়ীর সকলে প্রমাদ গণিলেন, এইবার বুঝি পাখী শিকল কাটিয়া বাহির হয়। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন সহজে সম্মতি দিলেন না। কিন্তু রঘুনাথ বলিলেন, চৈতন্যকে দেখিতে না পাইলে তিনি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন। ইঁহার ভাব দেখিয়া তাঁহারা বুঝিলেন—উহা ভীতি-প্রদর্শন নহে, বালক সত্যসত্যই ঐরূপ কিছু করিতে পারে,—কারণ চৈতন্যের নাম শুনিলেই তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয় এবং তিনি স্নান-ভোজন একরূপ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বাধ্য হইয়া কয়েকজন অশ্বারোহী সৈন্য ও অপরাপর লোকজন সহ গোবর্দ্ধন রঘুনাথকে চৈতন্যের নিকট পাঠাইয়া দিলেন; চৈতন্য তীব্রভাষায় তাঁহাকে গঞ্জনা দিয়া বলিলেন, "তুমি অকালে এই আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিবে না—আগে সংসারের কর্ত্তব্য অনাসক্ত হইয়া সম্পাদন কর—তবে সন্ন্যাসের যোগ্যতা জন্মিবে। এখন যে বৈরাগ্য দেখাইতেছ, তাহা মর্কট-বৈরাগ্য, তুমি গৃহে চলিয়া যাও এবং সমস্ত কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া যোগ্যতা অর্জ্জন কর।" রঘুনাথ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। বাঙ্গলার প্রতি পল্লী তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধানপূর্ব্বক পরমা সুন্দরী এক কন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। পিতা ও পিতৃব্য দেখিলেন, তাঁহার সম্পূর্ণ ভাবান্তর হইয়াছে। তিনি সুবোধ ও শান্ত ছেলেটির মত সর্ব্বদা তাঁহাদের অধীন হইয়া বিষয়কর্ম্ম করিতেছেন। এই সময়ে সপ্তগ্রামের ভূতপূর্ব্ব মুসলমান শাসনকর্ত্তা হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা কথা বাদশাহের হুজুরে জানাইল। বাদশাহ ভ্রাতৃদ্বয়কে ধরিয়া আনিবার জন্য ফৌজ পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা বাড়ী ছিলেন না—ফৌজগণ রঘুনাথকে ধরিয়া লইয়া গেল। বাদশাহ বলিলেন, "তোমার পিতা ও খুড়া সপ্তগ্রাম হইতে বহু অর্থ অর্জ্জন করে এবং আমাকে ফাঁকি দেয়। তুমি তাঁহারা কোথায় আছেন বলিয়া দেও, নতুবা ভীষণ শাস্তি পাইবে।" রঘুনাথের মুখে চোখে অপর এক রাজ্যের জ্যোতি, তাঁহার কণ্ঠস্বরে স্বর্গের মাধুর্য্য, কথায় অপূর্ব্ব

লালিত্য, চোখে বিশ্বপ্রেম—তিনি যে সকল কথা বলিলেন তাহাতে বাদশাহের মন স্নেহরসে আর্দ্র হইল, তাঁহার দাড়ি বহিয়া চোখের জল পড়িতে লাগিল। কতকগুলি সামান্ত সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়া রঘুনাথ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এই যে কঠোর কর্ম্মীর বেশ—ইহাতো রঘুনাথের নিতান্ত ছদ্মবেশ ছিল, ভিতরে ভিতরে তিনি অনাসক্ত যোগীর মত থাকিয়া চৈতন্তের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেছিলেন। এই সময়ে রঘুনাথ পানিহাটী গ্রামে আসিয়া নিত্যানন্দের সঙ্গে দেখা করেন। তিনমাসব্যাপী কীর্ত্তনানন্দে পানিহাটীর আকাশ নারদের বীণাভিনন্দিত বৈকুণ্ঠের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছিল। রঘুনাথ বুঝিলেন—রাজপ্রাসাদ তাঁহার স্থান নহে, ইহাই তাঁহার প্রকৃত নিকেতন। নিত্যানন্দ বলিলেন, "চোরা তোকে এবার ধরে ফেলেছি। তোকে দণ্ড দিব।" সংসারে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হইয়াও আসক্তির ভান দেখাইতেছিলেন, এই মিথ্যাচরণের জন্য তিনি 'চোরা' উপাধি পাইয়াছিলেন। যাহা হউক রঘুনাথ দণ্ডগ্রহণ করিলেন। সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের জন্ত মহোৎসবের ব্যবস্থা করিলেন, এই উপলক্ষে তাঁহার বহু ব্যয় হইয়াছিল। তৃপ্তির সহিত ভোজন ছাড়া প্রধান বৈষ্ণবেরা সকলেই যথাযোগ্য দক্ষিণা পাইয়াছিলেন,—নিত্যানন্দের জন্ত সাত তোলা সোণা এবং একশত টাকা প্রণামীর ব্যবস্থা হইল। নিত্যানন্দ রাঘবপণ্ডিতের গৃহে ছিলেন, তিনি পাইলেন একশত টাকা প্রণামী ও দুইতোলা সোণা, ইহা ছাড়া লক্ষ লক্ষ বৈষ্ণবকে তিনি ২০৲ টাকা হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। এই উৎসবের নাম "দণ্ড-মহোৎসব।" অদ্যাবধি প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে কলিকাতার সন্নিহিত পানিহাটী গ্রামে এই উৎসব হইয়া থাকে।

এবার গৃহে ফিরিয়া রঘুনাথ পুনরায় ঔদাসীন্ত দেখাইতে লাগিলেন, তিনি অন্তঃপুরে শোওয়া ছাড়িয়া দিলেন, তাঁহার আহার ও নিদ্রা একেবারে গেল। বহুসৈন্য-পরিবেষ্টিত হইয়া রাজপ্রাসাদে তিনি বন্দীর মত হইয়া রহিলেন। তাঁহার মাতা একদিন গোবর্দ্ধনকে বলিয়াছিলেন, "ইহাকে একটা থামের সঙ্গে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখ, তবে পলাইতে পারিবে না।" গোবর্দ্ধন বলিলেন, "ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরাসম, এসকল বাঁধিতে নারিল যার মন,—দড়ির বাঁধনে তাঁরে বাঁধিব কেমনে?" সতর্ক পাহারার চোখ এড়াইয়া কুলগুরু যদুনন্দন আচার্য্যকে ফাঁকি দিয়া ১৯ বৎসর বয়সে রঘুনাথ গৃহ ত্যাগ করিলেন, তিনি একদিনে শুধু-পায়ে ত্রিশ মাইল হাঁটিয়া রাত্রে একটা পরিত্যক্ত গরুর গোয়ালে কাটাইলেন। তারপরে যাত্রাভোগ হইয়া শারণে আসিলেন। পুরীতে আসিতে তাঁহার ১২ দিন লাগিয়াছিল। তখন কাশী মিশ্রের বাড়ীতে চৈতন্ত ছিলেন। মুকুন্দ দত্ত অঙ্গুলিদ্বারা রঘুনাথকে দেখাইয়া মহাপ্রভুকে বলিলেন, "ঐ দেখুন, আমাদের রঘু আসিয়াছে, আহা! কত কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে!" চৈতন্ত স্বরূপ-দামোদরের উপর রঘুনাথের শিক্ষার ভার দিলেন। তাঁহার পিতা ও খুল্লতাত দশজন অশ্বারোহী সৈন্ত ও অন্যান্ত লোকজন পাঠাইয়া শিবানন্দ সেনের নিকট সন্ধান লইয়া গিয়াছিলেন। তখনও শিবানন্দের সঙ্গে রঘুনাথের সাক্ষাৎ হয় নাই। অবশেষে দুঃখিত অন্তঃকরণে পুরীতে আছেন জানিয়া দুর্ভাগ্য বালকের হাত-খরচের জন্ত তাঁহারা সামান্ত ৪০০৲

টাকা পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মনে পাছে ব্যথা লাগে, এইজন্য তিনি সেই টাকা ফিরাইয়া না দিয়া তাহা হইতে মাসিক ৵৹ আনা গ্রহণ করিয়া সেই ব্যয়ে বৎসরে একদিন চৈতন্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। দুই বৎসর এইরূপে চালাইয়া সেই অর্থ হইতে আর কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। চৈতন্য তারপর একদিন স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করেন, "রঘু আর আমাকে নিমন্ত্রণ করে না কেন?" স্বরূপ বলিলেন, "রঘু বিষয়ীর অর্থ গ্রহণ করা পাপ মনে করে।" চৈতন্য এই কথায় মহাসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। রঘুনাথ যে কৃচ্ছ্র করিতেন তাহা অসাধারণ। পুরীর মন্দিরের দ্বারে দুই ঘণ্টা দাঁড়াইয়া এক একটি তণ্ডুল ভিক্ষা-স্বরূপ এক এক জনের কাছে গ্রহণপূর্ব্বক যে এক মুষ্টি ভিক্ষা পাইতেন, তাহাই একবার রাঁধিয়া খাইতেন। অবশেষে তাহাও ছাড়িয়া দিলেন। মন্দিরের বাহিরে যে সমস্ত পচা প্রসাদ পাণ্ডারা ফেলিয়া দিত, গাভীগণ তাহা খাইয়া গেলে—তাহারই এক মুষ্টি বারংবার পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া তিনি দিনান্তে একবার খাইতেন, প্রায় সবদিনই উপবাসে যাইত। উপবাস এবং অল্পাহারে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ও প্রেম প্রবল হয়—ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। এই বিনয়নম্র মধুরপ্রকৃতি সুন্দর কুমার চৈতন্যদেবের কাছে আসিতে লজ্জিত ও ভীত হইতেন। একদিন তবু স্বরূপ-দামোদরকে দিয়া তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি চৈতন্যের শ্রীমুখের উপদেশ শুনিতে চান। চৈতন্য তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন, "আমি ধর্ম্মাধর্ম্মের বিশেষ খবর জানি না। নিজ খেয়ালে চলি, এসকল বিষয়ে স্বরূপ-দামোদরই বিশেষ প্রাজ্ঞ, সেই তোমাকে শিক্ষা দিতেছে—তথাপি যদি আমার কথা শুনিতে চাও, 'গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥ তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥'" ১৯ বৎসর বয়সে রঘুনাথ পুরীতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার যখন ৩৫ বৎসর বয়স তখন মহাপ্রভুর তিরোধান হয়। একদিন রঘুনাথ চৈতন্যকে বলিয়াছিলেন, "আর কোন্ ঠাকুরের কথা আমাকে বলিতেছেন? আপনি ছাড়া আমার আর ঠাকুর নাই।" ইহার পর রঘুনাথ বৃন্দাবনে যাইয়া দীর্ঘকাল তথায় যাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার রচিত অনেক সংস্কৃত পুস্তক আছে। মহাভাবস্বরূপিণী রাধার সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা একটি কবিতায় তিনি যাহা দিয়াছেন, তাহাতে তিনি জীবাত্মার কৃষ্ণাভিসারে যাত্রার গুণরাশি ব্রজনায়িকাতে আরোপ করিয়াছেন,—"রাধা তারুণ্যামৃতে স্নান করিয়া লাবণ্যামৃতের তিলক পরিয়াছেন, তাঁহার সলজ্জভঙ্গিমা নীলবাসের ন্যায় অঙ্গে ঔজ্জ্বল্য সাধন করিতেছে, তাঁহার প্রিয়ের উপর একান্ত-নির্ভরতা এবং সহচরীদের প্রেম অঙ্গের সুরভির কার্য্য করিতেছে, তাঁহার একাগ্রতা দীপস্বরূপ অভিসারের পথ দেখাইতেছে।" ইত্যাদিরূপ ব্যাখ্যায় রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের খোসা ও বহিরাবরণ বাদ দিয়া তিনি প্রেমের আধ্যাত্মিক রসটি গ্রহণ করিয়াছেন। (মৎকৃত "Chaitanya and his Companions" পুস্তক দ্রষ্টব্য।) তাঁহার সব পুস্তকগুলিই ভক্তির ব্যাখ্যা। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনেক উপাদান তিনি দিয়াছিলেন। জন্ম ১৪৯৮ খৃঃ, মৃত্যু ৮৬ বৎসরে, ১৫৮৪ খৃঃ।

চৈতন্যের পরিকরদের মধ্যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন, **রামানন্দ রায়**। ইনি উড়িষ্যার মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং ইঁহার উপাধি ছিল 'রাজা'। ইঁহার পিতার নাম ভবানন্দ রায় এবং চারি ভ্রাতার নাম গোপীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, সুধানিধি এবং বাণীনাথ। ইঁহাদের বাড়ী ছিল মধ্যভারতে বিদ্যানগরে। ইনি "জগন্নাথবল্লভ" নামক সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটকের লেখক। যে কয়েকখানি পুস্তকের শ্লোক চৈতন্যদেব দিনরাত গান করিতেন—তন্মধ্যে 'রায়ের নাটকগীতি' একখানি। গোদাবরীতীরে চৈতন্য ইঁহাকে দেখিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক অশ্রুপাত করিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া তথাকার ব্রাহ্মণমণ্ডলী বিস্মিত হইয়া বলিতেছিলেন, "এই না ব্রাহ্মণ তেজে দেখি সূর্য্যসম। শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন।" বিদ্যানগরে মহাপ্রভুর সঙ্গে রামানন্দের দশদিন-ব্যাপক যে কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সার কথা বিবৃত হইয়াছিল। চৈতন্যের অনুজ্ঞাক্রমে রামানন্দ বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল কথাগুলি ব্যাখ্যা করেন। প্রথমতঃ সাধ্য ভক্তি, বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ের ৮ম শ্লোক এই ব্যাখ্যার প্রমাণ। সাধকের এতদপেক্ষা উন্নত পদ গীতার নবম অধ্যায়ের ১৭শ শ্লোকের প্রমাণ-দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল। তৎপরের অবস্থায় প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১৩শ স্কন্ধ, ৩২শ শ্লোক এবং গীতার ১৮শ অধ্যায়ের ১৭শ শ্লোক, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট অবস্থা গীতার ১৭শ অধ্যায়ের ১৫শ শ্লোক-দ্বারা প্রমাণিত। তৎপরের অবস্থা ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ১৫শ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে প্রমাণিত এই অবস্থায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলভিত্তি পঞ্চতত্ত্বের কথা—প্রথম দাস্য (প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোক)। তৎপরে সখ্য (ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ১২শ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক), ইহার পর বাৎসল্য (ভাঃ ১০ম স্কন্ধ, ১৮শ অঃ, ৩৭শ শ্লোক)। তৎপরে গোপীদের মাধুর্য্য (গোবিন্দ-লীলামৃত, ১০ম অধ্যায়, ৮ম শ্লোক এবং ভাঃ ১০ম স্কন্ধ, ৩৭শ অঃ, ৫৪শ শ্লোক এবং ভাঃ ৩৭শ অঃ, ১৯শ শ্লোক এবং ৪০শ অধ্যায়ের ২০শ শ্লোক। রামানন্দকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া চৈতন্যদেব সর্ব্বশাস্ত্র মন্থনপূর্ব্বক অবশেষে স্বয়ং রাধিকার মহাভাব প্রমাণ করিবার জন্য ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ২৫শ অঃ, ৯ম শ্লোক এবং ১১শ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৪শ শ্লোক স্বয়ং ব্যাখ্যা করিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃতকার লিখিয়াছেন, কোন ব্যক্তি একটা হারানো পয়সা খুঁজিতে যাইয়া যেরূপ মাটী খুঁড়িয়া হীরামুক্তার ভাণ্ডার আবিষ্কার করে, চৈতন্যের সঙ্গে সাধারণ ভক্তির সম্বন্ধে আলাপ করিতে যাইয়া রামানন্দ সেইরূপ "রাগানুগা"র উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। রামানন্দ সেদিন চৈতন্যকে সাক্ষাৎ ভগবানের প্রেমাবতার বলিয়া গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে তিনি যে কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন তাহা বৈষ্ণবজগতে সুবিদিত "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গে ভেলা। অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল। না সে রমণ না হাম রমণী, এ সখি সে সব প্রেম কাহিনী, কানু ঠাম কহবি বিছুরিব জানি। না খোজল দূতি, না খুঁজল আন, দুহুঁক মিলন মাঝহি পাঁচ বাণ। অবসই বিরাগ তুহু ভেল দূতি। সুপুরুষ প্রেম ঐছন রীতি।"

এই কয়েকটি পরিকর ছাড়া **কর্ম্মকার গোবিন্দদাস**, যিনি মহাপ্রভুর সঙ্গে

দুইবৎসর কাল দাক্ষিণাত্যে ঘুরিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন এবং খুব সম্ভব যিনি "শ্রীগোবিন্দ" নামে উত্তরকালে চৈতন্যের রাত্রিদিনের সঙ্গী হইয়া পুরীতে দিন যাপন করিয়াছেন; ইহার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহার স্ত্রীর নাম শশিমুখী ছিল এবং তিনি স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া স্বীয় আবাসপল্লী কাঞ্চননগর পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চৈতন্যের চিরসাথী হইয়াছিলেন।

কাঁচড়াপাড়ার মহা ধনাঢ্য ও পণ্ডিত **শিবানন্দ সেনকে** মহাপ্রভু পিতার ন্যায় মান্য করিতেন, তাঁহার পুত্র বিখ্যাত **পরমানন্দ সেন,** যিনি "কবিকর্ণপূর" নামে বৈষ্ণব জগতে সুপরিচিত এবং যাঁহার রচিত চৈতন্য-চন্দ্রোদয়, চৈতন্য-চরিতামৃত কাব্য চৈতন্যসম্বন্ধে আদি গ্রন্থসমূহের অন্যতম। **মুরারিগুপ্ত**—যাঁহার আদি নিবাস ছিল শ্রীহট্ট—এবং যাঁহার কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য এক সময়ে নবদ্বীপের গৌরব ছিল। ইঁহার রচিত চৈতন্যের জীবনীতে সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বপর্য্যন্ত ঘটনাগুলি বিবৃত হইয়াছে। কবিকর্ণপূর ও মুরারিগুপ্ত উভয়েই সংস্কৃতে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, মুরারিগুপ্তের কতকগুলি বাঙ্গলা পদ আছে। চট্টগ্রামবাসী **পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি**—ইনি ভোগের বাহ্যাবরণের আড়ালে নিবিড় কৃষ্ণানুরাগ এবং সংসারের প্রতি বিরাগ বহন করিতেন। চৈতন্য ইঁহাকে পিতৃ-সম্বোধন করিতেন। **বাসুদেব সার্ব্বভৌম**—যিনি পণ্ডিতদের শিরোমণি ছিলেন,—পুরীতে যেদিন চৈতন্যের নিকট ইঁহার বিচারে পরাজয় হয় সেদিন বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলী তরুণ চৈতন্যের নিকট বিস্ময়ে ও ভক্তিতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। যে সার্ব্বভৌম অল্পবয়স্ক চৈতন্যকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি সন্ন্যাসের যোগ্য নহ, আমার শাস্ত্রব্যাখ্যা শুন, তারপর তুমি তোমার বর্ত্তমান কর্ত্তব্য বুঝিবে,"—সেদিন তিনি কি জানিতেন এই তরুণবয়স্ক যুবক জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গতুল্য চৈতন্যের ভক্তিব্যাখ্যায় ও কৃষ্ণানন্দে বিহ্বলতা-দর্শনে পরাস্ত ও বিমুগ্ধ হইয়া স্তোত্ররচনাপূর্ব্বক তাঁহার স্তুতিপাঠ করিবেন? প্রবাদ চৈতন্য তাঁহাকে ষড়্‌ভুজ দেখাইয়াছিলেন। দুই হস্তে রামজন্মের ধনুর্ব্বাণ, অপর এক হস্তে কৃষ্ণজন্মের বাঁশী, এবং অপর দুইহস্তে বর্ত্তমান জন্মের করঙ্গ ও কমণ্ডলু। বাসুদেব সার্ব্বভৌম চৈতন্যের এতটা অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে তাঁহার অদর্শনে অস্থির হইয়া পড়িতেন—"শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরি যায়, প্রভুর বিরহ বাণ সহা নাহি যায়।" কাশীর **প্রকাশানন্দ সরস্বতী** এই ভাবেই চৈতন্যের ভক্তদের খাতায় তাঁহার নাম লিখাইয়াছিলেন, ইনি ছিলেন কাশীর দণ্ডিসন্ন্যাসীদের নেতা। প্রথমতঃ চৈতন্যের ভাব-বিহ্বলতা দেখিয়া তিনি কতই না ঠাট্টাবিদ্রূপ করিয়াছিলেন! তাহার শাস্ত্রজ্ঞান কি থাকিতে পারে—সে এক তরুণ যুবক! চৈতন্য এই সকল গালাগালি শুনিয়া প্রথমবার চলিয়া গেলেন কিন্তু দ্বিতীয় বার প্রকাশানন্দের সহিত তাঁহার বিচার হইল।

এই ভক্তি-ধর্ম্ম সে যুগের পরম বিস্ময়ের কথা। তখন একদিকে মুসলমানেরা হিন্দুর মন্দির ও বিগ্রহাদি ভঙ্গ করিতেছিল, অপরদিকে পল্লীর ছায়ায় বসিয়া ব্রাহ্মণগণ বেদবেদান্তের চর্চ্চা করিতেছিলেন,—এই সময়ে রঘুনাথ শিরোমণি ন্যায়শাস্ত্রকে অতি সূক্ষ্মবিচার-পারদর্শী পণ্ডিত-গণের বোধগম্য করিয়া চিন্তা-শীলতায় এরূপ উত্তুঙ্গ সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যাহাতে সমস্ত

পণ্ডিত বিস্ময়ে নবদ্বীপের টোলের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন ;—এই সময়ে নবদ্বীপের **রঘুনন্দন** সংস্কৃত সর্ব্বশাস্ত্র মন্থন করিয়া যে স্মৃতি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গলাদেশে এখনও কোটী কোটী হিন্দুর একমাত্র অবলম্বন ;—এই সময়ে **আগমবাগীশ** তান্ত্রিক ধর্ম্মের সমুন্নত ব্যাখ্যাদ্বারা তান্ত্রিক অনুষ্ঠানগুলির গূঢ়মর্ম্ম সকলকে বুঝাইয়া দিয়া তন্ত্রের প্রতি জনসাধারণের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, বাসুদেব সার্ব্বভৌম উড়িষ্যায় বসিয়া, প্রকাশানন্দ সরস্বতী কাশীর বিদ্যাকেন্দ্রের নায়ক এবং সন্ন্যাসীদিগের নেতৃস্বরূপ এবং দাক্ষিণাত্যে **ভারতী গোঁসাই**—চিন্তাজগতের কর্ণধারস্বরূপ সমস্ত হিন্দুস্থানের পূজা পাইতেছিলেন ; এই সময়ে একদিকে নবদ্বীপ অপরদিকে পুণ্যনগরে (পুণায়) সংস্কৃত বিদ্যার যে অনুশীলন হইতেছিল তাহার একখানি বৃহৎ ইতিহাস লিখিবার বিষয় বটে ; তখন মিথিলার দীপ নির্ব্বাপিত, এবং নবদ্বীপের বালকেরাও অদ্বৈতবাদের গূঢ় মর্ম্ম লইয়া আলোচনা করিত—"বালকেহ ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে" (চৈ. ভা. আদি),—এই অদ্ভুত বিদ্যা ও চিন্তার অভাবনীয় প্রভাবের দিনে কেবল নাচিয়া গাহিয়া, কেবল ঢল ঢল শতদল-প্রভ আনন্দাশ্রুপূর্ণ একখানি সুন্দর মুখ দেখাইয়া এক তরুণ যুবক সমস্ত ভারতবর্ষকে মাতাইয়া তুলিলেন, এমন কি আকবর বাদশাহ পর্য্যন্ত তাঁহার স্তুতিব্যঞ্জক পদ রচনা করিলেন, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? মোটকথা চৈতন্য পণ্ডিত-শিরোমণি ছিলেন। কিন্তু তিনি টোলে যাইয়া আজীবন শাস্ত্রচর্চ্চা করেন নাই, ভগবদ্দত্ত অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার বলে তিনি শাস্ত্র পড়িয়া যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা প্রগাঢ়, গভীর ও গ্রন্থ-কীটদিগের বিদ্যা হইতে অনেক বেশী। তিনি ভাবে মাতিয়া গিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার সাংসারিক জ্ঞান, সতর্কতা ও দূরদর্শন এরূপ ছিল যাহা বড় বড় সমাজ- ও ধর্ম্ম-সংস্কারকগণের ছিল না। সনাতনকে দিয়া যখন তিনি হরিভক্তি-বিলাস লিখাইয়াছিলেন, তখন তিনি পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে সতর্ক করিয়াছেন যে প্রত্যেক অনুশাসনের জন্য যেন শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেওয়া হয়। বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ তিনি নিজে কহিয়া দিয়াছিলেন (চৈ. চ. সনাতন শিক্ষা)। বস্তুতঃ ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয় যে যিনি পণ্ডিতে শিরোমণি ছিলেন, যিনি মেঘ দেখিলে মূর্চ্ছিত হইতেন, কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া তরুণ তমালকে নির্জ্জনে আলিঙ্গন করিয়া থাকিতেন—"বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল,"—এব যাঁহার চক্ষের জল দ্বিতীয় হরিদ্বারের সৃষ্টি করিয়া তাঁহার নিভৃত প্রেমের উৎস হইতে অবিরত উছলিয়া পড়িত, তিনি শাস্ত্র-বিচারের সময়ে একটিও ভাবের কথা বলিতেন না বাণী যেন স্বয়ং জিহ্বাগ্রে বসিয়া তাঁহার শ্রীমুখে সর্ব্বশাস্ত্র হইতে অবিরত প্রমা যোগাইত। যাঁহারা আজীবন কোন এক বিশেষ শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতেন, ঠিক সেই শাস্ত্রে চৈতন্যের অন্তর্দৃষ্টি গভীরতর ও সূক্ষ্মতর ; সেই শাস্ত্রের মর্ম্ম তিনিই বুঝিয়াছিলেন, আজীবন খাটিয়াও তাঁহারা সেই জ্ঞানের সীমান্তে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তিনি জানিতেন জনসাধারণ শাস্ত্রকে ত্যাগ করিয়া কোন কথা স্থায়ী ভাবে বিশ্বাস করিবে না। এজন্য তিনি তাঁহাদের হৃদয় চোখের জলে ও

পাণ্ডিত্যের যুগে ভাবের লীলা।

মধুর হরিনামে আর্দ্র করিয়াও "হরিভক্তি-বিলাসে"র সর্ব্বাংশে শাস্ত্রকে ভিত্তি করিয়াছিলেন। চৈতন্য ভিন্ন অন্য কেহ এই অসাধারণ কাজ সম্পাদন করিতে পারিতেন না, তিনি ছিলেন একদিকে চিন্তাজগতের অপরদিকে চোখের জলের রাজা—তিনি ১৩।১৪টি ভাষা জানিতেন। অল্পবয়সে তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে প্রাকৃত ও পালিভাষা পড়িয়াছিলেন (গৌড়পদ-তরঙ্গিণী), দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে ইঁহার অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের উল্লেখ আছে, পালিভাষা স্বয়ং শিখিয়া তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের মর্ম্মাভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। উড়িষ্যায় ১৮ বৎসর থাকিয়া ইনি সেই ভাষা খুব ভাল করিয়া শিখিয়াছিলেন, তিনি উড়িয়া ভাষায় বৈষ্ণবপদ প্রায়ই আবৃত্তি করিতেন, "জগন্নাথ প্রভু পরিমুণ্ডাই"—প্রভৃতি উড়িয়া পদ তিনি সর্ব্বদা আবৃত্তি করিতেন; অনেক উড়িয়া কবি তাঁহার অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন। তেলেগু ও মালায়ালাম ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। নারোজি দস্যুর ভাষা ছিল—মালায়ালাম, তাঁহার অনুচরেরা চৈতন্যদেবের সঙ্গে কথা কহিয়াছিল, এসম্বন্ধে গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন :—"একজন লোক আসি কাই মাই করি। কি কহিল আমি বুঝিতে না পারি॥ তার বাক্য বুলি সব প্রভু সমঝিয়ে। কাই মাই বলি তারে দিলেন বুঝায়ে।" তামিল সম্বন্ধে এই উল্লেখ আছে—"কখনও তামিল বুলি বলে গোরা রায়। কভু বা সংস্কৃত বলি লোকেরে বুঝায়॥"—এই ব্যাপারে কোন অলৌকিকত্বের অবকাশ গোবিন্দদাস রাখেন নাই; তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"এই দেশে ভ্রমি দীর্ঘকাল। সকলের ভাষা বুঝে শচীর দুলাল।" তাঁহার সময়ে বিদ্যাপতির মৈথিল পদের উপর বাঙ্গলার প্রভাব পড়ে নাই—বিদ্যাপতির পদ তখন খাস্ মৈথিলী ছিল। চৈতন্য দিনরাত্র চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদ গান করিতেন। (চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীতি, কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ। স্বরূপরামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে, গায় শোনে পরম আনন্দ॥" (চৈ. চ.)। বৃন্দাবনে তিনি ছয়টি বৎসর ছিলেন, হিন্দী তখনকার দিনের আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বজন-বিদিত ভাষা ছিল। সেই হিন্দীর অন্যতম কেন্দ্র মথুরা ও বৃন্দাবনে ক্রমাগত ছয় বৎসর থাকিয়া তিনি অবশ্য হিন্দী ভাষা জানিতেন। পাঠান বিজলী খাঁয়ের সঙ্গে চৈতন্যের মুসলমান ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল, বিজলী খাঁ আরব ও পারস্য দেশীয় শাস্ত্রে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে চৈতন্যের মুসলমান পণ্ডিতদের সঙ্গে যে বিচারের আভাস আছে, তাহাতে মনে হয় পারশী ও আরবী ভাষার মোটামুটি জ্ঞান [illegible]র ছিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে চৈতন্য আরবী, পারশী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, হিন্দী, উড়িয়া, মৈথিল, তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম—অন্ততঃ এই সকল ভাষা ভালরূপ জানিতেন। ইহা ছাড়া তিনি তাঁহাদের পরিবারের নিবাসভূমিতে যাতায়াত করিতেন। আসামী ভাষার [illegible] তাঁহার পরিচয় থাকিবার কথা। নানা প্রদেশে হরিনাম ও প্রেমধর্ম্মপ্রচারের জন্য তাঁহাকে এই সকল ভাষা শিখিতে হইয়াছিল। ভাষা-শিক্ষায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

শুধু সংস্কৃতে নহে, এতগুলি ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকার দরুন তিনি জনসাধারণকে সর্ব্বত্র উপদেশ দিতে পারিতেন। তিনি আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের বহু পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করিয়া তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু উত্তরকালে সহজে তিনি বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন না। "আমি মূর্খ সন্ন্যাসী, কি বিচার করিব?" এইরূপ পরম দৈন্যোক্তি-দ্বারা বিচার-সভা এড়াইয়া যাইতেন। কিন্তু যখন তিনি "কৃষ্ণ" বলিয়া ডাকিতেন, হঠাৎ শত সহস্র লোক সেই নামামৃত পান করিবার জন্য লালায়িত হইত, অকস্মাৎ যেন সেখানে পদ্মগন্ধ ছুটিত—শ্রোতৃবর্গ অসংখ্য নরনারী মুগ্ধ হইত, তাহাদের দেহ ঘন ঘন রোমাঞ্চিত ও চক্ষু সজল হইত, "পশ্চাৎ ভাগেতে মুই দেখি তাকাইয়া, শত শত নারীগণ আছে দাঁড়াইয়া। নারীগণ অশ্রুজল মুছিছে আঁচলে," এবং "অসংখ্য বৈষ্ণব শৈব সন্ন্যাসী জুটিয়া। হরিনাম শুনিতেছে নয়ন মুদিয়া।" মহারাষ্ট্র দেশে শুধু এরূপ দৃশ্য সংঘটিত হয় নাই, যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই এইরূপ। কৃষ্ণের মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া ভোলা মহেশ্বর অবধি যেরূপ শত শত দেবতারা অজ্ঞান হইয়া পিছনে পিছনে ছুটিয়াছিলেন, পরমা সুন্দরী কোন ষোড়শী রমণী রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইলে যেমন শত শত চক্ষু নির্নিমেষে তাহার প্রতি আবদ্ধ হয়—চৈতন্যের অশ্রুপ্লাবিত দুইটি চক্ষু ও কণ্ঠস্বরের অপার্থিব মোহিনী শক্তি বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য, সার্ব্বভৌম ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী হইতে আরম্ভ করিয়া আবালবৃদ্ধ নরনারী সকলেরই মন সেইভাবে—রূপ সাগরের পাড়ে টানিয়া লইয়া যাইত। এত বিদ্যাবুদ্ধি, এত পাণ্ডিত্য ও এত ভক্তি ছিল বলিয়াই তিনি যুগের প্রয়োজন সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। সেই শুষ্ক চিন্তাশীলতার যুগে পাণ্ডিত্য না থাকিলে কেহ আদর পাইত না।

জগাই ও মাধাই।

নবদ্বীপে জগাই মাধাইএর জীবন-সংশোধন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সুভানন্দ রায় নামক জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে অতিশয় ধনাঢ্য ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। হুসেন সাহের সঙ্গে ইঁহার অন্তরঙ্গতা ছিল এবং ইনি সম্রাটের নিকট হইতে রাজা খেতাব পাইয়াছিলেন। সুভানন্দের দুই পুত্র রঘুনাথ ও জনার্দ্দন; সুপ্রসিদ্ধ জগাই বা জগন্নাথ রঘুনাথের পুত্র এবং মাধব বা মাধাই—জনার্দ্দনের পুত্র, এই দুই যুবক নবদ্বীপে অসুর-কল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। জগতে এমন কোন পাপ নাই—যাহা ইহারা না করিত। দিবারাত্র মদ্যপান করিয়া বিভোর থাকিত—"ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ, ডাকা চুরি গৃহদাহ করে অনুক্ষণ" (চৈ. ভা.); চৈতন্য ও নিত্যানন্দের উপর ইহাদের আক্রোশ ছিল, এই দিনরাত্র হরিবোলের হট্টগোল ইহাদের অসহ্য হইয়াছিল;—ইহারা একদিন দুই তরুণ সাধুকে পথে পাইয়া তাহাদের মদের ভাঁড়টা ছুঁড়িয়া মারিল; নিত্যানন্দের কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল; তথাপি প্রসন্নমুখে তিনি বলিলেন—"আমাকে মারিয়াছ দোষ নাই, কিন্তু একবার তোমার শ্রীমুখে হরিনাম কর—আমার ব্যথার জ্বালা জুড়াইবে।" এই কথায় পরেও মাধাই আর একবার তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু তরুণ সাধুদ্বয়ের ক্ষমাশীল ভক্তিপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া জগাইএর নেশা ছুটিয়া গিয়াছিল, সে মাধাইকে বারণ করিল। কি মধুর কণ্ঠ—স্নেহার্দ্র হইয়াছিল! চৈতন্য কেবল বলিলেন,—"মাধাই, তুমি উঁহাকে না মারিয়া আমাকে মারিলেই

পারিতে।" দুই ভ্রাতা বাড়ী ফিরিয়া গেল, কিন্তু তাহাদের অনুতাপে রাত্রে ঘুম হইল না। রাত্রি থাকিতে থাকিতে তাহারা চৈতন্যের শয্যাগৃহের দ্বারে আঘাত করিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া বলিল, "আপনি আমাদের ক্ষমা করুন।" চৈতন্য বলিলেন, "আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাদিগকে ক্ষমা করিলাম, কিন্তু তোমাদের অপরাধ তো আমার কাছে নহে, তোমরা নিতাইয়ের কাছে যাও।" নিতাই বলিলেন; "শিশু যদি পিতামাতার কাছে অপরাধ করে, তবে কি তাঁহারা তাহা গণ্য করেন—আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিলাম, পরন্তু আমি যদি জীবনে কোন পুণ্য করিয়া থাকি তবে তাহার ফল যেন তোমরা পাও—ইহাই আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।" নিতাইয়ের চোখে অশ্রু ও মুখে হরিনাম এবং বাহুদ্বয় আলিঙ্গনের জন্য প্রসারিত। চৈতন্য ও নিত্যানন্দের দুই দেবমূর্ত্তি ভ্রাতৃযুগলের মনে চিরকালের জন্য অঙ্কিত হইয়া রহিল। কতক দিন পরে ইহারা নিত্যানন্দের নিকট আবার উপস্থিত হইল। মাধাই কাঁদিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া বলিতে লাগিল, "ঠাকুর, তুমিত আমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছ, কিন্তু তোমার মত সাধুর গায়ে হাত দেওয়ার জন্য হৃদয়ের জ্বালা কিছুতেই কমিতেছে না—কত শত লোকের উপর যে আমরা অত্যাচার করিয়াছি তাহার অবধি নাই। অনুতাপের বৃশ্চিক-জ্বালা যে কিছুতেই কমিতেছে না, তুমি আমার পাপের বোঝা গ্রহণ কর।" নিত্যানন্দ তাহাদিগকে দীক্ষা দিয়া বলিলেন, "গঙ্গার ঘাটে যেসকল লোকের উপর অত্যাচার করিয়াছ, পায়ে পড়িয়া তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।" মাধাই কাহার উপর অত্যাচার করে নাই! মাতাল হইয়া করিয়াছে, তাহা কি তাহার মনে আছে? একখানি কোদাল হাতে সে মাটী কাটিয়া একটি ঘাট প্রস্তুত করিল এবং যে সকল লোক স্নানার্থ তথায় আসিত, করজোড়ে সাশ্রুনেত্রে যাইয়া তাহাদের প্রত্যেকের পা ধরিয়া ক্ষমা চাহিত। এইভাবে দুশ্চর সেবাবৃত্তি ও সাধুজীবনের দ্বারা তাহারা তাহাদের অসাধু জীবনের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল। সম্ভবতঃ ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে নরহরি তাঁহার ভক্তিরত্নাকর রচনা করেন, তখনও "মাধাইয়ের ঘাট" বিদ্যমান ছিল, এই ঘাট কোন দেশবিজয়ের স্মৃতিস্তম্ভ নহে,—অপরাধ-ভঞ্জন প্রায়শ্চিত্তের চিরস্মরণীয় স্তম্ভ। স্বর্গীয় অজিতনাথ মহামহোপাধ্যায় আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি এই ঘটের সামান্য অংশ তাঁহার বাল্যকালে দেখিয়াছিলেন। এখন আর উহার কোন চিহ্ন নাই।

(এই জগাই-মাধাইয়ের জীবনের পরিবর্ত্তনসম্বন্ধীয় যে কত গান পল্লী-কুসুমের মত বাঙ্গলার তরুচ্ছায়ার শীতল বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহার অবধি নাই। একটিতে জগাই-মাধাই যাহা বলিতেছে, তাহার ভাবার্থ এই :—ষারে,—জগাই-মাধাই তুই শুনে আয়, গঙ্গাতীরে ঐ মধুর হরিনাম কার শ্রীকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে, পূর্ব্বেতো ঐ নাম বজ্রের মত কঠোর লাগিত, আজ নাম শুনিয়া কেন ঘন ঘন চোখের জল পড়িতেছে?)

ইহার পর চৈতন্য সন্ন্যাসী হইলেন—ভট্টাচার্য্যগণ তাঁহাকে প্রহার করিবেন, ভয় দেখাইয়াছিলেন। চৈতন্য মুকুন্দকে বলিলেন—আমি গৃহী, এইজন্য আমার মুখে ইহারা নাম গ্রহণ করিবেন না। যাঁহারা আমাকে মারিতে চাহিতেছেন, কাল যাইয়া সন্ন্যাসী হইয়া

তাঁহাদের পায়ে পড়িয়া হরিনাম দিব—তখন তাঁহারা আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না

"চণ্ডাল যুবক গৃহী বালবৃদ্ধ নারী।
নামে মত্ত হইয়া দাণ্ডাইবে সারি সারি॥
বালক বলিবে হরি বালিকা বলিবে।
পাষণ্ড অঘোর-পন্থী নামে মত্ত হবে।
আকাশ ভেদিয়া নামের পতাকা উড়িবে।
রাজা প্রজা এক সঙ্গে গড়াগড়ি যাবে॥"

চৈতন্যের সন্ন্যাস।

(চৈতন্যের সন্ন্যাসে দেশময় যে শোক হইয়াছিল, তাহা শত শত গানে বঙ্গের ঘরে ঘরে এখনও কারুণ্য জাগাইয়া থাকে। শচী ১২ দিন উপবাস করিয়াছিলেন—"দ্বাদশ উপাসে আই করিলা ভোজন" (চৈ. ভা.)। তাঁহার অনুমতি না লইয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ অসম্ভব। তিনি যে ভাবে অনুমতি পাইয়াছিলেন, তাহা অতি করুণ। শচী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আমার উপর—তোমার এই তরুণ-বয়স্কা স্ত্রীর উপর কি তোমার কোন কর্ত্তব্যই নাই? এখানে থাকিয়া কি ভগবান্‌কে ডাকা চলে না? আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে ত্যাগ করাই কি তোমার ধর্ম্ম? তুমি ধর্ম্মাবতার, তোমার মাকে ত্যাগ করিয়া তুমি কি ধর্ম্ম করিবে?—আমাকে বুঝাইয়া যাও।" চৈতন্য বলিলেন, "মা, তুমি কি জান না কি ভাবে কৌশল্যা রামকে বনে যাওয়ার অনুমতি দিয়াছিলেন। দেবহূতি অসহ্য বাৎসল্য-বিরহ সহ্য করিয়াও তাঁহার পুত্রকে বৈরাগ্যের পথ হইতে নিবৃত্ত করেন নাই। তুমিতো সেই দেশেরই রমণী! আমি জগতে হরিনাম বিলাইব, মা, তুমি আমার সাধুপথে বাধা দিও না, এই পরিবারে আবদ্ধ থাকিয়া আমি তাহা পারিব না। তোমার ছেলে সকলকে ভগবানের প্রেম দিতে যাইতেছে,—তুমি ভারতের পূজ্যা—নারীকুলে জন্মিয়া আমার হোমানল নিবাইও না।" শোকে মৃতপ্রায়া শচী অনুমতি দিয়াছিলেন, কারণ ধর্ম্মের আহ্বানকে তিনি প্রাণ দিয়াও শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া যে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা ঈশান-নাগর অদ্বৈতপ্রকাশে লিখিয়াছেন—সে উৎকট তপস্যা চৈতন্যের সহধর্ম্মিণীরই উপযুক্ত।) নবদ্বীপ অশ্রুর বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল, ভট্টাচার্য্যগণ অনুতপ্ত হইয়া কাঁদিয়াছিলেন, বাজারে দোকান-পাট সমস্ত বন্ধ ছিল, কেহ উচ্চৈঃস্বরে কথা কহে নাই, চৈতন্য ছাড়া আলাপের অন্য প্রসঙ্গ ছিল না, সে আলাপ অশ্রুময়—চৈতন্যগুণ-স্মারক। (শ্রীবাসের আঙ্গিনায় শচী অনিদ্ররজনী ধূলায় পড়িয়া কাটাইয়া দিতেন। শ্রীবাস হরিপূজার জন্য ফুল তুলিতে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়া যাইতেন, কখনও বা 'শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ' বলিয়া গৃহদেবতাকে পূজা করিতে যাইয়া 'চৈতন্যায় নমঃ' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন। এখনও নবদ্বীপবাসীরা মাথুর গাহিতে দেন না—মাথুর অর্থ শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-

যাত্রা—কিন্তু তাঁহাদের কাছে উহা চৈতন্যের সন্ন্যাসের স্মারক। তাঁহারা চৈতন্যের সন্ন্যাসমূর্ত্তি আঁকিবেন না, বা মূর্ত্তিতে গড়িবেন না—সন্ন্যাসের পর যাহা কিছু হইয়াছে তাঁহারা এখনও তাহা শুনিতে চান না—তাঁহাদের সেখানে সর্ব্বদাই "নবদ্বীপ-লীলা"স্মারক গান ও কীর্ত্তন। নবদ্বীপ পরিত্যাগ করার পরের কথা তাঁহারা শুনিতে চান না।)

নবদ্বীপ হইতে বাহির হইয়া ২৩ বৎসর বয়স্ক চৈতন্য কাটোয়ার কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করেন (১৫০৮)। যে সুন্দর চাঁচর কেশ পুষ্পমাল্যে শোভিত হইয়া তাঁহার অপূর্ব্ব রূপের শ্রী বাড়াইয়া দিয়াছিল, সেই কেশ-মুণ্ডনের উপলক্ষে কাটোয়ার নরনারী কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-সমাজের নেতা—চৈতন্যের দ্বিতীয় অবতার—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পিতা চাখন্দীনিবাসী গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণ ও কেশমুণ্ডনের সংবাদে এতটা অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি কতকদিনের জন্য উন্মত্ত হইয়াছিলেন—তরুণ নিমাই বাঙ্গলার এতই স্নেহের দুলাল ছিলেন। (তাঁহার নাম ছিল "বিশ্বম্ভর মিশ্র, বিদ্যাসাগর বাদী-সিংহ", এখন সন্ন্যাসগ্রহণের পর যে নাম হইল তাহাও কম উদ্ভট নহে, সন্ন্যাসীর নাম কেশবভারতী দিলেন "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য," কিন্তু বাঙ্গালী জন সাধারণ এ সকল আভিধানিক নামে তুষ্ট হয় নাই, তাহারা তাঁহাকে "গোরা," "প্রাণের গোরা," "গোরা চাঁদ," "নদের চাঁদ" ইত্যাদি নামে ডাকিয়া থাকে।)

দিন কয়েক শান্তিপুর থাকিয়া চৈতন্য পুরী গেলেন। তদবধি তাঁহার জীবনের গতি অন্যরূপ হইল। কিরূপে তাৎকালিক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম তরুণ সন্ন্যাসীকে অল্পবয়সে প্রব্রজ্যাগ্রহণের জন্য গঞ্জনা দিয়া শেষে তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সাতদিন বাসুদেব শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলেন, অগাধ প্রেমের তরুণ তাপস মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া ছিলেন—একটি কথাও বলেন নাই: বাসুদেব বলিলেন, "বালক, তোমার প্রতিভার কথা সকলের মুখে শুনি। কিন্তু আমার এই দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী ব্যাখ্যার সময় তুমিতো একটিও কথা বলিলে না। কত লোক কত প্রশ্ন করিয়াছে—তুমি মাথা গুঁজিয়া বসিয়া আছ। তুমি কি আমার ব্যাখ্যা শোন নাই।" চৈতন্য বলিলেন, "আপনার মত প্রবীণ পণ্ডিতের কাছে আমি কি বলিব,—তবে আমি অন্যরূপ বুঝিয়াছি।" স্পর্দ্ধা তো কম নয়! বৃদ্ধ বাসুদেব সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করিয়া যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নীলাম্বর পণ্ডিতের দৌহিত্র, জগন্নাথ মিশ্রের তরুণ পুত্র তাহা হইতে অন্যরূপ বুঝিয়াছে! কিন্তু সত্যসত্যই যখন চৈতন্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তখন বৃদ্ধ বাসুদেব দেখিলেন, প্রবীণতা ও পাণ্ডিত্য প্রতিভার নিকট দাঁড়ায় না, ক্ষুদ্র গিরিনদী যেরূপ বিশাল শাল-শাল্মলী অনায়াসে খরবেগে ভাসাইয়া লইয়া যায়, চৈতন্য সার্ব্বভৌমের যুক্তিতর্ক তেমনি অনায়াসে ঠেলিয়া ফেলিলেন এবং ভক্তিবাদ সুদৃঢ় করিলেন। উপসংহারে চৈতন্য পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর ছাড়িয়া ভক্তিগদ্‌গদকণ্ঠে হরিনামের সুধা বর্ষণ করিলেন। পরাজয়ের আহত অভিমানে বাসুদেবের হৃদয়ে যে জ্বালা হইয়াছিল,

এবার তাহা জুড়াইয়া গেল। বৃদ্ধ পণ্ডিত চৈতন্যের দেবমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া শ্লোকচ্ছন্দে তাঁহার স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কাশীর প্রকাশানন্দ চৈতন্যের কতই নিন্দা করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন চৈতন্যের অপূর্ব্ব ভক্তিব্যাখ্যা শুনিয়া সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও দণ্ডীদের নেতা সন্ন্যাসী বাঙ্গালী বালককে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তখন কাশীতে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ চুণ্ডীরাম তীর্থ, ভারতী গোঁসাই প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতের দশাও একই রূপ হইল। কিরূপে তিনি গুজরাটে ঘোগাগ্রামে নটী-শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বারমুখীকে সৎপথে আনিয়াছিলেন, তাহা ভক্তমালে আভাসে বর্ণিত আছে, কিন্তু গোবিন্দ কর্ম্মকার তাহার এমন বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন, যে তাহা একটি দৃশ্যপটের ন্যায় মনোহর হইয়াছে।

খাণ্ডবা গ্রামে সেবাদাসী ইন্দিরা বাই, নারোজী দস্যু, ভিল্ল পান্থ প্রভৃতি দুশ্চরিত্র ব্যক্তি-গণের কি অদ্ভুতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাঁহার শ্রীকণ্ঠে হরিনাম শোনার পর! তাঁহার মুখে চোখে যে অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম শক্তি ফুটিয়াছিল,—গলদশ্রু শতদলপ্রভ চোখে যে স্বর্গীয় প্রেমের কথা লিখিত ছিল, তাহাতেই ঐ সকল অসাধ্যসাধন সম্ভবপর হইয়াছিল। তিনি উপদেশ অতি অল্পই দিয়াছেন। জগতের ইতিহাসে এরূপ আর দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখা যায় না—যিনি উপদেশ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা প্রভৃতি চির-ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার না করিয়া শুধু নাম-বলে লোকের চিত্ত এমন ভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন। যে মহাধনী তীর্থরাম যুবক দুইটি বেশ্যা লইয়া তাঁহাকে বিচলিত করিতে আসিয়াছিল—সে তাঁহার মুখে শুধু হরিনাম শুনিয়া স্বয়ং দণ্ড-কমণ্ডলু হাতে লইয়া সন্ন্যাসী সাজিল, তাঁহার নিযুক্ত সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাইনামক বেশ্যাদ্বয় রূপের গর্ব্বে ফাটিয়া পড়িয়াছিল—তাহারা এই প্রেমোন্মাদের ভগবদ্ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া কাঁদিয়া পায়ে পড়িল। বাট বৎসরের ব্রাহ্মণ দস্যু নারোজি—চৈতন্যের প্রেমোচ্ছ্বাস দেখিয়া পাগল হইয়া গেল, সে তাহার অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত চিরতরে ফেলিয়া দিয়া সেই দিন হইতে চৈতন্যের যে সঙ্গ লইল, মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তাহা ছাড়ে নাই। ত্রিবাঙ্কুরের রাজা রুদ্রপতি, উড়িষ্যার প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যের পিছনে পিছনে অনুগত সেবকের ন্যায় চলিতেন। যে প্রতাপরুদ্রের কবাট-তুল্য বিশাল বক্ষের মর্দ্দনে প্রধান প্রধান পাঠান মল্লগণ নিষ্পেষিত হইতেন, কবিকর্ণপুর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন—এই মহাবীর রাজরাজেশ্বর চৈতন্যকে দেখিলে নবনীতের ন্যায় কোমল হইয়া তাঁহার দাসানুদাস হইতেন কোন্ গুণে? এই প্রতাপরুদ্র হুসেন সাহের হাত হইতে গৌড়দেশ কাড়িয়া লইবার জন্য একবার সমরোদ্যোগ করিয়াছিলেন। ইনি দাক্ষিণাত্যের অনেক প্রদেশ জয় করিয়া সার্ব্বভৌম রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। ইহার আদেশে চৈতন্যের যে ছবি আঁকা হইয়াছিল, তাঁহার পাদপীঠে—সর্ব্বাঙ্গপ্রণতির ভঙ্গীতে রাজার ভূলুণ্ঠিত মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। ইনিই চৈতন্যের সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া গোপীনাথ মিশ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এ কোন্ রাগিণী? অর্থবোধ না হইলেও যেমন কোকিল-কাকলী, এ যে তেমনই মিষ্টি, এরূপ মধুর রাগিণী ত আমি শুনি নাই, ইহা কে উদ্ভাবন করিয়াছেন?" গোপীনাথ মিশ্র বলিলেন—"ইহা মনোহর-সাই কীর্ত্তন, ইহার স্রষ্টা স্বয়ং চৈতন্যদেব।" প্রতাপরুদ্র রাজা পুরুষোত্তম দেবের

একমাত্র পুত্র ছিলেন। পরমা সুন্দরী পদ্মিনী কাঞ্জিভরম রাজ্যের রাজকন্যা ছিলেন। প্রতাপরুদ্রের পিতা ইহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়া রাজার নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। রাজা উত্তরে লিখিয়াছিলেন, "যে সামান্ত ঝাড়ুদারের কাজ করে—তাঁহার হাতে আমার কন্যা দিতে পারিব না।" বৎসরে একদিন উড়িষ্যার রাজারা সোণার ঝাঁটা হস্তে পুরীর মন্দির সাফ্ করেন, ইহা চিরাগত রীতি ছিল, রাজা ইহাই লইয়া ব্যঙ্গ করিয়া পুরুষোত্তমকে ঝাড়ুদার বলিয়াছিলেন। তিনি ক্রোধে কাঞ্জিভরম আক্রমণ করেন এবং রাজাকে পরাস্ত করিয়া পদ্মিনীকে পুরীতে লইয়া আসেন এবং সভাসমক্ষে সংকল্প করিয়া বলেন, "এই বন্দী রাজকুমারীকে আমি সত্যসত্যই এক ঝাড়ুদারের হস্তে দিব।" মন্ত্রীরা দুঃখিত হইয়া একটা ষড়যন্ত্র করিলেন।

আপনিই সেই ঝাড়ুদার।

এবারও বৎসরের সেই দিন আসিল—যেদিন রাজা সুবর্ণ ঝাঁটা হস্তে পুরীর মন্দির পরিষ্কার করিতে গেলেন। এই সুযোগে প্রধান মন্ত্রী বন্দী রাজকুমারীকে লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ইহাকে কোন ঝাড়ুদারের সঙ্গে বিবাহ দিবেন, আপনিই সেই ঝাড়ুদার, ইহাকে গ্রহণ করুন।" রাজার মন আর্দ্র হইয়াছিল, তিনি এই অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না, পদ্মিনীকে বিবাহ করিলেন। কাঞ্চী-কাবেরী নামক উড়িয়া-কাব্যে এই কৌতূহলজনক ঘটনা লিখিত আছে। আমাদের কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয় লইয়া একখানি সুন্দর বাঙ্গলা কাব্য লিখিয়াছেন।* প্রতাপরুদ্র রাজা পুরুষোত্তম ও রাণী পদ্মিনীর পুত্র। চৈতন্যের তিরোধানের পর প্রতাপরুদ্র যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন শোকে মৃতপ্রায় ছিলেন। একদা কবিকর্ণপূরকে (পরমানন্দ সেনকে) তিনি বলিয়াছিলেন, "ঐ দেখ রথযাত্রার সময় উপস্থিত, নীলাদ্রিনাথ রূপের ছটায় ঝলমল করিতেছেন, একদিকে নীল সিন্ধুজলের অস্ফুট গর্জ্জন, অপর দিকে লক্ষ লক্ষ লোকের আনন্দ-কোলাহলে পুরী যেন নবজীবন পাইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু চৈতন্য বিহনে এই উৎসবে আমার কণিকাপ্রমাণও আনন্দ হইতেছে না, তুমি তাঁহারই লীলা বর্ণনা করিয়া আমাকে শুনাও।" এই আদেশের ফল—সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক।

চৈতন্য একবার পুরী হইতে পালাইয়াছিলেন। পার্থিব স্নেহ-মমতার সম্পূর্ণ খপ্পরে পড়িলে নির্ম্মল সার্ব্বজনীন প্রেম ও সত্যদৃষ্টির বাধা পড়ে। পুরীতে আসিয়া দেখিলেন, সেখানেও নদীয়ার মত তাঁহার দ্বিতীয় একটা সংসারের সৃষ্টি হইয়াছে। জগদানন্দ তাঁহার প্রতি মাতার অধিক যত্ন করেন—এবং তাঁহার স্নান, ভোজন, শয়ন প্রভৃতি লইয়া অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়েন,—নানারূপের উপহারের খাদ্যদ্রব্য আনিয়া তাঁহাকে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেন,—তিনি না খাইলে হয় নিজে উপবাসী থাকেন, না হয় অভিমান করিয়া তিন দিন চৈতন্যের সঙ্গে কথা বলেন না। একদিন

পুরীত্যাগের সঙ্কল্প।

ইনি চৈতন্যের জন্য একটি তুলার বালিশ আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন, তরুণ সন্ন্যাসী অতি

* প্রতাপরুদ্র স্বর্ণঝাড়ু লইয়া যে জগন্নাথ মন্দির বৎসরে একদিন সাফ্ করিতেন, তাহার উল্লেখ চৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের ১৩শ অধ্যায়ে আছে।

কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া শুধু মেঝের পাথরের উপর শুইয়া থাকিতেন, জগদানন্দের তাহা সহ্য হয় নাই। সেই তুলার বালিশ দেখিয়া চৈতন্য বলিয়াছিলেন, "জগদানন্দ, বিলাসের আর আর আস্‌বাব বাকি রাখিলে কেন? এখন একটা খাট লইয়া এস এবং আমাকে দিয়া বিষয় ভোগ করাইবার অন্যান্য যোগাড় কর।" আর একদিন এক ভক্ত চৈতন্যকে এক হাঁড়ী সুগন্ধ তৈল উপহার দিয়াছিলেন, চৈতন্য বলিলেন, "ইহা মন্দিরে লইয়া যাও এবং জগন্নাথের আরতির সময়ে জ্বালাইও।" এই কথায় জগদানন্দ রাগিয়া গিয়া সেই তৈলের হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরিব্রজ্যার নিয়ম পালন করিয়া চৈতন্য শীর্ণদেহে মাঘের নিদারুণ শৈত্য অগ্রাহ্য করিয়া শেষরাত্রে স্নান করিতেন। মুকুন্দের ইহা সহ্য হইত না। চৈতন্য বলিলেন, "মুকুন্দ, জগদানন্দের মত রাগ করে না; কিন্তু অতি দুঃখিত হইয়া চুপ করিয়া থাকে, তাহাতে আমার অধিকতর কষ্ট হয়।" এদিকে স্বরূপ-দামোদর চৈতন্যের উপর শিক্ষা-দণ্ড ধরিয়া ছিলেন। চৈতন্য শাস্ত্র-নিয়মের ধার ধারিতেন না, উচ্ছ্বসিত প্রেমের আবেগে কোন বিধি পালন করিতেন না। কিন্তু স্বরূপ-দামোদর "ইহা করা উচিত নহে, সন্ন্যাসীর পক্ষে উহা উচিত নহে" ইত্যাদিরূপ অনুশাসন দ্বারা তাঁহাকে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন।

চৈতন্য দেখিলেন,—ইহারা তাঁহার জন্য পুনরায় স্নেহ ও শাসনের গৃহের মতই একটা কারাগার সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরীর এই স্নেহের বন্ধনী হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। একবার ছুটিয়া পালাইবার মুখে তিনি সনাতনের বাধা পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। বিবাহের বরের ন্যায় এক বিপরীত মিছিল সঙ্গে তিনি যে চলিয়াছিলেন, একথা তাঁহার খেয়াল ছিল না। সনাতনের উপদেশ তিনি গ্রহণ করিলেন। পুরীতে ফিরিয়া তথায় আর কিছুকাল থাকিয়া এবার প্রকৃতই পলাতক আসামীর ন্যায় গোপনে দাক্ষিণাত্যের দিকে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে কালাকৃষ্ণ দাস নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি গোদাবরীর তীর পর্য্যন্ত যাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। একমাত্র গোবিন্দ কর্ম্মকার বিশ্বস্ত কুকুরের ন্যায় দীর্ঘপথ তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং এই ভ্রমণের যে সবিস্তার বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন তাহা দৃশ্যপটের ন্যায় সুস্পষ্ট। গোবিন্দ কর্ম্মকারের বাড়ী ছিল—বর্দ্ধমান, কাঞ্চন নগর; তাঁহার পিতার নাম ছিল শ্যামাদাস এবং মাতার নাম মাধবী, গোবিন্দ তাঁহার স্ত্রী শশিমুখীর সহিত ঝগড়া করিয়া চিরদিনের জন্য চৈতন্যের সঙ্গী হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ উত্তর কালে ইনিই "শ্রীগোবিন্দ" নামে বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। এই করচা-লেখক সম্বন্ধে সমস্ত কাহিনী মৎসম্পাদিত "গোবিন্দ দাসের করচা"র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। (১৫১০ খৃষ্টাব্দের ৭ই বৈশাখ তিনি দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে বহির্গত হন ও ১৫১১ খৃষ্টাব্দের ৩রা মাঘ পুরীতে প্রত্যাগত হন। সুতরাং এক বৎসর আট মাস ছাব্বিশ দিনে এই ভ্রমণ শেষ হয়, পুরীতে ফিরিয়া আসিয়া চৈতন্য বলদেব ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে ছয় বৎসর ভ্রমণ করেন। তিনি অষ্টাদশ বর্ষ কাল পুরীতে ছিলেন। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথিতে রবিবার দিন বেলা ৩টার সময়ে তিনি পুরীর গুণ্ডিচা গৃহে দেহ রক্ষা করেন।)

(বৈষ্ণব-সমাজের উপর—সমস্ত বাঙ্গলা দেশটার উপর—চৈতন্যের যে প্রভাব তাহার তুলনা নাই। নিত্যানন্দ পুরীতে আসিলেই চৈতন্য সঙ্গোপনে এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া তাঁহাকে সমাজ-সংশোধনের উপদেশ দিতেন, (চৈ. ভা.)। তিনি জানিতেন—নিত্যানন্দের ন্যায় সর্ব্বজাতির প্রতি সমদর্শী, উদারহৃদয় ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-সমাজে আর দ্বিতীয়টি নাই। এই জন্য জাতিভেদের উৎকট বৈষম্য দূর করিয়া উদার বৈষ্ণব-সমাজের দ্বার উন্মুক্ত করিবার ভার তিনি নিত্যানন্দের উপর দিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ ও তাঁহার পুত্র বীরভদ্র খড়দহে বসিয়া পতিতদিগকে যে স্নেহ-মধুর আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ১২০০ নেড়া (মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষুক) ও ১৩০০ নেড়ী (উক্তরূপ বৌদ্ধ ভিক্ষুণী) সাগ্রহে আসিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিল। এইভাবে রামকলী নগরে আর এক বৃহৎ নেড়ানেড়ী সম্প্রদায় ভেকাশ্রিত হইয়া বৈষ্ণব বৈরাগী সাজিয়াছিল। বহু বৌদ্ধ মুসলমান হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু নিত্যানন্দের প্রসারিত-ভুজাশ্রিত হইয়া বৌদ্ধ-জনসাধারণ সাধারণ বৈষ্ণব-মত অবলম্বন করিয়া হিন্দুসমাজের গণ্ডীতে স্থান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল।) বৌদ্ধ আখড়ায় বিবাহপ্রথা ছিল না। ব্যভিচার-দুষ্ট নেড়ানেড়ীসমাজ তাহাদের নেতৃদলের সঙ্গে সম্বন্ধচ্যুত হইয়া বিলাসের স্রোতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত অবস্থায় রণাই হইয়াছিল, তাহাদের সন্তান-সন্ততি নাম-গোত্রহীন হইয়া অতি হেয় অবস্থায় ছিল,—নিত্যানন্দ ইহাদের মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলন করিয়া সমাজে ইহাদের একটা স্থান করিয়া দিয়াছিলেন। বৈরাগীরা কখনই ভেকাশ্রয়ের পূর্ব্বে তাহারা কোন্ জাতীয় ছিল তাহা বলিবে না। এই ভাবে তাহাদের পূর্ব্বজীবনের কলঙ্কিত অধ্যায় সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃতির জলে বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা লোক চক্ষে শুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু বাউলদের মধ্যে চৈতন্য-নিত্যানন্দকে গ্রহণ করার পরও বৌদ্ধধর্ম্মের দেহতত্ত্ব এখনও চলিয়া আসিয়াছে। পূর্ব্ব ধর্ম্মের সংস্কার বাউলদের সহজিয়া গানে স্পষ্টরূপে বিদ্যমান আছে। একদিন এক বাউলকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "তুমি চৈতন্য ও নিত্যানন্দের বিগ্রহ পূজা কর কি না?" সে বলিল, "ইহাদের কি বিগ্রহ আছে? চৈতন্য হচ্ছেন 'শূন্য মূর্ত্তি।'" এই উক্তি মহাযান বৌদ্ধগণের "ধ্যায়েৎ শূন্যমূর্ত্তিম্" ইত্যাদি ভাবে ব্যক্ত শূন্য-বাদের প্রতিধ্বনি করে। নিত্যানন্দের নাম হইয়াছিল "জাতনাশা"। তিনি সুবর্ণ-বণিক্-শিরোমণি—সপ্তগ্রামের ধনকুবের—সন্ন্যাসাবলম্বী উদ্ধারণ দত্তের সঙ্গে একত্র ভোজন করিতেন। অথচ সূর্য্যদাস সরকেলের দুই কন্যা "বসুধা' ও "জাহ্নবী"কে বিবাহ করিয়া নিত্যানন্দ দস্তুরমত গৃহী সাজিয়াছিলেন। চৈতন্যের আদেশে তিনি অবধূতের ব্রত ভঙ্গ করিয়া সংসারাশ্রমী হইয়াছিলেন। তিনিই সমস্ত নিম্ন-জাতীয় হিন্দুর গৃহে বৈষ্ণব গোস্বামীদের পূজাদি করিবার ব্যবস্থা চালাইয়াছিলেন; ব্রাহ্মণেরা ইতিপূর্ব্বে যাহাদের বাড়ীর দ্বারে পদার্পণ করাও মহাপাপ মনে করিতেন, বৈষ্ণব গোস্বামীরা তাহাদিগকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া [illegible]দের বাড়ীতে ভোজনাদি ও দেবপূজা অবাধে করিতে লাগিলেন। এজন্যই নিত্যানন্দের নাম হইয়াছিল "পতিত-পাবন।" ভক্তি ও প্রেমের রাজ্যের রাজচক্রবর্ত্তী চৈতন্য; তিনি [illegible] বিভোর থাকিতেন, কিন্তু সমাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিতেন—নিত্যানন্দ।)

চৈতন্যের প্রভাব।

চৈতন্যের আজ্ঞাক্রমে বৈষ্ণব-সমাজে সমস্ত নীচজাতির প্রবেশ-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া নিত্যানন্দ তাহাদিগকে অশেষরূপ সামাজিক দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাদের শ্রদ্ধায় নিত্যানন্দের নাম চৈতন্যকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি গানে এই কথা সুব্যক্ত আছে। "হাটের রাজা নিত্যানন্দ, পাত্র হৈল শ্রীচৈতন্য" প্রভৃতি গানে নিত্যানন্দ রাজা এবং চৈতন্য তাঁহার প্রধান মন্ত্রী বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছেন। নিত্যানন্দ এই মহৎ কার্য্য না করিলে আজ পতিত জাতির অধিকাংশই ইসলাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিত। চৈতন্যদেব পুরীতে তাঁহাকে সমাজ-সংস্কারসম্বন্ধে কোন্ পন্থা অবলম্বনীয়,—দ্বার বন্ধ করিয়া এক প্রকোষ্ঠে অতি গোপনীয়ভাবে সেই উপদেশ দিতেন।

চৈতন্য স্বয়ং ভগবৎপ্রেমে বিভোর থাকিয়াও বাঙ্গলার নবগঠিত বৈষ্ণব-সমাজকে সংশোধিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। সনাতনকে দিয়া তিনি এই সমাজের জন্য বিধিব্যবস্থা সংকলন করাইয়াছিলেন। এই কার্য্যের জন্য সনাতন অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি কেহ ছিলেন না। সনাতন বাঙ্গলার সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, ব্যবহার-শাস্ত্র তাঁহার নখাগ্রে ছিল, তিনি হিন্দুদের দর্শন, কাব্য ও পুরাণ উৎকৃষ্টরূপে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু স্মৃতিই ছিল তাঁহার বিশেষভাবে পঠিতব্য বিষয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, নবদ্বীপের [illegible] পাগল প্রেমভক্তি ভাবে বিভোর থাকিয়াও সংসারের প্রয়োজন এবং স্মৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ [illegible]সম্বন্ধে সনাতনের মত পণ্ডিতকে কলের পুতুলের ন্যায় পরিচালিত করিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে চৈতন্য-চরিতামৃতের সনাতন-শিক্ষা শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

একদিকে সমাজ-সংস্কার, অপরদিকে উহা পরিচালিত করিবার বিধি-ব্যবস্থা করিয়া তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কে জানিত হরিপ্রেমে উন্মাদ এই তরুণ যুবকের এরূপ অসাধারণ সমাজ-সংগঠনী শক্তি ও প্রতিভা ছিল?

তাঁহার "মহা-ভাব" অতুলনীয়—সমুদ্রের মত অপ্রমেয়। সেই মহাভাবের সৌন্দর্য্যে বৈষ্ণব-পদসাহিত্য ভরপুর; চণ্ডীদাস তাহার আভাস পাইয়া তাঁহার আগমনী গাহিয়াছিলেন, বাসুঘোষ নরহরি তাঁহার স্বর্গীয় প্রেমলীলায় আত্মহারা হইয়া শত শত পদ রচনা করিয়াছেন। হরিনাম করিতে করিতে যখন তিনি কাঁদিতেন, তখন নারদের বীণাধ্বনিবৎ তাঁহার সুকণ্ঠ-উচ্চারিত হরিলীলা যেন শ্রোতৃবর্গের প্রত্যক্ষ হইত। এই মনোহর কণ্ঠের ধ্বনিতে নূতন নূতন সুরের মূর্চ্ছনা জাগিয়া উঠিত। শুধু মনোহর সাহী, রেনেটি বা গরান-হাটার কীর্ত্তন নহে,—একদিন এমনই করুণ-মধুর কণ্ঠে তিনি সাশ্রুনেত্রে হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন যে তাহাতে "মায়ুর" নামক এক নবরাগিণীর সৃষ্টি হইয়া গেল। তাঁহার প্রেম-বিহ্বল চোখের মধুরিমা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নানাভাবে নানা মধুর বার্ত্তা মর্ত্ত্যলোকে বহন করিয়া আনিত। একদিন তাঁহার চোখে অভিমানের অরুণিমা খেলিতেছিল, অতিশয় অভিমান ও লজ্জাজনিত ক্ষোভ দুইটী নয়নে সুব্যক্ত হইয়াছিল, তাঁহার চোখে কি কথা ফুটিতে চাহিয়া যেন ফুটিতে পারিতেছিল না, চঞ্চলতা অতিশয় আবেগে দুলিতেছিল। রূপ-গোস্বামী মুগ্ধনেত্রে এই মহাভাবের পাগলের চোখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, অমনি সেই দৃশ্য তাঁহাকে কল্পনার স্বর্গলোকে লইয়া গেল,

তিনি রাধিকার একটি ভাব উহাতে আরোপ করিয়া দানকেলী-কৌমুদী নামক নাটকের মুখবন্ধে "অন্তঃ স্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণপক্ষাঙ্কুরা।" ইত্যাদি শ্লোকটি রচনা করিলেন, তাহাতে সাতটি ভাবের সমাবেশ আছে; আলঙ্কারিকগণ উহাকে "কিলকিঞ্চিৎ" ভাব সংজ্ঞা দিয়াছেন। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর স্বপ্নবিলাস এবং রাই উন্মাদিনী প্রভৃতি পুস্তক রাধিকার নামে চৈতন্য-লীলা;—বিশেষ রাই উন্মাদিনী গ্রন্থখানি চৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ ছানিয়া, তাহাদের সারাংশ কবিত্বমণ্ডিত করিয়া লিখিত হইয়াছে।) ইহাতে এমন একটি কথা নাই, যাহা চৈতন্য-জীবন হইতে সংগৃহীত হয় নাই। অথচ এই পরিপূর্ণ অধ্যাত্মতত্ত্ব বা ভক্তি-সংবাদ এমনই করুণভাবে লিখিত হইয়াছে যে রাধিকার এই রূপ ও চরিত্র—মহা করুণার প্রস্রবণস্বরূপ হইয়াছে। কে বলিবে এই কাব্যের উৎস মর্ত্ত্য-বাহিনী ভাগীরথী—স্বর্গ-গামিনী মন্দাকিনী নহে? উহা সংসারের বেশ ধরিয়া আসিয়াছে সত্য কিন্তু উহার উৎপত্তিস্থান স্বর্গে। (চৈতন্যদেবের মূর্ত্তি যদি অতি স্পষ্টভাবে কেহ দেখিতে চান, ভাল গায়কের মুখে 'রাই উন্মাদিনী' যাত্রাখানি শুনুন।) গোবিন্দ দাস প্রভৃতির পদে বর্ণিত আছে যে সময়ে সময়ে রাধিকা কৃষ্ণের ক্রোড়ে থাকিয়াও 'কোথা কৃষ্ণ' 'কোথা কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিয়া মূর্চ্ছিত হইতেন। যিনি দিনরাত্র কৃষ্ণের সঙ্গবিচ্যুত হইতেন না, তিনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া বিরহীর মত কাঁদিতেন—রাধাতে আরোপিত এই ভাব সেই লীলার দ্যোতক।

(চতুর্দ্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে বহু দেববিগ্রহ ও মন্দির মুসলমান অত্যাচারীরা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। তখন বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে কষ্টিপাথর-নির্ম্মিত বাসুদেব-বিগ্রহের পূজা হইত। এই সকল বিগ্রহ ভক্তদের প্রাণের ন্যায় প্রিয় ছিল।) যাঁহার কাছে বসিয়া রাত্রিদিন জপ চলিয়াছে,—নিত্য শত শত কুলবধূ যাঁহার জন্য নৈবেদ্য ও পুষ্পপত্র রচনা করিতেন,—যাঁহার ভোগ কত যত্নের সহিত রান্না হইত,—যাঁহার আরতির জন্য কত মালী বাগানের ফুল সংগ্রহ করিয়া মাল্য প্রস্তুত করিত এবং যাঁহার মন্দির-ধূপ অন্তরের সমস্ত কলুষ দূর করিত, এবং গঙ্গাস্নাত, পট্টবাস-পরিহিত ব্রাহ্মণ শুদ্ধদেহ ও শুদ্ধান্তঃকরণে যাঁহার পূজা অর্চ্চনা করিতেন, সেই সকল প্রাণাধিক বিগ্রহের ধ্বংসের পর ভগ্নদেবমন্দির শূন্য হইয়া পড়িল। (কত পুরোহিত ও পাণ্ডা হয়ত স্বীয় প্রাণ বিধর্ম্মীর খড়্গাঘাতে বিসর্জ্জন দিয়া শ্রীবিগ্রহ-রক্ষার বিফল প্রয়াস পাইয়াছিলেন—সেই সকল বিগ্রহ দেশ হইতে অন্তর্হিত হইল। কিন্তু ভক্তের মানসপটে তাহা আরও উজ্জ্বল হইয়া তাঁহার কল্পনাকে প্রবুদ্ধ করিতে লাগিল। সেই চন্দনানুরঞ্জিত কষ্টিপাথরের কৃষ্ণবর্ণ রূপ তাঁহাদের বুকে শেলসম বিদ্ধ হইয়াছিল। কালো কিছু দেখিলেই সেই কালো রূপের কথা মনে হইত। বঙ্গের প্রাচীন এবং আধুনিক বৈষ্ণব সাহিত্যে কালোরূপের প্রেম-স্নিগ্ধ উল্লেখ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়; এজন্য রাধিকা কাজল পরিতেন না, কালো শাড়ী দেখিলে চমকিত হইতেন। তিনি সখীকে [illegible]ন, "কালো কুসুমকরে, পরশ না করি ডরে, এ বড় মনের মনোব্যথা" (চণ্ডীদাস)। [illegible] তিনি কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দেখিলে নিশ্চল ও মুগ্ধ চক্ষুদুটি সেই দিকে নিবদ্ধ রাখিতেন, "সদাই চাহে মেঘপানে, না চলে নয়নের তারা;" এজন্যই তিনি মালতী মালা খুলিয়া কালো

চুলের রাশি হাতে লইয়া মুগ্ধ চোখে চাহিয়া থাকিতেন, এবং ময়ুর-ময়ুরীর কণ্ঠের উজ্জ্বল নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া উন্মত্তা হইতেন। কালো রঙ্গের বিগ্রহ সম্মুখ হইতে অপসারিত হওয়ায় সেই বর্ণ আরও প্রিয় এবং ধ্যানের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; এজন্যই মাধবেন্দ্র পুরী মেঘদর্শনে অজ্ঞান হইতেন এবং চৈতন্য দেব দাক্ষিণাত্যে চণ্ডপুর গ্রামে এক তমালতরু দেখিয়া তাহাকে সাশ্রুনেত্রে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন—কখনও যে-কোনও নদীকে কালিন্দী মনে করিয়া তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেন। এক পদকর্ত্তা রাধিকার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"বিজনে আলিঙ্গয়ে তরুণ তমাল।" এবং বহু বৈষ্ণব কবি রাধার মৃত্যুকালীন ইচ্ছা—মরণান্তে তমাল-ডালে তাঁহার তনু বাঁধিয়া রাখিবার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভগবদারাধনায় এই কৃষ্ণবর্ণটি ক্রমশঃ একটি স্মারক চিহ্নস্বরূপ হইয়া বৈষ্ণব কবিতায় এক অপূর্ব্ব উন্মাদনার অমৃত ঢালিয়া দিয়াছিল। এই কালো বর্ণ বৈষ্ণবের চক্ষে ধ্যানলোকের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং যাঁহাকে মন্দির হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইল, সেই বিগ্রহ স্থান লইলেন ভক্তের চক্ষে ও মনে—বিশ্বের সর্ব্বত্র—সমুদ্রের নীললহরীতে, সুশ্যাম তমালতরুতে, কৃষ্ণবর্ণ মেঘে ও ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠের বর্ণে। কবিরা এখনও গান বাঁধিয়া বলেন, "কালো কি হয় না ভালো-রে" চৈতন্যের মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা এবং ভগবানের সঙ্গে আনন্দমিলন অনেক সময়ে এই কৃষ্ণবর্ণকে সমাশ্রয় করিয়া হইত। কৃষ্ণের বর্ণ অবশ্যই কালো, কিন্তু ভারতবর্ষে কালো রঙ্গের উপর এত দরদ বাঙ্গালীদের মত আর কেহ দেখায় নাই।)

কালোর উপরে দরদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চৈতন্যের তিরোধান ও বৈষ্ণব সমাজ

১৫৩৩ অব্দে চৈতন্যের তিরোধান হয়। এই তিরোধান কিরূপে হইয়াছিল, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। তিনি সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, একথা চৈতন্যচরিতামৃতে লিপিবদ্ধ আছে, এই সূত্রে সমুদ্রের জলে তাঁহার তিরোধান হয়—এই যে সংস্কার কয়েকজন শিক্ষিত লেখক সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে কোন আস্থা দেওয়া যায় না। প্রাচীন সাহিত্যের কোথায়ও ইহার প্রমাণ নাই। স্থানীয় প্রবাদ, তিনি জগন্নাথের সঙ্গে অথবা গোপীনাথের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন—তাঁহার দেহ ছিল চিন্ময়, সুতরাং রক্তমাংসের দেহের ধ্বংসের মত তাহার বিলয় হইতে পারে না, এই সংস্কার-বশতঃ প্রবাদটির সৃষ্টি হইয়াছিল। কোন একটি প্রাচীন পদে "মহাপ্রভু হারাইলাম গোপীনাথের ঘরে" এই ছত্রটি আছে। ইহা গোপীনাথের সঙ্গে তাঁহার মিশিয়া

তিরোধান-সম্বন্ধে নানা মত।

যাইবার ইঙ্গিত-বাণী কিনা জানি না। কিন্তু, আমাদের মনে হয়, জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্য-মঙ্গলে মহাপ্রভুর তিরোধানের যে কাহিনী দিয়াছেন, তাহাই এতৎসম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও যুক্তিসঙ্গত কথা। রথযাত্রার সময়ে কীর্ত্তনানন্দে চৈতন্য উছট্ খাইয়া পড়িয়া যান এবং তাহাতে পায়ে ভয়ানক চোট লাগে। অনতিকাল-পরে গুণ্ডিচা গৃহে তাঁহাকে আনা হয়, এবং তথায় তাঁহার প্রবল জ্বর হয়। জয়ানন্দ বলেন, আষাঢ় মাসের রবিবার সপ্তমী তিথিতে (১৫৩৩ খৃঃ) বেলা তিনটার সময়ে তিনি স্বর্গধামে গমন করেন, কিন্তু লোচনদাস বলেন রাত্রি আটটায় তাঁহার বিয়োগ হয়। সেদিন অপরাপর দিনের ন্যায় বেলা তিনটার পর গুণ্ডিচা বাটীর দরজা খোলা হয় নাই। চৈতন্যের পার্শ্বচরগণ মন্দিরের দ্বারে ভিড় করিয়া ছিলেন। কিন্তু আটটা রাত্রিতে দরজা খুলিয়া পাণ্ডারা বলেন—মহাপ্রভু স্বর্গে গমন করিয়াছেন, তাঁহার দেহের আর কোন চিহ্ন নাই। বেলা তিনটা হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত সেই গৃহে পাণ্ডারা খিল লাগাইয়া কি করিয়াছিলেন? পূর্ব্বোক্ত দুই পুস্তকের কথা এবং ঈশান নাগরের অদ্বৈত-প্রকাশের কয়েকটি ছত্র হইতে আমাদের অনুমান হয়, বেলা ৩টার সময়ে তাঁহার দেহত্যাগ হইলে মন্দিরের মধ্যেই দেববিগ্রহের প্রকোষ্ঠ-সংলগ্ন বৃহৎ মণ্ডপের এককোণে তাঁহাকে সমাধি দেওয়া হয়। প্রতাপরুদ্রের অনুমতি লইয়াই সম্ভবতঃ ঐরূপ করা হইয়াছিল, যেহেতু উক্ত পুস্তকের একখানিতে লিখিত হইয়াছে, বহু পুষ্পমাল্য সেই মন্দিরের গুপ্তদ্বার দিয়া তখন লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। বেলা তিনটা হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত তাঁহার সমাধিকার্য্যে ব্যয়িত হয়, তৎপরে সেই মণ্ডপের পাথরগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া সমাধির চিহ্ন বিলুপ্ত করা হইয়াছিল। যাঁহারা সঠিক অবস্থা জানিয়াছিলেন—তাঁহারা তিরোধান বেলা ৩টায় হইয়াছিল এরূপ লিখিয়াছিলেন; কিন্তু আটটা রাত্রে সংবাদ রাষ্ট্র হয় যে তিনি আর ইহলোকে নাই। সেই মণ্ডপের দেবপ্রকোষ্ঠের একটি নিকটস্থ কোণে গৌরাঙ্গের প্রস্তর-নির্ম্মিত পদচিহ্ন আছে। ঐ মন্দিরে চৈতন্যের সেই পদচিহ্ন থাকার কোন কারণ নাই। জগন্নাথ মন্দির ও গোপীনাথ মন্দির এই দুইটি চৈতন্যের প্রধান লীলা-স্থল। গুণ্ডিচা মন্দিরের সেই পদচিহ্ন কি লুক্কায়িত সমাধির নিদর্শন? যাহা হউক এ বিষয়ে আমি আর বেশী কথা লিখিব না। আমি আমার অনুমান মাত্র লিপিবদ্ধ করিলাম। যাঁহারা বিগ্রহের অঙ্গে তাঁহার চিন্ময় দেহ মিশিয়া যাইবার কথা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের বিশ্বাসে আমি 'ঘা' দিতে ইচ্ছা করি না। পুরীর পাণ্ডাদের মধ্যে আর একটি ভীষণ প্রবাদ প্রচলিত আছে—তাহা আমি তথায় শুনিয়াছি। জগন্নাথ বিগ্রহ হইতেও চৈতন্যের প্রতিপত্তি বেশী হওয়াতে পাণ্ডারা নাকি গোপনে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল। কিন্তু রাজাধিরাজ প্রতাপরুদ্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া মান্য করিতেন, যাঁহার তিরোধানের পর রাজার ঘোর বিরাগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহারই রাজধানীতে কি এরূপ একটা ঘটনা ঘটিতে পারে? উড়িষ্যার রাজপঞ্জী সন্ধান করিলে হয়ত সত্য ঘটনা ব্যক্ত হইতে পারে।

চৈতন্যের তিরোধান-সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি সকলেই নীরব। যে কয়েকখানি পুস্তকে একটু ইঙ্গিত আছে, তাহা বৈষ্ণব-সমাজের সর্ব্বজনাদৃত গ্রন্থ নহে। শুধু লোচনদাস

একশ্রেণীর বৈষ্ণবদের মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, তাঁহার পুস্তকেও এ সম্বন্ধে সামান্য কয়েকটি কথা আছে।

চৈতন্যের তিরোধানের পর বৈষ্ণব-সমাজের অবস্থা।

যে কারণেই হউক, এই নীরবতা দুঃসহ শোকজ্ঞাপক। ভগবান্ ধুতি চাদর পরিয়া বাঙ্গালী সাজিয়া বাঙ্গালীর মধ্যে লীলা করিয়া গিয়াছেন, এত বড় গৌরবে এদেশের লোকেরা গৌরবান্বিত ছিল, চৈতন্যের তিরোধানে সেই জাতীয় গৌরব-কিরীট শিরশ্চ্যুত হইল। জাহাজ ডুবিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গেলে যেরূপ তাহার ভগ্ন অংশগুলি অর্ণবে ইতস্ততঃ দৃষ্ট হয়—এই মহাবিপদের দিনে বৈষ্ণব-সমাজ তেমনই বিচ্ছিন্ন ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। গঙ্গাতীরে যে মহাকীর্ত্তনের দল মন্দিরা, করতাল, ডম্ফ ও মৃদঙ্গনিনাদে আকাশ দিবারাত্র প্রতিশব্দিত করিত, হঠাৎ সেই আনন্দোৎসব থামিয়া গেল। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস ও নরহরি ধীরে ধীরে শোকসন্তপ্ত হইয়া অব্যক্ত দুঃখে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। শচী তাঁহার পুত্রের সন্ন্যাসের পর প্রতিবৎসর প্রাণের নিমাইয়ের সংবাদ পাইতেন,—শেষবার চৈতন্য পুরী হইতে জগদানন্দকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে বলিয়া দিয়াছিলেন, "মা, আমি তোমার বৃদ্ধ বয়সে সেবা করিতে পারি নাই। আমার ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই হইল না,—আমি পাগল হইয়া কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছি, আমি তোমার চিরস্নেহের ছেলে, আমার শত অপরাধও তোমার নিকট মার্জ্জনীয়—মা, তোমার স্নেহের নিমাইকে মাপ করিও।" একবার শান্তিপুরে শোকাকুলা মাকে সান্ত্বনা দিয়া চৈতন্য বলিয়াছিলেন, "মা, আমি তোমারই রান্নাঘরে ও শ্রীবাসের আঙ্গিনায় অশরীরিভাবে সর্ব্বদা থাকিব; তুমি যেদিন কোন ভাল জিনিষ রান্না করিবে,—জানিও, আমার আত্মা তোমার ঘরে সেই সময় বিরাজ করিবে, আমার দেহ অন্যত্র থাকিলেও প্রাণ-মন নদীয়ায় তোমার ঘরে থাকিবে।" এই সকল সংবাদ পাইয়া শচীর শতধাবিদীর্ণ হৃদয়ের জ্বালা কথঞ্চিৎ জুড়াইত; কিন্তু আজ তিনি কি করিবেন? চিরবিশ্বস্ত ভৃত্য ঈশান আজ তাঁহাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবেন? চির-ব্রহ্মচর্য্য ও কঠোর নিয়মপালনে কঙ্কালসার তন্বঙ্গী বিষ্ণুপ্রিয়ার দশা কি হইল, জানা নাই। নিত্যানন্দ দাস খেতুরীর মহোৎসব এবং গৌরাঙ্গ-বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সেই বিষণ্ণ, ভগবৎপরায়ণার অপূর্ব্ব সাধ্বীমূর্ত্তি আভাসে দেখাইয়াছিলেন, তারপর তৎসম্বন্ধে কোন লেখক কিছু বলেন নাই।

এদিকে বৃন্দাবন নূতন নগর হইয়া সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। চৈতন্য তাঁহার প্রিয় ভক্তদিগকে সেখানে পাঠাইয়া তীর্থগুলির উদ্ধার করার পর সমস্ত ভারতবর্ষের চক্ষু বৃন্দাবনের দিকে পড়িয়াছিল। দলে দলে তীর্থদর্শনকারীরা তথায় ভিড় করিয়াছিল। লোকনাথ, রঘুনাথ দাস, রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, জীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি বরেণ্য সাধুগণের অলৌকিক ভক্তি-দর্শনে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অনুরাগী হইয়াছিল,—তথায় শত শত মঠ মন্দির উত্থিত হইল। গ্রাউজ সাহেবের মথুরার ইতিহাস ও নাভাজি-কৃত ভক্তমালে তথাকার সমৃদ্ধি ও ভক্তিধর্ম্মের সাফল্যের কথা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। যে সনাতনের ভক্তিদর্শনে সম্রাট্ আকবর বিস্মিত হইয়াছিলেন, রাজা মানসিংহ শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বিষয়বিরাগীর নির্দ্দেশানুসারে ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে

আকাশস্পর্শী মন্দির রচনা করিয়াছিলেন, সেই সনাতন এবং তাঁহার ভারতপ্রসিদ্ধ ভ্রাতা রূপ গোস্বামী চৈতন্যের তিরোধান শুনিয়া তাঁহার সর্ব্বজনবন্দিত চরণ ধ্যান করিয়া ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ১৫৩৩ খৃঃ অব্দের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের কাজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী বন্ধ ছিল। মহাশোকে মতিচ্ছন্ন চৈতন্যের অনুচরগণ যেন বজ্রাঘাতে চেষ্টাহীন ও নীরব হইয়াছিলেন—কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দী পরে আবার ধীরে ধীরে নবজীবনের আলোকচ্ছটায় দিগ্বলয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত—এই তিনজন প্রথম অধ্যায়ের নেতা ছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ এই তিনজন নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। আবার তেমন করিয়া খোল বাজিয়া উঠিল—যেমন করিয়া চৈতন্যের সময়ে বাজিত, আবার সঙ্কীর্ত্তনের উচ্চরোলে, রামসিঙ্গার চীৎকারে ভক্তিধর্ম্ম শুধু বঙ্গ-উড়িষ্যায় নহে, মথুরা, বৃন্দাবন ও রাজপুতনায় বিজয়ী হইল। বাঙ্গালী কবিরা বাঙ্গলা-ভাষা কতক পরিমাণে ত্যাগ করিয়া ব্রজবুলীতে পদ রচনা করিতে লাগিলেন, কারণ তাঁহাদের অপূর্ব্বপদগুলি এখন আর শুধু বাঙ্গালীর জন্য নহে—সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে তাহা গীত হইবে। চিরঞ্জীব সেনের পুত্র, দামোদরের দৌহিত্র বুধরী-গ্রামবাসী সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিরা বিদ্যাপতির অনুসরণ করিয়া এই ব্রজবুলি ছন্দে যে রস বিলাইয়া দিলেন, তাহা বৃন্দাবনবাসীরা পর্য্যন্ত উপভোগ করিতে সমর্থ হইলেন। বাঙ্গালী কবির পদ সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে প্রচারিত হইল। নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকরে জীব গোস্বামী ও গোবিন্দদাসের যে সকল সংস্কৃত-পত্র উদ্ধৃত আছে, তাহাতে দেখা যায় বাঙ্গালী কবিরা ব্রজবুলি ছন্দ অবলম্বন করিয়া কিভাবে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত বিজয় করিয়াছিলেন।

অর্দ্ধশতাব্দী পরে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পর পর তিনটি কেন্দ্র হইয়াছিল। প্রথম কেন্দ্র নবদ্বীপে, যেখানে সর্ব্বপ্রথম বাসুদেব ঘোষের দুই ভ্রাতার হাতে খোল বাজিত এবং মুকুন্দ ও শ্রীবাস মধুর কণ্ঠে হরিনাম গাইতেন আর বক্রেশ্বর তাঁহার স্বর্গীয় নৃত্যে দর্শকদিগকে মুগ্ধ করিতেন। এই কেন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী ছিলেন চৈতন্য।

তিনটি কেন্দ্র।

চৈতন্য পুরীতে গেলে নবদ্বীপ হতশ্রী হইল। এবার খোল বাজিয়া উঠিল পুরীতে। বর্ষাকালে বাঙ্গালী ভক্তেরা শিবানন্দ সেনের নেতৃত্বে পুরীতে চলিয়া আসিতেন, তখন শ্রীবাসের কণ্ঠের স্বরলহরী ফিরিয়া আসিত; মুকুন্দ আবার গাইতেন,—বক্রেশ্বরের নৃত্যে, নিত্যানন্দ-সমাগমে, স্বরূপ-দামোদর, রামরায় এবং রাজাধিরাজ প্রতাপরুদ্রের প্রেমোচ্ছ্বাসে ভক্ত জনসাধারণ নীলাদ্রিনাথের পথ ভুলিয়া বাঙ্গালী ভাবানের কীর্ত্তনে যোগ দিতেন। মহাপ্রভুর লীলাবসানের সঙ্গে সঙ্গে এই কেন্দ্র নিষ্প্রভ হইয়া গেল।

তৃতীয় কেন্দ্র—বৃন্দাবন। মহাপ্রভুর লীলাবসানের পর বৃন্দাবন কতকদিন শোকে সমাচ্ছন্ন ছিল। এখানে শুধু ভক্তি ও প্রেমের চর্চ্চা হয় নাই, অশেষ দৈন্য—ব্রহ্মচর্য্যের অশেষ কঠোরতা, ও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতদিগের অশেষ পাণ্ডিত্য—এই কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য হইয়া ইহাকে শ্রীসম্পন্ন করিয়াছিল। এখানে সনাতনের হরিভক্তিবিলাস, রূপের ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব, উজ্জ্বল-নীলমণি, দানকেলী-কৌমুদী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত

হইয়াছিল। এখানে বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ও অশেষ পাণ্ডিত্য ও সাধুতার অমৃতফলস্বরূপ বাঙ্গলা ভাষায় বিরচিত অপূর্ব্ব চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন; এখানেই নরহরি চক্রবর্ত্তী তাঁহার অসামান্য অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যের কীর্ত্তিস্তম্ভ ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। উত্তরকালে জীব গোস্বামী এই বৃন্দাবন কেন্দ্রের নেতা হইয়াছিলেন। এখানে রূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, জীব ও গোপাল ভট্ট—এই ছয়জন গোস্বামী বাস করিয়া গিয়াছেন। উত্তরকালে যে সকল বৈষ্ণবগ্রন্থ বাঙ্গলাদেশে লিখিত হইত, তাহা এই গোস্বামীদের নিকট প্রেরিত হইত। যে সকল গ্রন্থ ইঁহারা অনুমোদন করিতেন, তাহাই বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত হইত। যাহাতে ইঁহাদের শিলমোহর থাকিত না, তাহা বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত হইতে পারিত না। ইঁহারা বৈষ্ণব-সমাজের বিধানকর্ত্তা ও নিয়ন্তা ছিলেন। বৃন্দাবন দাস তাঁহার 'চৈতন্যমঙ্গল' লিখিয়া ইঁহাদের অনুমোদনের জন্য বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, গোস্বামীরা ইহা পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলাজ্ঞাপক ভাগবতের সঙ্গে ইহার সৌসাদৃশ্য দেখিয়া ইহার নাম 'চৈতন্যভাগবত' রাখিয়াছিলেন।

জীব গোস্বামী ছিলেন রূপ ও সনাতনের সহোদর অনুপমের পুত্র। জীব অতি সুদর্শন ছিলেন, তাঁহার পিতৃব্যেরা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহারা চৈতন্যের পাগল—এই সমস্ত কথা বাল্যে যখন তাঁহার মাতা বলিতেন, তখন বালকের গণ্ড বহিয়া অশ্রু পড়িত। অল্পবয়সে তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে কৃতিত্ব লাভ করেন। কিন্তু ভক্তির আকর্ষণে তিনি একেবারে উন্মত্ত হইয়া যাইতেন। এই সংসার তাঁহার নিকট অল্পবয়সেই অসার বোধ হইত—পিতৃব্যদের পরিত্যক্ত অতুল ঐশ্বর্য্য, কৈশোরাতিক্রান্তে তাঁহার অতুল্য রূপ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য—এসকলের আকর্ষণ তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না। যাহাকে চৈতন্য আকর্ষণ করিতেন—তাঁহাকে কে রোধ করিবে? একদিন ষোড়শবর্ষীয় বালক জীব তাঁহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, সন্ন্যাসী হয় কেমন করিয়া?" মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে সন্ন্যাস লওয়ার পদ্ধতি বলিতে লাগিলেন, কারণ—শুধু তাঁহার স্বামীর ভ্রাতারা নহেন, তাঁহার স্বামীও মৃত্যুর অনতিকালপূর্ব্বে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাশ্রুনেত্রে মাতা কিরূপে মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়, কিরূপে দীক্ষা লইতে হয়, কিরূপে গৈরিক বস্ত্র পরিতে ও দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়—এই সকল কথা বলিলেন। বালক বলিল, "আমার পিতৃব্যেরা অতুল সম্পদের অধিকারী ছিলেন, তাঁহারা সন্ন্যাস লইয়া জঙ্গলের বৃক্ষপত্রে শয়ন করিয়া ও তথাকার কষায় ফল খাইয়া কিরূপে থাকেন?" মাতা বলিলেন, "ধর্ম্মে বিশ্বাস ও চৈতন্যের প্রতি ভালবাসার দরুন তাঁহারা দৈহিক কষ্টকে কষ্টের মধ্যেই গণ্য করেন না।" পরদিন জীব দণ্ডহস্তে ও গৈরিক পরিয়া মাতার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "মা, আমায় কি সন্ন্যাসীর মত দেখায় না? এখন হইতে সকলে আমাকে প্রণাম করিবে—আমি একজন সাধু!" সুন্দর বালককে গৈরিক বাসে বড়ই মানাইয়াছিল। মাতা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এমন সুন্দর চাঁচর কেশ মাথায় করিয়া কি কেহ সন্ন্যাসী হইতে পারে?" বালক ক্ষণকাল নিরুত্তর থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা, কাল দেখিবে"

পরদিন মস্তক মুণ্ডিত করিয়া গৈরিকপরিহিত কিশোর জীব মাতাকে বলিল, "মা, প্রণাম, তোমার স্নেহের দুলালকে চিরদিনের জন্য বিদায় দাও, আমি ব্রাহ্মণ, আমার পিতা ও পিতৃব্যদের যে গতি, আমারও তাহাই। আমি বিষয়ভোগের জন্য জন্মগ্রহণ করি নাই। মা, আমি চলিলাম, তোমার স্নেহের ছেলেটিকে আর দেখিতে পাইবে না।" জীব ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতাকে প্রণাম করিল। বজ্রাহতের ন্যায় মাতা জ্ঞানহারা হইয়া রহিলেন। রূপ-সনাতনের পরিবারবর্গ ফতেয়াবাদে বাস করিতেছিলেন, তথা হইতে জীব সন্ন্যাস লইয়া প্রথমতঃ নবদ্বীপে আসিলেন। তিনি শ্রীবাসের বাড়ীতে আসিয়া নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শ্রীবাসের আঙ্গিনা চৈতন্যের পদরজে পবিত্র হইয়াছিল। বালক সন্ন্যাসী কাঁদিতে কাঁদিতে সেই আঙ্গিনায় গড়াইয়া পড়িলেন। নবদ্বীপ হইতে কাশী যাইয়া প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতির নিকট তিনি কয়েক বৎসর উপনিষদের শিক্ষালাভ করিলেন। বৃন্দাবনে আসিয়া স্বীয় পিতৃব্যদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অচিরে তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইল। রূপ ও সনাতনের পরে বৈষ্ণব-সমাজে তেমন প্রতিষ্ঠা আর কাহারও হয় নাই। তিনি ২৫ খানি সংস্কৃত পুস্তক রচনা করেন, ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রধান ভিত্তি। এই পুস্তকগুলির মধ্যে ষট্‌সন্দর্ভই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। উত্তরকালে জীব গোস্বামীই বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজের একমাত্র কর্ণধার হইয়াছিলেন। কোন পণ্ডিত বা সামাজিকের শাস্ত্র-বিষয়ে দ্বিধা উপস্থিত হইলে তাঁহারা জীব গোস্বামীর নিকটে বৃন্দাবনে পত্র লিখিতেন, তাঁহার সিদ্ধান্তই শিরোধার্য্য হইত। নাভাজি ভক্তমালে লিখিয়াছেন, "শ্রীরূপ সনাতন ভক্তিজল শ্রীজীব গোসাঁই সর গম্ভীর। বেলা ভজন সুপক রসায়ন কবহু ন অভিলাষী। বৃন্দাবন দৃঢ়বাস যুগলচরণ অনুরাগী। সন্দেহ গ্রন্থচ্ছেদন সমর্থ রসবাসী উপাসক পরম বীর। শ্রীরূপ সনাতন, শ্রীজীব গোসাঁই সর গম্ভীর।" গ্রাউজ সাহেব তাঁহার মথুরার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, "এই সময়ে বৃন্দাবনের সর্ব্বাপেক্ষা লব্ধপ্রতিষ্ঠ, বৈষ্ণব-সমাজের নেতা ছিলেন রূপ ও সনাতন। ইহাদের সহিত তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামীর নাম করাও কর্ত্তব্য। মানসিংহ গোবিন্দজীর যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই কয়েকটি কথা উৎকীর্ণ হয়—"মহারাজ পৃথ্বীরাজের বংশোদ্ভব মহারাজ শ্রীভগবান্ দাসের পুত্র, মহারাজ মানসিংহকর্ত্তৃক এই মন্দির তাঁহার গুরু রূপ ও সনাতনের আদেশে সম্রাট্ আকবরের ৩৪ রাজ্যাঙ্কে নির্ম্মিত হয়।" গ্রাউজ সাহেব বলেন, "It is the most impressive religious edifice that the Hindu art has ever produced at least in Upper India. It is not a little strange that of all architects who have described this famous building, not one has noticed its most characteristic feature—the harmonious combination of dome and spire which is still noted as the great crux of modern art, though nearly 300 years ago; the difficulty was solved by the Hindus with characteristic grace and ingenuity." [ভারতবর্ষে অন্ততঃ আর্য্যাবর্ত্তে এই ধর্ম্মমন্দির

বৃন্দাবন—বাঙ্গালী সন্ন্যাসীদের সৃষ্টি।

স্থাপত্য হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হিন্দুরা যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন—এই মন্দির তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মহিমান্বিত। আশ্চর্য্যের বিষয় যত স্থপতিবিশারদ এই মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কেহই ইহার একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন নাই। গম্বুজ ও চূড়ার অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য এই মন্দিরে যাহা দৃষ্ট হয়—তাহা শুধু সম্প্রতি য়ুরোপের স্থপতিবর্গ কলাকৌশলের সর্ব্বাপেক্ষা জটিল প্রশ্ন বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুরা তাঁহাদের অভ্যস্ত বৈশিষ্ট্য, মনোহারিত্ব ও কৌশল সহকারে এই সমস্যার উৎকৃষ্ট সমাধান করিয়াছিলেন।। গ্রাউজ এই সকল মন্দিরের বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। এই মন্দির স্থপতিবিদ্যাবিশারদ কল্যাণ দাস, স্থপতি গোবিন্দ দাস এবং মাণিকচাঁদ চোপরের সাহায্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বৃন্দাবনে রূপ, সনাতন ও জীব যে ভাবে জীবন যাপন করিতেন, একটি ঐতিহাসিক আখ্যায়িকাদ্বারা তাহা বিশদভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

রূপনারায়ণ।

এককালে কামরূপের রাজধানী এগারসিন্দুরের নিকটবর্ত্তী ভাটাদিয়া গ্রামে লক্ষ্মীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য নামক এক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার সাধ্বী পত্নীর নাম কমলা দেবী। ইঁহাদের একমাত্র সুদর্শন পুত্র ছিলেন রূপনারায়ণ। অল্পবয়সে তিনি লেখাপড়ায় অমনোযোগী ও দুর্বৃত্ত ছিলেন। সংশোধনের সমস্ত চেষ্টা বিফল হওয়াতে একদা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পত্নীকে আদেশ করিলেন, বালককে অন্নাম খাইতে দিতে। সাধ্বী কমলা দেবী স্বামীর আদেশ অমান্য করিতে না পারিয়া ভাতের থালায় এক পার্শ্বে একটুকরা কয়লা ধুইয়া তাহা পুত্রকে পরিবেষণ করিলেন। কিন্তু রূপনারায়ণের দৃষ্টি সেই কয়লাটুকুর দিকেই সর্ব্বাগ্রে পড়িল। মাতার নিকটে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া কারণ জানিতে পারিলেন এবং তদ্দণ্ডে অন্নের থালা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। প্রথম পঞ্চবটী নামক এক গ্রামের টোলে আসিয়া তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন, তারপর নবদ্বীপে আসিয়া তথাকার টোলে নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তথা হইতে অনুমান ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পুরীতে আসিয়া চৈতন্যদেবের সঙ্গে দেখা করেন, কিন্তু উদ্ধত যুবক ভক্তির সেই প্রবল বন্যার পাশ কাটাইয়া কাশীতে আসিয়া সংস্কৃত শাস্ত্র আরও বিশেষ করিয়া অধ্যয়ন করেন। সর্ব্বশেষে রূপনারায়ণ বোম্বাইয়ের পুণা নগরীতে যাইয়া পাঠসমাপ্তিপূর্ব্বক "সরস্বতী" উপাধি লাভ করেন।

তেজস্বী উদ্ধত যুবক এখন পণ্ডিত-শিরোমণি হইলেও তাঁহার স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই। তিনি আর্য্যাবর্ত্তে আসিয়া হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, "আমি দিগ্বিজয়ী, যদি কোন পণ্ডিতের গৌরব থাকে, তবে সেই গৌরব পরীক্ষা করিবার কষ্টিপাথর আমি। আমার সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হউন।" বহু পণ্ডিতকে যাল করিয়া এক বোঝা জয়পত্র সঙ্গে লইয়া তিনি বৃন্দাবনের দিকে ছুটিলেন, কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন, রূপ ও সনাতনের মত পণ্ডিত তখন ভারতবর্ষে কেহ ছিল না। দৈন্যের অবতার ভ্রাতৃদ্বয় রূপনারায়ণের গর্ব্বিত আক্রমণের উত্তরে বলিলেন, "ভাই, তুমি ভুল শুনিয়াছ, লোকে আমাদের সামান্য গুণ বাড়াইয়া তোমাকে

বলিয়াছে। আমরা দীনহীন কৃষ্ণকৃপাপিপাসু, তোমার মত পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নামিবার সামর্থ্য আমাদের নাই।” স্পর্দ্ধিত পণ্ডিত বলিলেন, “সে হইলে ছাড়িব না। তর্কে না পার, আমাকে জয়পত্র লিখিয়া দাও।” সদাশয়তার আতিশয্যে এবং বৈষ্ণবোচিত বিনয় ও দৈন্তের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা উহাকে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন, কারণ বৈষ্ণবের নীতি “অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।” এই জয়পত্র হাতে করিয়া রূপ সরস্বতী মনে করিলেন—তিনি ভারতের বিদ্যারাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্। কিন্তু কে যেন বলিল, বৃন্দাবনেই এই দুই ভ্রাতার এক পাণ্ডিত্যাভিমানী ভ্রাতুষ্পুত্র আছেন, তিনিও বড় কম নহেন। রূপনারায়ণ অমনি যাইয়া জীব-গোস্বামীর কুটিরে উপস্থিত। তাঁহার পিতৃব্যদ্বয়ের স্বাক্ষরিত জয়পত্র দেখিয়া যুবক জীব-গোস্বামী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তখনই সরস্বতীর সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঁচদিন পর্য্যন্ত বিচারে সমকক্ষতা চলিল, কিন্তু ষষ্ঠ দিনে জীবের নিকট রূপনারায়ণ পরাস্ত হইলেন,—সপ্তম দিনে উপনিষৎ এবং অদ্বৈতবাদের বিচার সমাধার পর জীব গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। রূপনারায়ণের নিকট ইহা সম্পূর্ণ নূতন। সপ্তমদিনের ব্যাখ্যায় পাথর গলিয়া জল হইয়া গেল—অহঙ্কার ও দর্প রসাতলে গেল। অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়া রূপনারায়ণ রূপ-সনাতনের নিকট যাইয়া তাঁহার অকৃত্রিম দৈন্য ও অনুতাপ জ্ঞাপন করিলেন এবং বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তারপর তিনি বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতার নিকটবর্ত্তী পক্কপল্লীর রাজা নৃসিংহের সভাপণ্ডিত হইলেন এবং বৈষ্ণবশাস্ত্র চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। রূপনারায়ণ সঙ্গীত-শাস্ত্রেও কৃতী ছিলেন, রাজসভায় তাহারও আলোচনা চলিল।

এদিকে জীবকে রূপ গোস্বামী বলিলেন, “তোমার বিচারজয়ের প্রবৃত্তি এখনও দূর হয় নাই—তুমি বৃন্দাবনে বাস করিবার যোগ্য নও; সর্ব্বতোভাবে অহঙ্কার বিলুপ্ত না হইলে বৃন্দাবনবাসের যোগ্যতা হয় না, তুমি বৃন্দাবনের সীমানার মধ্যে থাকিতে পারিবে না।” পিতৃব্যের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া জীব বৃন্দাবন ছাড়িয়া যমুনা-তীরে এক কুটিরে বাস করিয়া প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া এক বৎসর কাটাইলেন। একদিন সনাতন রূপকে বলিলেন, “বলতো ভাই, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রধান গুণ কি?” রূপ বলিলেন, “জীবে দয়া।” সনাতন বলিলেন, “তবে তুমি জীবের প্রতি এত নিষ্ঠুর কেন?” জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া রূপ জীব গোস্বামীকে বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিতে অনুমতি দিলেন।

রূপ-সনাতনের দৈন্য।

১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আকবর রূপ ও সনাতনের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। গ্রাউজ সাহেব লিখিয়াছেন, এই দর্শনের ফলে সম্রাট্ এতই প্রীত হইয়াছিলেন যে, সমস্ত হিন্দুরাজাদিগকে বৃন্দাবনে বড় বড় মন্দির-নির্ম্মাণের অনুমতি দিয়াছিলেন। স্বয়ং চৈতন্যের বহু গুণকীর্ত্তন শুনিয়া তিনি চৈতন্যসম্বন্ধে একটা হিন্দী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের ‘গৌরলীলা-তরঙ্গিণী’তে দ্রষ্টব্য। কথিত আছে অদ্বৈত সর্ব্বপ্রথম মদনমোহন বিগ্রহ আবিষ্কার করেন, তিনি উহা মথুরা চোবে নামক এক ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, উক্ত চোবে উহা সনাতনকে দিয়াছিলেন। রামদাস কাপুরী নামক একজন ক্ষেত্রী নদীতে তাঁহার

বহুমূল্য বাণিজ্যদ্রব্যসহ জাহাজ আটকাইয়া যাওয়াতে মদনমোহন-বিগ্রহের নিকট মানত করেন, জাহাজ উদ্ধার পাইলে তিনি সেই বৎসরের সমস্ত আয় দিয়া উক্ত বিগ্রহের জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করাইবেন। মদনমোহনের বিশাল মন্দির এই মানতের ফলে প্রস্তুত হইয়াছিল। গ্রাউজ সাহেবের ইতিহাস, চৈতন্যচরিতামৃত, নাভাজিকৃত ভক্তমাল ও লক্ষ্মণদাসপ্রণীত ভক্তি-সিন্ধু পুস্তকে এই বিগ্রহ-সংক্রান্ত অনেক কথা আছে। উত্তরকালে এই বিগ্রহ জয়পুরের রাজা লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি উহা তাঁহার ভ্রাতা কারাউলির রাজা গোপাল সিংহকে প্রদান করেন, তিনি ইহার জন্য তথায় একটি নূতন মন্দির তৈরী করিয়া পূজার ভার রামকিশোর গোঁসাই নামক মুর্সিদাবাদের এক ব্রাহ্মণের হস্তে ন্যস্ত করেন। এই ভাবে চৈতন্যের প্রভাবে তাঁহার ভক্তগণকর্ত্তৃক যে নব বৃন্দাবন স্থাপিত হয়, তাহা ক্রমে এরূপ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ

শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ।

মহাপ্রভুর তিরোধানের পর বৃন্দাবনের ষট্ গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের নিয়ন্তা হইয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের স্থলে আর তিনজন নেতৃত্বপদে অভিষিক্ত হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ক্ষেত্র অশেষরূপে বাড়াইয়া দেন। ইঁহাদের ভক্তিপূর্ণ জীবন বহু সুপ্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, তন্মধ্যে ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস, নরোত্তমবিলাস, বংশী-শিক্ষা, অনুরাগবল্লী, কর্ণামৃত প্রভৃতি পুস্তক উল্লেখযোগ্য। এই তিনজনের মধ্যে প্রথম নাম **শ্রীনিবাস আচার্য্যের।**

কথিত আছে চৈতন্যদেব ইঁহার আবির্ভাবসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। ইনি নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী চাখন্দিবাসী গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের পুত্র। বর্দ্ধমান যাজিগ্রাম ছিল ইঁহার মাতুলালয়। ইঁহার মূর্ত্তি অতি সুন্দর ছিল; বৈষ্ণব-সমাজে ইনি মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতার বলিয়া পরিচিত। ধনঞ্জয় বিদ্যানিবাসের নিকট ইনি শৈশবে সংস্কৃত শিক্ষা করেন।

শ্রীনিবাস।

কিন্তু ইঁহার পিতা ছিলেন চৈতন্যের অনুরাগী। সেই অনুরাগ পুত্রে বর্ত্তিয়াছিল। শৈশবে গঙ্গাধর নবদ্বীপে ইঁহাকে লইয়া যাইয়া চৈতন্যলীলার সমস্ত স্থান দেখাইতেন ও সেই মধুরাদপি মধুর লীলাকাহিনী শুনাইতেন। বক্তা ও শ্রোতা—পিতাপুত্র—দুই জনেই কাঁদিয়া আকুল হইতেন। গঙ্গাধরের মৃত্যুর পর ইনি নবদ্বীপে শচী দেবীর সঙ্গে দেখা করেন। তৎপরে পুরীতে গদাধরের নিকট ভাগবত পড়িতে যান। গদাধরের একখানি মাত্র ভাগবতের পুঁথি ছিল, তাহার অক্ষর মহাপ্রভুর অশ্রুতে মুছিয়া গিয়াছিল। বঙ্গদেশ হইতে একখানি বিশুদ্ধ পুঁথি আনিলে তিনি পড়াইবেন—

স্বীকার করিলেন। তৎকালে যাতায়াত সহজ ছিল না। কয়েক মাস পরে শ্রীনিবাস ভাগবতের পুঁথি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন, গদাধর স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তখন ফিরিয়া বাঙ্গলায় আসিয়া নিত্যানন্দের পত্নী শ্রীজাহ্নবী গোস্বামিনীর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁহার আদেশে বৃন্দাবনে রওনা হন, উদ্দেশ্য রূপ-সনাতনের নিকট ভক্তিশাস্ত্রপাঠ। যাজিগ্রাম হইতে পাঁচদিনে রাজমহল আসিয়া তথা হইতে গৌড়দ্বার হইয়া পাটনায় আসিলেন। কাশীতে যাইয়া চৈতন্যের লীলাক্ষেত্রগুলি, বিশেষতঃ চন্দ্রশেখরের বাড়ীর তুলসীতলা, যেখানে মুসলমান দরবেশবেশী হরিদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন, সেই সকল দেখিয়া তাঁহার মনে প্রেম ও শোকের বন্যা বহিয়া গেল। চৈতন্য-প্রেমে তিনি প্রায়ই উপবাস করিতেন, তাঁহার জীবনের কথা বলিতে বলিতে গদ্গদকণ্ঠ হইয়া আর কথা বলিতে পারিতেন না,—প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি হইত চোখের জলে। যে এই সুদর্শন বালককে দেখিত সেই ইঁহাকে প্রাণের দুলাল ও অন্তরঙ্গ ভাবিয়া আলিঙ্গন করিতে চাহিত। তাঁহার জিহ্বাগ্রে ছিলেন সরস্বতী করুণ রসের ভাণ্ডার লইয়া। বৃন্দাবনের পথে শুনিলেন, রূপ ও সনাতন উভয়েই অল্প সময়ের ব্যবধানের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; বৃন্দাবন তাঁহাদের শোকে অন্ধকার।

নিরাশ বালক বহু পরিতাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু জীব গোস্বামী ইঁহার ভক্তি ও প্রতিভাদর্শনে ইঁহাকে আশ্রয় দিয়া ভক্তিশাস্ত্র সম্যগ্‌রূপে শিখাইতে লাগিলেন। এই সময়ে অপর দুই জন প্রসিদ্ধ যুবকের সঙ্গে ইঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি রাজসাহী জেলার খেতুরী নামক নগরীর রাজা কৃষ্ণানন্দের একমাত্র পুত্র নরোত্তম দত্ত। খেতুরী বোয়ালিয়া হইতে ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং পদ্মার তীরস্থ প্রেমতলী গ্রামের এক মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। কৃষ্ণানন্দের বহুদিন কোন সন্তান জন্মে নাই। নরোত্তম সেই রাজবাড়ীর চোখের মণিস্বরূপ ছিলেন। শ্রীনিবাসের ন্যায় নরোত্তমও অতি প্রিয়দর্শন। শৈশব হইতেই তাঁহাকেও চৈতন্যপ্রেম পাইয়া বসিয়াছিল। একদিন পদ্মার তীরে বালক সেই সমুদ্রতুল্য অসীম জলরাশি দেখিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, তিনি দেখিলেন এক গৌরাঙ্গ পুরুষ ঊর্দ্ধলোক হইতে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "নরোত্তম, তুমি তো বিষয়ভোগের জন্য জন্মগ্রহণ কর নাই—তুমি যে আমার। আমার কাছে এস।" সেই পরম অন্তরঙ্গের স্বর যেন তিনি সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। তখনই তিনি অজ্ঞান হইয়া নদীতীরে পড়িয়া গেলেন। রাজবাড়ী হইতে বহু সন্ধানে তাঁহার খোঁজ মিলিল। চিকিৎসকেরা শিবাদিঘৃতের ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু নরোত্তম বলিলেন, "যদি আমার জন্য শিবা হত্যা করা হয় তবে আমি না খাইয়া প্রাণত্যাগ করিব।" কিন্তু রাজা দেখিলেন—যেমন দেখিয়াছিলেন কপিলাবস্তুর শুদ্ধোদন,—যেমন দেখিয়াছিলেন সপ্তগ্রামের গোবর্দ্ধন দাস—ভরা যে ডুবি হয়। চৈতন্যের নাম করিতে সদ্যোবিকশিত সরসিজের ন্যায় বালকের শ্রীমুখ অশ্রুতে ভাসিয়া যায়। গৌড়েশ্বর সম্রাট্ কৃষ্ণানন্দ দত্তের অন্তরঙ্গ ছিলেন। কৃষ্ণানন্দ তাঁহার ইজারাদার ছিলেন। তিনি রাজার বিপদ্ শুনিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "নরোত্তমকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও, আমি তাহার ক্লেশ সারাইয়া দিব।" বহু অশ্বারোহী সৈন্য-পরিবেষ্টিত করিয়া ষোড়শবর্ষবয়স্ক

নরোত্তমকে গৌড়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু তরুণ নরোত্তম সম্রাটের ফাঁদে পা দিলেন না।

ঊর্দ্ধ হইতে সেই বাণী যে তিনি সর্ব্বদা শুনিতেছিলেন। তারপর সিদ্ধার্থ যাহা করিয়াছিলেন, রঘুনাথ দাস যাহা করিয়াছিলেন, রূপ-সনাতনের জীবনে যে বিরাগ দেখা দিয়াছিল সেইরূপ বিরাগের বশবর্ত্তী হইয়া বালক-নরোত্তম পালাইয়া গেলেন। প্রহরীরা জাগিয়া দেখিল—পিঞ্জর খালি, পাখী উড়িয়া গিয়াছে। ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বালক পালাইতেছেন, সংসারকে বিভীষিকা ভাবিয়া—বিলাসকে নরকের বাগুরা মনে করিয়া বিশ্ব-হিতের আহ্বানে সে কি উন্মত্তভাবে ছুটিয়াছেন! ক্ষুদ্র গিরিনদী যেরূপ শৈলখণ্ড ভাসাইয়া লইয়া যায়, দুর্দ্দমনীয় ভক্তি তাঁহাকে সেইরূপ তাড়াইয়া লইয়া চলিল। কয়েক দিন পরে দুর্গম জঙ্গলের অজ্ঞাত পথ ভাঙ্গিয়া বালক কাশীর নিকট রাজঘাটে উপস্থিত হইলেন—তখন তাঁহার সুন্দর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। দুই দিনের উপবাসী, পদ্মপ্রভ মুখখানি ম্লান, ভ্রমণে অনভ্যস্ত দুইটি পদতল কণ্টকবিদ্ধ হইয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। এক বৃক্ষতলে পড়িয়া তিনি আর উঠিতে পারিলেন না—আবার সুস্পষ্ট স্বর শুনিলেন, "তুমি আমার জন্য এত সহিয়াছ, তরুণ জীবনে সমস্ত সুখভোগের আশা বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছ, আমি তোমাকে ছাড়িব না, উঠ খাও।" তাঁহার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, তখনই কোন ব্যক্তি দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে এক বাটী দুগ্ধ দিয়া গেল। তিনি উহা পান করিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করিলেন এবং তৃপ্ত হইলেন। বৃন্দাবনের নিকট কয়েক জন তীর্থগামী সঙ্গী জুটিল। চৈতন্যের কথা বলিতে গেলে বালকের প্রেমে কণ্ঠরোধ হয়, আনন্দাশ্রুতে গণ্ড প্লাবিত হয়। সঙ্গীদেরও চোখ হইতে জল পড়ে এবং ঘনঘন রোমাঞ্চ হয়—তাহারা ভাবিল "এ দেববালক কে?"

বৃন্দাবনে আসিয়া সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত, নিঃসঙ্গ বালক পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান, অনাহারে শরীর কৃশ, কিন্তু কোন স্বাধীন নৃপতি যদি কারাগার হইতে মুক্তি পান, হাত-পায়ের লৌহশৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলেন, তবে তাঁহার সেই মুক্তির আনন্দই যেরূপ সকল জ্বালা জুড়াইয়া দেয়—নরোত্তমেরও সেইরূপ হইল। তাঁহার মুখ অলৌকিক প্রফুল্লতায় উজ্জ্বল। এই অবস্থায় সুপ্রসিদ্ধ লোকনাথ গোস্বামীর আশ্রমে শেষরাত্রে ঢুকিয়া নিত্য নিত্য তাহার আবর্জ্জনা মুক্ত করিয়া ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া আসেন। সেই অদ্ভুতকর্ম্মা, বিষয়নিঃস্পৃহ, সম্পূর্ণ অনাসক্ত, অপ্রতিগ্রাহী সন্ন্যাসী দেখিলেন, কে যেন তাঁহার আশ্রম ও আঙ্গিনা ফিটফাট করিয়া রাখিয়াছে। একদিন, দুইদিন, তিনদিন তিনি বিস্ময়সহকারে এই অদ্ভুত কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়া এক রাত্রি জাগিয়া রহিলেন—চোরকে ধরিবার জন্য। হঠাৎ সেই জ্যোৎস্না-পুলকিত নিশীথে তিনি দেখিতে পাইলেন, দেবতার মত সুন্দর এক কুমার ঝাঁটা হস্তে আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া। তাঁহার চক্ষু দুটি পদ্মদলের মত জলে ছলছল করিতেছে, কখনও ঝাঁট দিতেছেন এবং কখনও বা ঝাঁটাটি বুকে রাখিয়া অজস্র চক্ষুজলে গণ্ড প্লাবিত করিতেছেন। লোকনাথ পরম স্নেহভরে পিছন দিক্ হইতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"চোর! তুমি কে? আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব না।" লজ্জিত ও বিস্মিত বালক লজ্জাবতী লতার

ন্যায় আর কথা বলিতে পারিলেন না, ভাঙ্গা স্বরে অল্প কথায় বলিলেন, "যদি ছাড়িবেন না, তবে আমাকে শিষ্য করুন!"—যে যোগিবর পাছে মনে অহঙ্কারের উদয় হয় এজন্য কখনও শিষ্য গ্রহণ করেন নাই, যিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজকে তাঁহার গ্রন্থের বহু উপকরণ দিয়া নিজের নাম উল্লেখ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, যিনি চৈতন্যের বাল্যসখা এবং তাঁহারই আদেশে বুকভরা ব্যথা লইয়া—চৈতন্যের শ্রীমুখদর্শনে চিরজীবন বঞ্চিত হইয়া—বৃন্দাবনের এককোণে দুশ্চর প্রেম-তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই বিষয়বিরাগী, কৃষ্ণে সমর্পিতজীবন প্রেমের সন্ন্যাসীর অটল সঙ্কল্প আজ টলিল। বিশাল বিটপিশাখা যেরূপ বনলতাকে আশ্রয় দেয়, তিনি সেই ভাবে নরোত্তমকে দীক্ষা দিয়া তাঁহার নিকট রাখিলেন। ক্রমে বালকের পাণ্ডিত্য, অসীম ভক্তি ও পদগৌরব বৃন্দাবনে বিদিত হইল, জীব গোস্বামী শ্রীনিবাসের সঙ্গে তাঁহারও শিক্ষার ভার লইলেন।

শ্যামানন্দ।

তৃতীয় ব্যক্তির নাম **শ্যামানন্দ**। ইনি নিম্ন শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহার পিতা কৃষ্ণ মণ্ডল উড়িষ্যার দণ্ডকেশ্বর পরগনার ধারেন্দা বাহাদুরপুরবাসী ছিলেন। কিন্তু এই পরিবার শেষে বঙ্গদেশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্যামানন্দের নাম ছিল দুঃখী। অল্পবয়সেই ইহার বিরাগ উপস্থিত হইয়াছিল। ইনি কালনায় আসিয়া গৌরীদাস পণ্ডিতের চৈতন্যমন্দিরে কতকদিন বাস করিয়াছিলেন। এখানকার পুরোহিত হৃদয়চৈতন্য দয়া করিয়া ইহাকে ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং ইঁহার দুঃখী নাম ঘুচাইয়া কৃষ্ণদাস নাম দিয়াছিলেন। কালনা হইতে ইনি যাত্রা করিয়া ভারতের যাবৎ তীর্থস্থান দর্শন করেন। "রসিকমঙ্গল" নামক পুস্তকে ইহার বিস্তৃত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত দেওয়া আছে। ইংরেজেরা যাহাকে mystic বলেন, ভারতের সাধু-সম্প্রদায়ের সকলেই সেই শ্রেণীভুক্ত! ইঁহারা যে সকল রূপ বা দৃশ্য দর্শন করেন, তাহা সাধারণ লোকেরা চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পায় না। নরোত্তম তাঁহার মানস গৌরাঙ্গের রূপ দেখিয়াছিলেন, শ্রীনিবাসও কত কি দেখিয়া সমাধির দশা প্রাপ্ত হইতেন, "কর্ণানন্দ" প্রভৃতি পুস্তকে তাহা বর্ণিত আছে। তিনি মূর্চ্ছিত অবস্থায় মৃতকল্প হইয়া থাকিতেন, আত্মীয় ও ভক্তগণ তাঁহার জীবনের আশঙ্কা করিয়া বিষণ্ণ হইতেন। মহাপ্রভুর তো কথাই নাই, স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যে ছিল তাঁহার জীবন। সেই আশ্চর্য্য কবিত্বময় স্বপ্নগুলি সূক্ষ্ম অধ্যাত্মজগতের দৃশ্যের ন্যায়—তাহা ধরা-ছোঁয়া যাইত না। ক্যাথারিন অব সিয়েনা (১৩৪৭ খৃঃ জন্ম) ছয় বৎসর বয়সে এক গির্জ্জা-ঘরের উপরে খৃষ্টের মূর্ত্তি দেখিতেন, তাঁহার জীবনই এই স্বপ্নঘোরে কাটিয়াছিল। জীবনে কতবার যে এই মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া অলৌকিক আনন্দ উপভোগ করিতেন তাহার ঠিকানা নাই। সেণ্ট টেরেসা (১০৯১-১১৪৩ খৃঃ) খৃষ্টমূর্ত্তি এতবার দেখিয়াছেন যে তাঁহার পুনঃ পুনঃ প্রেমের আবেগে মনে হইয়াছে যে তিনি ও খৃষ্ট এক। জয়দেবের রাধার সম্বন্ধে "মুহুরবলোকিত মণ্ডনলীলা, মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা", বিদ্যাপতির "অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেল মাধাই" এবং ভাগবতের গোপীদের "অনুক্ষণ কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া তাঁহারা নিজেই কৃষ্ণ এই ভাবিতে লাগিলেন" প্রভৃতি কাহিনীর সঙ্গে এই সকল ক্যাথলিক সাধুজীবনের অনুভূতির অনেকটা ঐক্য আছে। আণ্ডার হিলের 'মিষ্টিসিজম' পাঠ করিলে পাঠক

এ সম্বন্ধে বহু কথা জ্ঞাত হইবেন। মুসলমানদের মধ্যে জেলালুদ্দিন (১২০৭-১২৭৩ খৃঃ), হাফিজ (১৩০০-১৩৮৮ খৃঃ), এবং জামি (১৪১৪-১৪৯৩ খৃঃ) প্রভৃতি সুফী কবি ও সাধুদিগের আধ্যাত্মিক অনুভূতি এইরূপ হইয়াছিল। শ্যামানন্দ একদিন বৃন্দাবনে এক মন্দিরে যাইয়া দেখিলেন, আরতি হইয়া গিয়াছে, পাণ্ডারা চলিয়া গিয়াছেন—এমন সময়ে স্বয়ং রাধিকা তথায় আসিয়া কৃষ্ণকে পরিক্রমা করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, সে কি স্বর্গীয় ভঙ্গী! কি আনন্দ কি 'গতি অতি সুলবনী'! শ্যামানন্দ অপলক হইয়া দেখিতে লাগিলেন, দেবনৃত্যের বিরাম নাই। সমস্ত রাত্রি নিমেষের মত চলিয়া গেল। পাখীরা কাকলী করিয়া উঠিল। চমকিত হইয়া রাধিকা তাঁহার এক পায়ের স্বর্ণনূপুর ফেলিয়া গিয়াছেন। সমস্তটাই একটা স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিত, কিন্তু স্বর্ণনূপুরটিতো একটা খাঁটি সামগ্রী, তাহা কি করিয়া সেখানে আসিল? সেই নূপুরটি হাতে করিয়া যখন শ্যামানন্দ সাশ্রুনেত্রে জীব গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন বৃন্দাবনের সমস্ত ভক্তমণ্ডলী এই অলৌকিক ব্যাপার বিশ্বাস করিয়াছিলেন,' অনেক পুস্তকে এই কাহিনীটি বর্ণিত আছে।) নিম্ন-কুলজাত হইলেও জীব গোস্বামী বিশেষ যত্নের সহিত শ্যামানন্দকে ভক্তিশাস্ত্র পড়াইয়াছিলেন। যুবকের অসামান্য মেধা ও ধারণাশক্তি-দর্শনে জীব গোস্বামী আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন; প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া গুরু তাঁহার শিষ্যের নিকট হইতে এরূপ সন্তোষজনক উত্তর পাইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার বিশেষ পক্ষপাতী না হইয়া পারেন নাই। বৈধী ভক্তি, রাগানুগা, স্বকীয়া ও পরকীয়া ইত্যাদি বিষয়ে প্রসঙ্গক্রমে তিনি শ্যামানন্দকে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার সর্ব্বশেষ উপদেশ ছিল :—"তুমি তোমার উপদেশ দেওয়ার পূর্ব্বে ভাল করিয়া বুঝিবে, তোমার শ্রোতা জড়বাদী কিনা, যদি তাহা হয়—তবে তাহাকে কিছুই বলিবে না. তোমার সমধর্ম্মী ও চিত্তবৃত্তির অনুকূল ব্যক্তির সহিত শাস্ত্রালোচনা করিবে।"

ইঁহার প্রথম নাম ছিল "দুঃখী", দ্বিতীয় নাম "কৃষ্ণদাস", তৃতীয় নাম জীব গোস্বামীর দেওয়া "শ্যামানন্দ", এই নামই উত্তরকালে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কোন কোন রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক পদে ইনি 'দুঃখী' 'দুঃখিনী' অথবা "দুঃখী কৃষ্ণদাস" এইরূপ নাম ভণিতায় ব্যবহার করিয়াছেন। ইনি ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের একখানি পদ্যানুবাদ রচনা করেন, তাহার এক মাত্র পুঁথি বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে।

এই যে তিন ব্যক্তির কথা বলা হইল, ইঁহারাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান পাণ্ডা হইয়া পড়িয়াছিলেন। সম্পূর্ণ সপ্তদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ এই তিন ব্যক্তির কীর্ত্তিপ্রদীপে উজ্জ্বল। সুতরাং ইঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের একটু বিস্তারিত আলোচনা করিতে হইয়াছে। জনসাধারণের উপর ইঁহাদের যে প্রভাব হইয়াছিল, তাহার তুলনা বঙ্গদেশে বিরল।

(জীব গোস্বামী কৃষ্ণের প্রিয় বলিয়া দুঃখী কৃষ্ণদাসের উপাধি দিলেন 'শ্যামানন্দ,' শ্রীনিবাসের উপাধি হইল 'আচার্য্য' এবং নরোত্তমের উপাধি হইল 'ঠাকুর মহাশয়'। বৈষ্ণব-সমাজে আচার্য্য প্রভু বলিতে একমাত্র শ্রীনিবাসকে ও ঠাকুর মহাশয় বলিতে শুধু নরোত্তমকে বুঝাইবে।) এই তিন জনেই জীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র শিখিয়াছিলেন। তিনি

আদেশ করিলেন—"আমাদের এই ভক্তিগ্রন্থগুলি লইয়া তোমরা গৌড়দেশে যাও, নতুবা শুধু বই পাঠাইলে কি হইবে—ইহাদের ব্যাখ্যা করিবে কে?"

শ্রীনিবাস বলিলেন—"আমরা সন্ন্যাসী, কি করিয়া আমরা গৃহে যাইব, আপনাকে ছাড়াই বা আমরা থাকিব কিরূপে? আপনার সঙ্গ ছাড়া স্বর্গও সুখকর নহে। জীব উত্তর করিলেন, "সত্য নিজে পাইয়া অপরকে বিতরণ করা ইহাই মুখ্য কর্ত্তব্য। আমি তোমাদের গুরু। আমি তোমাদিগকে আদেশ করিতেছি, দ্বিরুক্তি করিও না।"

বঙ্গদেশে রাজকন্যার খণ্ডরে

১২১খানি ভক্তিগ্রন্থ—তন্মধ্যে সনাতনের হরিভক্তিবিলাস, হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু, চৈতন্যচরিতামৃত, উজ্জ্বল-নীলমণি, ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব, দানকেলী-কৌমুদী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সর্ব্বপ্রধান রত্নভাণ্ডার ছিল। একটি কাঠের বাক্সে মোমজমার আবরণে সুরক্ষিত করিয়া তাহা বড় একটা শকটে উত্তোলিত হইল। চারিটী বিশালকায় বৃষচালিত শকট ও তৎপরিচালক ১০ জন সশস্ত্র ব্রজবাসীর সহিত যুবক সন্ন্যাসিত্রয় জয়পুর রাজের নিকট হইতে অনুমতিপত্র লইয়া গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে ছোটনাগপুরের বিশাল অরণ্য—ঝারিখণ্ড। ইহারা তথায় কোকিল-কলরব-মুখরিত বনশোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, এবং চৈতন্য একদা ঐ বনে ভক্তির আবেশে বৃক্ষ ও লতাপল্লবকে কৃষ্ণ ভাবিয়া প্রিয়সম্বোধন-পূর্ব্বক ছুটিয়া কাঁদিয়া বেড়াইয়াছেন, সেই প্রেমের পাগল দেবতার কথা সর্ব্বত্র মনে করিয়া ইহারা কখনও তাঁহার পদরজের স্পর্শের আশায় সেই ভূমিতে লুটাইয়া পড়িতেন। বামে মগধের প্রান্তভূমি, তাঁহারা আগ্রা হইয়া ইটা নামক স্থানে একটা প্রশস্ত পথ দিয়া চলিলেন।

এই সময়ে বনবিষ্ণুপুরের রাজা **বীরহাম্বির** অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন। তিনি দস্যু-বৃত্তি করিয়া স্বরাজ্যের বাহিরে নানাবিধ অত্যাচার করিতেন। সময়টা ছিল ১৬০০ খৃষ্টাব্দের সন্নিহিত, পাঠান ও মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ চলিতেছিল। গৌড়েশ্বর প্রবল বহিঃশত্রুকে দমন করিতে ব্যস্ত, সমস্ত নৃপতিরা দেশ লুটপাট করিতেন, রাজস্ব দিতেন না, কিন্তু গৌড়ের বাদশাহের মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যোগ করার সময়ে, গৃহকলহ বাড়াইবার ইচ্ছা বা শক্তি ছিল না; এইজন্য দেশে একরূপ অরাজকতা চলিয়াছিল। বীরহাম্বির কতকটা স্বাধীন হইয়া নানারূপ অত্যাচার করিতেন। সম্ভবতঃ কতলু খাঁ নবাবের নিকট তিনি উত্তরকালে ১,৬৭,০০০৲ টাকা বাৎসরিক রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু যে সময়ের কথা বলা হইতেছে তখনও তিনি ঐরূপ কোন সন্ধি করেন নাই। তাঁহার নিজের ১৫টি প্রধান দুর্গ ছিল এবং তাঁহার অধীন ১২ জন সামন্ত রাজার আরও ১২টি দুর্গ ছিল। যদিও শেষে রাজস্ব দেওয়ার একটা বন্দোবস্ত হইয়াছিল, কিন্তু মুরসিদ্ কুলিখাঁএর রাজত্বের পূর্ব্বপর্য্যন্ত বনবিষ্ণুপুরের রাজারা একরূপ স্বাধীন ছিলেন।

একটা শকটের পিছনে গেরুয়াধারী তিনজন সন্ন্যাসী এবং ১০ জন সশস্ত্র ব্রজবাসীকে দেখিয়া বীরহাম্বিরের গুপ্তচরেরা মনে করল—নিশ্চয়ই এই শকট বহু ধনরত্নে বোঝাই। তারপর যখন সন্ন্যাসিগণের একজনকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, ইহার মধ্যে কি আছে? তখন তিনি শাস্ত্রগ্রন্থগুলির প্রতি শ্রদ্ধার আতিশয্যে নিশ্চিন্তমনে বলিয়া ফেলিলেন—

"রত্ন",—গ্রন্থ কথাটা মনের ভিতর উহ্য রহিল। চরেরা এখন ঠিক বুঝিল ইহা মণিমাণিক্য না হইয়া যায় না। বীরহাম্বিরের রাজসভায় জ্যোতির্বিদপ্রবর গণিয়া বলিলেন—ঐ শকটের বাক্সে ধনরত্ন আছে। গুপ্তচরেরা শকটের সঙ্গে সঙ্গে চলিল, সঙ্গে বীরহাম্বিরের নিযুক্ত দস্যুদল। তামর নামক একস্থানে আসিয়া দস্যুরা কালীপূজা করিয়া লইল এবং সেই গ্রামেই তাহারা শকটটি আক্রমণ করিবে প্রথমতঃ এরূপ সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু সেই গ্রামে সুবিধা হইল না। তারপর রঘুনাথপুর হইয়া শকট ধীরগতিতে পঞ্চবটী নামক স্থানের দিকে আসিল, এই গ্রামের দক্ষিণে মালিয়ারা গ্রামে সন্ন্যাসিত্রয় এক সদাশয় জমিদারের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া রাত্রিবাস করিলেন, পরদিন ইঁহারা গোপালপুর পল্লীতে আসিয়া পৌঁছিলেন,—ঐ সময়ে রাত্রিকালে দুইশত দস্যু রাহাজানি করিয়া শকটসহ বৃহৎ কাষ্ঠাধার লইয়া চম্পট দিল।

বীরহাম্বির প্রচুর ধন-লোভের আশায় সেই রাত্রে ঘুমান নাই। সেই রাত্রেই বাক্স আসিয়া তাঁহার রাজপ্রাসাদে পৌঁছিল। তিনি উহা পাইয়া এত হৃষ্ট হইয়াছিলেন যে বাক্স খুলিবার পূর্ব্বেই দস্যুদিগকে পারিশ্রমিক ও পুরস্কার দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

তিনি ভাণ্ডারে যাইয়া বাক্স খুলিলেন। কিন্তু একি, প্রথমেই একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ। "রূপের আখর যেন মুকুতার পাঁতি", মহাপ্রভু বলিতেন। সেই মুক্তাসম অক্ষরগুলি দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন, সমস্তই পুস্তক—ধর্ম্মগ্রন্থ, রত্নের নামগন্ধ নাই। বীরহাম্বির সভার জ্যোতিষী পাণ্ডিতকে বলিলেন, "তোমার ভবিষ্যদ্‌বাণী এইরূপ!" জ্যোতিষী লজ্জায় মাথা হেঁট করিলেন। রাজা বলিলেন, "রত্ন বই কি? যে জহরত চিনে, তাহার নিকট এগুলি রত্নই বটে!" গুপ্তচরকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ সাধু—কোন্ পণ্ডিতের আজীবন সাধনার ধন তোমরা লইয়া আসিয়াছ? তাঁহাদের উপর তো অত্যাচার হয় নাই? তাঁহাদের নিঃশ্বাসে আমার রাজপ্রাসাদ দগ্ধ হইয়া যাইবে।" গুপ্তচরেরা বলিল, "মহারাজের নিষেধ আমরা সর্ব্বদা স্মরণ রাখি, যেখানে বিনা অত্যাচারে কার্য্যসিদ্ধি হয়—সেখানে আমরা কোন আঘাত করি না, এক্ষেত্রে নিরীহ সাধুদিগের প্রতি কোনই অত্যাচার হয় নাই। রাজা চুপ করিয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে মৌন হইয়া রহিলেন। রাণী সুদক্ষিণা আসিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

এদিকে তিন সাধু-যুবকের মনে যে শোক হইল—তাহা বর্ণনীয় নহে। সাধু-মহন্তদের আজীবন তপস্যার ফল তাঁহাদের হাতে ন্যস্ত ছিল, সেই পবিত্র মহামূল্যবান্ ন্যাস অপহৃত হইল। তাহাদের আর নকল ছিল না, বঙ্গদেশ হইতে গ্রন্থগুলি নকল করিয়া ভারতবর্ষের নানাস্থানে প্রেরিত হইবে—এই ছিল ব্যবস্থা। হরি-ভক্তিবিলাস ও চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি মহারত্ন চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইল। ধৈর্য্যহারা না হইয়া শ্রীনিবাস গ্রামবাসী একজনের নিকট হইতে কাগজ-কলম লইয়া জীব গোস্বামীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের তখন বৃদ্ধ বয়স, এই শোকসংবাদ তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না, সেইখানেই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন এবং তখনই বা তাহার অব্যবহিত পরে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

অপরদিকে শ্রীনিবাস তাঁহার দুই বন্ধুকে গৌড়মণ্ডলে পাঠাইয়া দিলেন, নরোত্তমের

হাতে শ্যামানন্দকে সঁপিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "যাবৎ এই হৃতরত্নের সন্ধান করিতে না পারি তাবৎ আমি এখানেই থাকিব। এই গ্রন্থগুলির উদ্ধার-চেষ্টায় আমার প্রাণ গেলে তাহাও মঙ্গল।" নয়দিন পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুরের সমীপবর্ত্তী স্থানগুলি ঘুরিয়া শ্রীনিবাস জানিলেন, সে দেশের রাজা স্বয়ং একজন দস্যু সুতরাং অপহৃত পুস্তকগুলি সম্বন্ধে সেখানে কোন সন্ধান পাওয়া সহজ নহে। দশমদিনে তিনি দেওয়ালি নামক গ্রামে পৌঁছিলেন—এই গ্রাম বিষ্ণুপুর হইতে এক মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত এবং যশোদা নদীর তীরবর্ত্তী। সেইখানে কৃষ্ণবল্লভনামক এক তরুণ ব্রাহ্মণ যুবকের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়; ব্রাহ্মণ বটু ব্যাকরণ পড়িতেছিলেন। শ্রীনিবাসের সঙ্গে আলাপ করিয়া তিনি বুঝিলেন, ইহার পাণ্ডিত্য অগাধ। যুবক তাঁহাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গিয়া সেখানে প্রস্তাব করিলেন যে, যদি তিনি তাঁহাকে ব্যাকরণ ও অলঙ্কার পড়িতে একটু সাহায্য করেন, তবে তিনি চিরকৃতজ্ঞ ও কৃতার্থ হইবেন। স্বপাকে শুধু সিদ্ধ তরকারী দিয়া একবেলা দুটি ভাত খাইতেন, পরণে ছোট একখানি কটিবাস, শ্রীনিবাস কৃষ্ণবল্লভকে পড়াইতে লাগিলেন। চুম্বক-পাথর যেরূপ ইস্পাতকে আকর্ষণ করে, শ্রীনিবাসের বিষণ্ণ ও করুণ মূর্ত্তি ও অগাধ পাণ্ডিত্য কৃষ্ণবল্লভকে সেইরূপ আকর্ষণ করিল। কৃষ্ণবল্লভ রাজসভায় ব্যাসাচার্য্যের ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিতে যাইতেন। হিন্দু রাজগণ সম্ভবতঃ সেনবংশের সময় হইতেই অপরাহ্ণে ধর্ম্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা শুনিতেন, কিন্তু ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায় যে ধর্ম্মপাল প্রভৃতি রাজাও ঐ ভাবে ভাগবত-পাঠ শুনিতেন; তাঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন। ধর্ম্মমঙ্গলের এই উক্তি বিশ্বাস্য নহে। পরবর্ত্তী হিন্দু রাজারা ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিতেন. গ্রাম্য কবি প্রাচীন সংস্কারগুলির মধ্যে এই গোলযোগ ঘটাইয়া থাকিবেন।

বীরহাম্বির দস্যুপতি দুর্দ্দান্ত রাজা হইলেও তাঁহার সভাপণ্ডিত ব্যাসাচার্য্যের নিকট সেই দেশের চিরাগত রীতি অনুসারে অপরাহ্ণে শাস্ত্রপাঠ শুনিতেন। উৎসুক হইয়া শ্রীনিবাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাগবত-পাঠ কেমন শুনিলে?" কৃষ্ণবল্লভ বলিলেন, "আমার মন আপনার পাদপদ্মে পড়িয়াছিল, আপনার সঙ্গের জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলাম, তাই তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিয়াছি।" শ্রীনিবাসকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণবল্লভ সেই শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিতে তাঁহাকে পরদিন রাজসভায় লইয়া গেলেন। প্রথম দিন শ্রীনিবাস নির্ব্বাক্ হইয়া সেই ব্যাখ্যা শুনিলেন। দ্বিতীয় দিন আর থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন "আপনি প্রশস্ত পথ ছাড়িয়া এ কি ব্যাখ্যা করিতেছেন!" ব্যাসাচার্য্য একথার কোন উত্তর করিলেন না, তৃতীয় দিনও শ্রীনিবাস বলিলেন, "আপনি ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন, অথচ শ্রীধরকে ত্যাগ করিয়া নিজের মত স্থাপন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। শ্রীধরের টীকা ছাড়িয়া আপনি রাসপঞ্চাধ্যায় বুঝিতেই পারিতেছেন না।" এ কথার উত্তর না দিয়া ব্যাসাচার্য্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তখন রাজা সভাপণ্ডিতকে বলিলেন, "এই ব্রাহ্মণ আপনার ব্যাখ্যায় তুষ্ট নহেন, আপনি কি ভুল ব্যাখ্যা করিতেছেন?" বিরক্তির স্বরে ব্যাসাচার্য্য বলিলেন, "এই গৈরিকধারী যুবকের আস্পর্দ্ধা দেখুন, আমার ব্যাখ্যায় ভুল ধরিতে পারে এমন পণ্ডিত এদেশে কে আছে?" শ্রীনিবাসের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আসুন, আপনি ভাগবত

ব্যাখ্যা করুন, দেখি আপনি কত বড় পণ্ডিত!" এই বলিয়া তিনি বেদী ছাড়িয়া উঠিলেন, অকুণ্ঠিতভাবে শ্রীনিবাস তাহাতে আসীন হইয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সে কি কণ্ঠ, সে কি অদ্ভুত পাণ্ডিত্য! তাঁহার হৃদয়ের ব্যথা অসীম ভক্তিতে যেন উছলিয়া উঠিতেছে। সেই ব্যাখ্যা যেন নৈবেদ্যের মত, অশ্রুর ডালির মত তাঁহার প্রাণের দেবতাকে উৎসর্গ করিতেছেন, যেন সপ্ততন্ত্রী বীণা নারদের অঙ্গুলীস্পর্শে বাজিতেছে! রাজা ও অপরাপর শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইয়া গেলেন, এমন কি ব্যাসাচার্য্যও বুঝিলেন যে সত্য সত্যই সেদিন বনবিষ্ণুপুরের রাজ্যের প্রকৃত গুরু আসিয়াছেন। পর দিন শীঘ্র শীঘ্র যার যার কাজ সারিয়া শত শত লোক আবার শ্রীনিবাসের ব্যাখ্যা শুনিতে রাজবাড়ীতে ভিড় করিল, বিপুল হরিধ্বনির সঙ্গে শ্রীনিবাস ভাগবতের ডুবি খুলিলেন। সেদিনের ব্যাখ্যায় পাষাণ গলিয়া গেল। দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুর তুফান বহিয়া গেল—অশ্রুচক্ষে সকলে দেখিল শ্রীনিবাস মানুষ নহেন,—দেবতা। রাজা সভাভঙ্গের পর অনুগত ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। রাজবাড়ীর এক বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠে তাঁহার স্থান করিয়া দিয়া নানারূপ উপাদেয় ভোজ্যের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু শ্রীনিবাস নিজে ভাতেভাত রাঁধিয়া এক বেলা মাত্র আহার করিলেন। সেই সন্ধ্যাকালে রাজা তাঁহাকে নিভৃতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্মণ! আপনি কে? কেন আসিয়াছেন? শুনিয়াছি কোন বিপদে পড়িয়া আপনি এ রাজ্যে আসিয়াছেন, আমার দ্বারা যদি আপনার কোন সাহায্য হয় তবে অকুণ্ঠিতচিত্তে আমায় বলুন।" শ্রীনিবাসের বুকের ব্যথা উথলিয়া উঠিল। তিনি গদ্গদ-কণ্ঠে সকল কথা বলিলেন। উপসংহারে বলিলেন, "গোস্বামিগণের এই অমূল্য রত্নভাণ্ডার আমার হাতে ন্যস্ত ছিল, এগুলি না উদ্ধার করিতে পারিলে আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, আমার সঙ্গী এক রাজকুমার ও অপর এক তরুণ সাধু শোকান্বিত হইয়া বঙ্গদেশে চলিয়া গিয়াছেন।"

হাম্বিরের অনুতাপ।

তখন রাজা ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন,—"আমার মত নরপিশাচ আর নাই, আপনারা যে দস্যুকে খুঁজিতেছেন, আমিই সেই দস্যু—আমার মত অপরাধী এত বড় রাজ্যে দ্বিতীয় নাই। আপনার সেই গ্রন্থগুলি যেমন ছিল তেমনই আছে, আপনি আশ্বস্ত হউন। আমার রাজ্যের নরহত্যাকারীর যে সাজা তাহাই আমাকে দিন।" এই বলিয়া নতজানু হইয়া রাজা সাশ্রুনেত্রে শ্রীনিবাসের পায়ে পড়িলেন, তাঁহার রাজবেশ ধূলায় লুণ্ঠিত হইল। সমসাময়িক প্রেমবিলাসে বর্ণিত এই ঘটনা আমরা লিপিবদ্ধ করিলাম। ভক্তিরত্নাকর ইহার প্রায় এক শতাব্দী পরের লেখা। তাহার কাহিনীও প্রায় এইরূপ; দুই একটি জায়গায় সামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়। ভক্তিরত্নাকরের সময়ে শ্রীনিবাস দেবতাস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছেন; তিনি যেদিন প্রথম বীরহাম্বিরের রাজসভায় প্রবেশ করেন—সেই দিন তাঁহার উজ্জ্বলচ্ছটামণ্ডিত স্বর্গীয় রূপ দেখিয়া সকলে দাঁড়াইয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন; রাজা তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলেও তিনি বলিয়াছিলেন, "যে পর্য্যন্ত ভাগবত-পাঠ শেষ না হইবে, তাবৎ বসিয়া শোনা আমার রীতি নহে!" ইহা ছাড়া প্রেমবিলাসের মতে রাজসভায় রাস-পঞ্চাধ্যায় প্রথম দিন পঠিত হইতেছিল, কিন্তু ভক্তি-রত্নাকরে

বর্ণনায় "ভ্রমর-গীতা"র কথা লিখিত হইয়াছে। মোটামুটি কাহিনীটি একরূপ, তবে পরবর্ত্তী ভক্তি-রত্নাকরের অতিরঞ্জিত ভক্তির বর্ণনা হইতে প্রেমবিলাসের সরল স্বাভাবিক বর্ণনা আমাদের কাছে অধিকতর প্রামাণিক মনে হয়।

এই ঘটনার পর রাজা স্বয়ং, সভাপণ্ডিত ব্যাসাচার্য্য, রাণী সুদক্ষিণা প্রভৃতি সকলেই শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহার রাজ্যশাসনের ভার শ্রীনিবাসের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। গৈরিকবসনপরিহিত সাধুর রাজ্য-শাসনের ভার গ্রহণ করা এই নূতন নহে; মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের উপর এইরূপ ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, দেবপাল তদীয় মন্ত্রী দর্ভপাণির উপর সমস্ত বিষয়ে নির্ভর করিতেন। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরেশ্বর ঈশান মাণিক্য তাঁহার গুরুদেব বিপিনবিহারীর হস্তে ঋণজালজড়িত ত্রিপুররাজ্যের ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পর বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগণ ও সংকীর্ত্তনীয়ারা বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান অঞ্চলের লোক। গোবিন্দ দাসের বাড়ী ছিল শ্রীখণ্ড (বর্দ্ধমান)। ইনি শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের একান্ত অন্তরঙ্গ, রামচন্দ্র কবিরাজের সহোদর; জ্ঞান দাসের বাড়ী কাঁদরা, লোচন দাসের বাড়ী কোগ্রাম, আর আর প্রায় সমস্ত বৈষ্ণব কবিই বর্দ্ধমান ও বীরভূমনিবাসী।

বীরহাম্বিরের বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণের ফলে দেশে স্থাপত্যশিল্প বিশেষরূপে শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। বনবিষ্ণুপুরে বহু বৈষ্ণবমন্দির গঠিত হইয়াছিল, তাহাদের স্থাপত্য ও কারুকার্য্য বঙ্গদেশে ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর কলাচর্চ্চার নিদর্শনস্বরূপ। বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে পুঁথির মলাটে, প্রাচীরের গায়, কাষ্ঠফলকে, কাগজে ও কাপড়ে এই সময়ে গৌরাঙ্গবিষয়ক সহস্র সহস্র চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। শ্রীনিবাস ধর্ম্মপ্রচারকার্য্য খুব বিস্তৃত ভাবে চালাইয়াছিলেন, বিষ্ণুপুরের রাজাদের সাহায্যে শুধু বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চল নহে, ত্রিপুরা, মণিপুর, ময়নামতী-পাহাড় এবং কুকী প্রভৃতি উলঙ্গ পার্ব্বত্য জাতিদের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল। পার্ব্বত্য ত্রিপুররাজ্যের পাহাড়িয়া লোকদিগকে আমি কুমিল্লায় নিম্ন সমতলভূমে প্রায়ই দেখিয়াছি। তাহারা স্ত্রীপুরুষে কাঠ বিক্রয় করিবার জন্য কুমিল্লায় অবতরণ করে এবং তাহাদের কেহ কেহ পাহাড়ে ফিরিবার মুখে দোকান হইতে চৈতন্য-চরিতামৃত কিনিয়া লইয়া যায়। তাহারা টিপ্রা ভাষায় কথা বলে—সে ভাষা আমাদের নিকট দুর্ব্বোধ, কিন্তু কিছু কিছু ভাঙ্গা বাঙ্গলা বলিতে পারে, অথচ চৈতন্য-চরিতামৃতের মত কঠিন পুস্তক তাহারা লইয়া যায়। শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের প্রচারকগণ ও তাঁহাদের বংশধরেরা যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারের জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের সহায় ছিল—বনবিষ্ণুপুর ও খেতুরীর রাজভাণ্ডার। এদিকে শ্যামানন্দ সমস্ত উড়িষ্যাদেশবাসী রাজন্যবর্গকে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রধান শিষ্য রাজা রসিকানন্দের রাজভাণ্ডার এই প্রচারকার্য্যের সহায় ছিল। চৈতন্য শেষকাল উড়িষ্যায় ছিলেন। তথাকার বহু পল্লীতে গৌরাঙ্গদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে,

খাস্ বাঙ্গলা দেশে যত গৌরাঙ্গবিগ্রহ তদপেক্ষা অনেক বেশী বিগ্রহ উড়িষ্যার পল্লীতে পল্লীতে পূজা পাইয়া থাকেন। এই প্রচারের উদ্যমশীলতা শ্রীনিবাস, নরোত্তম এবং শ্যামানন্দ বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। ইঁহারা সুরধুনীর তীরের কীর্ত্তন সমস্ত বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা দেশে প্রচলন করিয়াছেন। সনাতন, রূপ, জীব গোস্বামী এবং গোপাল ভট্টের চেষ্টায় মধ্যভারত ও রাজপুতনায় প্রচার চলিয়াছিল, শেষোক্ত স্থানে কতকগুলি ষ্টেট গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন। মধ্য ভারতের ছতরপুরের রাজা ৫।৭ বৎসর পূর্ব্বে মহাসমারোহের সহিত গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুর বিগ্রহ স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি শান্তিপুরবাসী অদ্বৈত প্রভুর এক বংশধরের শিষ্য। দাক্ষিণাত্যের স্থানে স্থানে চৈতন্য প্রভুর ধর্ম্মে দীক্ষিত দল আছেন। ত্রিবাঙ্কুরের সন্নিহিত কোন স্থানে ঐরূপ একটি দল থাকার কথা আমরা শুনিয়াছিলাম। এমন কি একজন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির মুখে আমি শুনিয়াছি, আফগানিস্থানবাসীদের মধ্যে চৈতন্যসম্প্রদায়ভুক্ত লোক আছেন। সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্র কবি ও সাধু তুকারামের চৈতন্যসম্বন্ধে একটি 'অভঙ্গ' আছে, তাহাতে তুকারাম তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তিনি গৌরাঙ্গকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। ডাক্তার আর ডি. ভাণ্ডারকরের নিকট এই অভঙ্গটি আছে। আকবর বাদশাহ যে গৌরাঙ্গসম্বন্ধে একটি গান রচনা করিয়াছিলেন,—সেই হিন্দি গানটি ৺জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের গৌরপদতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি।

ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দ্বার উদ্ঘাটন।

সুতরাং দেখা যায়—অনুসন্ধান করিলে সমস্ত ভারতবর্ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের বিকাশ এবং বিস্তারসম্বন্ধে একখানি ইতিহাস লিখিত হইতে পারে। যাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া আছেন, তাঁহারা এক হইতে পারেন। গোস্বামিগণ তো সে চেষ্টা করিবেনই না। সাহেবেরা যখন অগ্রণী হইয়া এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই, আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায় কোন্ সাহসে সেরূপ মৌলিক ব্যাপারে হাত দিবেন? অথচ ব্যাপারটি গুরুতর হইলেও খুব কঠিন নহে। খড়দহ ও শান্তিপুরের গোস্বামিগণের শিষ্যতালিকা এবং শ্রীনিবাসের বংশধরগণের শিষ্যতালিকা খুঁজিলে বিস্তর উপকরণ পাওয়া যাইতে পারে। মণিপুর, ত্রিপুরা, মধ্য-ভারতের ছতরপুর এবং উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি রাজগণের পুঁথিশালায় এবং বংশতালিকায় এসম্বন্ধে অবশ্য অনেক তথ্য আছে। কোন শিক্ষিত ও কর্ম্মী যুবক যদি এসম্বন্ধে উদ্যোগী হইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন তাহা হইলে দেশের প্রকৃত একটা উপকার হয়। বঙ্গদেশের কোন রাজা বৈষ্ণবধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ দেখাইবার জন্য নবদ্বীপের ধুলটে একবৎসর একলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন, এমন শুনিয়াছি। কিন্তু এই ইতিহাস-লেখার কার্য্যে উৎসাহ কে দিবেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস যিনি বাহিরের কোন উৎসাহের উপর নির্ভর না করিয়া স্বীয় প্রাণের অনুরাগে কাজ করিবেন, রিক্তহস্ত হইলেও ভগবান্ তাঁহার ভাণ্ড পূর্ণ করিয়া দিবেন এবং তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কৃতকার্য্য হইবেন হিন্দুরা নবব্রাহ্মণ্যের যুগে তাঁহাদের ধর্ম্ম অন্যের অনধিগম্য করিয়া রাখিয়াছিলেন—বৈষ্ণবেরা এই যুগে সর্ব্বপ্রথম সেই অচলায়তনের দ্বার উদ্ঘাটন করেন।

শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুর হইতে খেতুরীতে (রাজসাহী জেলা) নরোত্তমের নিকট গ্রন্থগুলির উদ্ধার ও রাজার দীক্ষাদিসম্বন্ধে সমস্ত কথা জানাইয়া চিঠি পাঠাইলেন। নরোত্তম ফিরিয়া আসিলে তাঁহার পিতা কৃষ্ণানন্দ দত্ত হাতে স্বর্গ পাইলেন, কিন্তু নরোত্তম রাজপ্রাসাদে গেলেন না, তিনি তথাকার কৃষ্ণমন্দিরে রহিয়া গেলেন এবং পিতামাতাকে জানাইলেন, তিনি যে সন্ন্যাসী সেই সন্ন্যাসী থাকিবেন, গেরুয়া ছাড়িবেন না, এবং কৃষ্ণমন্দিরের যে নির্দ্দিষ্ট ভোগ আছে, তাহা হইতে প্রসাদ পাইবেন। খাওয়া-দাওয়া কিংবা অন্য কোন সম্বন্ধে অনুরোধের বাড়াবাড়ি করিলে তিনি খেতুরী ছাড়িয়া পালাইবেন। তাঁহার স্থানে তাঁহার খুল্লতাত-ভ্রাতা সন্তোষ দত্ত রাজা হইয়াছিলেন। নূতন রাজা ও বৃদ্ধ কৃষ্ণানন্দ দত্ত ভয়ে আর কোন বাড়াবাড়ি করিলেন না। কিন্তু কৃষ্ণানন্দ ভিন্ন অপর সকলে নরোত্তমের রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়া গেলেন, তাঁহার রাজপরিচ্ছদ নাই, শিরোভূষণ নাই, রাজদণ্ড নাই, শুধু গেরুয়া, মুণ্ডিত মস্তক ও দণ্ডকমণ্ডলু লইয়া যেন একখানি দেবমূর্ত্তি ঝলমল করিতেছে। সেই মূর্ত্তিতে এমন একটা গৌরবের ঘটা ছিল যে স্বয়ং পিতা কৃষ্ণানন্দ তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। গ্রন্থোদ্ধারের সংবাদ খেতুরী রাজধানীতে ঢাকঢোল এবং অপরাপর বাদ্যযন্ত্রের উচ্চতানে এবং রজনীতে শত শত দীপের আলোকে বিঘোষিত হইয়াছিল। নরোত্তম মনে মনে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, খেতুরীতে গৌরাঙ্গদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবেন। সেই ইচ্ছার কথা আভাসে জানিতে পারিয়া সন্তোষ দত্ত তাঁহার সমস্ত রাজভাণ্ডার মুক্ত করিয়া দিলেন, যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া এই উৎসব সম্পন্ন করিবেন—ইহাই সঙ্কল্প করিলেন। সম্ভবতঃ ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে এই স্মরণীয় উৎসব সম্পাদিত হইয়াছিল। এত ঘটা বৈষ্ণব-সমাজে আর হয় নাই; পাণিহাটির দণ্ডমহোৎসবের (১৫০৯ খৃঃ) পর এই উৎসব বঙ্গদেশে বৈষ্ণব-সমাজের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। সহস্র সহস্র বৈষ্ণব বঙ্গদেশের নানাস্থান হইতে আসিয়াছিলেন; নিমন্ত্রণ-পত্রিকা বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বিতরিত হইয়াছিল; তাহার মর্ম্ম এইরূপ—"আমরা সকলের নাম জানি না, জানা সম্ভবপরও নহে। যিনি এই উৎসবে যোগ দিয়া আমাদের উৎসব সফল করিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনিই দয়া করিয়া আমাদের এখানে আসিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন। রবাহূত ও আহূতের মধ্যে কোন পার্থক্য আমরা রাখিব না।" এইরূপ সার্ব্বজনীন নিমন্ত্রণ আর কোথায়ও কখনও হইয়াছে কিনা আমরা জানি না। এই উৎসব বৈষ্ণবদিগের "মহোৎসবের" মতই উদার এবং সর্ব্বব্যাপী। সন্তোষ দত্ত উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের পাথেয় দিয়াছিলেন; সেই শত সহস্র অভ্যাগতের মধ্যে একজনের উপর সকলের দৃষ্টি আবদ্ধ হইয়াছিল, শতবর্ষবয়স্কা, অতি শীর্ণা, উপবাসকৃশা, তপঃপ্রভায় উজ্জ্বলকান্তি, বিশ্বজননীকল্পা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহার স্বামীর বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা দেখিবার জন্য খেতুরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যখন মন্দিরে স্বামীর বিগ্রহের দিকে যুক্ত করে চাহিতে চাহিতে তাঁহার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা বহিয়া পড়িতেছিল তখন শত শত লোকের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল। ভৃত্য ঈশানের মুখে সন্তোষ দত্ত জানিতে পারিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া শেষ দশায় বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা পোষণ করেন, জানিয়া তদর্থে গোপনে তরুণ রাজা বিষ্ণুপ্রিয়ার পাথেয় এবং ১৫০৲ টাকা

প্রদান করেন। শ্রীনিবাস, বীরহাম্বির, ব্যাসাচার্য্য প্রভৃতি সকলেই আসিয়াছিলেন। সন্তোষ দত্ত শ্রীনিবাসকে দুইটি সুবর্ণমুদ্রা এবং বহুমূল্য গরদের এক জোড়, ব্যাসাচার্য্যকে একখানি রেশমী বস্ত্র এবং ৫৲ টাকা প্রণামী দিয়াছিলেন। সকলেরই পাথেয় এবং পদগৌরব অনুসারে মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছিল। এই বিরাট্ উৎসবে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিরা উপস্থিত ছিলেন, পূর্ব্বর্বণিত প্রসিদ্ধ রূপনারায়ণ পণ্ডিত, রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি অনেকের নামই এই উপলক্ষে প্রেমবিলাসে বর্ণিত আছে। এই সকল ঘটনা প্রেমবিলাস-প্রণেতা নিত্যানন্দ দাসের চাক্ষুস বিষয়, সুতরাং তাহাতে বর্ণনার সমস্ত খুঁটিনাটিই পাওয়া যায়। শ্যামানন্দ স্বয়ং যে রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক গানটি রচনা করিয়াছিলেন, সেই "শুনলো পরাণ সই, মরম কথা তোরে কই"—আদ্য পদটি উৎসবে যখন গাওয়া হয়, তখন লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছিল নরোত্তমের উপর, রাধার কথা ভুলিয়া তাঁহারা তখন তাঁহাদের সন্ন্যাসী রাজকুমারের কথাই ভাবিতেছিলেন। "আমার ঐশ্বর্য্যশালা হেমাগার, গুরু গৌরব সিংহদ্বার,—আমার সকলই ত ছিল সই—বংশীরব বজ্রাঘাত প'ড়ে গেল অকস্মাৎ" ইত্যাদি কথায় যিনি কৃষ্ণের আহ্বানে রাজকুলের গৌরব—হৈম প্রাসাদ ছাড়িয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার অহঙ্কার ছাড়িয়া নিরহঙ্কার, দীনাতিদীন হইয়াছেন—তাঁহারই কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক হইয়াছিল। এই উৎসবে দেবীদাস ও গোকুলদাস দুই প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়ার সুমধুর পদকীর্ত্তনে—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস জ্ঞানদাস প্রভৃতি মহাজনের পদরসাস্বাদনে উপস্থিত জনমণ্ডলী যেরূপ তৃপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে খেতুরী কয়েক দিনের জন্য বৈকুণ্ঠপুরীতে পরিণত হইয়াছিল। উৎসবের পূর্ণবৃত্তান্ত, নরহরি চক্রবর্ত্তীর নরোত্তমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকর, নিত্যানন্দের প্রেমবিলাস, শিশিরকুমার ঘোষের নরোত্তম-চরিত প্রভৃতি পুস্তকে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। এই স্থানটিকে কি একটা প্রস্তর-লিপিদ্বারা স্মরণীয় করিয়া রাখা যায় না?

নরোত্তম বঙ্গীয় সমাজে আর একটি বিপ্লব উপস্থিত করিলেন, তিনি কায়স্থ কিন্তু তাঁহার অনেকগুলি ব্রাহ্মণ শিষ্য হইয়াছিল। এই সকল ব্রাহ্মণ আবার পণ্ডিত-শিরোমণি ছিলেন। ভগবান্ যাঁহার ললাটে সাধুত্বের তিলক আঁকিয়াছেন তাঁহার প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কায়স্থ গুরুর ব্রাহ্মণ শিষ্য।

নরোত্তমের সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মণ-শিষ্য ছিলেন বলরাম মিশ্র। একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ নরোত্তমের শিষ্য হইয়াছেন, এ সংবাদে সমস্ত ব্রাহ্মণ-সমাজ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। এই উত্তেজিত দলের নেতা হইলেন পদ্মার তীরে গাম্ভিলা-গ্রাম-নিবাসী গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও ধনশালী লোক ছিলেন। ইঁহার বাড়ীতে যে টোল ছিল তাহাতে পাঁচ শত ছাত্রের ব্যয়ভার ইনি বহন করিতেন। "বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ তেঁহো পণ্ডিত প্রধান। পাঁচ শত পড়ুয়ার নিত্য অন্নদান"।—প্রেমবিলাস, বিংশ তরঙ্গ)। এই সময়ে বলরাম মিশ্র ছাড়া আরও দুইটি ব্রাহ্মণ নরোত্তমের চরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন—ইঁহাদের নাম রামকৃষ্ণ ও হরিনারায়ণ। গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও উত্তেজিত হইয়া ইঁহাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। তবে তাঁহার কৃষ্ণে ভক্তি ও শাস্ত্রে বিশ্বাস ছিল, সুতরাং ভাবিয়াছিলেন, নিম্নজাতিকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণকে শিষ্য করার প্রমাণ কোন শাস্ত্রে

পাওয়া যাইবে না, এই বিশ্বাসে ইনি নরোত্তমের ফাঁদে পা দিলেন। বহু তর্ক ও আলোচনার পর তিনি দেখিলেন, ইঁহারা দেবদূতের ন্যায় দেশে যে নূতন সংবাদ আনিয়াছেন তাহা গ্রহণ না করিলে বাঙ্গালীর উদ্ধারের দ্বিতীয় পন্থা নাই। পরাভূত এবং সম্যগ্রূপ নূতন ভাবে প্রণোদিত হইয়া পণ্ডিত ও দুর্দ্দান্ত গঙ্গানারায়ণ স্বয়ং নরোত্তমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু নরোত্তমের প্রধান সংস্কারকার্য্য গৌড়দ্বারে হইয়াছিল। গৌড়দ্বার রাজমহলের নিকটবর্ত্তী। তথাকার রাজা রাঘবেন্দ্র অতি প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ ভূস্বামী ছিলেন, তাঁহার দুই পুত্র চাঁদ রায় ও সন্তোষ রায়। ইঁহারা অতি প্রবলপরাক্রান্ত দস্যু হইয়া উঠিয়াছিলেন। পাঠান বাদশাহ মোগল সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, সুতরাং এই রাজারা রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তখন বাদশাহ ইঁহাদিগকে ঘাঁটাইতে ইচ্ছা করেন নাই। মোগলদের সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য দাউদ খাঁ সর্ব্বস্ব পণ করিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি সমস্ত নৃপতিদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া বলক্ষয় করা সময়োচিত মনে করেন নাই। কয়েকবার বাদশাহের কর্ম্মচারীরা রাজস্ব আদায় করিতে গৌড়দ্বারে গিয়াছিলেন, কিন্তু চাঁদ রায় তাঁহাদিগকে মারিয়া ধরিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

চাঁদ রায়ের পীড়া।

একটি নিরপরাধ ব্রাহ্মণকে হত্যা করার পর চাঁদ রায় বায়ুরোগগ্রস্ত হইলেন, তাঁহার ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইত, এবং তিনি প্রলাপ বকিতেন। এতবড় দুর্দ্দান্ত রাজা একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেন। চাঁদ রায় এই অবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন, কেহ যেন বলিতেছে—"খেতুরীর সন্ন্যাসী রাজ-কুমারের শরণ লইলে তাঁহার রোগ আরোগ্য হইবে।" কিন্তু অহঙ্কারী ব্রাহ্মণ রাজা—একটা কায়স্থের শরণ লওয়ার কথা তাঁহার পক্ষে অসহ্য! বৃথা কল্পনাজাত স্বপ্ন মনে করিয়া তিনি কথাটা উড়াইয়া দিলেন, কিন্তু রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল—সেই নির্দ্দোষ হত ব্রাহ্মণের ভূত চাঁদ রায়ের কাঁধে চাপিয়াছে। ভিষক্‌দের আপ্রাণ চেষ্টা ব্যর্থ হইল, চাঁদ রায়ের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইল।

এ অবস্থায় সমস্ত অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়া বৃদ্ধ রাজা রাঘবেন্দ্র রায় নরোত্তমকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। নরোত্তম আসিলেন না, বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি যাদুবিদ্যা জানেন না, তাঁহার কোন অলৌকিক ক্ষমতা নাই। তিনি চাঁদ রায়ের দুঃসাধ্য রোগ সারাইবেন কিরূপে? কিন্তু এবার অনুতপ্ত চাঁদ রায় প্রাণের দায়ে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া স্বয়ং চিঠি লিখিলেন—রোগও যদি না সারে, তবে তাঁহার মুখে মৃত্যুকালে হরিনাম শুনিলেও একটা গতি হইবে। এবার নরোত্তম থাকিতে পারিলেন না, কারণ পাপী আর্ত্ত হইয়া ডাকিয়াছে। তিনি তাঁহার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু বুধুরির সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও ভিষক্ এবং কবিকুলচূড়ামণি গোবিন্দদাসের সহোদর রামচন্দ্র কবিরাজকে সঙ্গে লইয়া গৌড়দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা রাজধানীতে বিপুলভাবে সংবর্দ্ধিত হইলেন। চাঁদ রায়ের ব্যাধি ছিল মানসিক। কতকটা নরোত্তমের প্রাণ-জুড়ানো উপদেশে কতকটা বা রামচন্দ্র কবিরাজের চিকিৎসার ফলে তাঁহার মনের উপর বৈষ্ণব-প্রভাব খুব হিতকর হইল। চাঁদ রায় অল্পদিনের মধ্যে সারিয়া উঠিলেন। তখন নরোত্তমের উপর তাঁহার অচলা

ভক্তি হইল। তাঁহারা ছিলেন ঘোর শাক্ত; শরৎকালে রাজবাড়ীতে বহু আড়ম্বরপূর্ণ যে দুর্গাপূজা হইত, তাহাতে শতসহস্র মেষ ও মহিষ বলি দেওয়া হইত। কিন্তু এই সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারের মনে যে পরিবর্ত্তন হইল, তাহার ফলে বৃদ্ধ রাঘবেন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া রাজবাড়ীর সকলেই কায়স্থ নরোত্তমের নিকট বৈষ্ণব-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন। এই ঘটনা এরূপ বিস্ময়কর হইয়াছিল যে, লোকে সহসা ইহা বিশ্বাস করিতে চায় নাই।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই চাঁদ রায় পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্মগুলির জন্য বহু অনুতাপ করিয়া গৌড়ের বাদশাহকে চিঠি লিখিলেন এবং বলিলেন, এবার বাদশাহের কর্ম্মচারী আসিলেই তিনি বাকী রাজস্ব সমস্ত পাঠাইয়া দিবেন। পাঠান-রাজসভায় এই চিঠি লইয়া অনেক আলোচনা হইল; অধিকাংশ রাজমন্ত্রী এই চিঠির উপর নির্ভর করা অবিবেচনার কার্য্য মনে করিলেন—মহা ধূর্ত্ত চাঁদ রায় কি গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিয়া ভাল মানুষটি সাজিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। যুদ্ধবিগ্রহাদি না করিয়া এই ফাঁদের জালে পা দিতে কোন রাজকর্ম্মচারী স্বীকৃত হইলেন না।

চাঁদ রায় গেরুয়া পরেন, সংসারে ঔদাসীন্য, নিজে দুই বেলা কৃষ্ণপূজা করেন। গুরু নরোত্তম দীক্ষা দিয়া চলিয়া গেলেন। চাঁদ রায় খেতুরীর দেবমন্দিরে অগণিত মণি-মাণিক্য ও বস্ত্রালঙ্কার উপঢৌকন পাঠাইলেন, নরোত্তম স্বয়ং এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিলেন না। নরোত্তমের যাওয়ার পর একদা চাঁদ রায় মাত্র ১০০ অশ্বারোহী ও ৪০০ পদাতিক সঙ্গে নিশ্চিন্তমনে গৌড়দ্বার হইতে গঙ্গাস্নানের জন্য যাত্রা করিলেন। গুপ্তচরেরা গৌড়ের বাদশাহকে জানাইল—চাঁদ রায় অরক্ষিত অবস্থায় দূর পথে যাইতেছেন। এই সুযোগ পাইয়া গৌড়েশ্বর বহু সৈন্য পাঠাইয়া চাঁদ রায়কে বন্দী করিয়া লইয়া আসিলেন। লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ, অসামান্য দৈহিক বলসম্পন্ন চাঁদ রায়কে সম্বোধন করিয়া বাদশাহ বলিলেন, "পাপিষ্ঠ, তোমার এত বড় বুকের পাটা যে তুমি বহুকাল যাবৎ আমার রাজ্য লুট করিয়া খাইতেছ?" চাঁদ রায় রাজোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বৈষ্ণব-দৈন্যের সঙ্গে বলিলেন, "আমি হজুরে পূর্ব্বেই জানাইয়াছিলাম—পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্মের জন্য আমি অনুতপ্ত, আমাকে উচিত শাস্তি প্রদান করুন।" বাদশাহ তাঁহার গাম্ভীর্য্য ও সরলতা-দর্শনে কতকটা মুগ্ধ হইলেন, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। "ইহার বিচার পরে হইবে" এই বলিয়া একটা অন্ধকার কারাগারে ইহাকে পাঠাইয়া দিলেন। মাটীর নীচে কারাগার, আলোর প্রবেশপথ নাই; দাঁড়াইলে ছাদে মাথা ঠেকে—দিনান্তে অতি তুচ্ছ খাদ্যের ব্যবস্থা। কিন্তু সংসারের কোলাহল হইতে এই গুহায় ঢুকিয়া—ইনি ইহাকে আশ্রমের ন্যায় পবিত্র মনে করিয়া মুক্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। তিনি সেই নিভৃত নিকেতনে সারাদিন কৃষ্ণধ্যানে রত থাকিতেন। কোন সময়ে ভাবিতেন তিনি কৃষ্ণের জন্য চন্দন ঘসিতেছেন এবং অতি যত্নে তাহার টিপ বিগ্রহের মাথায় পরাইয়া দিতেছেন। কখনও ভাবিতেন, তিনি তাঁহার আরতি করিতেছেন, পঞ্চপ্রদীপের আলোতে বিগ্রহ ঝলমল করিতেছে; কখনও মনে করিতেছেন, তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন, অথবা নৈবেদ্য সাজাইতেছেন। কখনও মনে

হইত, বনে বনে ঘুরিয়া তিনি কৃষ্ণের জন্য সদ্যঃপ্রস্ফুট ফুল চয়ন করিতেছেন, অথবা তাহার দ্বারা মাল্য রচনা করিতেছেন। এই ভাবে দিনযামিনী কোথা দিয়া কাটিয়া যাইত, তাহা তিনি জানিতেন না। মনুষ্যের হৃদয়ে যখন এই সহজ আনন্দ শতদলের মত ফুটিয়া উঠে, তখন বাসস্থান কর্দ্দমাক্ত বা নিবিড় বন্ধনযুক্ত কারাগৃহ—তাহা ভাবিবার অবকাশ কোথায় থাকে ?

চাঁদ রায়ের পিতা রাঘবেন্দ্র রায় কারাধ্যক্ষকে উৎকোচ পাঠাইয়া তাঁহার আহারের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। আর একজন লোক পাঠাইয়া এমন একটা সুযোগ করিয়াছিলেন, যাহাতে অনায়াসে চাঁদ রায় মুক্তি পাইতে পারিতেন। সেই লোক অতি গোপনে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন, "আপনি কালীবিগ্রহকে ফুল-বেলপাতা দিয়া পূজা করুন ; তারপর আমি আপনার বাহির হইবার ব্যবস্থা করিব।" এই বলিয়া একটি ক্ষুদ্র কালীবিগ্রহ উপস্থিত করিলেন। চাঁদ রায় বলিলেন, "কৃষ্ণ ভিন্ন আমার উপাস্য আর কেহ নাই, এখানে মরি তাহাও ভাল—কিন্তু আমি অন্য কোন দেবের পায়ে ফুল দিব না। আমার সকল ফুল, সকল নৈবেদ্য, আমার দেহমন তাঁহার পায়ে বিলাইয়া দিয়াছি ; অপর কাহাকেও দিবার মত আমার কিছুই নাই। আমার পিতাকে বলিও, আমি ভাল আছি, রাজপ্রাসাদে যেরূপ ছিলাম তদপেক্ষা অনেক ভাল আছি, আমি মুক্তির আনন্দ অনুভব করিয়া দেহমনে পরম পবিত্রতা ও অপূর্ব্ব শান্তি অনুভব করিতেছি, আমি চুরি করিয়া পলাইয়া যাইতে চাহি না।" পিতার নিযুক্ত দূত দেখিলেন, কালীপূজা না করিলে এসম্বন্ধে কিছু করা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ ; তিনি ফিরিয়া গেলেন।

যথা সময়ে দরবারে চাঁদ রায়ের ডাক পড়িল। বাদশাহ বিচার করিয়া "হস্তিপদদলিত করিয়া হত্যা করা হউক"—এই আদেশ দিলেন। চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে সমস্ত এশিয়াতে বন্দী ও শত্রুদিগকে হস্তিদ্বারা হত্যা করার প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল।

চাঁদ রায়ের শক্তি ছিল অসীম। একটা বৃহৎ হস্তীকে তাঁহার দিকে ধাওয়াইয়া দেওয়া হইল। তিনি তাঁহার হস্তদ্বারা হাতীর শুঁড় ধরিয়া এমনই জোরে মোচড় দিলেন যে, হাতীটা চীৎকার করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল। এই অমানুষিক বল দেখিয়া বাদশাহ বিস্মিত হইয়া চাঁদ রায়কে বলিলেন, "তুমি বহুদিন যাবৎ অতি তুচ্ছ খাদ্যের উপর নির্ভর করিয়া একরূপ অনশনে আছ, এ অবস্থায় তোমার এরূপ অদ্ভুত বল হইল কি প্রকারে ?"

চাঁদ রায় প্রথমে কারাধ্যক্ষের জন্য অভয় চাহিয়া বলিলেন, "আমি কারাগারে উত্তম খাদ্য খাইয়াছি। কারাগারে আমি খুব ভাল ছিলাম—আমি সাংসারিক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দ মনে কৃষ্ণসেবা করিতে পারিয়াছি। আমার পিতা আমার মুক্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু কালীপূজা করিবার কথা থাকাতে আমি তাহাতে রাজী হই নাই। হুজুর আমায় মৃত্যুদণ্ড বা যে কোন দণ্ড দিবেন, আমার তাহাতে ক্ষোভ নাই। আমি কৃষ্ণে আত্মনিবেদন করিয়া দিয়াছি।" বলিতে বলিতে চাঁদ রায়ের চক্ষু সজল হইল। বাদশাহ তাঁহার কথা শুনিয়া এত প্রীত হইলেন যে, তখনই তাঁহার মুক্তির আদেশ দিয়া যে সকল স্থান চাঁদ রায় বলপূর্ব্বক দখল করিয়াছিলেন, তাহাদের অধিকারও তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

চাঁদ রায় গৌড়দ্বারে প্রত্যাবর্তনের পর বাদশাহ তাঁহাকে পুনরায় ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং অতি প্রীতির সহিত বলিলেন, "সেবার আমি তোমাকে শুধু তোমার পৈত্রিক ও বাহুবলার্জ্জিত সম্পত্তির অধিকার দিয়াছি, আজ তোমাকে একটা পুরস্কার দিব।" বাদশাহের আদেশ-অনুসারে চাঁদ রায়কে একটি ফারমান দেওয়া হইল, তাহাতে তিনি আহেদি পরগনার অধিকার পাইলেন।

চাঁদ রায়ের দলে যে সকল ব্রাহ্মণ দস্যু ছিলেন তাঁহারা অনেকেই নরোত্তমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে গোবিন্দ বাড়ুয্যে, কালিদাস চট্টো, নিরারণ চক্রবর্ত্তী, রামজয় চক্রবর্ত্তী, হরিনাথ গাঙ্গুলী এবং শিব চক্রবর্ত্তীর নাম নরোত্তম-বিলাস ও অপরাপর পুস্তকে উল্লিখিত দেখিতে পাই।

(মহাপ্রভুর জীবনে শক্তির মধুরতাই বেশী ছিল, তাহা জনসাধারণকে মুগ্ধ করিত। নিত্যানন্দ পতিত জাতিদের মধ্যে বৈষ্ণব গোসাঁইদের পৌরোহিত্য চালাইয়াছিলেন, সমাজ তাঁহাকে প্রথম বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। নিত্যানন্দের সঙ্গে কন্যার পরিণয় সম্পাদন করার জন্য সূর্য্যদাস সরখেল ব্রাহ্মণ-সমাজে খুব বেশী বেগ পাইয়াছিলেন। অদ্বৈত হরিদাসকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য শান্তিপুরে বিলক্ষণ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা বুঝিয়াছিলেন হিন্দু সমাজের সঙ্গে বিরোধ করিলে সমাজে অচল হইয়া পড়িবেন—তাহা হইলে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টা সফল হইতে পারিবে না। নিত্যানন্দের বংশধর ক্ষীরোদবিহারী গোস্বামিকৃত "নিত্যানন্দ বংশাবলী ও সাধনা" পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের বংশধরেরা বহু চেষ্টায় এবং অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া ব্রাহ্মণ কুলীন-সমাজে আদানপ্রদান-সম্পর্ক বজায় রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা যদি বিনীত হইয়া সমস্ত দাবী-দাওয়া মিটাইয়া কুলীন-সমাজকে হস্তগত না করিতেন, আজ খড়দহ ও শান্তিপুর একেবারে সমাজ-বহির্ভূত হইয়া থাকিত।

কিন্তু নরোত্তম সমাজের কাছে একটুও অবনতি স্বীকার করেন নাই। বরঞ্চ বৈষ্ণবেরা জনসাধারণের এক বিশাল সভা আহ্বান করিয়া নরোত্তমকে খাঁটী ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহাকে যজ্ঞসূত্র দান করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র। এখন আর শুধু বলরাম মিশ্র কিংবা গঙ্গারাম চক্রবর্ত্তী নহেন, চাঁদ রায়-প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ প্রকাশ্যভাবে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার পদধূলি মস্তকে ধারণ ও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিতেছিলেন।) ব্রাহ্মণ-সমাজের ক্রোধ সকল সীমা অতিক্রম করিল, তাঁহারা একেবারে ক্ষেপিয়া গেলেন।

কলিকাতার নিকট পকপল্লী (আধুনিক পাইকপাড়া) তখন সমৃদ্ধ নগরী ছিল, তথাকার রাজা নৃসিংহ রায় একজন ব্রাহ্মণভক্ত গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। এই রাজপরিবার কায়স্থ হইলেও সমাজে ইঁহাদের খুব প্রভাব ছিল। ব্রাহ্মণেরা সমবেত হইয়া সমাজসংস্কারের একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহারা ছয়জন প্রতিনিধি নৃসিংহ রাজার নিকট পাঠাইলেন। এই ছয় জনের নাম যদুনাথ বিদ্যাভূষণ, কাশীনাথ তর্কভূষণ, হরিদাস শিরোমণি, চন্দ্রকান্ত ন্যায়পঞ্চানন, শিবচরণ বিদ্যাবাগীশ এবং দুর্গাদাস বিদ্যারত্ন। ইঁহারা পকপল্লীর

রাজাকে বলিলেন, "আপনি ধর্ম্মের রক্ষক, সনাতন ধর্ম্ম যে ঘোর কলিতে রসাতলে যাইতেছে। ব্রাহ্মণ শূদ্রের উচ্ছিষ্ট খাইতেছে, ইহা হইতে কি বীভৎস ব্যাপার হইতে পারে? আপনি দেশ রক্ষা করুন।" অনেক আলোচনার পর এই ঠিক হইল যে রাজা নৃসিংহ পণ্ডিতগণসঙ্গে খেতুরী যাইয়া নরোত্তমকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিবেন। পণ্ডিতগণ বলিলেন, "যদি সেই কায়স্থ-গুরু এই সকল অনাচার শাস্ত্রদ্বারা সমর্থন করিতে পারেন, তবে আমরা সকলে তাঁহার নিকট মাথা মুড়াইব, নতুবা তাঁহাকে উপযুক্ত শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে।"

তর্কযুদ্ধে আহ্বান ও পরাজয়।

পণ্ডিতেরা চলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের পড়ুয়ারাও চলিলেন, বহুশকট বোঝাই পুঁথি চলিল। রাজা নৃসিংহের সভাপণ্ডিত রূপনারায়ণ মধ্যস্থতা করিবার জন্য সহযাত্রী হইলেন। এই ভাবে রাজা একটা খুব বড় দল লইয়া খেতুরীর অভিমুখে রওনা হইলেন। এই অভিযানের সংবাদ খেতুরীতে পৌছিল। নরোত্তমের শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, অন্তরঙ্গ সুহৃৎ রামচন্দ্র কবিরাজ ও তৎসহোদর কবিচূড়ামণি গোবিন্দদাস এই রাজকীয় দলের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের জগমান্য আচার্য্য নরোত্তমকে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতরণ করাইতে সম্মত হইলেন না। "আমরা তাহাদিগকে বুঝিয়া লইব, আপনি খেতুরীতে বসিয়া থাকুন"—এই অভিপ্রায় জানাইয়া তাঁহারা তিনজন অগ্রসর হইলেন। খেতুরী আসিবার পথে কামারপুর গ্রাম। নৃসিংহ রাজা তথায় শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বেই গঙ্গানারায়ণ, রামচন্দ্র ও গোবিন্দ সেই গ্রামে তিনখানি ছোট দোকান খুলিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। গঙ্গা-নারায়ণের তেলের দোকান, রামচন্দ্রের মুদিখানা এবং গোবিন্দ একখানি পানের দোকানের মালিক হইলেন। নৃসিংহ রাজার সঙ্গী পণ্ডিতদের পড়ুয়ারা জিনিষ কিনিতে যাইয়া দেখে তেলী, মুদী ও পানওয়ালা সকলেই সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা বলে। আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহারা তাঁহাদের শিক্ষাসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। ছদ্মবেশীরা বলিলেন, "আমরা খেতুরীর লোক, সেখানে ঠাকুর মহাশয়ের কাছে বহু পণ্ডিতের সমাগম হয়, খেতুরীর লোকেরা সকলেই অল্প-বিস্তর সংস্কৃত জানে।" কিন্তু এতো অল্প বিদ্যা নহে! পড়ুয়ারা শাস্ত্রের যে কথা পাড়িল, তাহাতেই তাহারা পরাস্ত হইল। সুতরাং অতি বিস্ময়ে তাহারা যাইয়া তাহাদের অধ্যাপকদিগকে এই বৃত্তান্ত অবগত করাইল। সেই ক্ষুদ্র তিনটি দোকানের কাছে রাজকীয় দলের অসম্ভব ভিড় হইল। ছয়জন পণ্ডিত তাঁহাদের বহু পড়ুয়া ও কয়েক শকট পুঁথি একদিকে, অপরদিকে তেলী, মুদি ও পানওয়ালা। রাজা স্বয়ং সভা জাঁকাইয়া বসিয়া গেলেন, মধ্যস্থ স্বয়ং পণ্ডিতরাজ রূপনারায়ণ সরস্বতী। পণ্ডিতদল আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন, প্রতিপক্ষ তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী পণ্ডিত—উপরন্তু ভক্তিশাস্ত্রে, যাহাতে তাঁহাদের প্রবেশমাত্র নাই, তাঁহারা সেই নব অমোঘ অস্ত্রের নিপুণ সন্ধানী। সনাতনকৃত হরিভক্তিবিলাসের "যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্" প্রভৃতি শ্লোক ও অনিবার্য্য যুক্তির ব্যূহে পড়িয়া পণ্ডিতেরা একান্তরূপে অসমর্থ হইলেন। তাঁহাদের মনোহারী কথা, ভক্তির আবেগ ও পাণ্ডিত্য সকলকে মুগ্ধ করিল। রাজা নৃসিংহ এবং সতীর্থ পণ্ডিতমণ্ডলী নরোত্তমের

শরণ লইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। রাজা নৃসিংহ ও রাজ্ঞী রূপমালা একত্র দীক্ষিত হইলেন। (বিস্তারিত বিবরণ নরোত্তমবিলাস ও প্রেমবিলাসে দ্রষ্টব্য।)

নরোত্তম আরও অনেক লোকের জীবনের গতি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দস্যুতস্কর ছিল। সদ্গোপ-কুলজাত শ্যামানন্দ পুনরায় দেশে আসিয়া তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের আদিনিবাস ধারেন্দা-বাহাদুরপুরে উপস্থিত হন (পরগনা দণ্ডকেশ্বর, উড়িষ্যা)। এখানে তিনি অদ্বৈতবাদী দামোদরকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। শের খাঁ নামক এক মুসলমান দস্যু তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া এতই ভক্তিভাবাপন্ন হন যে, তিনি শ্যামানন্দের নিকট বৈষ্ণব-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া চৈতন্যদাস নামে পরিচিত হন। এই চৈতন্যদাস একজন পদকর্ত্তা। ভক্তিরত্নাকরের ১৫শ তরঙ্গে ইহার সংস্কারকাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। রাধাকৃষ্ণ-গানে ইনি আবিষ্ট হইয়া পড়িতেন (প্রেমবিলাস দ্রষ্টব্য)।

রয়ানি থানার নিকটবর্ত্তী ভারজিৎ নগরে তৎকালে এক পরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করিতেন, ইঁহার নাম অচ্যুত। ইঁহার অধিকার মল্লভূমির অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। ভারজিৎ নগরের একদিকে দোলঙ্গা নদী। এই নদীর তীরদেশ অতি রমণীয়, তথায় একটি বাণেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজা অচ্যুত তাঁহার রাজ্ঞী ভবানীর সহিত অনেক সময়ে এই মন্দিরের নিকটে বাস করিতেন। অচ্যুতের জ্যেষ্ঠপুত্র রসিকমুরারি পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসন অধিকার করেন। তিনিও অনেক সময়ে দোলঙ্গা-নদীতীরে বাস করিতেন। শাস্তশীলা নামক স্থানে রসিকমুরারি শ্যামানন্দের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। সেই সাক্ষাতের পর রসিকমুরারি ভক্তি-সুধার রসাস্বাদ পাইলেন—তাঁহার মনের ভাব ও জীবনের গতি ফিরিল। তিনি মানুষ চিনিলেন, জাতের খোসাটা তাঁহার নিকট অসার বোধ হইল। ক্ষত্রিয় রাজা রসিকমুরারি তাঁহার দুই রাজ্ঞী ঈশানী ও মালতীর সহিত সদ্গোপ শ্যামানন্দের শিষ্য হইলেন। উড়িষ্যার প্রায় সমস্ত রাজারাই এই রসিকমুরারির শিষ্য। সুতরাং ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি উড়িষ্যার অন্তর্গত যাবতীয় রাজ্যের অধীশ্বরদের গুরুর গুরু শ্যামানন্দ। ভক্তিরত্নাকরে শ্যামানন্দের শিষ্যগণের মধ্যে উদ্ধব, অক্রুর, মধুবন, গোবিন্দ, জগন্নাথ, আনন্দানন্দ এবং রাধামোহনের নাম উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বপ্রধান শিষ্য রসিকমুরারি। সমস্ত উড়িষ্যাদেশে শ্যামানন্দ চৈতন্যধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের পরে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজের নেতা হইয়াছিলেন। ইঁহারা জাতিভেদ একেবারে অস্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে ধর্ম্মমন্দিরের দ্বার সর্ব্বসাধারণের নিকট উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র একান্ত অন্ত্যজ বৌদ্ধ নেড়ানেড়ীদিগকে বৈষ্ণব-পর্য্যায়ে স্থান দিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহারা পতিতের উদ্ধারকারী ছিলেন, শাস্ত্রানুশাসিত জটিলতাগ্রস্ত কৃত্রিমতাপূর্ণ হিন্দুসমাজকে একেবারে ইঁহারা জাগরণমন্ত্রে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। নব-জীবনের স্ফূর্ত্তিতে বৈষ্ণবগণ মণিপুর হইতে মধ্যভারতের ছতরপুর, উড়িষ্যা হইতে আফগানিস্থান পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র, পাহাড়িয়াদের মধ্যে কুকী, ত্রিপুরবাসী প্রভৃতি নানা জাতি ও দেশবাসীকে

চৈতন্যের প্রেম শিক্ষা দিয়াছিলেন। চৈতন্যের সঙ্কীর্ত্তনের খোল ও মন্দিরা বঙ্গদেশের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে বাজিয়া উঠিয়াছিল, তাহা এখনও থামে নাই। ইহারা ভিন্ন ধর্ম্মের গ্রাস হইতে জনসাধারণকে অনেক পরিমাণে রক্ষা করিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য যে এই ধর্ম্মপ্রচার ও সমাজসংস্কার সমস্তই চৈতন্যের প্রেরণা-জাত। তিনি ভাবের পাগল, ভগবৎ-প্রেমানন্দে বিভোর ছিলেন। কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার ইঙ্গিত ছিল। সেই ইঙ্গিত ক্ষুদ্র গিরিনির্ঝরের মত কালে বিশালতোয়া স্রোতস্বিনীতে পরিণত হইয়াছিল। জাতিভেদসম্বন্ধে তাঁহার উক্তি সুস্পষ্ট, "মোর জাতি—মোর সেবকের জাতি নাই" (চৈ. ভা. অন্ত্য ১১)। "সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে সর্ব্বনাশ। নীচ শূদ্র দিয়া করে ধর্ম্মের প্রকাশ" (চৈ. চ. অন্ত্য)। রঘুনাথ-দাসের জ্ঞাতি কালিদাস ঝড়ু ভূঞমালীর উচ্ছিষ্ট খাইয়াছিলেন, চৈতন্য এজন্য তাঁহার সাধুবাদ করিয়াছিলেন। যবন হরিদাসের মৃত্যুকালে চৈতন্য সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে তাঁহার পাদোদক পান করাইয়াছিলেন, শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে তিনি হরিদাসকে সদ্‌ব্রাহ্মণদের তুল্য আদর ও শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন। জাতি-নির্ব্বিশেষে তাঁহার প্রেম ও উদার ব্যবহার গোঁড়া ব্রাহ্মণসমাজে নিষিদ্ধ, এজন্য কীর্ত্তনীয়ারা গাহিয়া থাকে,—"সব অ-বিধি, নদের বিধি" (অর্থাৎ যত অনাচার—তাহাই নদীয়ার ধর্ম্ম)। শাক্ত কবি চৈতন্যের এই উদারনীতিকে ঠাট্টা করিয়া লিখিয়াছিলেন, "গৌর ব'লে আনন্দে মেতে, একত্রে ভোজন ছত্রিশ জেতে, বাগ্দী কোটাল ধোপা কলুতে একত্র সমস্ত।"

পরবর্ত্তী কালে হিন্দুবিধি অতিক্রম করিয়া বৈষ্ণবেরা যে প্রচারকার্য্য চালাইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, সেই প্রচারকার্য্যের প্রস্রবণ চৈতন্য হইতে নির্গত হইয়াছিল।)

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে এই বিপুল উদ্যম শ্লথ হইয়া পড়ে। বীরহাম্বির বন-বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণবধর্ম্ম লইয়া একটু বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন, অবশ্য তথাকার শিল্প ও স্থাপত্য বৈষ্ণবপ্রভাবে অত্যন্ত শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। বহু দুর্লভ বৈষ্ণব পুস্তক রাজার পুঁথিশালায় সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তিনি সাধারণ রাজধর্ম্মের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে তিনি প্রত্যহ একটা নির্দ্দিষ্টসংখ্যক নাম জপ করার জন্য প্রজাদিগকে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। লিখিত আছে, কোন কোন লোক রাত্রি জাগিয়া নাম জপ করিত, পাছে ঘুমাইয়া পড়িয়া নির্দ্দিষ্টসংখ্যক নাম জপ করিতে অক্ষম হয়, সেই ভয়ে তাহারা নিজেদের টীকি ঘরের টুয়া বা আড়ার সঙ্গে সূতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিত। বসিয়া বসিয়া জপ করিবার সময়ে যদি তন্দ্রাবশে ঝিমাইতে থাকিত, তবে টীকিতে টান পড়িত। তখন জাগ্রৎ হইয়া পুনরায় জপে মনোযোগী হইত। ধীরে ধীরে বৈষ্ণব গোঁসাইগণ প্রচুর ক্ষমতা ও লোকশ্রদ্ধা লাভ করিয়া আভিজাত্যদর্পী ও কতকটা ধর্ম্মের বিকৃত অর্থবাদী হইয়া পড়েন। আমরা বলিতে বাধ্য, চৈতন্য যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, বাঙ্গলার গোস্বামিগণ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম আর সেরূপ নাই। চৈতন্যের অশেষ দৈন্য ছিল, তাঁহাকে যদি কেহ ভগবানের অবতার বলিত, তিনি তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। কিন্তু তিনি নবদ্বীপ ত্যাগ করার পর তাঁহার সম্বন্ধে বহু আজগুবী গল্পের

সৃষ্টি হইল, তদ্দ্বারা তাঁহাকে ভগবানের অবতার প্রতিপন্ন করিতে। তিনি বরাহ হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, ভীষণ এক সর্পের উপর শুইয়া অনন্তশয্যাশায়ী বিষ্ণুর অভিনয় করিলেন, বহুলোকের খাদ্য একা খাইয়া দামোদর হইলেন, চতুর্ভুজ ও ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তিতে ঘন ঘন দেখা দিতে লাগিলেন, একদিনে আম্রবীজ বপন করিয়া সেইদিনই গাছে ফল উৎপন্ন করিলেন, জামীরের গাছে কদম্ব ফুটাইলেন, কখনও নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিলেন (চৈ. ভা. মধ্য ২য়, মধ্য ৩য়, চৈ. চ. মধ্য, ১৭ প., ১২-১৩ শ্লোক, চৈ. চ. মধ্য, ৩য় প. ৪৯ শ্লোক প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। লোচন দাস লিখিয়াছেন, তিনি পুরীতে আছেন শুনিয়া লঙ্কা হইতে বিভীষণ তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, এ সকল কথা পূর্ব্বে বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ চৈতন্য-বিরহখিন্ন নবদ্বীপবাসীদের মধ্যে যে-কেহ তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, সেই আদৃত হইয়াছে। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, 'অলৌকিক গল্পে যে বিশ্বাস না করিবে—তাহার মস্তকে তিনি পদাঘাত করিবেন।' চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়—চৈতন্যের পূর্ব্বলীলাতেই যত অলৌকিক ব্যাপার, রূপ গোস্বামীরা কৃষ্ণদাস কবিরাজকে যে সকল বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন, তাহাতে অলৌকিক অংশ খুব অল্প। এই পূর্ব্বলীলার বর্ণনা নবদ্বীপবাসীরা করিয়াছিলেন। যাঁহাকে তাঁহারা ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে ভাগবত-লীলা আরোপ করা তাঁহারা দোষাবহ মনে করেন নাই, বরঞ্চ উহা অবিশ্বাস করা তাঁহারা পাপ মনে করিয়াছেন। এজন্য মুরারি গুপ্তের মত প্রবীণ পণ্ডিতও অনেক আজগুবী কথা বিশ্বাস করিয়া তাঁহার কাব্যে স্থান দিয়াছেন। শুধু গোবিন্দদাসের করচা এই দোষ হইতে মুক্ত। একথা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে চৈতন্য নবদ্বীপে থাকিলে ভক্তির ক্ষেত্রে ঐ সকল আগাছা জন্মাইতে পারিত না। তিনি এসকল অলৌকিক কথার কখনই প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি শতবার এই সকল ভক্তির আতিশয্য নিরস্ত করিয়াছিলেন, এমন কি সার্ব্বভৌমের মত পূজ্যপাদ প্রবীণ পণ্ডিত তাঁহাকে সাক্ষাৎ বিষ্ণু বলাতে তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়াছিলেন, "প্রভু কহে সার্ব্বভৌম আর কথা কহ। আতাল পাথাল কথা কেন বা বলহ।" তাঁহার অনুপস্থিতিতে গৌড়দেশে ভক্তির রাজ্যের পথঘাট, ঘরের আঙ্গিনা উপগল্পের আগাছায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

চৈতন্যদেবকে ভগবান্ রূপে প্রতিপন্ন করার পর গোস্বামীরা নিজেরাও তাঁহার দেবত্বের অংশীদার হইতে দাবী করিলেন। চৈতন্য স্বয়ং বিষ্ণু, নিত্যানন্দ বলরাম এবং অদ্বৈতকে সদাশিব করা হইয়াছে। কেশব ভারতী—শ্রীকৃষ্ণ-গুরু সান্দীপনি মুনি, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—বৃষভানু, নরহরি দাস—মধুমতী, রামানন্দ—বিশাখা, রূপ—শ্রীরূপমঞ্জরী, গদাধর—রাধিকা, রাঘব—চম্পকলতা, সনাতন—লবঙ্গমঞ্জরী, গদাধরভট্ট—সুদেবী, রঘুনাথ দাস—রূপমঞ্জরী, মুকুন্দ—বৃন্দাদেবী, দেবানন্দ—গর্গমুনি, কাশীশ্বর—ইন্দুরেখা, ভূগর্ভ—প্রেমমঞ্জরী, এইরূপ প্রত্যেকেই রাধাকৃষ্ণলীলা-সংক্রান্ত দ্বাপর যুগের কোন সঙ্গীর অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। গোস্বামিগণ এইভাবে মনুষ্যজগতের ভক্ত সিংহাসন স্থাপন করিয়া দেবকল্প হইলেন এবং জনসাধারণের নিকট পূজার দাবী [illegible]

করিলেন। চৈতন্যের "না খাইয়া অস্থিচর্ম্ম হইয়াছে সার", "নিরবধি দাস্যপ্রেমে প্রভুর বিহার, মুই কৃষ্ণদাস বই না বলায় আর। হেন কার শক্তি নাই সম্মুখে তাহানে। ঈশ্বর করিয়া বলিবেক দাস বিনে" (চৈ. ভা. অন্ত্য ১০), "ত্রিরাত্র চলিয়া গেল বৃক্ষের তলায়। অনাহারে উপবাসে কিছু নাহি খায়। বহিছে হৃদয়ে দরদর অশ্রুধারা। শত ডাকে কথা নাই পাগলের পারা।" "ছিন্ন এক বহির্বাস পাগলের বেশ" (কড়চা) "ধুলামাখা জটাবাঁধা অন্য কথা নাই। পথে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি চলিছে নিমাই।" "অনাহারে শীর্ণদেহ চলিতে না পারে। তবু প্রভু হরি নাম দেন ঘরে ঘরে।" (কড়চা) এই প্রেমার্দ্র চৈতন্য-মূর্ত্তি আর বৈষ্ণব-সমাজে নাই। কৃষ্ণনগরের কুমারেরা তাঁহার যে মূর্ত্তি প্রস্তুত করে, তাহাতে চৈতন্যদেব গোঁসাইদের মত নধরকান্তি, ভুঁড়িটি অগ্রগণ্য, তৈলে ঘৃতে মাখনে পুষ্ট দেহ। গোস্বামিগণ এই ভাবে নিজেরা অংশ-অবতাররূপে লোকবিশ্বাসে স্থান অধিকার করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রধান সূত্র দৈন্য ও আর্ত্তি হইতে বিচ্যুত হইলেন। চৈতন্যদেব রঘুনাথ দাসকে শিক্ষা দিয়াছিলেন—"ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।"—তাঁহাকে তরুর মত হইতে বলিয়াছিলেন—তরু ঝড়বৃষ্টি রৌদ্র বিদ্যুৎ স্বয়ং মাথা পাতিয়া লয়—কিন্তু পরকে ছায়া দান করে। যে কুঠারাঘাতে তাহাকে কর্ত্তন করে, তাহাকেও স্বীয় অমৃতফল ও সুগন্ধ পুষ্প প্রদান করে; শুষ্ক তৃষ্ণায় মরিয়া গেলেও কাহারও কাছে কিছু প্রার্থনা করে না। নিজকে রিক্ত করিয়া তাহার তপস্যার্জ্জিত পুণ্যফল—পুষ্পরস ও ফল অপরকে বিনামূল্যে প্রদান করে। জগতে তরুর মত সহিষ্ণুতার আদর্শ, দৈন্যের, দানের, অযাচক বৃত্তির আদর্শ—আর কোথায় আছে? এইজন্য চৈতন্য রঘুনাথ দাসকে তরুর মত হইতে বলিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার তরুর গুণ ব্যাখ্যা করিয়া টিপ্পনী করিয়াছেন :

এই জগতে নিত্য ধ্বংসলীলা চলিতেছে, প্রস্ফুট ফুল শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, কত পল্লব, কত পত্র, কত সৌন্দর্য্য, কত সৃষ্টির ধ্বংসের মধ্যে জগৎ প্রতিদিন জাগ্রৎ হইতেছে, তথাপি এই ধ্বংসলীলার মধ্যে পরমানন্দ। সেই আনন্দময়ের হাসির বিরাম নাই। নিত্য বিহঙ্গের আগমনী গান, নিত্য নবকুসুম-সম্ভার, নিত্য নির্ঝরের কুলুকুলু, উষার সুবেশ; এই অস্থায়ী চিরচঞ্চল জগতের মধ্যে চিরস্থায়ী আনন্দের রূপ আছে—সেই রূপ সমুদ্রে অবগাহন করিলে মানুষ আনন্দনিকেতনে পৌঁছিতে পারে—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।" চৈতন্য সেই আনন্দময়ের দেখা পাইয়াছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্ম—আনন্দের ধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম দুঃখের ধর্ম্ম। সেই আনন্দময় পুরুষবরকে দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ আত্মা নিজসত্তা ভুলিয়া আনন্দসাগরে ডুবিয়া যায়, যেমন নদী সমুদ্রে পড়িয়া নিজকে হারাইয়া ফেলে—এই অবস্থার নাম "বিশিষ্ট দ্বৈতাদ্বৈতবাদ," এই অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া জয়দেব বলিয়াছেন—"মুহুরবলোকিত-মণ্ডনলীলা মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা" ভাগবতও তাহার আভাস দিয়াছেন। চৈতন্যদেব ভগবানের সেই অপূর্ব্ব হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশস্বরূপ। তিনি শুধু তাঁহার ভগবদ্‌ভক্তিপ্রবুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, সুনির্ম্মল মূর্ত্তি দেখাইয়া সর্ব্বলোককে পাগল করেন নাই, তাঁহার প্রেমে

মহাপ্রভুর ধর্ম্মের ত্রিরূপ ব্যাখ্যা।

রঘুনাথ দাস, রূপ, সনাতন, উদ্ধরণ দত্ত, নরোত্তম, বীরহাম্বির, চাঁদ রায় প্রভৃতি রাজা ও রাজকল্প ব্যক্তিরা তাঁহাদের অতুল বৈভব পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রত্যেকটি এক এক জন বুদ্ধের ন্যায়। এই বাঙ্গলাদেশে গোপীচন্দ্র, দীপঙ্কর হইতে লালাবাবু ও চিত্তরঞ্জন পর্য্যন্ত যত রাজা, রাজপুত্র ও রাজকল্প ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন জগতের এত স্বল্প-পরিসর কোন দেশে বোধ হয় সেরূপ-সংখ্যক রাজর্ষিদের আবির্ভাব হয় নাই। কিন্তু এই রাজর্ষিদের দেশেও ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে চৈতন্যের প্রভাবে যতজন রাজতুল্য ব্যক্তি ইন্দ্রতুল্য বৈভব পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছেন, এত আর কোন যুগে হয় নাই। এই দেশ খুব বড় আদর্শ ও খুব বড় ত্যাগের দেশ। এ হাটে ক্ষুদ্রকথা বিকায় না, এখানে জীবন-মরণ পায়ের ভৃত্য—কিন্তু ধ্বংসের জন্য নহে, অনুরাগ ও প্রেমের জন্য। এদেশে মানুষের যে বল, কামান গোলাগুলি ও বারুদের সে বল নাই। চৈতন্য আনন্দাশ্রুর উপর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। জগৎ কতকাল পরে তাঁহার এই উচ্চ আদর্শকে বুঝিতে পারিবে, জানি না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গুরুবাদ ও পরকীয়া

আমরা দেখাইয়াছি, মহাপ্রভুকে ভগবান্ কল্পনা করিয়া সেই কেন্দ্রের পরিধিতে যে সকল নরদেবতার মণ্ডলী পরিকল্পিত হইয়াছিল তাহা কখনই চৈতন্যের অনুমোদিত হইত না। চৈতন্যের অবতার-বাদ এই কল্পনার ভিত্তি। ইহা কখনই তিনি গ্রহণ করিতেন না, বরঞ্চ তিনি সর্ব্বদা ইহার বিরোধী ছিলেন।

রামরায় তাঁহার সঙ্গে যে সকল কথাবার্ত্তা বলেন, এবং যে সকল গান ও নাটক রচনা করেন, তাহা চৈতন্যের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। বস্তুতঃ যে কয়েকখানি পুস্তক তিনি নিত্য আবৃত্তি করিতেন, তন্মধ্যে "রায়ের নাটকগীতি"-খানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামানন্দের প্রসিদ্ধ "সো নহ রমণ হাম নহ রমণী" গানটি চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

গুরুবাদ।

ইহাতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, জীব ও ভগবানের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা ভগবানের অনুরাগমূলক। "পহিলহি প্রেম নয়নভঙ্গে ভেল"—তাঁহার দৃষ্টির ভঙ্গীতে আমার প্রেম প্রথম উদ্ভূত হইল, দিনে দিনে তাহা বাড়িয়া চলিল, তাহার অবধি হইল না। এই প্রেমের মধ্যে আর কেহ ছিল না, দূতী বা অন্য তৃতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন হয় নাই। "না খিলল দূতী, না খিলল আন, দুহুঁক মাঝে শুধু পাঁচবান" এই কথায় গুরুবাদকে স্পষ্ট অস্বীকার করা হইয়াছে। চৈতন্যের নিজ উক্তি "ঈশ্বরে বিশ্বাস ঈশ্বরে আনিয়া মিলায়"

সেই বিশ্বাস অপর কাহারও নিকট হইতে পাওয়া যায় না। শুভ মুহূর্ত্তে তিনি স্বয়ং তাঁহার অযাচিত করুণা কোন ভাগ্যবান্‌কে দিয়া যান।

কিন্তু বর্ত্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গুরুবাদের উপর দাঁড়াইয়া আছে। গোস্বামিগণ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন—"বৃন্দাবন-লীলার সখীরাই মহাপ্রভুর (স্বয়ং কৃষ্ণের) সহচর হইয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং ব্রজরস আস্বাদন করিবার আর উপায় নাই, গোপীগণের হাতেই সেই রসের চাবি। গোস্বামিগণের বংশধরদিগের শরণ না লইলে বৃন্দাবনে প্রবেশাধিকার কাহারও হইতে পারে না। গৌরগণোদ্দেশের শ্লোক মুখস্থ করাইয়া বৈষ্ণব-শিশুদিগের মনে গোস্বামিগণের দেবত্বে বিশ্বাস সম্যক্ দৃঢ়ীকৃত করা হইয়াছিল। এই ভাবের বর্ত্তমান বৈষ্ণব-ধর্ম্মমত চৈতন্যের ধর্ম্ম সমাশ্রয় করিয়া উদ্ভূত হয় নাই। তাহাতে কুল-শীলের—বংশের কোন মর্য্যাদা নাই। "কহে চণ্ডীদাস, কানুর পীরীতি—জাতিকুলশীল ছাড়া।" এক এক গোস্বামীর শিষ্যগণ হইলেন—তাঁহার পরিবার। ইঁহারা গ্রন্থাদি লিখিতে গিয়া নিজ পিতামাতা কিংবা পূর্ব্বপুরুষদের নাম উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার গুরু ও গুরুভ্রাতাদের পরিচয়ার্থ দীর্ঘ বন্দনাসূচক কবিতা লিখিয়া মুখবন্ধ করিয়াছেন। নিজের জাতি-বংশ, গোষ্ঠী বা পারিবারিক অপরাপর সমস্ত বন্ধন ছাটিয়া ফেলিয়া ইঁহারা গুরুপদে মাথা বিকাইয়াছেন ও তৎসমর্পিতকর্ম্মা হইয়াছেন। এরূপ গুরুবাদ বৈষ্ণবেরা পাইলেন কোথা হইতে? বৌদ্ধগণের মধ্যে গুরুবাদ অত্যন্ত প্রবল ছিল—"শুনহে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ বড়, তাহার উপরে নাই"—চণ্ডীদাসের এই মানুষ কে তাহা জানি না, কিন্তু বৌদ্ধগণের যে গুরুই সর্ব্বশক্তিমান্—অনন্যসাধারণ, একমাত্র পূজার্হ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। নেপালে হিন্দুদিগকে "দেভাজু" ও বৌদ্ধদিগকে "গুভাজু" বলা হয়। দেভাজু অর্থ "দেবতা-ভজনশীল" ও "গুভাজু" অর্থাৎ "গুরুকে ভজনশীল"। নাথধর্ম্মেও গুরুর প্রতি অসামান্য ভক্তির বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। গোরক্ষনাথ তাঁহার গুরুর জন্য কি অসামান্য কৃচ্ছ্র সাধন করিয়াছিলেন! চৈতন্য দেবমন্দির ও তীর্থস্থানগুলি দেখাইয়া বেড়াইতেন—সুতরাং তাঁহাকে "দেভাজু" বলা যাইতে পারে। গুরুর প্রতি এই অসাধারণ ভক্তির লীলা তিনি কোথাও দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আমার বিশ্বাস এই গুরুবাদ বৌদ্ধতন্ত্র এবং হিন্দুতন্ত্র উভয় তন্ত্র হইতেই বৈষ্ণবগণ লইয়াছিলেন, ইহার মধ্যে চৈতন্যের কোন প্রেরণা ছিল না। এই গুরু-বাদের দ্বারা গোস্বামিগণের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও অর্থসম্পদের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

পরবর্ত্তী বৈষ্ণবেরা বৌদ্ধ মত হইতে অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অশোকের ধর্ম্মমহামাত্রের পদে গোস্বামিগণ নিজেরা অধিষ্ঠিত হইয়া পুরস্কার ও নিগ্রহ বিতরণ করিতেন। অনেক বৈষ্ণববাড়ীর গৃহে জেল ছিল। শিষ্যদের অপরাধের বিচার গোস্বামীরা স্বয়ং করিতেন, এবং তাঁহাদের জেলে অপরাধীরা দণ্ড পাইত। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী বলিয়াছেন, খড়দহে তাঁহাদের জেল ছিল,—নিত্যানন্দের বংশধর-গণ বিচার করিয়া তাঁহাদের শিষ্যদিগকে শাস্তি দিতেন। দুই হাজার তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ প্রিয়দর্শী যে ধর্ম্মমহামাত্রপদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এতকাল পরে সেই পদে

গোস্বামীদিগকে সমাসীন দেখিয়া মনে হয়—ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠাও নষ্ট হয় নাই। নব ভারতের পল্লী খুঁজিলে জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় সেই সকল পত্র এখনও পাওয়া যায়। মহারাজ প্রিয়দর্শী শুধু "ধর্ম্মমহামাত্র" পদের সৃষ্টি করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, ধর্ম্মের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ও ধর্ম্ম প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে উচ্চশিক্ষিতা চরিত্রবতী মহিলাদিগকেও সেই ভাবে নিযুক্ত করিতেন। এই স্ত্রীধর্ম্মমহামাত্রগণের ধারাটিও গোস্বামিনীগণ বজায় রাখিয়াছেন। ইঁহারা ভদ্রপরিবারে যাতায়াত করিয়া ধর্ম্মের অনুশাসন ও তত্ত্ব প্রচার করিতেন। চলিত ভাষায় ইঁহাদের নাম ছিল "মা গোঁসাই।"

বৌদ্ধধর্ম্ম শেষকালটা দেহতত্ত্ব লইয়া ব্যস্ত ছিল, আমরা পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে (১৪ অঃ, ৫ম পঃ, ৫৮৪-৮৫ পৃষ্ঠায়) তাহা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। মহাপ্রভুর ভাবপ্রবণ ভক্তি-ধর্ম্মে এই দেহতত্ত্ব একটা স্থান জুড়িয়া বসিল। গোরক্ষবিজয়ে দেখিতে পাই, ছদ্মবেশী গোরক্ষ মৃদঙ্গের বোলে "কায়া সাধ—কায়া সাধ" এই ধ্বনি তুলিয়া গুরু মীননাথকে উদ্বোধন করিতেছেন। "যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে" এই উক্তির সঙ্গে বঙ্গের জনসাধারণ বিশেষভাবে পরিচিত। অনেক সময়ে পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মকে বর্জ্জন করিয়া নহে—আত্মসাৎ করিয়া পরবর্ত্তী ধর্ম্ম শির উত্তোলন করিয়া থাকে। মহাপ্রভুর নাম করিয়া অনেক কথা বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা বৌদ্ধতন্ত্র ও হিন্দুতন্ত্র হইতে গৃহীত। চণ্ডীদাস স্বয়ং তাঁহার কৃষ্ণকীর্ত্তনে "এড়িয়া টানিবে শ্বাস" প্রভৃতি তন্ত্রোক্ত শ্বাসনিয়ামক প্রাণায়ামের তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, সহজিয়া পুস্তকমাত্রেই হরিভক্তি ও হরিপ্রেমসম্বন্ধে বিশেষ কোন উপদেশ নাই।

দেহতত্ত্ব।

মহাপ্রভুর অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার অথবা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য মাধুর্য্য এই পঞ্চ অবস্থার সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ সহজিয়া-সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। তাহাতে কেবলই দেহতত্ত্বের কথা। 'অমৃতরত্নাবলী'র প্রথম ও শেষ কথা "সকলের সার হয় আপন শরীর। নিজ দেহ জানিলে আপনি হবে স্থির।" (৩ পৃঃ) চণ্ডীদাসের উক্তিতেও সেই একই কথা—"নিজ দেহ দিয়া ভজিতে পারে, সহজ ভজন বলিব তারে।" সহজিয়া সাহিত্যে ভক্তি বা প্রেমবাদ অত্যল্প—সর্ব্বত্র দেহতত্ত্বের কথা। ইহা সেই সুপ্রাচীন তান্ত্রিক ধারা। সহজিয়ারা হিন্দুতন্ত্রের সঙ্গে যোগ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্রই তাঁহাদের ভিত্তি। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে খুশী-বিশ্বাসী, রাম-বল্লভী, সাহেবধনী, দরবেশী, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা, বলরামী, হজরতী, গোবরাই, পাগলনাথী, পাঁচ ফকিরী প্রভৃতি যে সকল শ্রেণী আছে, তাঁহারা হিন্দুগণের প্রধান প্রধান সংস্কারগুলির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন; কোন কোন স্থানে মুসলমান গুরু এবং ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্য; হিন্দুদের মধ্যেও গোমাংস কোন কোন শ্রেণীর নিষিদ্ধ নহে।

স্ত্রীজাতিসম্বন্ধে এই সহজিয়াদের যে সকল মত আছে তাহা একেবারে সামাজিক আদর্শকে উলট্‌পালট্ করিয়া দিয়াছে। ইঁহাদের আদর্শ সীতা সাবিত্রী নহেন, সহজিয়াদের মতে তাঁহারা স্বেচ্ছায় তাঁহাদের সর্ব্বস্ব স্বামীর পদে বিকাইয়া দেন নাই। হিন্দুসমাজ পাতিব্রত্যের স্থান যতটা উচ্চ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে পাতিব্রত্যের জন্য প্রচুর তৈলঘটের ব্যবস্থা

আছে—তাহাতে ইহকালে ইষ্টবন্ধুজাতির উচ্চতান-প্রশংসা এবং পরকালে অক্ষয় স্বর্গ। ইহাদের কোন্‌টির লোভ অলক্ষিতভাবে সীতা-সাবিত্রীদের মনের উপর বেশী কার্য্য করিয়াছিল—ইহা একটি জটিল প্রশ্ন। অন্ততঃ সহজিয়াদের আদর্শ ইহারা হইতেই পারেন না। পরকীয়া-প্রেমে যে রমণী আত্মসমর্পণ করিল, সেই মুহূর্ত্তে সে লোকচক্ষুর বালাই হইল। নিজের পিতামাতা তাহার জন্ম চিরতরে গৃহের অর্গল রুদ্ধ করিলেন, স্বামিগৃহে সে অস্পৃশ্য, ঘৃণিত, অপাঙ্‌ক্তেয়। বন্ধু ও স্বগণেরা তাহাকে অস্বীকার করিল, শাস্ত্রকারেরা তাহাকে নিম্নতম নরক দেখাইলেন। সুতরাং পরকীয়ার প্রথম অবস্থা হইতে সে পার্থিব যাহা কিছু কাম্য তাহা সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া—পরকালের সমস্ত ভীতি অগ্রাহ্য করিয়া কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া পথে দাঁড়াইল। সুতরাং ত্যাগ-সম্বন্ধে সে যে উচ্চতম আদর্শে পৌঁছাইয়াছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পরকীয়া।

স্ত্রীলোক লইয়া ধর্ম্মচর্চ্চা বা প্রেমের আদর্শ প্রদর্শন করা এক সময়ে য়ুরোপের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। মধ্য যুগের "নাইট এরাণ্ট্রী" বেশী দিনের কথা নহে। কিন্তু খৃষ্টের পূর্ব্বেও অনেক শ্রেণী এই রমণীদের লইয়া ব্যভিচারকে ধর্ম্মের অঙ্গীয় মনে করিতেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে স্ত্রীলোকের গণিকাবৃত্তি অতি সাধুকার্য্য এবং প্রশংসনীয় ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইত। পুরাকালে উর্ব্বশী-তিলোত্তমা প্রভৃতি স্বর্গের গণিকারা লোকমতে উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এমন কি মৃচ্ছকটিকে বসন্তসেনাই সেই নাটকের সর্ব্বগুণসম্পন্না প্রধান নায়িকা। গণিকাদের নৃত্য, গীত এবং সমস্ত কলাবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতে হইত। উদ্দালক মুনির পুত্র-কর্ত্তৃক বিবাহপ্রথা আর্য্য-সমাজে প্রচলিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের বহুনায়কের সহিত সম্বন্ধ প্রশংসনীয় ছিল। যে রমণী বহুনায়ককে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন, সমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইত। যিনি পুরুষের নিবেদন অগ্রাহ্য করিতেন, তিনি সমাজে নিন্দিতা হইতেন, তাঁহাকে সমাজ "কর্কশা" নাম দিয়া তাহাদের প্রতিকূলভাব দেখাইতেন। (দুর্গাচরণ সান্যালের সামাজিক ইতিহাস দ্রষ্টব্য।) যদিও বুদ্ধদেব ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর মিলনসম্বন্ধে বহু কঠোর নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তথাপি কালে সংঘের মধ্যে নরনারীর অবাধ মিলন হইতে লাগিল। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতেও যে একান্তিগ্রামীর দল বিদ্যমান ছিল তাহা পূর্ব্বেই (৩২১ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত হইয়াছে। তাহারই নব নব সংস্করণ এখনও পল্লীতে পল্লীতে উৎপন্ন হইয়া সেই অক্ষয়-বটের অবিনাশী বংশধারা বজায় রাখিয়াছে। ঘোষপাড়ার মত শত শত গ্রামে রজনীর অন্ধকারে অর্গলবদ্ধ গৃহে নরনারীর অবাধ ধর্ম্মানুশীলন এখনও চলিতেছে। আমরা পার্ব্বতীচরণ কবিশেখর-প্রণীত চারুদর্শন নামক পুস্তক হইতে এই নরনারী-মিলনের একটা দৃশ্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

'কিশোরী-ভজনের মেলায় যাইয়া হাকিম চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া দেখিলেন প্রায় পাঁচশত লোক উপস্থিত। সেই লোকের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বার আনা। সেই স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিধবার সংখ্যাই দশ আনা। সেই বিধবাদের মধ্যে যুবতীর সংখ্যা আট আনা। কোন স্ত্রীলোকের কোলেই শিশু নাই। বৃদ্ধের সংখ্যাও বড় কম, যুবতী ও যুবকদের সংখ্যাই পনের

আনা। ………পদে পদে এত ত্রুটি দেখিলেও তিনি একটী প্রধান বিষয়ে একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। তাদৃশ সন্তুষ্টি উন্নত ব্রাহ্মসমাজেও জন্মিতে পারে নাই। ব্রাহ্মগণ স্ত্রী-স্বাধীনতার ঘোর পক্ষপাতী হইলেও সভায় বসিবার কালে একত্র মিলিয়া মিশিয়া বসেন না। …… কিন্তু এখানে তাদৃশ সঙ্কীর্ণতা নাই। স্ত্রীপুরুষ যার যেখানে ইচ্ছা, সেখানে পূর্ণ স্বাধীনতা পাইয়া বসিয়াছে। কাজেই ঈদৃশ স্ত্রীস্বাধীনতা-দর্শনে হাকিমবাবু সমস্ত অভাব ও সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। হাকিমের এই চিন্তা শেষ হইতে না হইতেই ভজন-ক্রিয়া আরম্ভ হইল।

কিশোরী-ভজনের মেলা।

সেই মোকদ্দমায় অভিযুক্ত বৈষ্ণবীগণ ও কৃষ্ণপুরের কৃষ্ণদাসী বৈষ্ণবী হাকিমবাবুর অতি নিকটে আসিয়া গান ধরিল—"এই পাগলের দলে—এই দলে কেউ এসনা রে ভাই! কেউ এসনা বলে না, কেউ প্রেম না গায়। এই দলেতে এলে পরে—জাতের বিচার নাই। এক পাগল উড়িষ্যাতে জগন্নাথ গোসাই, চণ্ডালেতে আনে অন্ন ব্রাহ্মণেতে খায়। এক পাগল চিতলাহতে শম্ভু চাঁদ গোসাই, সে যে হিন্দুর গুরু, ব্রাহ্মণের শিব, মোসলমানের সাঁই।" উক্ত গান-সমাপনের পর কমলদাস আসিয়া ঘোষণা করিল—"সেবানন্দে প্রেমানন্দ বাধে" অর্থাৎ ক্ষুধানিবৃত্তি না করিতে পারিলে ভগবানের প্রেমানন্দ লাভ ঘটে না। ……… কতকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অন্নব্যঞ্জনের পাত্র সভার মধ্যস্থলে বিছানার উপর আসিয়া উপস্থিত হইল, তৎসঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীপুরুষগণ সেই পাত্রের চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বসিল, এবং এক এক জনের মুখের অন্ন টানাটানি ও হাসাহাসি করিয়া অন্যে অন্যে খাইতে লাগিল। এই দৃশ্যে হাকিমবাবু মহাসন্তুষ্ট হইলেন। এত বিভিন্ন জাতির একত্র সম্মিলিত মেলার মধ্যস্থলে বিছানার উপর হিন্দুজাতির অন্নব্যঞ্জন আসিতে পারে, তাহা হাকিমবাবু স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন নাই। তদুপরি আবার এক থালার খাদ্য টানাটানি করিয়া সকলে খাইতে পারে, ইহা অসম্ভব হইতেও মহা অসম্ভব।………সুতরাং ঈদৃশ জাতিভেদবিরোধী আচরণ হিন্দুজাতির মধ্যে পাইয়া হাকিমবাবু আহলাদে গলিয়া গেলেন। তাঁহার 'জাতিভেদ' নামক পুস্তকখানিতে যে নূতন অধ্যায় লিখিত হইবে তাহাও মনে মনে স্থির করিয়া লইলেন। সেই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার আশাও জাগিয়া উঠিল। সেই আশা হঠাৎ বর্দ্ধিত হওয়াতে হাকিমবাবু স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাই তিনি হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, "হে প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ—আপনাদের মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিতে আমি দণ্ডায়মান হই নাই। এই মেলায় জাতিভেদ-নাশক সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা দেখিয়া এত আনন্দিত হইয়াছি যে. তাহা হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না ………এই জাতিভেদ-নিবারক ভোজনক্রিয়া-নির্ব্বাহকালে সদর দরজা খুলিয়া সকলকে দেখান উচিত। নতুবা এই মহাসত্য-প্রচারের সুবিধা হইবে না. ব্রাহ্ম-সমাজের স্ত্রীস্বাধীনতা প্রকাশ্য দিবালোকে। তাই এই মহাসত্য-প্রচারের মহাসুযোগ ঘটিতেছে। আপনাদের স্ত্রীস্বাধীনতা রাত্রিতে অতীব গোপনে পাপকার্য্যের মত সভয়ে সম্পন্ন হয় কেন? আপনারা যখন ধর্ম্মের বলে বলীয়ান্, তখন আর ভয় করেন কাহাকে? ……

"হিন্দুজাতির অধঃপতনের অন্যতম কারণ অবরোধপ্রথা। ঈদৃশ বর্ব্বরতা কোন সুসভ্য জাতির মধ্যে নাই। দেশ জাগাইতে হইলে স্ত্রীস্বাধীনতার আবশ্যক। দেখুন বৃক্ষের অর্দ্ধাংশে সূর্য্যের উত্তাপ পাইয়া যদি বাকী অর্দ্ধাংশ উহা না পায়, তবে সেই বৃক্ষ রীতিমত হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে পারে না।—এই জন্যই চিন্তাশীল কবি বজ্রনিনাদে ঘোষণা করিয়াছেন, 'না জাগিলে সব ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।'......আপনাদের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে সুশিক্ষিত উন্নত ব্রাহ্ম-সমাজের বেশ মিল আছে। তাই আপনাদিগকে আগামী রবিবার সেই পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজে যাইতে অনুরোধ করি। তথায় আমি থাকিয়া বহু উন্নতির পথ দেখাইয়া দিব।.........আমি স্বয়ং কয়েকখানি গাড়ীসহ এই আখড়ায় আগামী রবিবার ১২টায় আসিতে প্রস্তুত আছি। আমার সঙ্গে আপনারা গেলে ব্রাহ্ম-সমাজ ধন্য হইবেন।"

হাকিমবাবুর এই বক্তৃতার মর্ম্ম কেহ বুঝিলেন না। তাঁহাদের পক্ষে যে তাহা বুঝিবার কোন আবশ্যকতা আছে তাহাও তাঁহারা মনে করেন না। শ্রীগুরুর শ্রীমুখের উপর যে হাকিমের মুখ বা অন্যের মুখ থাকিতে পারে, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। তাঁহারা নির্ভুল এবং বাকী সমস্তই ভুল, ইহাই তাঁহাদের মজ্জাগত দৃঢ় ধারণা। তাঁহারা বিদ্যা ও বুদ্ধিকে কুপথের সহায় বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বেদ বা শাস্ত্রকে ঐহিকের খেলা বলিয়া মনে করেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে বৃথা মনুষ্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা সংসারে থাকিয়াও সাংসারিক নিয়মকে তুচ্ছ মনে করেন। গুরু, পুরোহিত, স্বামী ও গুরুজনকে তত গ্রাহ্য করেন না। দেবপূজা, উপবাস, শঙ্খ, ঘণ্টা, পবিত্রতা, নিয়ম ও নিষ্ঠা প্রভৃতিকে অসার মনে করেন, আনন্দময়-মেলার আনন্দময় ভজনকেই জীবনের সারাংশ মনে করেন। তাই হাকিমের বক্তৃতার উত্তরে এই মেলার সাধু ও সাধুনীরা নিম্নোক্ত গান ধরিল :—"মন বাদুড় সন্ধ্যার সময় উড়িস্ না,—কাল কাক পেলে তোরে ছেড়ে দিবে না। শোন বলি মূর্খ বাদুড়, দিনে থেকো দিন-কানার মত, রাত্রে হইও চতুর। উপর দিকে দিয়ে লেঙ্গুর, ঝুলন স্বভাব গেল না।......" এই গান হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভোজনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া আচমনের সময় আসিল। তাই দশ বারো জন স্ত্রীলোক—হাকিমবাবুর মুখ খোওয়া জল খাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

কাজেই এবার বিষম হুড়াহুড়ি বাধিয়া গেল। তাহার ফলে হাকিমবাবুকে রাত্রি দশটার সময়ে স্নান করিতে বাধ্য হইতে হইল। এমন সময়ে কমলদাস মনে মনে স্থির করিল, হাকিম-বাবু অবশ্য সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু ব্যক্তিভেদে যে বৈষম্য ঘটে, তাহা সে জানিত না। যে উপাদানে অশিক্ষিত নীচলোকের আনন্দ জন্মে, সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ধর্ম্ম-প্রাণ লোকের তাহাতে আনন্দ না জন্মিবারই সম্ভাবনা বেশী। বরঞ্চ স্ত্রীলোকের এত নির্লজ্জতা ও অসভ্যতায় তাঁহার ক্রোধ জন্মিয়াছিল। তাই তিনি স্নানের পর কাহাকেও গাত্র মোছাইবার অধিকার দিলেন না। কমলদাস এই আমোদকে ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া প্রমাণের প্রত্যাশায় হাকিমকে লক্ষ্য করিয়া ঘোষণা করিলেন :—"পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদা শিবঃ" অর্থাৎ ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, নিন্দা ও আসক্তিকে অষ্টপাশ (আট প্রকার বন্ধন) বলে। সাধনবলে সেই

পাশমুক্ত হইতে হইবে। পাশমুক্ত না হইলে জীব বালকের ন্যায় সরল হয় না। সরল না হইলে ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না।" হাকিমবাবু স্ত্রীলোকদের নির্লজ্জতা ও কমলদাসের উক্তি মিলাইতে গিয়াও মিলাইতে পারিলেন না। এমন সময়ে কমলদাস আবার ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিল। যথা—ধর্ম্মজগতের দেশ চারি প্রকার—(ক) স্থূল, (খ) প্রবর্ত্তক, (গ) সাধক, (ঘ) সিদ্ধ। প্রত্যেক দেশের জন্য ছয়টি শিক্ষিতব্য বিষয় আছে, যথা—(১) দেশ, (২) কাল, (৩) আশ্রয়, (৪) পাত্র, (৫) আলম্বন (৬) উদ্দীপক............দেশের অর্থ ও গানের অর্থ হাকিমবাবু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তজ্জন্য হাসাহাসির সঙ্গে যোগ দিতে পারিলেন না, বলিয়া অনেকের মুখে হাসি লাগিল.........তাই তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। যাতায়াত কালে যাহা চক্ষে দেখিলেন বা অনুমান করিলেন তাহা বর্ণনার যোগ্য নহে' (১৪০-১৪২ পৃষ্ঠা)।

ইহা একটি ব্যঙ্গদৃশ্য হইলেও এই বর্ণনার ভিতর যে কতকটা সত্য আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ছবির আর একটি দিক্ আছে। উন্নত সহজধর্ম্মীর আদর্শ—সংস্কারের ঊর্দ্ধে।

নরনারীর প্রেমসম্বন্ধে সহজিয়াদের ধারণা খুব উচ্চ। তাহা সাধারণের বোধগম্য নহে। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, "প্রেম করিয়া ভাঙ্গয়ে যে, সাধন-অঙ্গ পায় না সে।" যাহাকে প্রেম দিয়াছ, তাহা হইতে সে প্রেম আর ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না—সে ব্যভিচারী হউক বা ব্যভিচারিণী হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না; সাংসারিক সুখ হয়ত হইল না, হয়ত প্রেমের পাত্র বা পাত্রী পুনরায় নির্ব্বাচন করিলে ঘরকন্না সুখের হইত। কিন্তু সহজিয়া সে সুখ চায় না। ফুল যেরূপ তাহার সৌরভ বিতরণ করিয়া তাহা ফিরাইয়া আনিতে পারে না, ভালবাসিয়া প্রকৃত প্রেমিক তাহা নষ্ট করিতে পারে না। দান-ধর্ম্ম ইহা নহে, দান করিয়া তুমি নিঃস্ব হইতে পার দ্বিতীয় হরিশ্চন্দ্রের মত ;—কিন্তু প্রেমকে যিনি সাধনার বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি দুঃখসুখের অতীত হইয়া গিয়াছেন। দুঃখের বোঝা মাথায় করিয়া তাঁহাকে সাধনার পথ পরিষ্কার রাখিতে হইবে—প্রেম আদান-প্রদানের—কারবারের বা বিনিময়ের সামগ্রী নহে। যিনি শেষ রক্ষা করিতে পারিবেন না—তিনি সাধন-অঙ্গ পাইবেন না। সহজিয়া-প্রেমে "তলাকনামা" অগ্রাহ্য। চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন, তাঁহার সময়ে "সহজ প্রেমের" নেশায় যুবক-যুবতীরা উন্মত্ত ছিল। কিন্তু এ সাধনা বড় শক্ত। কবি বলিয়াছেন, যোগ্য ব্যক্তি "কোটিকে গোটিক হয়", এক কোটী সাধনপন্থীর মধ্যে একজন হয়। সে ব্যক্তি কেমন, তৎসম্বন্ধে চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—যিনি "সুমেরু পর্ব্বতকে সূতা-তন্তু দিয়া বাঁধিয়া আকাশে ঝুলাইয়া রাখিতে পারেন, যিনি বিষধরের কবলে ভেককে পাঠাইয়া তথায় তাহাকে নৃত্য করাইয়া ফিরাইয়া আনিতে পারেন—তিনি যোগ্য। অর্থাৎ যিনি অসাধ্য সাধন করিতে পারেন, তিনিই যোগ্য। "অন্ধাবন্ধু" গীতিকায় (পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ) এইরূপ প্রেমের দৃষ্টান্ত আছে। প্রথম উপদেশ নিজদেহকে "কাষ্ঠ-লোষ্ট্রসম" করিতে হইবে। অর্থাৎ উহাতে ইন্দ্রিয়াসক্তির লেশ মাত্র থাকিবে না। দৈহিক উত্তেজনার লেশ থাকিলে

সহজিয়াদের আদর্শ-প্রেম।

দেবতারা সে প্রেমের স্বর্গ হইতে সাধককে তাড়াইয়া দিবেন। "মরম না জানে, ধরম বাখানে, এমন আছয়ে যারা। কাজ নাই সখি, তাদের কথায়, বাহিরে রহুন তারা। আমার বাহির দুয়ারে, কপাট লেগেছে—ভিতর দুয়ার খোলা।" যাঁহারা শাস্ত্র লইয়া ব্যাখ্যা করেন—মর্ম্মী নহেন—তাঁহারা দূরে থাকুন,—বহিরিন্দ্রিয়ের লেশ যাহার আছে—তাহার অধিকার নাই। "চৌওকি রয়েছে সেথা"—প্রহরী আছে, দৈহিক কোনরূপ চাঞ্চল্য দেখিলে তাহারা তাড়াইয়া দিবে—"সে দেশের কথা, এদেশে কহিলে, লাগিবে মরমে ব্যথা।" সে দেশের সুখদুঃখ—এদেশের সুখদুঃখ নহে। চণ্ডীদাস বলিতেছেন—"ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমার ভজন, তুমি বেদমাতা গায়ত্রী, তুমি হও পিতৃমাতৃ।" ইত্যাদি কথায় কবি যে স্বর্গলোকের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহার পথঘাট প্রাচীন কবি তরণীরমণ তাঁহার চণ্ডীদাস-জীবনীতে দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহার মূল পুঁথি বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ তাহা ছাপাইয়াছেন। ইহাতে আছে—প্রণয়ী ও প্রণয়িনী পরস্পরকে নির্ব্বাচন করার পর পরস্পরের নিকট হইতে দূরে,—পুরুষ সুন্দরী রমণীর মধ্যে, ও নারী সুন্দর যুবকগণের মধ্যে,—বাস করিবেন। নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে যদি শত প্রলোভনসত্ত্বেও তাঁহাদের একনিষ্ঠ প্রেমের পরিবর্ত্তন না হয়, তবে তাঁহাদের প্রথম পরীক্ষা হইয়া গেল। দ্বিতীয় অবস্থায় তাঁহারা একগৃহে বাস করিবেন, তখন স্বীয় চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বভাব লইয়া তাঁহারা কি কি স্তব অতিক্রম করিবেন তাহা তরণীরমণ রামীর মুখে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—"চারিমাস আগে তার চরণ সেবিয়া; পদতলে পড়ি রবে স্বভাব লইয়া; পুনঃ আর চারিমাস চরণ সেবিয়া। বামভাগে শুতি রবে স্বভাব লইয়া॥ পুনরপি চারিমাস সর্ব্বাঙ্গ সেবিয়া। ছন্দ-বন্দে শুতি রবে স্বভাব লইয়া। আর চারিমাস তার চরণ ধরিয়া—হৃদয়ে রাখিবে তাকে স্বভাব লইয়া।" প্রত্যেক পদের পশ্চাতে "স্বভাব লইয়া" কথাটি আছে—অর্থাৎ স্বীয় সংযমের ও দৈহিক পবিত্রতার আদর্শটি বজায় রাখিয়া শুদ্ধভাবে এইরূপে সেই মানস প্রেমপাত্রের মানসী-পূজা করিতে হইবে। এত বড় কষ্টিপাথর কে কবে কল্পনা করিতে পারিয়াছে?

পুনঃ পুনঃ বেদকে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। বেদ-বিরুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্মের এই বাণী সুপরিচিত। পরকীয়ার ধর্ম্ম এই "লোক বেদধর্ম্ম পাপ-পুণ্য যে নাহি মানয়; মন নিছে অন্য কান্তে করয় প্রণয়।" ইহাই পরকীয়ার ধর্ম্ম—লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, পাপপুণ্যে ভেদজ্ঞান—এই সমস্ত পরিত্যাজ্য। এই তান্ত্রিক মতের ধ্বনি

রসসার।

আমরা চৈতন্যচরিতামৃতে পর্য্যন্ত দেখিতে পাই। উজ্জ্বলচন্দ্রিকা নামক সহজিয়া-পুঁথিতে পাই "লোকশাস্ত্র করে যারে অনেক বারণ" তাহাই পরকীয়ার শ্রেষ্ঠ বিধান। স্বকীয়া অগ্রাহ্য, "পরকীয়ারূপ অতি রসের উল্লাস। তাহাতে পরম রতি মন্মথের হয়।" এই পরকীয়া-ধর্ম্ম কিরূপ উচ্চ এবং তাহা যে শুধু একটা ধর্ম্মমত নহে, তাহা অনুষ্ঠিত হইবার যোগ্য এবং এখনও হইতেছে, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি-প্রণীত 'সাধুচরিতে'র আখ্যায়িকা এখানে অতি সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে :—

শ্রীহট্ট জেলার ইটা পরগনার কেমসহস্র গ্রামে দুর্গাপ্রসাদ কর (পিতার নাম হরিবল্লভ কর

এবং মাতার নাম শান্তা দাসী। নায়ক একজন কায়স্থ ১৮৫১ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি তরুণ যৌবনেই একান্ত ধর্ম্মানুরাগী এবং সাধুচরিত্র বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ইনি শৈশব হইতে মনোমোহিনী নাম্নী তাঁহার এক দূর আত্মীয়াকে ভালবাসিতেন। এই ভালবাসা অর্থ মানসিক পূজা। ইহা দুর্গাপ্রসাদের মনের নিভৃতে থাকিয়া তাঁহাকে সমস্ত সাধুকার্য্যে প্রেরণা দিত। ইহা এত গুপ্ত ছিল যে বহুদিন পর্য্যন্ত মনোমোহিনী নিজেও ইহার অস্তিত্ব জানিতেন না। তাঁহার ২৪ বৎসর বয়সে তিনি মনোমোহিনীর নিকট প্রত্যহ তিনবার যাইতেন—প্রত্যেকবার অতি অল্প সময় থাকিতেন, সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিতেন। কিন্তু মধ্যাহ্নে একখানি থালা-হাতে তাঁহার দ্বারে দাঁড়াইলে মনোমোহিনী তাঁহাকে অন্নব্যঞ্জন দিতেন, তাহার কিছু তিনি উচ্ছিষ্ট করিয়া দিলে দুর্গাপ্রসাদ তাহা গৃহে আনিয়া খাইতেন। এই সময়ে দুর্গাপ্রসাদ মৌনব্রত অবলম্বন করেন। তাঁহার সাধু নিষ্পাপ জীবনদর্শনে প্রথম প্রথম লোকে কিছু বলিত না এবং মনোমোহিনীও এই অদ্ভুত খেয়ালী লোকটির আবদার প্রতিপালন করিতেন। কিন্তু কালক্রমে লোকেরা কানাকানি করিতে লাগিল। তাঁহার চরিত্রসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণই ছিল না—কিন্তু তথাপি লোকেরা বলাবলি করিত, "মনোমোহিনীই বা কিরূপ?" সে উহাকে প্রণাম করিতে দেয় কেন এবং তাহার উচ্ছিষ্টই বা খাইতে দেয় কেন?" হিন্দুরমণীর সম্ভ্রমে ঘা পড়িল। পরদিন থালাহস্তে দুর্গাপ্রসাদ তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইলে তিনি অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন। সেদিন ভ্রাতৃবর্গের বহু অনুরোধ ও উপরোধসত্ত্বেও দুর্গাপ্রসাদ কোন খাদ্য গ্রহণ করিলেন না। দুর্গাপ্রসাদের বয়স তখন মাত্র ২৪ বৎসর। ক্রমাগত উপবাস চলিল, আত্মীয়বন্ধুগণ নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া ব্যর্থ হইলেন, দুর্গাপ্রসাদের উপবাসব্রত ভাঙ্গিতে পারিলেন না। নিরুপায় হইয়া তাঁহারা মনোমোহিনীকে তাঁহাদের বাড়ী আসিয়া খাদ্য উচ্ছিষ্ট করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। বিরক্তির স্বরে মনোমোহিনী বলিলেন, "কেউ খেল বা না খেল তাহাতে আমার কি? আমাকে তোমরা আর ঐ লোকটার জন্য জ্বালাইয়া মারিও না।" আরও দুই তিন দিন গেল, তাঁহার ভ্রাতারা নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে লইয়া তাঁহাদের এক নিকট আত্মীয়ার বাড়ী গেলেন। সেই আত্মীয়াকে দুর্গাপ্রসাদ অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। রাস্তায় বহুবার তাঁহারা উহাকে খাওয়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছে। যেদিন তাঁহারা তাঁহাকে লইয়া সেই আত্মীয়ার বাড়ীতে পৌঁছিয়াছেন সেদিন ধরিয়া পূরো দশদিন দুর্গাপ্রসাদ উপবাসী। কিন্তু সেই আত্মীয়া অনেক কাঁদিয়া-কাটিয়া কিছুতেই দুর্গাপ্রসাদের ধনুর্ভঙ্গ পণ টলাইতে পারিলেন না। তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহাকে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিলেন, তখন চতুর্দ্দশ দিবস সাধু-যুবক নিরম্বু উপবাসী, তিনি কঙ্কালসার ও শয্যাশায়ী। যাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্র ও সাধুত্বের প্রতিষ্ঠা সর্ব্বত্র প্রচারিত, এমন নির্ম্মলচরিত্র যুবক না খাইয়া মরিতে বসিয়াছেন—এজন্য প্রতিবাসীদের মন বিগলিত হইল। তাঁহারা সকলে যাইয়া মনোমোহিনীকে দয়া করিয়া উহাকে উচ্ছিষ্টান্ন দিতে অনুরোধ করিলেন।

সহজিয়া আদর্শ।

সাধু দুর্গাপ্রসাদ।

মনোমোহিনীর মন গোপনে তীব্র জ্বালা বোধ করিতেছিল—কেবল লোকলজ্জায় তিনি নির্ম্মমতা দেখাইতেছিলেন। এখন লোকানুরোধে তিনি অত্যন্ত আহ্লাদ-সহকারে দুর্গাপ্রসাদের বাড়ীতে যাইয়া তাঁহার অন্ন উচ্ছিষ্ট করিয়া দিলেন। ১৫ দিন পরে তিনি আহার করিলেন। অচ্যুতবাবু লিখিয়াছেন—যাঁহারা এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এখনও অনেকে জীবিত। জীবনের এক সময়ে দুর্গাপ্রসাদ প্রত্যেক মানুষের আদেশ ঈশ্বরাদেশ বলিয়া মান্য করিতে লাগিলেন; তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কালীচরণ তরফদার নামক একব্যক্তি তাঁহাকে সন্ধ্যাকালে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার গোশালায় লইয়া গেলেন, সেখানে গোবরের স্তূপ এত বেশী ছিল যে দাঁড়াইবার স্থান ছিল না, তাহারই এক কোণে কোন রকমে দুর্গাপ্রসাদকে ঠেলিয়া দিয়া কালীচরণ আদেশ করিলেন, "এইখানে দাঁড়াইয়া থাক।" সে রাত্রে ঘোর বিদ্যুৎ, ঝড় ও মেঘবৃষ্টি, গোয়ালের চাল জরাজীর্ণ, অনর্গল বৃষ্টি পড়িয়া দুর্গাপ্রসাদের দেহ সিক্ত করিতেছে, এদিকে সহস্র সহস্র মশক তাঁহার রক্ত চুষিয়া খাইতেছে,—অপরদিকে পচা গোময়ের অসহ্য দুর্গন্ধ। কিন্তু নির্ব্বিকার মহাপুরুষ প্রস্তরবিগ্রহের ন্যায় অনড় অটল হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ৬।৭ ঘণ্টা পরে রাত্রি একটার সময়ে কালীচরণ তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া মুক্তি দিয়া বলিলেন, "এখন ঘরে যাও।"

এইরূপ তপস্যার কথা যুরোপ কি কখনও শুনিয়াছেন? তাঁহারা জানেন অস্ত্র তৈরী করার তপস্যা—পৃথিবীর শক্তিপুঞ্জের উপর আধিপত্য-স্থাপনের তপস্যা। কিন্তু এই আধ্যাত্মিক জগতের তপস্যা তাঁহারা বর্ব্বরোচিত বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন, কিন্তু ইহা তাঁহাদের অনায়ত্ত এবং ইহাই আমাদের সম্পদ। (প্রতীচীকে যদি জয় করিতে হয় তবে প্রাচ্যের এই নির্ব্বিকার, নির্ব্বিরোধ, ইন্দ্রিয়জয়ী, দেহতুচ্ছকারী, অসীমসহিষ্ণু—অনন্ত বিশ্বাসপূর্ণ প্রেমের তপস্যা দ্বারা তাহা করিতে হইবে, যাহাদ্বারা প্রাচ্যের বুদ্ধ অর্দ্ধেক জগৎ জয় করিয়াছিলেন—প্রাচ্যের যীশু প্রতীচ্য জয় করিয়াছিলেন—এ সেই শ্রেণীর তপস্যা, পথ ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু অধ্যাত্মশক্তির উদ্বোধনই এই তপস্যার মূল লক্ষ্য।)

প্রেমের জন্য অসাধ্যসাধন—সহজপন্থীরা দেখাইয়াছেন। ভূমাই আনন্দের কারণ, ভূমা না হইলে তৃপ্তি হয় না—উপনিষদের এই মহাবাণী, প্রেম-জগতে বাঙ্গালীরা যাহা দেখাইয়াছেন অন্যত্র তাহা সুলভ নহে। চিন্তার এই স্বাধীনতার পথে হাঁটিতে আরম্ভ করিয়া কোন বাধা না মানিয়া ভূমাকে লক্ষ্য করা, ইন্দ্রিয়-সংযমের শেষচেষ্টা—ত্যাগের শেষ দৃষ্টান্ত, ইহাই সহজিয়া-মত। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে বলসেভিক্ এবং অধ্যাত্মজগতে সহজিয়া—ইহারা প্রাচীন সংস্কার সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। এরূপ নির্ভীক বীরত্ব জগতে বিরল। ভারতবর্ষে দাঁড়াইয়া স্বাধীনমতের ধ্বজা তুলিয়া সীতাসাবিত্রীর আদর্শ প্রেমের ক্ষেত্রে উপেক্ষা করিয়া—তাহা হইতে উচ্চতর আদর্শের পরিকল্পনা ইহারা করিয়াছেন; ইহাদের বুকের পাটা কত বড় প্রশস্ত! "অন্ধাবন্ধু"তে স্বামীকে বলিয়া কহিয়া প্রণয়ীর সঙ্গে যাওয়ার দুর্দ্দান্ত স্বাধীনতা বাঙ্গালী ভিন্ন কে কল্পনা করিতে পারিয়াছে? কোথায় শাস্ত্র, কোথায় পুরাণকার—কতটা পেছনে ফেলিয়া ইহারা অগ্রসর হইয়াছেন।

প্রাচ্য তপস্যা।

(সহজিয়ারা বলেন কাঠ-পাথরের বিগ্রহ সহজে তুষ্ট করা যায়—কয়েকটি ফুলবেলপাতা পায়ে ফেলিয়া দিলেই যথেষ্ট। কিন্তু মানুষের মন জোগান বড় উৎকট তপস্যার কাজ, তিনি যাহা করিবেন আমি তাহাই দেবতার কাজ বলিয়া গ্রহণ করিব, তাঁহার ইচ্ছায় আমার ইচ্ছা একেবারে ডুবাইয়া দিব; উপবাসী আমি, আরাধ্য ব্যক্তি আমার হাত হইতে থালা ফেলিয়া দিয়া আমার বিরুদ্ধে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন, তথাস্তু—তথাপি তিনি ভগবান্, দুর্গাপ্রসাদের এই দুশ্চর তপস্যার মহিমা ভূলোক হইতে দ্যুলোক স্পর্শ করিয়াছে। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, "আমি নিজ সুখদুঃখ কিছু না জানি। তোমার কুশলে কুশল মানি"—অতি সরল সহজ দুটি কথা—কিন্তু অনুষ্ঠান করিতে হইলে বড় শক্ত! শত্রুবৎ যে ব্যবহার করিতেছে, তাহাকে শুধু ক্ষমা নহে—সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসা এবং তাঁহার হাতের শূল ফুল বলিয়া গ্রহণ করা।

চণ্ডীদাস সহজিয়ার তান্ত্রিক অংশের উপর জোর দেন নাই, তিনি অনুরাগের দিক্‌টায় বেশী ঝুঁকিয়াছিলেন। আর একটি নূতনত্ব তিনি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা এই :—নরনারীর প্রেম ঈশ্বরপ্রেমের পথ চিনাইয়া দেয়। বোধ হয় তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন সহজিয়া একথাটা বলেন নাই। "ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন, কেহ না জানয়ে তারে। প্রেমের আরতি যে জন জানয়ে সেই সে চিনিতে পারে", এই পার্থিব প্রেমের সিঁড়ি বহিয়া স্বর্গলোকে যাইতে হয়, এবং এই নরনারীর প্রেমই গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইবার একমাত্র উপায়—তথায় পৌঁছিলে এই প্রেমের আর প্রয়োজন হয় না। কবি এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর উপমা দিয়া বলিয়াছেন, যদি দীপহস্তে কেহ গৃহে প্রবেশ করিয়া তথায় কোথায় কি আছে তাহা জানিতে চাহে, তবে সেই ভাবে সমস্ত জানিয়া লইলে তখন দীপের আর কোন প্রয়োজন হয় না।") (বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, ১৬৬৩-১৬৬৫ পৃঃ।)

৩৭৯ পৃষ্ঠায় তিব্বতপ্রসঙ্গে আমরা যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহাতে দেখা যায় বঙ্গের বাউল ও সহজিয়াদের সঙ্গে কোন কোন বৌদ্ধ শ্রেণীর মতের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। একসময়ে তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের নরনারীর অবাধ মিলন ও ব্যভিচারে উত্যক্ত হইয়া তিব্বতের রাজা বঙ্গদেশ হইতে দীপঙ্করকে লইয়া যাওয়ার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষের অবাধ মিলনের বিরোধী ছিলেন। তিনি ছোট হরিদাসকে শিখী মাহিতীর ভগিনী মাধবীর কাছে ভিক্ষা চাহিবার অপরাধে একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন। "প্রভু কহে সন্ন্যাসী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ, দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন।" হরিদাস প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াও চৈতন্যের দর্শনলাভে বঞ্চিত হইয়া অবশেষে ত্রিবেণীতে যাইয়া জলে পড়িয়া আত্মহত্যা করেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে কথিত আছে, সহচরদের সঙ্গে কোন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে চৈতন্য সমুদ্রতীরে যাইয়া আকাশে এক মধুর ও করুণ আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং চৈতন্য "ক্ষমা করিলাম" বলিয়াছিলেন। তিনি সহচরদিগকে বলিলেন, "হরিদাসের আত্মা আমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছে।" সে পর্য্যন্ত তাঁহার মৃত্যুসংবাদ কেহ জানিতেন না। পার্ষদগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। চূড়াধারী মাধব যখন তাঁহাদের দলবল লইয়া পুরীতে আসিয়াছিল, তখন চৈতন্য অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন—তাঁহার

পার্ষদগণ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। শৈশবের পর চৈতন্য মেয়েদের সম্বন্ধে অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, "সবে পরস্ত্রী মাত্র নহে উপহাস, স্ত্রী দেখি প্রভু হন একপাশ।" সহজিয়াদের অবলম্বিত স্ত্রীসাধনপদ্ধতি তাঁহার অনুমোদিত ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রেম প্রেম করে লোকে প্রেম জানে কেবা, প্রেম করা কি হয় রমণীর সেবা ? অভেদ পুরুষ নারী যখন জানিবে। তখন প্রেমের তত্ত্ব উদিত হইবে।"

সুতরাং এই সহজিয়া-ধর্ম্ম চৈতন্যের ধর্ম্ম নহে। চৈতন্য মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করিয়া বেড়াইতেন। সহজিয়াদের মধ্যে একদল বাউল বিগ্রহপূজা মানে না, কৃষ্ণের রূপ অগ্রাহ্য করে। একখানি সহজিয়া-পুস্তকে কৃষ্ণবিগ্রহপূজা, কৃষ্ণের বর্ণ এবং রূপ,—এমন কি বৈষ্ণব-শাস্ত্রোক্ত সমস্ত মূল সূত্রগুলি সুস্পষ্টভাবে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। (বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, প্রথম ভাগ, ভূমিকা ।)

কৃষ্ণের রূপ কল্পনা করা পাপ। এমন কি ঈশ্বরে বিশ্বাসও ইহাদের মতে নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং নানা সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ যে সহজিয়া নাম গ্রহণপূর্ব্বক বীরচন্দ্রের কৃপায় বৈষ্ণব-সমাজে প্রবেশ পাইয়া বৌদ্ধ-চিন্তাধারার সঙ্গে হিন্দু তন্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্রের কতকটা যোগস্থাপন-পূর্ব্বক "জয় চৈতন্য, নিত্যানন্দ" দোহাই দিয়া বৈষ্ণব-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। সহজিয়াদের নৈশমিলন যে একাভিপ্রায়ী দলের মিলনের ধারা চালাইয়া রাখিয়াছে—তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি (৩২১ পৃঃ), দুই একখানি পুস্তকে বৌদ্ধ-মতের প্রকাশ্যভাবে দোহাই আছে। "লোকশাস্ত্র করে যারে আনক বারণ। তাহাতে পরমা রতি মন্মথের হয়। মহামুনি নিজ শাস্ত্রে এই মত কয়।" (উজ্জ্বলচন্দ্রিকা দ্রষ্টব্য, মণীন্দ্রনাথ বসু-কৃত পোষ্ট-চৈতন্য বৈষ্ণব-সাহিত্য দেখুন)। এই 'মহামুনি' বুদ্ধ ছাড়া আর কে ? চট্টগ্রামে এখনও 'মহামুনির' মেলা হয়।

বাঙ্গালীর মত বর্ত্তমান জগতে আর একটি জাতি আছে কিনা জানি না, যাঁহারা কোন বিষয়েই চূড়ান্ত না করিয়া ছাড়েন না। যাঁহারা ক্ষুদ্রে সন্তুষ্ট নহেন, বৈষয়িকের গণ্ডী, লোকাচার, ধর্ম্মের অনুশাসন, পারিবারিক বন্ধন যাঁহারা নিমেষের মধ্যে ছিন্ন করিয়া ভূমার উদ্দেশ্যে ছুটিয়া যান। দানের আতিশয্য দেখাইবার জন্য দাতাকর্ণের কল্পনা। অতিথি গৃহে আসিয়াছেন তাঁহার একমাত্র পুত্রকে কাটিয়া সেই মাংস দিয়া অতিথির সৎকার করিতে হইবে। পিতা ও মাতা রাজকুমারকে করাত দিয়া কাটিবেন—অতিথির এই অদ্ভুত আবদার। পুত্রকে কাটিবার সময়ে মাতার এক ফোঁটা জল গণ্ড বাহিয়া পড়িলে আতিথ্য নষ্ট হইবে, মাতা স্বয়ং পুত্রের মাংস রন্ধন করিয়া খাওয়াইবেন। জাতক-গ্রন্থে মাঝে মাঝে এইরূপ উপাখ্যান আছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বাঙ্গলার শত শত লোক বসিয়া এই দানের কথা লিখিয়াছে ও সহস্র সহস্র লোক ইহা শুনিয়াছে। কেহ বলে নাই—এই গল্পে বড় বেশী রকমের বাড়াবাড়ি হইয়াছে, কেহ বলে নাই—অতিথির এই আবদার দুঃসহ। বঙ্গবাসীর চক্ষু তখন এই গল্পের সাংসারিক দিক্‌টার উপর পড়ে নাই। তাহারা এই গল্পে ভূমার আনন্দ লাভ করিয়াছে, ত্যাগের অতুলনীয় মাহাত্ম্যে তাহাদের মন ভরিয়া গিয়াছে। এই দানের আতিশয্য তাহাদের

চোখে পড়ে নাই, অতিথির স্পর্দ্ধার কথা, রাজার নির্ব্বুদ্ধিতার কথা, তাহারা ভাবে নাই। যদি ভাবিতে পারিত, তবে বঙ্গমহিলা সুস্থ—সবলদেহে মৃত স্বামীর পাশে শুইয়া হরিনাম করিতে করিতে পরমানন্দে পুড়িয়া ছাই হইতে পারিত না। কাঞ্চনমালা যে স্বামীর ভালবাসার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিল, সেই স্বামীকে সহজে এই কড়ারে সপত্নীকে দিয়া গেল যে, সে তাঁহাকে আর জীবনে দেখিতে পাইবে না। সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন, যদি তোমার একফোঁটা অশ্রু পড়ে তবে তোমার সাধনা ব্যর্থ হইবে। অন্ধ স্বামী চক্ষু ফিরিয়া পাইবেন, এই আনন্দে সে যে আজ দীন ভিখারিণী অপেক্ষাও হীন হইয়া সর্ব্বস্বহারা হইল—"অন্ধাবন্ধুর" জন্য স্বামীকে ছাড়িয়া রাজকন্যা ভিখারিণী হইল। স্বামীর কাছে সে নিজেকে ভিক্ষাস্বরূপ চাহিয়া লইল। এই সমস্তই আতিশয্য—কল্পনা এই সকল স্থানে পৃথিবী ডিঙ্গাইয়া চলিয়া গিয়াছে—বাঙ্গালী সীতা-সাবিত্রীর সাধনা তুচ্ছ করিয়া উচ্চতর সাধনার ক্ষেত্র আবিষ্কার করিয়াছে। একদিকে কৃত্রিমতার একশেষ, অন্ধসংস্কারের কূপ, আটবৎসর-বয়স্কা রাসমণি দুইহস্ত-পরিমিত ঘোমটা টানিয়া দিয়া তাহার স্বামীর বাড়ীর ঘোটকটিকে দেখিয়া লজ্জায় জড়সড় হইতেছে (রাসমণির আত্মচরিত দ্রষ্টব্য)—অপরদিকে অভিসারিকা বলিতেছে—নগরে ঢাক পিটিয়া ঘোষণা কর যে, আমি প্রণয়ীর প্রেমকলঙ্কসাগরে ডুবিয়াছি, ভালবাসা আমাকে ভয়শূন্য করিয়াছে, আমি তাঁহার নামের কুণ্ডল কানে পরিব; তাঁহার অনুরাগের রক্ত-তিলক ভালে পরিব, তাঁহার কলঙ্ক হার করিয়া গলায় পরিব; "কানু পরিবাদ মনে ছিল সাধ, সফল করিল বিধি", জন্ম জন্ম আমি এই কলঙ্কের জন্য তপস্যা করিয়াছিলাম, আজ বিধাতা আমার মনের সাধ মিটাইয়াছেন। এদেশের একদিকে স্বামীর নাম লইতে ফুলের কুঁড়ির মত লজ্জাশীলার মুখ মুদিত হইয়া পড়ে, অপরদিকে কালী স্বামীর বুকের উপর নৃত্য করিতেছেন এবং রাধা শ্যাম-অঙ্গে পা দিয়া নিদ্রা যাইতেছেন, "নিন্দ যায় চাঁদবদনী শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা।" একদিকে ভক্তি ও প্রেমের বন্যা—গোরা তাঁহার পাগলামীর লীলাস্রোতে জগৎ ভাসাইয়া দিতেছেন, অপরদিকে রঘুনাথ শিরোমণি সূক্ষ্ম ন্যায়ের যে জাল প্রস্তুত করিতেছেন—সেই কূটবুদ্ধির বাগুরায় পড়িয়া জগতের বুদ্ধিমানের শিরোমণিগণ নিষ্কৃতির পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। বাঙ্গালীর চিন্তাধারা এই স্বাধীনতা, এই কেন্দ্রবহির্মুখ এবং কেন্দ্রাভিমুখ গতি উভয়েরই ভূমাকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছে। উভয়ের গতি অবাধ, উভয়েই লৌকিক গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর সাধনার পথে গিয়াছে। এ যেন ঘড়ির পেণ্ডুলম্ দুলিতেছে। (ঘাত-প্রতিঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বাঙ্গালী যে ক্ষেত্র আঁকিয়া দেখাইয়াছে—সেই ক্ষেত্রের কোন গণ্ডীর সীমা সে মানে নাই। উচ্চে উঠিতে তাহার নরদৃষ্টি দেবদৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। অবতরণ করিতে সে কূপ হইতে গভীরতম কূপে নিপতিত হইয়াছে তাহার ভক্তের পা ধরিয়া বসিয়া তাহার ঈশ্বর মানভঞ্জন করিতেছেন। ধর্ম্মজগতে এরূপ দুঃসাহস কোন জাতি করে নাই, তথাপি এই পরিকল্পনার অসত্যের লেশ নাই। পুত্ররূপে, পত্নীরূপে, সখারূপে ভগবান্ তো সর্ব্বদাই আমাদের পা ধরিয়া বসিয়া মান ভাঙ্গাইতেছেন। এই জন্য চণ্ডীদাস বলিতেছেন—আমার ন্যায় সৌভাগ্যবতী জগতে কে আছে—যিনি

স্পর্শমণিস্বরূপ, যাহা স্পর্শ করেন তাহাই সোনা হয়—তিনি—সেই পুরুষের মধ্যে স্পর্শমণিস্বরূপ—"নন্দের কুমার, কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে আমার।" বাঙ্গালী মানুষ চিনিয়া ভগবান্‌কে চিনিয়াছে—পৃথিবীর ফাঁক দিয়া সে স্বর্গ দেখিতে পাইয়াছে, এজন্য সে ভগবান্‌কে দিয়া ভক্তের পায় ধরাইবার পরিকল্পনা করিতে সাহস করিয়াছে।

বাঙ্গলাদেশে সহজিয়াদের লিখিত পুস্তক অসংখ্য। তন্মধ্যে অমৃতরসাবলী, আগমসার, আনন্দভৈরব, অমৃতরত্নাবলী—এই চারিখানি পুস্তক বিশেষ আদৃত। 'বিবর্ত্তবিলাস' মুকুন্দ নামক এক লেখকের রচিত। ইনি নিজেকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের (চৈতন্য-চরিতামৃত-প্রণেতা) শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সহজিয়াদের "সদানন্দগ্রাম" নামক আনন্দসদন—কখনও "সহজপুর" বলিয়া পরিচিত। উহা হিন্দুর বৈকুণ্ঠ, বৌদ্ধের সুখাবতী এবং মুসলমানের বেহস্তের ন্যায় পরিকল্পিত। এই সদানন্দগ্রাম কেবল সাধকদেরই গম্য, নরনারীর মিলনানন্দে উহাকে অধ্যাত্মরাজ্যে পরিণত করা হইয়াছে। বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রের সঙ্গে সহজিয়ারা তাঁহাদের স্বর্গপরিকল্পনার আশ্চর্য্যরূপ মিল রাখিয়াছেন।

সহজিয়া-সাহিত্য।

ষোড়শ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাঠান-বিদ্রোহ

মোগল-পাঠান—"যেন ভুজঙ্গ-নকুল।"

এইবার আমরা মোগল অধ্যায়ের সন্নিহিত হইলাম। দাউদখাঁর পরেও পাঠানেরা তাহাদের দাবি ছাড়ে নাই, সুবিধা পাইলেই বিদ্রোহ করিয়াছে। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে পাঠানেরা কতলু খাঁর নেতৃত্বে উড়িষ্যায় বিদ্রোহী হইয়াছিল,—মোগল সৈন্যেরা বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে সম্যক্ বিধ্বস্ত করিতে পারে নাই। এমন কি ১৫৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার নবাব সাহাবাজ খাঁ কতলু খাঁর সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সন্ধিতে কতলু খাঁ বঙ্গদেশের উপর কোন হাত দিতে পারিবেন না, উড়িষ্যার অধিকার লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন, এই কথা ছিল। আকবর সাহাবাজ খাঁ-কৃত সন্ধিতে সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহার বিশ্বাস হইল, খাঁ সাহেব উৎকোচ-গ্রহণপূর্ব্বক বিদ্রোহীর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিয়াছেন,—সুতরাং সম্রাট্ তাঁহাকে বাঙ্গলার মসনদ হইতে বিচ্যুত করিয়া উজির খাঁ হেরেবীকে তাঁহার স্থানে নিযুক্ত করিলেন; এই শাস্তিই প্রচুর হইল না, বহু অর্থ উৎকোচ-গ্রহণের সন্দেহে সাহাবাজ তিন বৎসর কাল বন্দী হইয়াছিলেন।

১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ বঙ্গের মসনদ পাইয়া কতলু খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে উড়িষ্যা ছাড়াইয়া লইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কতলু খাঁ নিজে উড়িষ্যায় থাকিয়া তাঁহার এক প্রবল দল ধেরপুর (জাহানাবাদ হইতে ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী) নামক গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। মানসিংহের তরুণ পুত্র জগৎসিংহ তখন কতলু খাঁকে বশীভূত করিবার ভার লইয়া আসিয়াছিলেন। পাঠানেরা ধূর্ত্ততা করিয়া সন্ধির প্রস্তাব চালাইতে লাগিল—তাহারা যুবরাজের কাছে আত্মসমর্পণ করিবে এই সন্ধির কথা লইয়া মৈত্রীস্থাপনের চেষ্টা পাইতে লাগিল। কিন্তু ইহা একটি ষড়যন্ত্রমাত্র। কোন প্রকারে দেরী করিয়া স্বদলের পুষ্টি ও শৃঙ্খলাসাধন ছিল ইহাদের উদ্দেশ্য। যুবরাজ সন্ধির কথা বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। এই অবস্থায় অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া তাহারা তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। এই ঘটনায় পাঠানেরা অত্যন্ত উল্লসিত হইল এবং মানসিংহের পরিতাপ ও

মনঃকষ্টের সীমা-পরিসীমা রহিল না, কারণ একথাও জনরব হইয়াছিল যে তাহারা জগৎ-সিংহকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

কিন্তু মোগলদের বরাৎ ভাল। কতলু খাঁ কিছু দিন হইতে অসুস্থ ছিলেন, হঠাৎ (১৫৯০ খৃঃ) তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পুত্রেরা নাবালক ছিল, এবং সৈন্যদিগকে প্রবলপরাক্রান্ত মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতে পারেন, তাহাদের মধ্যে এরূপ কোন নেতা ছিলেন না। পাঠানেরা ভয় পাইয়া জগৎসিংহকে মুক্তি দিল, মানসিংহকে বহু অর্থ ও ১৫০ শত হস্তী উপঢৌকন দিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিল—উড়িষ্যা তাহাদের থাকিবে কিন্তু তাহারা সম্রাটের অধীন হইয়া থাকিবে। উড়িষ্যায় আকবর বাদশাহের নামে মুদ্রা অঙ্কিত হইবে, এতদ্ব্যতীত তাহারা মানসিংহকে পুরীর অধিকার ছাড়িয়া দিল। সন্ধির শেষোক্ত দফায় "বিষ্ণুপদাম্বুজে ভৃঙ্গ" মানসিংহ বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন।

আকবর এই সন্ধিতে বিশেষ সন্তুষ্ট না হইলেও তিনি ইহা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকাল যাইতে না যাইতে পাঠানদের প্রধান মন্ত্রী খাজে ইস্‌সার মৃত্যু হওয়াতে তাহাদের স্বাভাবিক উচ্ছৃঙ্খলবৃত্তি বৃদ্ধি পাইল। তাহারা পবিত্র জগন্নাথ মন্দির অধিকার করিয়া লুণ্ঠন করিল। মানসিংহ পুনরায় রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। মোগলেরা একটা যুদ্ধের পরই পাঠানদিগকে বিধ্বস্ত করিল। এবারও তাহারা সন্ধির প্রস্তাব করিল, সন্ধিতে উড়িষ্যা পুনরায় মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। পাঠান-নেতৃগণ কতক জায়গীর পাইলেন, কিন্তু উড়িষ্যার রাজস্ব মোগল সম্রাটের প্রাপ্য হইল (১৫৯২ খৃঃ), কিন্তু পরবৎসরই পাঠান জায়গীরদারগণ পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া বঙ্গদেশে লুটপাট চালাইতে লাগিল। তাহারা রাজার প্রধান বন্দর লুণ্ঠন করিল। পুনরায় মানসিংহ তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। তাহারা অতিশয় দৈন্যের সহিত বশ্যতা স্বীকার করিল। রাজা তাহাদিগকে একেবারে নিরাশ করা অবিবেচনার কাজ মনে করিয়া জায়গীরগুলির অধিকার প্রত্যর্পণ করিলেন।

কতলু খাঁ ও ওসমান।

কিন্তু মানসিংহ বাঙ্গলা ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার পর, কতলু খাঁর পুত্র ওসমান বিদ্রোহী হইলেন। তিনি বাঙ্গলাদেশে লুটপাট আরম্ভ করিয়া দিলেন, মোহন সিংহ ও প্রতাপ সিংহ নামক মোগল পক্ষের সেনানায়কদ্বয় ঘোর যুদ্ধ করিয়া ওসমান খাঁর হস্তে মেওারক নামক স্থানে পরাস্ত হন। মোগলরাজ-ভাণ্ডারের প্রধান আয়ব্যয়ের হিসাবরক্ষক আব্দুল রজ্জককে পাঠানেরা বন্দী করিয়া লইয়া যায়। এই ঘটনায় বঙ্গদেশ কিছুকালের জন্য ওসমান খাঁর অধিকারে আসে এবং পাঠান-শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় (১৬০০ খৃঃ)।

সুতরাং রাজা মানসিংহকে সম্রাটের আদেশে পুনরায় বঙ্গদেশে পাঠান-দলন-কার্য্যের ভার লইয়া আসিতে হয়। শ্রীপুর অত্রয় নামক স্থানে পাঠানেরা বিপুল ক্ষতির সহিত পরাভূত হয়। আব্দুল রজ্জককে তাহারা লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া আসিয়াছিল। তিনি যে হাতীর পিঠে ছিলেন, তথায় এক দুর্দান্ত ভীষণদর্শন পাঠান মুক্তকৃপাণ-সহ তাঁহার রক্ষকের কাজ

আব্দুল রজ্জকের মুক্তি।

ক রতেছিল, তাহার উপর আদেশ ছিল, মোগলেরা জয়ী হইলে তৎক্ষণাৎ যেন তাঁহার মুণ্ড কাটিয়া ফেলে। কিন্তু দৈবক্রমে মোগলদের এক গোলা আসিয়া রক্ষকের শরীরে পড়ে, সে তখনই নিহত হয়। মোগলেরা শৃঙ্খলিত রক্ষককে মানসিংহের হস্তে অর্পণ করেন, তিনি তাঁহার শৃঙ্খল মোচন করিয়া সানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন।

এই ঘটনার পর পাঠানদের সকল আশা প্রায় নির্ম্মূল হইয়া গেল—তাহারা পালাইয়া উড়িষ্যায় যাইয়া আর কোন সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কিন্তু ইসলাম খাঁ যখন বাঙ্গলার নবাব হন, তখন পাঠানেরা পুনরায় মাথা তুলিয়া বিদ্রোহী হইল। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে ওসমান খাঁ বহুকষ্টে ২০,০০০ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নিজেকে খুব প্রবল ব্যক্তি মনে করিলেন। ৬০০ বৎসর যাবৎ পাঠানেরা ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছেন, আগন্তুক মোগল-শাসন তাঁহাদের নিকট দুঃসহ বোধ হইয়াছিল। এই বিদ্রোহের আভাস পাইয়া নবাব ইসলাম খাঁ পাঠান-নেতা ওসমানের নিকট দূত পাঠাইয়া অনেক মিষ্ট ও হিতকর বাক্যদ্বারা তাঁহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু অন্য কোন জাতি হইলে হয়ত তাঁহার এই শুভার্থক চেষ্টা সফল হইত, কিন্তু পাঠান বড় দুর্দ্দান্ত জাতি, তাহারা লেখনী বা দাঁড়িপাল্লা অথবা লাঙ্গল, ইহার কোনটিই ধরিতে প্রস্তুত নহে,—তাহাদের একমাত্র অবলম্বন মুক্ত তরবারি। ওসমান সন্ধির প্রস্তাবে কাণ দিলেন না। নবাব ইসলাম খাঁ, সুজাত খাঁকে ওসমানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। সুবর্ণরেখার তীরে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে ওসমানের অপূর্ব্ব সাহস ও বীরত্ব মোগলদিগকে বিস্মিত করিয়াছিল। বহু মোগল সেনাপতি ও ওমরা এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া গোলাগুলির মত ক্ষিপ্রকারিতার সঙ্গে পাঠান নবাব-পুত্র মোগলদিগকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। এক সময়ে মোগলসেনাপতি সুজাত খাঁর প্রাণ-সংশয় হইয়াছিল। কিন্তু পরিণামে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার বরপুত্র আকবরের পক্ষপাতী হইলেন; অপরিমিত স্থূলদেহ ওসমানের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর সেই রাত্রিতেই তাঁহার বীরদেহ পৃথিবীতে পড়িয়া রহিল, আর মুক্ত আত্মা তাঁহার কাম্য স্বাধীন রাজ্যে মহাপ্রয়াণ করিল (১৬১২ খৃঃ)। তাঁহার মৃত্যুর পর ভেলি এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুমরিজ সুজাত খাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করিল, তাহাদের অবশিষ্ট সম্পত্তি—৪৯টি হাতী এবং কিছু মণিমাণিক্য—সকলই মোগল সেনাপতির নিকট উপস্থিত করা হইল এবং মোগল সম্রাটের অধীন হইয়া তাহারা তাঁহারই উপর জীবিকানির্ব্বাহের ভার দিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

ওসমানের অপূর্ব্ব সাহস ও মৃত্যু, ১৬১২ খৃঃ।

বঙ্গদেশে এই ১৬১২ খৃষ্টাব্দ স্মরণীয়—এই বৎসরে পাঠান-শক্তির শেষ আশা নির্মূল হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙ্গলার বিদ্রোহিগণ

কিন্তু পাঠান নবাব ও তাঁহার বংশধরেরাই শুধু মোগল সম্রাটের বিদ্রোহিতা করে নাই। বঙ্গদেশ পাঠানযুগে একরূপ স্বাধীন ছিল, বাঙ্গলার নৃপতিরা কেহবা শুধু মুখে, কেহবা নামমাত্র, পাঠান বাদশাহের বশ্যতা জানাইলে—তাঁহারা স্বাধীন থাকিতেন। তাঁহারা নিজের নিজের রাজ্যে দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা থাকিতেন। পাঠান আমলে বঙ্গের সিংহাসন লইয়া পরস্পরের মধ্যে যেরূপ হত্যাকাণ্ড ও কাড়াকাড়ি চলিয়াছিল, তাহাতে দেশটা অনেক পরিমাণে হিন্দুর হাতেই পড়িয়াছিল। অবশ্য এক এক সময়ে রাষ্ট্রবিপ্লবের ঝড় দেশে বহিয়া যাইত, তখন দেব-মন্দির ও বিগ্রহ ভাঙ্গার ধুম পড়িয়া যাইত, এবং যাহারা ঝড়ের মুখে পড়িত, তাহারা মরিত। কিন্তু মোগল সম্রাট্ সমস্ত দেশটি আত্মসাৎ করিতে চাহিলেন, তোদরমল্লকে পাঠাইয়া সমস্ত দেশ জরিপ করিয়া রাজস্বের হার স্থির করিয়া দিলেন, পাঠানদের ও অনেক হিন্দুর জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিলেন, এমন কি পাঠানদের হাত হইতে যে সকল জায়গীর দখল করিয়া মোগলদিগকে দিলেন, তাঁহাদিগকে তাহা নিরুদ্বেগে ভোগ করিতে দিলেন না,—তাঁহাদিগকে রীতিমত রাজস্ব দিতে হইত এবং অন্যান্য কঠোর নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সেই জায়গীর ভোগ করিতে হইত। কোথায় জঙ্গল-বাড়ীতে ক্ষুদ্র ভৌমিক ইশা খাঁ, শ্রীপুরে কেদার রায়, যশোহরে প্রতাপাদিত্য—কে কি করিতেছে, আকবর তাহার সন্ধান লইতেন। পাঠান শক্তি প্রবল ঝড়ের ন্যায় উচ্চ বৃক্ষগুলি ভাঙ্গিয়া চলিত, কিন্তু মোগল সম্রাটের চক্ষুতে সেরূপ পাহাড়-পর্ব্বত পড়িত, দূর্ব্বাঘাস ও তৃণগুল্মও সেইরূপ তাঁহার শ্যেন-দৃষ্টি এড়াইত না। পাঠান রাজাদের দৃষ্টি ছিল ক্ষুদ্র বাঙ্গলার মসনদের উপর, দিল্লীশ্বরগণের অনেকেই দুর্ব্বল ছিলেন, সুতরাং বাঙ্গলার বাদশাহের ক্ষমতা তাঁহারা প্রায়ই লোপ করিতেন না। কিন্তু এবার বাঙ্গলায় প্রকৃত স্বাধীনতার সমর আরম্ভ হইল। বৃহত্তর বাঙ্গলার সঙ্গে দিল্লীর লড়াই নূতন কথা নহে। চিরকাল বাঙ্গলাদেশ দিল্লীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আসিয়াছে। সেই ইতিহাস-পূর্ব্বযুগে জরাসন্ধ, পৌণ্ড্র বাসুদেব, ভগদত্ত, বাণ, মুর, নরক প্রভৃতির সময় হইতে বাঙ্গলাদেশ দিল্লীর সম্রাটের সার্ব্বভৌমত্ব সহ্য করিতে পারে নাই। নন্দবংশের সময় হইতে বৃহত্তর বাঙ্গলা জয়ী হইল—ইন্দ্রপ্রস্থ আড়ালে পড়িল! যুগ যুগ ধরিয়া মগধ ভারতবর্ষের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিল। তারপর গুপ্তগণ পূর্ব্বাঞ্চলের সমৃদ্ধি নানাদিকে বাড়াইয়া দিলেন, গুপ্তদের শেষকালে রাজলক্ষ্মী মগধ ছাড়িয়া খাস গৌড়ে আসিলেন। পালেরা খাস বাঙ্গলার রাজা। তখন ইন্দ্রপ্রস্থ নিবিয়া গিয়াছে, তথাপি পশ্চিম-ভারতের সহিত বাঙ্গলার বিরোধ থামে নাই, বঙ্গরাজকে প্রতারণা করিয়া কাশ্মীরাধিপতি নিধন করিলেন, বঙ্গসৈন্য পরিহাস-কেশবের মন্দির ভাঙ্গিবার জন্য যে অদম্য সাহস ও আত্মোৎসর্গ দেখাইয়াছিল তাহা কলহণ কবি নানা উপমাখচিত করিয়া স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

পাঠান ও মোগল রাজত্ব।

বাঙ্গলার রাজা শশাঙ্ক কনোজাধিপ রাজ্যবর্দ্ধনকে প্রতারণা করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন—এই দুর্নাম আছে। প্রাচ্য ভারতের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থ ও তৎসন্নিহিত প্রদেশগুলির সংঘর্ষ নূতন নহে। বাঙ্গলাদেশ শ্রীকৃষ্ণকে স্বীকার করে নাই, রৈবতকে যাইয়া তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল। বৃহত্তর বাঙ্গলার জরাসন্ধের ভয়ে তিনি স্বদেশত্যাগী হইয়া সমুদ্রের তীরে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর রাজকীয় রক্তে দিল্লীর বিদ্বেষ নিহিত ছিল। পাঠানদের সময়ে যে স্বাধীনতা তাঁহাদের লুপ্ত হয় নাই, এবার মোগলদের সাম্রাজ্য-বৃদ্ধির আওতায় তাহা বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইল।

এই বিদ্রোহীদের প্রথম নাম করিব—ইশা খাঁ মসনদ আলির।

অযোধ্যাতে বাইশওয়ার পরগনায় ভগীরথ নামক এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। ইনি দিল্লীশ্বরের সামন্ত রাজা এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ভগীরথ বঙ্গদেশে তীর্থদর্শনে আসিয়া সুলতান গিয়াসুদ্দিনের সঙ্গে প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হন এবং অবশেষে সুলতানের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশে থাকিয়া যান। ভগীরথের বংশে কালিদাস জন্মগ্রহণ করেন; ইনি অতি পণ্ডিত, নিষ্ঠাবান্ ও প্রিয়দর্শন পুরুষ ছিলেন। কথিত আছে প্রত্যহই ইনি একটি ছোট সোণার হাতী নির্ম্মাণ করিয়া তাহা ভাগ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতেন। এজন্য তিনি "কালিদাস গজদানী" নামে খ্যাত হন। কাহারও কাহারও মতে সুলতান জালালউদ্দিনের তৃতীয় কন্যা মমিনা খাতুন,—কাহারও মতে হুসেন সাহের এক কন্যা—কালিদাসের গঙ্গাস্নাত সুন্দর গৌর বপু ও সুদর্শন মুখচোখ দেখিয়া যাচিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু কালিদাস সুলতানের কন্যার কাছে যে উত্তর লিখেন, তাহাতে অনেক সদুপদেশ ছিল—এবং তাহার শেষ কথা ছিল—কুমারীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান। ক্রুদ্ধ ও অবমানিত হইয়া রাজকুমারী কৌশল-ক্রমে তাঁহাকে গোমাংস খাওয়াইয়া তাঁহার জাতি নষ্ট করেন। অনন্যোপায় হইয়া কালিদাস গজদানী ইসলামধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক মমিনা খাতুনকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন। ইঁহার মুসলমানী নাম হইল—সোলেমান খাঁ। কয়েকজন মুসলমান পল্লীগীতিকার এই ভালবাসার ব্যাপার বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—কিন্তু অপর কয়েকজন ঐতিহাসিকের মতে মুসলমান মমিনগণের জ্ঞানগর্ভ উপদেশে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইসলামধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। দেওয়ান পরিবারের ইতিহাসে এই সকল কথা লিপিবদ্ধ আছে। আইন-ই-আকবরীর মতে সোলেমানের দুই পুত্র ইসমাইল ও ইশা খাঁ,—সোলেমান তাজ খাঁ এবং সালিম খাঁ কর্ত্তৃক নিহত হওয়ার পর—দাসবৎ পারস্যদেশে প্রেরিত হন। তাঁহারা তাঁহাদের এক খুল্লতাতকর্ত্তৃক পুনরায় বঙ্গদেশে আনীত হইয়া ক্রমে ক্রমে ভাটী অঞ্চলের অধিপতি হন। ইশা খাঁ তরুণ যৌবনে ত্রিপুরেশ্বর অমর মাণিক্যের সেনাপতিগণের তালিকাভুক্ত হইয়া শ্রীহট্টের (তরপের) রাজা ফতে খাঁর বিরুদ্ধে যুবরাজ রাজাধরের সঙ্গে অভিযান করেন। ত্রিপুরেশ্বরকে সহায়তা করিয়া ইনি মোগল সেনাপতি সাহবাজ খাঁকে পরাস্ত করেন। তখন ত্রিপুরার সরাইল পরগনার মালিক হইয়া ইনি অমর মাণিক্যের রাজ্ঞীকে মাতৃসম্বোধন

করিয়া রাজপরিবারে প্রতিষ্ঠা ও আদর লাভ করেন। যখন অমর মাণিক্য চৌদ্দগ্রামে বিখ্যাত অমরসাগর দীঘি কাটাইতেছিলেন, তখন (১৫৮২ খৃঃ) ইশা খাঁ তাঁহাকে সরাইল হইতে এক হাজার মজুর পাঠাইয়া সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজকুমার রাজ্যধরের সরাইল পরগনায় শিকারযোগ্য পশুপক্ষি-বহুল অরণ্য দেখিয়া ঐ স্থানের উপর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে। এদিকে সাহবাজ খাঁ পরাস্ত হইয়া প্রতিশোধে কৃতসঙ্কল্প হন—তখন সরাইল পরগনায় থাকিতে না পারিয়া সাহবাজের বিরুদ্ধে সৈন্যসংগ্রহাদি ও যুদ্ধোদ্যোগ করিবার জন্য ইশা খাঁ কোন নিভৃত অরণ্য-সংরক্ষিত স্থান খুঁজিতে থাকেন। অমর মাণিক্য তাঁহার রাজ্ঞীর অনুরোধে ইশা খাঁকে 'মসনদ আলি' উপাধি এবং ৫০,০০০ সৈন্য দিয়াছিলেন। উপাধিটি দিল্লীশ্বর-প্রদত্ত নহে—আবুল ফজল ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। রাজমালায় ইহার উল্লেখ আছে। ইশা খাঁ সহসা একরাত্রে একটা তুফানের মত ময়মনসিংহে কিশোর গঞ্জের অন্তর্গত কোচ রাজাদের রাজধানী জঙ্গলবাড়ীতে হানা দেন (১৫৮৫ খৃঃ)। উক্ত স্থানে লক্ষ্মণ হাজরা ও রাম হাজরা ভ্রাতৃদ্বয় রাজত্ব করিতেছিলেন। অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া তাঁহারা রাত্রির অন্ধকারে পলায়নপর হন। তদবধি জঙ্গলবাড়ী ইশা খাঁর অধিকৃত হয়। ইশা খাঁ জঙ্গলবাড়ী দখল করিয়া ক্রমে ক্রমে ২২টি পরগনা (সেরপুর, জোয়ানসাহী, আলপসিংহ, জোয়ানসাই, নসির-উজিয়াল, হুসেন সাহ, ভাওয়াল, মহেশ্বরদি, কটরার, কুড়িখাই, সিন্দ, হাজরাদি, দরজিবাবু, গোয়ের ও হুসেনপুর প্রভৃতি) অধিকার করেন ও নানাস্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া প্রকাশ্যভাবে দিল্লীশ্বরের বিদ্রোহিতা করেন। তিনি রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দেন। এগার সিন্দুরের দুর্গ ইঁহার অজেয় নিরাপদ্ নিবাস ছিল। আবুল ফজল লিখিয়াছেন, ইনি সমস্ত ভাটি অঞ্চলের রাজা হইয়াছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মতে ইনি ঘোড়াঘাট হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। ১৫৮৩ খৃঃ অব্দে সাহবাজ খাঁ ইশা খাঁর বক্তিয়ারপুরের রাজপ্রাসাদ ধ্বংস করেন। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে ইশা খাঁ মানসিংহের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া কতকগুলি কামান প্রস্তুত করেন, তন্মধ্যে ৩টি পাওয়া গিয়াছে। তাহার একটিতে "সরকার শ্রীযুত ইশা খাঁ, মসনদালি ১০০২" উৎকীর্ণ আছে। ১০০২ বাং সনে অর্থাৎ ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে মানসিংহ আসিয়া ইশা খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। যদিও ইশা খাঁ অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন, তথাপি সম্রাট্-বাহিনীর সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া প্রথমতঃ বুকাই নগরে পরাস্ত হইয়া সেরপুর গড়জরিপা অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেরপুর হইতে দেওয়ানবাগ—তথা হইতে মুড়াপাড়া এইরূপে এক দুর্গ হইতে ক্রমাগত তাড়িত হইয়া দুর্গান্তরে উপস্থিত হন। এখানে পরিশেষে মানসিংহ চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন। দিল্লীশ্বর তাঁহার বিক্রম ও সাহসে, তদধিক আত্মসমর্পণে প্রীত হইয়া তাঁহার সমুচিত আতিথ্য করেন, এবং সম্মানিত করিয়া তাঁহাকে রাজধানী জঙ্গলবাড়ীতে প্রেরণ করেন। এই আখ্যায়িকা বহু প্রাচীন পল্লীগীতিকায় স্থান পাইয়াছে। ইশা খাঁর বংশধরেরা দেওয়ান ভগীরথ—তৎপরে দেওয়ান কালিদাস

১৫৮২ খৃঃ।

১৫৮৫ খৃঃ জঙ্গলবাড়ী।

গঙ্গদানীর উপাধি-অনুসারে জঙ্গলবাড়ীর 'দেওয়ান পরিবার' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন। শ্রীপুরের ভুঞা কেদার রায়ের ভগিনী সোনামণি (অপর নাম সুভদ্রা) স্বেচ্ছায় ইশা খাঁকে আত্মদান করিয়া শ্রীপুর হইতে পলায়ন করিয়া ইশা খাঁর অঙ্কশায়িনী হন। বঙ্গবিশ্রুত এই ঘটনাসম্বন্ধে অনেক পল্লীগাথা আছে। মৎসম্পাদিত পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকার দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা ইশা খাঁ, তাঁহার যুদ্ধবিগ্রহ, প্রণয়কাহিনী, সোণামণির দুই পুত্র আরাম-বিরামের কথা—ইত্যাদির বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। করিমুল্লার হস্তে কেদার রায়ের মৃত্যু ও শ্রীপুর-ধ্বংসের বৃত্তান্তও তথায় বিবৃত হইয়াছে। ইশা খাঁর বংশধর বলিয়া যাঁহারা দাবী করিয়া থাকেন—তাঁহাদের সংখ্যা অগণ্য। কথিত আছে হয়বৎপুরের দেওয়ানেরা সোণামণির সন্তানের কুলোদ্ভব। এই দেওয়ান পরিবারের সোলেমানকে দাউদ খাঁর সহোদর প্রতিপন্ন করিয়া বঙ্গের নবাবের সঙ্গে তাঁহাদের রক্তসম্বন্ধ প্রমাণ করিতে যে চেষ্টা পাইয়াছেন, ঐতিহাসিক প্রমাণাভাবে তাহা অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় বিদ্রোহী যশোরের প্রতাপাদিত্য। ইঁহার পিতা বিক্রমাদিত্য এবং খুল্লতাত বসন্ত রায় পাঠান বাদশাহ দাউদ খাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃৎ ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। বঙ্গদেশের শাসনসংক্রান্ত ও রাজস্বের হিসাবপত্রের সমস্ত কাগজপত্র ইঁহাদের হস্তে ছিল। সুতরাং দাউদের মৃত্যুর পর বঙ্গাধিপ রাজা তোদরমল্ল ইঁহাদিগের অনুসন্ধান করেন। ইঁহারা মোগলদিগের বশ্যতা স্বীকার করায় তোদরমল্ল ইঁহাদিগকে বিস্তৃত ভূমির অধিকার প্রদান করিয়া বিক্রমাদিত্যকে মহারাজা উপাধি প্রদান করেন। যশোরে মহারাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র প্রতাপাদিত্য জন্মগ্রহণের পর রাজজ্যোতিষী গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন—"ইনি পিতৃহন্তা হইবেন।" বিক্রমাদিত্য এই ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করিয়া ইঁহাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এরূপ কিংবদন্তী আছে। কিন্তু খুল্লতাত বসন্ত রায় শিশুর প্রতি কোন অত্যাচার হইতে দেন নাই। তিনিই পিতার অধিক বাৎসল্য দেখাইয়া প্রতাপাদিত্যকে লালনপালন করিয়াছিলেন। বসন্ত রায় স্বয়ং সুদক্ষ বীরপুরুষ ছিলেন, তাঁহার 'গঙ্গাজল' নামক এক সুবৃহৎ খড়্গ ছিল। তিনি বালক প্রতাপাদিত্যের রণশিক্ষার গুরু। কৈশোর অতিক্রম করিয়া প্রতাপাদিত্য দুই বৎসর কাল আগ্রায় অতিবাহিত করেন, তথায় তিনি মোগল সম্রাটের সভা, রাজনীতি, সৈন্যব্যূহ—এ সকল দেখিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করেন। যৌবনে তিনি নাগবংশীয়া শরৎকুমারী নাম্নী এক

প্রতাপাদিত্য।

পরমা সুন্দরী ও গুণবতী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বিক্রমাদিত্য মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার রাজ্যের দশ আনা প্রতাপাদিত্যকে ও ছয় আনা বসন্ত রায়কে ও তাঁহার পুত্রগণকে প্রদান করিয়া যান। প্রতাপাদিত্যের ক্ষমতা-লিপ্সা ও দুর্দ্দান্ত চরিত্র স্মরণ করিয়া বসন্ত রায় এই অসম রাজ্যবিভাগে বরং সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে প্রতাপাদিত্য কতলু খাঁর পক্ষ হইয়া মোগলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু মানসিংহ বঙ্গাধিপ হইয়া আসিলে তিনি মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি ক্রমাগত সৈন্যবৃদ্ধি ও দুর্গাদি রচনা করিয়া উত্তরকালে

মোগলশক্তি নির্ম্মূল করিয়া সমস্ত বাঙ্গলাদেশে স্বাধীন রাজা হইবার কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী কোথায় ছিল—ইহা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। কেহ বলেন সাগর-দ্বীপ, কেহ বলেন ঈশ্বরপুরের নিকটে, কেহ বা বলেন চ্যাণ্ডিকানে। কিন্তু সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় অনেক অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ধূমঘাটেই প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল। পর্ত্তুগীজগণ যাহাকে চ্যাণ্ডিকান বলিয়াছেন, আমার মনে হয় তাহা সাগরদ্বীপের সন্নিহিত স্থানগুলির প্রাচীন নাম—চণ্ডিকানগর—হইতে পারে। প্রতাপাদিত্যের বহু দুর্গের মধ্যে ১৪টি প্রধান দুর্গ ছিল—(১) যশোর দুর্গ, (২) ধূমঘাট দুর্গ, (৩) রায়গড় দুর্গ, (৪) কমলপুর দুর্গ, (৫) বেদকাশী দুর্গ, (৬) শিবসাহ দুর্গ, (৭) প্রতাপনগরের দুর্গ, (৮) শালিখা দুর্গ, (৯) মাতলা দুর্গ, (১০) হায়দার গড়, (১১) আড়াইকাকী দুর্গ, (১২) মণিদুর্গ, (১৩) রামমঙ্গল দুর্গ, (১৪) চকশ্রী বা চাকশ্রী দুর্গ। কথিত আছে বর্ত্তমান কলিকাতার নিকটে প্রতাপাদিত্যের ৭টি দুর্গ ছিল—যথা, মাতলা, রায়গড়, টালা, বেহালা, শালখিয়া, চিৎপুর, মূলাজোড়। প্রতাপাদিত্য জাহাজনির্ম্মাণের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহার নৌবহরের জন্য সুন্দরী কাঠের অনেক জাহাজ ও রণতরী নির্ম্মিত হইত। কোন কোন নৌকার ৬৪টি বা তদধিক দাঁড় ছিল এবং অনেক তরীতেই কামান থাকিত। তাঁহার নৌকা, রণতরী ও জাহাজের অনেক নাম ছিল, এখনও তাহাদের কতক নাম বাঙ্গলা দেশে প্রচলিত আছে। যশোরে প্রতাপাদিত্যের নৌবহরে 'পিয়ারা', 'মহলগিরি', 'ঘুরাব', 'পাল', 'মাচোয়া', 'পশত', 'ডিঙ্গি,' 'গছাড়ি', 'বালাম', 'পলওয়ার', 'কোচা' প্রভৃতি অনেক শ্রেণীর তরী ছিল। প্রতাপাদিত্যের সময়ে যশোরের কারিগরেরা জাহাজ-নির্ম্মাণে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিল। তাহার ফলে সায়েস্তা খাঁ অনেক জাহাজ যশোর হইতে প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিলেন। (যশোর-খুলনার ইতিহাস, ১১১ পৃষ্ঠা।) প্রতাপের উৎকৃষ্ট যুদ্ধ-জাহাজের সংখ্যা ১০,০০০-এর উপরে ছিল এবং অন্যান্য পোতের সংখ্যাও দ্বিসহস্র কিংবা তদধিক ছিল। জাহাজঘাটা এখনও নামে মাত্র বর্ত্তমান। আবদুল লতিফের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে জানা যায়—"প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধের উপকরণ শত শত তরীতে বোঝাই থাকিত।" এই রণতরীগুলি প্রথম বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর অধীন ছিল, কিন্তু পরে পর্ত্তুগীজ ফ্রেডারিক ডুড়লীই এই কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হন। প্রতাপের সৈন্য (১) ঢালী, (২) অশ্বারোহী, (৩) তীরন্দাজ, (৪) গোলন্দাজ, (৫) নৌসৈন্য, (৬) গুপ্তসৈন্য, (৭) রক্কিসৈন্য, (৮) হস্তিসৈন্য—এই আট বিভাগে বিভক্ত ছিল। ঢালী সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন কালিদাস রায় মদন মল্ল ("যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী"—ভারতচন্দ্র)। অশ্বারোহী সৈন্যের প্রধান অধ্যক্ষ প্রতাপসিংহ দত্ত, সহকারী মহিউদ্দিন ও নুরউল্লা। তীরন্দাজের অধ্যক্ষ সুন্দর ও ধুলিয়ান বেগ। নৌবহরের অধ্যক্ষ অগষ্টাস পেড্রো। বিপক্ষদের গতিবিধির গুপ্ত সংবাদ লইবার জন্য যে গুপ্তসৈন্য সৃষ্ট হইয়াছিল তাহার অধ্যক্ষ ছিল 'সুখা' নামক এক অসমসাহসী বীর ("গুপ্তসেনাপতিশ্চাপি সুখাখ্যো ভীম-বিক্রমঃ"—ঘটককারিকা)। কুকীসেনাদের অধ্যক্ষের নাম রঘু। "ষোড়শ হলকা হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাতী, বায়ান্ন হাজার যাঁর ঢালী"—প্রতাপাদিত্যের সৈন্যসংখ্যার এই নির্দ্দেশ ভারতচন্দ্র

করিয়াছেন। পূর্ত্তবিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন জগৎসহায় দত্ত। প্রতাপাদিত্যের বহু কামান ও গোলার নিদর্শন এখনও যশোরে দৃষ্ট হয়। চব্বিশ পরগনার অধিকাংশ এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী সুন্দরবনের সমৃদ্ধিশালী বহু নগর ও পল্লী এবং পূর্ব্ববঙ্গের কতকাংশ লইয়া প্রতাপাদিত্যের রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার সৈন্যদের মধ্যে অসন্তুষ্ট ও পরাজিত পাঠান সৈন্য, পর্ত্তুগীজ ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরার কুকী সৈন্য বিস্তর ছিল; বাঙ্গালী রায়-বেঁশে ও ঢালী সৈন্যগণ অতীব দুর্দ্ধর্ষ ছিল। কতলু খাঁর পুত্র জমাল খাঁ তাঁহার অন্যতম সেনাপতি ছিলেন।

মানসিংহের সময়ে হিন্দু রাজার অমায়িক ব্যবহারে প্রতাপাদিত্য কিছুকাল পোষ মানিয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি ইস্‌লাম খাঁর শাসনকালে পুনঃ পুনঃ তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে লাগিলেন। মূল কথা তাঁহার একান্ত অনুরক্ত বন্ধু শঙ্কর চক্রবর্ত্তী এবং মহাবলশালী সূর্য্যকান্ত গুহ (সূর্য্যকান্তো মহাশূরো গুহবংশ্যো ভূসত্তমঃ) এই দুইজনে মিলিয়া পাঠানাধিকারের পরে দেশে হিন্দুরাজত্ব ফিরাইয়া আনিতে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তাঁহার সৈন্যবল এবং প্রতাপ ছিল—এবং তিনি নিজে যেরূপ বীরবিক্রম ছিলেন, তাহাতে এইরূপ আশা করা অসম্ভব ছিল না। কমল (সম্ভবতঃ কামাল) নামক এক বিশ্বস্ত অতি দুর্দ্দান্ত রণদক্ষ খোজা তাঁহার এই আশার এক প্রধান অবলম্বন ছিলেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে এবং তৎসঙ্গে বাঙ্গালী চরিত্রের কতকগুলি লক্ষণ মিলাইয়া দেখিলে কেন যে তিনি হারিয়া গেলেন তাহা বুঝা যাইবে।

তিনি তান্ত্রিকভাবে শক্তির উপাসনা করিতেন, এজন্য মদ্যপায়ী ছিলেন। তাঁহার ক্রোধ হইলে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকিত না। তিনি খুল্লতাত বসন্ত রায়কে হত্যা করেন। যে ভাবে এই হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়, তাহাতে তাঁহার খুব দোষ দেওয়া যায় না। বসন্ত রায়ের পুত্র গোবিন্দ প্রথমতঃ তাঁহার প্রতি তীর বর্ষণ করে এবং তিনি তৎক্ষণাৎ খড়্গাঘাতে তাহাকে নিহত করেন। শ্রাদ্ধকার্য্যে উপবিষ্ট বসন্ত রায় ভৃত্যকে "গঙ্গাজল" আনিতে বলেন; প্রতাপ বুঝিলেন, পুত্রহত্যার প্রতিশোধার্থ বসন্ত রায় তাঁহার প্রসিদ্ধ 'গঙ্গাজল' নামক খড়্গ আনিতে আদেশ করিলেন; তখনই পিতা হইতে অধিক স্নেহে যিনি তাঁহাকে লালনপালন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহাকে নির্ম্মমভাবে বধ করিলেন (১৫৯৫ খৃঃ)। ক্রোধের সময়ে তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান থাকিত না। তাঁহার সদ্যোবিবাহিত জামাতা বাক্‌লার অধিপতি তরুণবয়স্ক রামচন্দ্রকে তিনি হত্যা করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের সঙ্গে 'রামাই ঢঙ্গী' নামক এক ভাঁড় আসিয়াছিল। বিবাহ-উৎসবে সে তাহার ভাঁড়ামী দেখাইয়া খুব 'বাহবা' পাইয়াছিল। কিন্তু সে স্ত্রীলোকের বেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রমণীমহলে ভাঁড়ামী করিতে থাকে। কিন্তু অবিলম্বে তাহার রমণীর ছদ্মবেশ ধরা পড়ে এবং মহারাণী শরৎকুমারী একথা প্রতাপাদিত্যকে জানান। ক্রোধে আত্মহারা হইয়া প্রতাপাদিত্য রামাই ঢঙ্গী এবং তৎসঙ্গে জামাইকে কাটিয়া ফেলিতে হুকুম দেন। হয়ত মুহূর্ত্ত পরে ক্রোধ থামিয়া যাইত এবং জামাইকে তিনি

বসন্ত রায়ের হত্যা।

নির্দ্দোষ জানিয়া লজ্জিত হইলেন, কিন্তু ভীত হইয়া বাড়ীর সকলের পরামর্শে সেই রাত্রেই রামচন্দ্র ৬৪ দাঁড়যুক্ত এবং কামান দ্বারা সুরক্ষিত নৌকাযোগে পলায়ন করেন। রাজকুমারী পরমা সাধ্বী বিমলা অবশ্য শেষে বাক্‌লার অন্তঃপুরে তাঁহার স্বীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্বশুর-জামাই যেন 'ভুজঙ্গ-নকুল' হইয়া চিরকাল শত্রু হইয়া রহিলেন। বসন্ত রায় ও তাঁহার পুত্রের নিধন এবং স্বীয় জামাতার প্রতি ঈদৃশ ব্যবহারে তিনি জনসমাজের শ্রদ্ধা হারাইলেন। এই সকল পাপ ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনামূলক, সুতরাং ক্ষমার্হ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তিনি যেভাবে সন্দ্বীপের অধিপতি কার্ভালোকে হত্যা করিয়াছিলেন তাহা কোন ক্রমেই ক্ষমা করা যাইতে পারে না। আরাকানের রাজাকে তাঁহার চিরশত্রু কার্ভালোর মুণ্ড উপহার দিতে পারিলে মগরাজার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপিত হইবে এবং মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহে তাঁহার আনুকূল্য পাইবেন, এই ছিল তাঁহার অভিসন্ধি। আরাকানাধিপের সঙ্গে ষড়যন্ত্র দৃঢ়ীভূত করিয়া তিনি অতিশয় অন্তরঙ্গভাবে তাঁহার বাহ্য সরল ব্যবহারে ও মৈত্রীর প্রস্তাবে পর্ত্তুগীজ বীরকে মুগ্ধ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে লইয়া আসিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন। ভুজারিকের বিবরণীতে এই ঘটনার সবিস্তার উল্লেখ আছে। আত্মীয়ভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া এইরূপ আতিথ্য বঙ্গেশ্বর শশাঙ্ক একবার কান্যকুব্জাধিপতি রাজ্যবর্দ্ধনকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন, দ্বিতীয়বার বাঙ্গলার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় প্রতাপাদিত্য এই কলঙ্ক প্রক্ষেপ করিলেন। ইহা ছাড়া অতিশয় ধনবান্ ও ক্ষমতাশালী "হ'রে শুঁড়ি" নামক আর এক বণিক্‌কে তিনি নির্ম্মমভাবে হত্যা করেন, তাঁহার পরিবারবর্গ প্রতাপাদিত্যের ব্যবহারে এত ভীত হইয়াছিল যে তাহারা রাজভয়ে জলমগ্ন হইয়া মরিয়াছিল। যমুনা হইতে ঢলুন্দিয়া মোহনার কাছে এখনও লোকে "হ'রে শুঁড়ির দহ" দেখাইয়া থাকে। এই 'হ'রে শুঁড়ি' গোবরডাঙ্গার নিকট একটি অতি বৃহৎ রাস্তা করাইয়া দিয়াছিলেন। এখনও "হ'রে শুঁড়ির রাস্তা"র অনেকটা বিদ্যমান আছে।

কথিত আছে, একদা মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া তিনি এক বৃদ্ধা ভিখারিণীর স্তন কাটিয়া ফেলেন। এদিকে তাঁহার সদ্‌গুণরাশিরও শেষ ছিল না। তাঁহার উদারতার খ্যাতি সমস্ত যশোরবাসীর মুখে এখনও শুনা যায়। তিনি আশার অতীত অর্থ প্রার্থীকে দিতেন। এমন কি, কথিত আছে, ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া কল্পতরু হইয়াছিলেন—তখন একজন ব্রাহ্মণ রাজ্ঞী শরৎকুমারীকে চাহিয়া বসিয়াছিলেন। ইহা শুধু পরীক্ষার জন্য। কল্পতরু হওয়ার প্রথা রঘুবংশীয় রাজা দিলীপের সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছে; কালিদাস তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই রীতি বৌদ্ধযুগেই বিশেষরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। হিউনসাঙ্গ হর্ষবর্দ্ধনের এই কল্পতরু হওয়ার ব্যাপার সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কান্যকুব্জরাজ সর্ব্বস্ব দান করিয়া তাঁহার ভগিনী রাজ্যশ্রীর নিকট হইতে লজ্জা-নিবারণার্থ একখানি বস্ত্র চাহিয়া লইয়াছিলেন। দিলীপ সম্বন্ধে কৃত্তিবাস কালিদাসের বর্ণনা অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "অন্ন ভক্ষ্য মহারাজা নাহি রাখে ঘরে। মৃত্তিকার ভাণ্ডে রাজা জলপান করে।" কিন্তু হিন্দুরাজত্বকালে এ প্রথা ছিল কি না সন্দেহস্থল। বাল্মীকির

রামায়ণে ইহার উল্লেখ নাই। বুদ্ধের ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ ও ত্যাগের আদর্শে যে বৌদ্ধরাজগণ ইহার অনুসরণ করিতেন, তাহাই অধিকতর সম্ভব বলিয়া মনে হয়। বঙ্গদেশে ত্রিপুরা রাজ্যে সেদিন পর্য্যন্ত এ প্রথা নামে মাত্র অনুষ্ঠিত হইত। রাজা কল্পতরু হওয়ার পর মহারাণী সর্ব্বপ্রথম তাঁহার রাজত্ব ও সর্ব্বস্ব চাহিয়া লইতেন। প্রতাপাদিত্য সিংহাসনে বসিয়া কল্পতরুব্রত সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি কোন গুরুতর ব্যাপার লইয়া ছিনিমিনি খেলার লোক ছিলেন না। ব্রাহ্মণ শরৎকুমারীকে পাইলেন, শরৎকুমারীও রাজার ধর্ম্মকার্য্যে বাধা দিলেন না। এইস্থানে শরৎকুমারী ব্রাহ্মণের বাড়ীতে দাসীর বৃত্তি করিবেন—এই পর্য্যন্ত, কিন্তু গ্রহীতা পরস্ত্রীর উপর হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা কখনই পান নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণ রাজাকে জানাইলেন, তিনি শুধু রাজার দানবল পরীক্ষা করিবার জন্য এইভাবে রাণীমাকে মাঙ্গা করিয়াছিলেন; তিনি তাঁহাকে বিধিমত প্রত্যর্পণ করিলেন এবং বিনিময়ে রাজ্ঞীর ওজনমত স্বর্ণ পাইলেন। প্রতাপাদিত্যের শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্ট ছিল। প্রবলপরাক্রান্ত রাজা রাজ্যের এরূপ সুশৃঙ্খলা করিয়াছিলেন যে সকলে রামরাজ্যে বাস করিত। তাঁহার অপূর্ব্ব দানশক্তি ও উদারতাসম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে, --রামরাম বসু ও সতীশ মিত্র মহাশয়ের পুস্তকে তাহা বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি দুর্দ্দান্ত পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণকে নিরস্ত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার রাজ্যের লোকেরা বহিঃশত্রুর আক্রমণসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিল। তাঁহার পিতা বিক্রমাদিত্য ও পিতৃব্য বসন্ত রায়ের সময় হইতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ—কুলীন এবং পণ্ডিতগণ যশোরে আমন্ত্রিত হইয়া বসবাস করিয়াছিলেন। সুতরাং সর্ব্ববিষয়ে তখন যশোর বঙ্গদেশে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল। পুরাকালে এই রাজ্য সমৃদ্ধ ও শ্রীসম্পন্ন ছিল—প্রাচীন কীর্ত্তির অনেক ভগ্নাবশেষ তথায় দুর্লভ নহে। প্রতাপাদিত্য যশোরেশ্বরীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি পাইয়া তাহা অতি আড়ম্বরের সহিত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে এই বিগ্রহের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল এবং এই জন্যই ভারতচন্দ্র তাঁহাকে "বরপুত্র ভবানীর" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

যখন বসন্ত রায়ের আত্মীয় কূটবুদ্ধি রূপরাম বসু কচু রায়কে লইয়া জাহাঙ্গীরের দরবারে তাঁহার হত্যার কথা জানাইল, সেই স্মরণীয় দিনে বাঙ্গলার স্বাধীনতার শেষ আশা-রশ্মি অস্তমিত হইল। মানসিংহ ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে উপস্থিত হইলেন, তিনি প্রতাপাদিত্যের নিকট একখানি তরবারি ও একটি বেড়ী (শৃঙ্খল) পাঠাইলেন। বেড়ী অধীনত্বের চিহ্ন—এবং তরবারি যুদ্ধের। কেশবভট্ট নকীব উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"এই বেড়ী যেন মানসিংহ তাঁহার প্রভু জাহাঙ্গীরের পায়ে পরাইয়া দেন"—"বেড়ি দিও আপনার মনিবের পায়ে" (ভারতচন্দ্র)। সাদরে তিনি তরবারিটী গ্রহণ করিয়া বেড়ী ফিরাইয়া দিলেন, তৎসঙ্গে রাজা মানসিংহ মোগলের আত্মীয়তা করিয়া যে জাতিচ্যুত ও কুলচ্যুত হইয়াছেন, তাহাও বলিতে ছাড়িলেন না।

মানসিংহ আকবরের নিকট যুদ্ধনীতি বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন, পাখ পাখ

বঙ্গের যে সকল জমিদার ও রাজা প্রতাপাদিত্যের ("ভয়ে যত নৃপতি দ্বারস্থ") দরবারে গরুড় পক্ষীর ন্যায় থাকিতেন, তাঁহাদিগকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিলেন। প্রতাপের নিজ সেনাপতিদের মধ্যেও কাহাকে কাহাকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করিতে চেষ্টা করিলেন। বাঙ্গালীসমাজ তখনও প্রায় এখনকার সমাজের মতই ছিল। কোন সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে একত্র হইবার প্রবৃত্তি তাহাদের ছিল না। কেহ কেহ প্রতাপাদিত্যের শ্রেষ্ঠত্বে ঈর্ষ্যান্বিত ছিলেন; কেহবা মোগলের অনুগ্রহপ্রার্থী ছিলেন, কেহবা প্রতাপাদিত্য-কৃত পিতৃব্য ও তৎপুত্রের হত্যা, কার্ভালোর হত্যা, স্বীয় জামাতাকে হত্যা করিবার চেষ্টা ইত্যাদি দুর্নীতি ও পাপ খুব বাড়াইয়া বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তিনি যে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, কোন হিন্দুরাজা তাহা বুঝিলেন না, তাঁহার দানশীলতা ও উদারতার কথা কেহ বলিলেন না, তাঁহাকে খর্ব্ব করিতে পারিলেই তাঁহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল মনে করিলেন। সুতরাং রূপরাম ও কচু রায়কে সঙ্গে করিয়া ২২ লস্কর সঙ্গে যে দিন মানসিংহ বঙ্গে পদার্পণ করিলেন—সেদিন বাঙ্গলাদেশে তিনি সহায়তার অভাব অনুভব করিলেন; যদিও কিছু ঐক্যের গুঁড়া বঙ্গদেশে তখনও ছিল, তাহা মানসিংহের ন্যায় রাষ্ট্রনৈতিক খেলোয়াড়ের ভেদনীতিতে সম্যক্ বিধ্বস্ত হইয়া গেল।

(১) কৃষ্ণনগরের রাজাদের পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহকে বিশেষ সাহায্য করেন। ঝড়বৃষ্টি ও বন্যার প্রকোপে যখন মানসিংহের সৈন্যদল মৃত্যুদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল—তখন তিনি রসদ জোগাইয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করেন এবং প্রতাপাদিত্যের সম্বন্ধে অনেক সন্ধান দেন। তাঁহার গৃহদেবতা গোবিন্দ ও লক্ষ্মীর মহাসমারোহে বিবাহ দিবার জন্য তিনি বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, সেই উপকরণে মোগল সেনাদের মহা-বিপদ ঘুচিল। ভবানন্দ মজুমদার নিশ্চয়ই ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে তিনি বহুদিন যশোরে প্রতাপাদিত্যের অনুগৃহীত হইয়া ছিলেন।

(২) চাঁচড়ার রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ ভবেশ্বর রায়ের বংশধর মহাভাব রায় বা মুকুট রায় যশোর রাজ্যের উত্তর সীমান্তের প্রধান কিল্লাদার এবং প্রতাপাদিত্যের অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি মানসিংহকে গোপনে রসদ ও সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন।

(৩) নলডাঙ্গার রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ রণবীর খাঁ এবং কুশদহের জমিদার রাঘব সিদ্ধান্ত-বাগীশ উভয়ে মানসিংহের সহায়তা করিয়াছিলেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মানসিংহের দরবারে বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

(৪) কামদেব ব্রহ্মচারীর পুত্র লক্ষ্মীকান্ত প্রতাপের বিশেষ অনুগৃহীতদের অন্যতম। কেহ কেহ বলেন, রূপরাম বসুর কৌশলে গুপ্তভাবে কামদেবের লিখিত পত্র প্রেরিত হয় এবং মানসিংহ যশোহরের সমীপবর্ত্তী হইলে লক্ষ্মীকান্ত গোপনে আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দেন। শুধু যোগ দেওয়া নহে যুদ্ধের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত প্রতাপ কি ভাবে আয়োজনাদি করিয়াছিলেন, লক্ষ্মীকান্ত সে সকল গুপ্ত সন্ধান ব্যক্ত করিয়াছেন—তদ্দ্বারা মোগল সৈন্যের জীবনরক্ষা হয়।

ভবানন্দ মজুমদার, লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার * এবং বাঁশবেড়িয়ার রাজাদের পূর্ব্বপুরুষ জয়ানন্দ মজুমদার—এই তিন মজুমদার বঙ্গদেশটাকে ভাগবাটরা করিয়া লইয়াছিলেন—এরূপ প্রবাদ আছে। ইঁহারা সকলেই মানসিংহকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহা হইতে দেশের অবস্থাটা বেশ বুঝা যায়। ব্যক্তিগতভাবে বাঙ্গালী প্রতিভার এখনও পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুগেও পরমহংস দেব, রাজা রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত কীর্ত্তিমান্ পুরুষদের অভাব নাই। কিন্তু বাঙ্গলার সে ঐক্য আর নাই, যাহা মহীপালকে ভীম কৈবর্ত্তের বিরুদ্ধে শক্তি দিয়াছিল, যাহার বলে বল্লাল সেন সমস্ত বঙ্গদেশে কৌলীন্য চালাইয়াছিলেন, যাহা আদিকালে গোপালের হস্তে সমস্ত রাজশক্তি তুলিয়া দিয়াছিল। কোন মনস্বী ব্যক্তি প্রতিভাদ্বারা কিছু কালের জন্য উচ্চলোকে শির উত্তোলন করিতে পারেন,—কিন্তু লক্ষ্যভেদ করিতে অর্জ্জুন উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিল ("এত বলি ধরাধরি করি বসাইল"—কাশীদাস)—বঙ্গদেশের লোক সেইরূপ কাহারও উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রতিভা দেখিলে তাহাকে সহায়তা করা দূরে থাকুক—তেমনই নিরস্ত করে। পরস্পরের গার্হস্থ্য বিবাদ ভুলিয়া সর্ব্বজনহিতকামীর হস্তে বলসঞ্চার করার যোগ্য ঐক্য-বন্ধন আর এদেশে নাই। সেই শকুনির সময় হইতে যে গৃহবিবাদ চলিয়া আসিয়াছে, যাহাতে পৃথ্বীরাজ ভারতসাম্রাজ্য হারাইলেন—তাহা কবে নির্ব্বাপিত হইবে?

"জিত্বা বঙ্গাধিপান্ বীরান্ রাঢ়াধিপান্ মহাবলান্। আ-সমুদ্রকরগ্রাহী বভূব নর-শার্দ্দূলঃ॥"

প্রতাপসম্বন্ধে টীকা-কারিকা।

প্রতাপ এইভাবে স্বগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বিশ্বস্ত খোজা কমল সাতদিন উপবাসী থাকিয়া অবিশ্রান্ত লড়াই করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছিলেন, সূর্য্যকান্তের মৃতদেহের উপর হয়ত তাঁহার চিরবিশ্বস্তভাব জন্য দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন। মানসিংহের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের এই যুদ্ধ তিনদিন যাবৎ চলিয়াছিল; ইহাতে শৌর্য্যবীর্য্যের চূড়ান্ত প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্য শুধু খোজা কমল ও আশৈশব বন্ধু সূর্য্যকান্তকে হারান নাই—এই যুদ্ধে তাঁহার প্রাণপ্রিয় অন্তরঙ্গ শঙ্কর চক্রবর্ত্তী বন্দী হইলেন, তৎপক্ষীয় ফিরিঙ্গী সেনানায়ক রডা নিহত হইলেন এবং তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি মদন-মল্ল প্রাণ হারাইলেন। মোগলদিগের বহু ওমরাহ নিহত হন। শেষে প্রতাপাদিত্য পরাজিত হইলেন। তখন বর্ষা আসিয়া পড়িয়াছে। বর্ষায় বাঙ্গলাদেশের অবস্থা মানসিংহের ভালরূপই বিদিত ছিল, পূর্ব্ববৎসর বর্ষায় তাঁহার বিপুল সৈন্যের কোনরূপে প্রাণ-রক্ষা হইয়াছে, বর্ষার বিপদ্ তিনি জানিতেন। সুতরাং যখন প্রতাপ সন্ধিপ্রার্থী হইলেন, তখন তিনি তাহা মঞ্জুর করিলেন। সন্ধিদ্বারা প্রতাপ নামে মাত্র মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং বসন্ত রায়ের পুত্র কচু রায়কে তাঁহার প্রাপ্য 'ছয় আনি' প্রত্যর্পণ করিলেন। ১৬০৩ হইতে ১৬০৮ খৃঃ পর্য্যন্ত প্রতাপাদিত্য নিরুদ্বেগে রাজ্য করিয়া বহু মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা

* লক্ষ্মীকান্ত বড়িষা গ্রামের সাবর্ণ চৌধুরীদের পূর্ব্বপুরুষ।

করিয়া রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিলেন। ১৬০৮ খৃঃ অব্দে ইসলাম খাঁ নবাব হইয়া বঙ্গের মসনদ অধিকার করেন। তিনি একটু উগ্রপ্রকৃতি ছিলেন। বক্রপুরে তাঁহার সঙ্গে প্রতাপের দেখাসাক্ষাৎ ও সন্ধির প্রস্তাব দূরীভূত হইলেও স্বাধীনতার সেই চিরপোষিত ইচ্ছা তিনি কিছুতেই দমন করিতে পারিলেন না। এ ছুতো সে ছুতো ধরিয়া তিনি সন্ধির নিয়ম ভাঙ্গিলেন। পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এইবার প্রতাপাদিত্য ধূমঘাটের নৌযুদ্ধে ইসলাম খাঁর সেনাপতি ইনায়েৎ খাঁ ও মীর্জ্জা সহনের হাতে সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়া বন্দী হইলেন। তাঁহার বন্দী হওয়ার সংবাদে তৎপুত্র উদয়াদিত্য মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া প্রাণের আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক মোগলসৈন্তসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। শালিখার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তিনি নিবৃত্ত হন, এবং পিতার যোগ্য পুত্রের প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। এদিকে বন্দী প্রতাপাদিত্যকে লইয়া ঢাকায় গিয়া ইসলাম খাঁ পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রকে আগ্রায় প্রেরণ করেন। পথে কাশীধামে ১৬১১ খৃষ্টাব্দে ৫০ বৎসর বয়সে প্রতাপের লীলাবসান হয়। ভারতচন্দ্র এবং অপর দুই একজন লেখক লিখিয়াছেন—মানসিংহের দ্বারাই তিনি পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া আগ্রায় প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহা ভুল। মানসিংহ নহে, ইসলাম খাঁর হাতেই তাঁহার পতন।

প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস বহুস্থান হইতে পাওয়া যাইতেছে। রামরাম বসু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে একখানি নাতিক্ষুদ্র ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, একখানি পার্শীতে লেখা 'প্রতাপাদিত্য-চরিত' হইতে তাঁহার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নূরজাহানের ভ্রাতা আসাফ খাঁর অনুচর আবদুল লতিফ খাঁ প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে প্রতাপসম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক মীর্জ্জা সহন আলাউদ্দিন ইস্পাহিনী (অপর নাম গাইবী) "বাহিরিস্তান গাইবী" নামক গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের কথা সবিস্তারে লিখিয়াছেন, তাহা মূলতঃ বিশ্বাসযোগ্য এবং খুঁটি-নাটি তত্ত্বে পূর্ণ। ঘটককারিকা গ্রন্থসমূহেও প্রতাপসম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে। বিভারেজ-লিখিত বাখরগঞ্জের ইতিহাস, পর্ত্তুগীজদের লিখিত অনেক বিবরণ, বিশেষতঃ ডুজারিকের ইতিহাস—প্রভৃতি বহুগ্রন্থে যশোররাজসম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া যশোর ব্যাপিয়া প্রতাপাদিত্য ও বসন্ত রায় সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে। আমাদের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাসের সঙ্গে প্রতাপের খুল্লতাত ও লাতুষ্পুত্র উভয়েরই সখ্য ছিল—তিনি তাঁহার পদে ইঁহাদের নামের উল্লেখ করিয়াছেন।

আর একটি কথা বলিয়া প্রতাপাদিত্যের কথা উপসংহার করিব। মোগলদের বিরুদ্ধে ইশা খাঁ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কেদার রায়ের সঙ্গে মানসিংহের অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিয়াছিল, অন্ততম ভুঞা সত্রাজিৎ ও আরও অনেকে মোগলদিগের প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন। এদিকে পাঠানেরা মোগলের চিরশত্রু, বঙ্গদেশে তখনও তাঁহাদের প্রভাব একেবারে নষ্ট হয় নাই। সুতরাং মোগল সমস্ত দেশের শত্রু-স্বরূপ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা কেন মিলিত হইলেন না—প্রতাপের শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃৎ ইশা খাঁ, যিনি নানা উৎসবে ধূমঘাটে আসিয়া প্রতাপাদিত্যের

শুভকার্য্যে যোগ দিয়াছেন, তিনিই বা প্রতাপকে সাহায্য করিলেন না কেন? এক একটি করিয়া প্রতিপক্ষ রাজা ও মুসলমান নায়ক পতঙ্গের মত মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন—সকলে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিলেন না কেন? একথা দূরে থাকুক, প্রতাপের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত মোগলদিগকে তাঁহার সর্ব্বনাশের পথ দেখাইয়া দিল। তাঁহার নিজ জামাতা বাকলারাজ কি ক্ষণকালের জন্য পারিবারিক কলহ ভুলিয়া তাঁহার সাহায্যে দাঁড়াইতে পারিতেন না? অনৈক্যে দেশ নষ্ট হইল, ঐক্য-লক্ষ্মী এদেশে থাকিলে রাজলক্ষ্মী এখান হইতে বিদায় লইতেন না; তাঁহার সিংহাসন পাতা ছিল—আমাদের নৈতিক অধঃপতন হইয়াছে, তাই সমস্ত বিড়ম্বনাকে বরণ করিয়া আসিয়াছি। (এই অধ্যায়ের অনেক বিষয়ই বাবু সতীশ মিত্র মহাশয়ের ইতিহাস হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।)

পূর্ব্বোল্লিখিত বারভূঞাদের অন্যতম বীর কেদার রায়। চাঁদ রায় ও কেদার রায় সহোদর ছিলেন। ইঁহাদের রাজধানী পদ্মার এক শাখা কালীগঙ্গার কূলে শ্রীপুরে অবস্থিত ছিল।

কেদার রায় ও চাঁদ রায়।

ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ নিম রায় সম্ভবতঃ সেন-রাজাদের সময়ে কর্ণাট হইতে আসিয়া বিক্রমপুর আরা ফুল-বেড়িয়াতে বাসস্থাপন করেন, এবং পরে তৎকালীন বঙ্গাধিপের নিকট 'ভূঞা' উপাধি লাভ করিয়া বঙ্গদেশের একজন পরাক্রান্ত জমিদার বলিয়া গণ্য হন। ডাক্তার ওয়াইজের মতে আকবরের সময়ে নিম রায় কর্ণাট হইতে আসিয়াছিলেন। (বারভূঞাসম্বন্ধে জেমস্ ওয়াইজ্ সাহেবের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—এসিয়াটিক সোসাইটীর জারনাল, ১৮৭৪।) চাঁদ রায় ও কেদার রায় সমস্ত বিক্রমপুর পরগনা ও পার্শ্ববর্ত্তী কতকগুলি স্থান অধিকার করিয়া পাঠান-রাজত্বের শেষভাগে স্বাধীন নৃপতিরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী সন্দ্বীপ মোগলদের দখলে ছিল—কিন্তু জনৈক পর্ত্তুগীজ সেনাপতি কার্ভালো কেদার রায়ের নামে ঐ স্থান অধিকার করেন। কেদার রায় তাঁহার সেনাপতি কার্ভালোর দ্বারা ঐ স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কারস্বরূপ ঐস্থান সেই পর্ত্তুগীজ যোদ্ধাকেই প্রদান করেন। এই সন্দ্বীপের অধিকার লইয়া আরাকানের রাজার সঙ্গেও কেদার রায়ের দ্বন্দ্ববিগ্রহ হইয়াছিল। দুইবার তিনি আরাকানের রাজার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হন, কিন্তু শেষে সন্দ্বীপের অধিকার শেষোক্তের ভাগ্যেই ঘটিয়াছিল (১৬০২ খৃঃ)। কাম্পোস লিখিত "Portuguese in Bengal" পুস্তকে দৃষ্ট হয় আরাকানরাজ মানরাজগিরি-কর্ত্তৃক সন্দ্বীপ অধিকৃত হওয়ার পর কার্ভালো তাঁহার নৌবহর লইয়া শ্রীপুরেই অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি কেদার রায়ের নৌবলের ভার প্রাপ্ত হইয়া শ্রীপুরের রাজকীয় সেনার অন্যতম অধিনায়ক হইয়াছিলেন। মোগলেরা বুঝিল তাঁহাদের অধিকৃত দ্বীপটি কেদার রায়ের সাহায্যে কার্ভালো কাড়িয়া লইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারা শ্রীপুরের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। মহারাজ মানসিংহের সেনাপতি মন্দারায়ও কেদার রায়ের সঙ্গে যে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন—তাহা অনেকটাই জলযুদ্ধ। তাহাতে কালীগঙ্গার শ্যাম সলিল উভয় পক্ষের শোণিতে লোহিত হইয়াছিল। যুদ্ধে কেদার রায় জয়ী হইলেন এবং মোগল-পক্ষীয় দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা মন্দারায় নিহত হইলেন (Parch's Pilgrims, Pt. IV, Bk. V, p. 513)। কথিত আছে এই যুদ্ধে

কার্ভালো অতিশয় বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং আহত হন। তখন (১৬০৬ খৃঃ) মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধে বিশেষরূপ ব্যস্ত ছিলেন। প্রতাপের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া তিনি কেদার রায়ের বিরুদ্ধে সমস্ত সৈন্য লইয়া অভিযান করিলেন। প্রথমতঃ তরবারি ও শৃঙ্খল প্রেরিত হইল, দর্পিতভাবে কেদার রায় শৃঙ্খল ফিরাইয়া দিলেন এবং মানসিংহকে বিদ্রূপ করিয়া প্রত্যুত্তরে একটি সংস্কৃত শ্লোক পাঠাইলেন, তাহা তদবধি সংস্কৃত-সাহিত্যের উদ্ভট শ্লোকগুলির মধ্যে স্থান পাইয়াছে। "ভিনত্তি নিত্যং করিরাজকুম্ভং। বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকম্। করোতি বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে। তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ॥" মানসিংহ বলশালী, ক্ষমতাপন্ন, রাজানুগ্রহে প্রতিষ্ঠার শিখরদেশে স্থিত, তথাপি তিনি পশুতুল্য। এই বিদ্রূপে উত্তেজিত হইয়া মানসিংহ শ্রীপুর অবরোধ করেন। কেদার রায় এই যুদ্ধে পরাজিত হইলে মানসিংহ সন্ধির প্রস্তাবে স্বীকৃত হন। কথিত আছে মানসিংহ কেদার রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন, এ সম্বন্ধে হিন্দুস্থানে অনেক প্রবাদ চলিত আছে, তাহার একটি এই—"যদি রাজা মানসিংহজীউকি বেটি মাঁগী। যদি রাজা কেদার দেনী করী। আর মিলাপ হুবো। যদি নীজর করি।" (অম্বরের শিলাদেবীর পুরোহিতগণের বংশাবলী।) কিন্তু এই সন্ধি স্থায়ী হইল না। কেদার রায়ের সঙ্গে মানসিংহের পুনরায় সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। কথিত আছে নয় দিন পর্য্যন্ত ভীষণ যুদ্ধের পর কেদার রায় পরাস্ত ও নিহত হন। এই যুদ্ধের কথা Elliot's History of India, Vol. vi, এবং আকবরনামার ১১১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে। (যোগেন্দ্রবাবুর বিক্রমপুরের ইতিহাসের ১০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) কথিত আছে কেদার রায় তাঁহার ৫০০ রণতরী লইয়া এই যুদ্ধে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং মোগল সেনাপতি কিল্‌মককে বন্দী করিয়াছিলেন কিন্তু পরিণামে মোগলেরই জয় হইয়াছিল। কিন্তু জনপ্রবাদ অন্যরূপ। ইশা খাঁ যে কেদার রায়ের ভগিনী সোণামণিকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইয়া বিবাহ করেন, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এতৎসম্বন্ধে বিক্রমপুরের ইতিহাস (যোগেন্দ্রবাবু-কৃত) এবং অপরাপর ঐতিহাসিক গ্রন্থে যে বিবরণ দেওয়া আছে, তাহাতে জানা যায় ইশা খাঁ ও চাঁদ-কেদার ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে এক সময়ে খুব সৌহার্দ্দ্য ছিল। ইশা খাঁ এক সময়ে শ্রীপুর রাজধানীতে আতিথ্য স্বীকার করিয়া স্নানার্থিনী সোণামণির অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া যেরূপে পারেন তাঁহাকে লাভ করিবেন এইজন্য কৃতসংকল্প হন। রায় রাজাদের এক অসন্তুষ্ট কর্ম্মচারী শ্রীমন্ত খাঁর সাহায্যে তিনি কতকদিন পরে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই অপমানে ও লজ্জায় চাঁদ রায় যে দুঃসহ পরিতাপ পাইলেন—তাহাতে পীড়িত হইয়া পড়েন এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। কেদার রায় প্রতিশোধার্থ পদ্মার অপর পারে থাকিয়া ইশা খাঁর অন্যতম রাজধানী খিজিরপুর লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেন, তাহা ছাড়া কৈলাগাছা দুর্গ ভূমিসাৎ করেন। কিন্তু "ইশা খাঁ" শীর্ষক যে পল্লীগাথা বহুদিন যাবৎ ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমান কবিকর্ত্তৃক রচিত হইয়া মুসলমান গায়েন-কর্ত্তৃক গীত হইয়া আসিতেছে—তাহাতে এই বিষয়টি ভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে, একদা ইশা খাঁ তাঁহার অপূর্ব্ব শিল্পখচিত সুবৃহৎ কোষা লইয়া যখন শ্রীপুরের

নদী দিয়া যাইতেছিলেন তখন চাঁদ রায়ের ভগিনী স্বভদ্রাকে দেখিতে পান (সোণামণি হয়ত তাঁহার আদরের দেওয়া নাম ছিল, পোষাকী নাম স্বভদ্রাটাই হয়ত তিনি মুসলমান অন্দর-মহলে প্রচার করিয়াছিলেন। [illegible] উভয়ের প্রতি উভয়ে আকৃষ্ট হন। স্বভদ্রা সোলার মাঝে চিঠি লিখিয়া ঈশা খাঁকে কোন নির্দ্দিষ্ট যোগের দিনে কোষা লইয়া শ্রীপুরে আসিতে অনুরোধ করেন—সেই যোগ উপলক্ষে তিনি নদীতে পুনরায় স্নান করিতে আসিবেন, তখন ঈশা খাঁ তাঁহাকে অনায়াসে তাঁহার ক্ষিপ্রগতি কোষাতে উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারিবেন। এই ইঙ্গিত পাইয়া ঈশা খাঁ সেই যোগ উপলক্ষে সদ্যঃস্নাতা স্বভদ্রাকে ধরিয়া লইয়া যান। কেদার রায় তাঁহার কোষা লইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত পলাতক তস্করকে অনুসরণ করিয়াছিলেন—শেষে ঈশা ঢাকায় মুসলমান নবাবের রাজ্যে আসিয়া পড়িলে তিনি ইহার প্রতিশোধ লইবেন, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। কেদার রায় তদবধি ঈশা খাঁর সহিত চিরশত্রুতা করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি জঙ্গলবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ভগিনীর সঙ্গে দেখা করেন। তখন বিধবা বেগম (নাম "নিয়ামৎ জান" হইয়াছিল) দুই পুত্র আরাম ও বিরামের সহিত রাজধানীতে বাস করিতেছিলেন। তিনি নানা ছন্দে ভগিনীকে আদর করিয়া বলেন—তাঁহার দুই কন্যার সঙ্গে আরাম ও বিরামের বিবাহ দিবেন, মুসলমানী-মতে বিবাহ হইলে ইহাতে কোন বাধা হইবে না। কেদার রায় আরও বলেন যে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা বালক দুটীকে দেখিতে চান, স্বতরাং মাতুলের সহিত কয়েকদিনের জন্য তাহারা যাইয়া শ্রীপুরে বেড়াইয়া আসুক।

কেদার রায়ের মৃত্যু-সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ।

নিয়ামৎ জান এই স্নেহের প্রস্তাবের মধ্যে তপ্ত লৌহশলাকার ন্যায় ভ্রাতার ক্রূর অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন এবং কিছুতেই সম্মত হইলেন না। এদিকে কেদার রায় বিপুল ভোজের আয়োজন করিয়া জঙ্গলবাড়ীর গণ্যমান্য সকল ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার কোষা নৌকাগুলিতে আনাইলেন, আরাম-বিরামও সঙ্গে আসিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমোদ-আহ্লাদে ব্যয়িত হইল এবং কেদার রায় তাঁহার ভাগিনেয়দিগকে এরূপ মধুর ও অমায়িক ব্যবহারে তুষ্ট করিলেন যে তাহারা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। তিনি তাহাদিগকে "আজ বাকী রাতটুকু এখানে থাক," এই অনুরোধ করিলে তাহারা আনন্দের সহিত স্বীকৃত হইল। রাজপুত্রদ্বয় নিদ্রিত হইলে বহুহস্তসঞ্চালিত কোষা অবশিষ্ট রাত্রি বাহিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীপুরে আসিল। "কালনেমী মামা" কেদার রায়ের মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইল। ভাগিনেয়দ্বয়কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তিনি কারাগারে প্রেরণ করিলেন এবং তাহাদিগকে কালীমন্দিরে বলি দেওয়ার জন্য সমারোহ করিয়া আয়োজন চলিল। এদিকে কেদার রায়ের দুই কন্যা শুনিয়াছিলেন যে তাহাদের পিসতুত ভাইয়েদের সঙ্গে তাহাদের বিবাহ হইবে। তাহাদের পিতা স্বয়ং এই কথা দিয়াছেন, তাহারা প্রতারণা বুঝিল না। "যখন পিতার মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, তখন আমরা তাহাদেরই হইয়া গিয়াছি" এই মনে করিয়া তাহারা বন্দিদ্বয়ের নিকট কারাগারে যাইয়া মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব করিল। আরাম-বিরাম

বলিলেন, "আমরা চোরের মত তোমাদিগকে বিবাহ করিয়া পালাইয়া যাইব না, বিবাহ করিলে প্রকাশ্যভাবেই করিব।" যখন কালীর কাছে তাঁহাদিগকে বলি দেওয়ার জন্য উপস্থিত করা হইল, তখন এই দুই রাজকুমারী খড়্গ হস্তে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে দাঁড়াইল, ভয়ে কেহ অগ্রসর হইল না। এদিকে শতযুদ্ধের বীর, অসাধারণ বলসম্পন্ন, ঈশা খাঁর দক্ষিণহস্ত করিমুল্লা—বিধবা বেগমের শোকোন্মত্ততা দেখিয়া অধীর হইলেন। তিনি নৌবাহিনীর নেতা সাধনের সাহায্য লইয়া শ্রীপুরে উপস্থিত হইয়া রাজপ্রাসাদ অবরোধ করিলেন, এবং যখন আরাম ও বিরাম কালীমন্দিরে রাজকুমারীদ্বয়ের আনুকূল্যে জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—তখন অকস্মাৎ ধূমকেতুর মত উপস্থিত হইয়া ইঁহাদিগকে রক্ষা করিলেন। কেদার রায় নিকটবর্ত্তী বনে পালাইয়া গিয়া তাঁহার ভূনিম্নস্থ প্রাসাদ নিরাপদ্ মনে করিয়া তথায় আশ্রয় লইলেন। রাজকুমারীরা দেখিল, কেদার রায় বাঁচিয়া থাকিলে তাহাদের নিজেদের জীবন ও আরাম-বিরামের জীবন সর্ব্বদাই শঙ্কটাকীর্ণ থাকিবে। তাহারা সেই গুপ্ত স্থানের সন্ধান দিল। রাজধানীর নিকটবর্ত্তী 'আসুয়া' নামক স্থান ঘোরজঙ্গলাকীর্ণ, সেই জঙ্গলের মধ্যে কেদার রায়ের একটি বৃহৎ প্রাসাদ ছিল, উহা শ্রীপুর হইতে মাত্র পাঁচ রসী দূরে—সেই আসুয়ার রাজপ্রাসাদে একটা গুপ্ত সুরঙ্গ ছিল, তাহার দ্বারা নদীতে পৌঁছান যায়। করিমুল্লা সেই স্থানে যাইয়া কেদার রায়কে আক্রমণ করিয়া নিহত করিলেন—তিনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছিলেন।

করিমুল্লা।

আরাম-বিরাম যে ঈশা খাঁর দুই পুত্র ও সোণামণির গর্ভজাত তাহার উল্লেখ অনেক স্থলে পাওয়া যায়। (পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।) এই সময়ে কেদার রায় মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন, হয়ত এই ঘটনাই খাঁটি, কিন্তু করিমুল্লার ন্যায় মল্লবীরের বীরত্বের যশ লুপ্ত করিয়া মোগলেরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা আগ্রার দরবারে বাড়াইবার জন্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ভিন্নরূপ বিবরণ দিয়াছেন। কথিত আছে, ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর ব্রহ্মরাজ হাজিগঞ্জ দুর্গ আক্রমণ করিলে সোণামণি উপায়ান্তর না দেখিয়া অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন। অপর এক প্রবাদ যে, সোণামণির স্বামীর মৃত্যুর পর পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।

যে দ্বাদশ জন ভৌমিক মোগল-আগমনের পূর্ব্বে বঙ্গদেশ একরূপ শাসন করিতেছিলেন, তন্মধ্যে ভূষণা বা ফতেয়াবাদ (আধুনিক কালে অনেকটা ফরিদপুর জেলা লইয়া এই রাজ্য গঠিত হইয়াছিল) রাজ্যের অধিপতি মুকুন্দরাম রায় মোগলদিগের বিরুদ্ধে প্রায় সমস্ত জীবন যুদ্ধ করিয়াছেন। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দরাম অতি অল্প সময়ের জন্য মোগল রাজ-প্রতিনিধি বঙ্গেশ্বর ইসলাম খাঁর সঙ্গে সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কুচবিহার অভিযানের সময়ে কিছু সৈন্য দিয়া সহায়তা করিয়াছিলেন; কিন্তু মূলতঃ ইনি মোগলদের চিরশত্রু ছিলেন। ক্ষণকালব্যাপী সখ্যের ফলে কতকদিনের জন্য তিনি পাণ্ডুয়া ও গৌহাটীর সুবেদার হইয়া মোগলদের অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বাধীন প্রকৃতি

এই কার্য্য একেবারেই পছন্দ করেন নাই, তাঁহার পুত্র সত্রাজিৎকে ঐ সুবেদারী দিয়া তিনি স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সৈন্য সংগ্রহ ও রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া মোগলের বিরুদ্ধে পুনরায় বিদ্রোহ করেন। কথিত আছে, প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পরও তিনি মোগলদিগের সঙ্গে কিছুকাল যুদ্ধবিগ্রহ চালাইয়াছিলেন। তিনি মোগল-সেনাপতি মোরাদের পুত্রগণকে ভূষণায় আমন্ত্রণ করিয়া নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন (বেভারিজ—আকবরনামা, ৩য় খণ্ড, ৪৬৯ পৃঃ)। কথিত আছে মুকুন্দরাম রায় মোগলরাজপ্রতিনিধি বঙ্গেশ্বর সৈয়দ খাঁর সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। পুত্র সত্রাজিৎও তাঁহার পৈত্রিক বিদ্রোহভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, তিনি সময়ে সময়ে মুখে বশ্যতা স্বীকার করিলেও মোগলদিগের বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। কোচদের সঙ্গে যখন মোগলেরা যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন, তখন কোচরাজ বলদেবের সঙ্গে একটা গুপ্তসন্ধি করিয়া ইনি মোগলদিগের গতিবিধির সমস্ত সংবাদ শত্রুপক্ষকে দিতেছিলেন। ব্লকম্যান সাহেব লিখিয়াছেন, "Satrajit gave Jahangir's governors of Bengal no end of trouble and refused to send in the customary *peskash* or do homage at the court of Dacca." (Blockman, p. 332.) সত্রাজিৎ জাহাঙ্গীরের বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তাদের যৎপরোনাস্তি অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি ঢাকায় বঙ্গেশ্বরকে প্রচলিত পেশকাশ প্রদান কিংবা বশ্যতা স্বীকার করিতে কখনই স্বীকৃত ছিলেন না। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বন্দী হইয়া ঢাকায় আনীত হন এবং তথায় তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

ভূষণার মুকুন্দরাম রায়।

বার ভূঞার অন্যতম ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য অতি প্রবলপরাক্রান্ত ছিলেন, তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব-শক্তিরও অনেকস্থলে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে তিনি "বিখ্যাত-বিজয়" নামক সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র ইঁহার সহিত চক্রান্ত করিয়া মাধব পাশাকে হত্যা করেন।

ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য।

মোগলদিগের বিরুদ্ধে বঙ্গবীরদের জাতক্রোধ ছিল। যে শক্তি দ্বারা যজ্ঞস্থলে আনীত পশুরা তাহাদের আসন্ন মৃত্যু বুঝিতে পারে, যাহাদ্বারা কসাইয়ের কাছে বিক্রীত গাভী বা বৃষ তাহার আসন্ন বিপদ্ বুঝিয়া ছটফট্ করে—সেই শক্তি দ্বারা বঙ্গীয় বীরেরা বুঝিয়াছিলেন, মোগলদের অধীনত্ব স্বীকার করার অর্থ চিরকালের জন্য দাসত্বের যূপকাষ্ঠে নিজেদের আবদ্ধ করা। পাঠানেরা তাঁহাদের নিকট সামান্য কিছু দক্ষিণা পাইলেই পুরোহিতের মত সন্তুষ্টচিত্তে ফিরিয়া যাইতেন এবং শুধু যুদ্ধবিগ্রহকালে তাঁহাদের সহায়তা চাহিতেন—কিন্তু সাম্রাজ্যলোভী বহুকামী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী মোগলদের খপ্পরে পা দিলে আর রক্ষা নাই। তোদরমল্লের জরিপে কোথায় কাহার কতটকু জমি তাহা ধরা পড়িয়া গিয়াছিল,—দেশের শাসনকর্ত্তারা মোগলানুগ্রহে খাইতে পরিতে পারিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের চলাফেরা, কার্য্যকলাপ সমস্তই মোগল বাদশাহের সূক্ষ্মপর্য্যবেক্ষণাধীন হইত। মোগলব্যাঘ্রের নখের দাগ, সাম্রাজ্য গঠনের কঠোর নিয়মাবলী ও তীব্রদৃষ্টি রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে পড়িয়াছিল। দেশের লোকদের

বঙ্গদেশ মোগলদের বিরুদ্ধে কেন হইল ?

স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার অবকাশ পাইত না, আকবরের প্রেরণায় তোদরমল্ল ও মানসিংহ যে ভারতব্যাপী জাল প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সে জালে পড়িলে আর উদ্ধারের সম্ভাবনা ছিল না। রাজস্ব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে—লুব্ধ মোগলগণ ভারতের সর্ব্বত্র অর্থসংগ্রহ করিয়া তাজমহল, ময়ূর-সিংহাসন, দেওয়ানী খাস প্রস্তুত করিবেন, রাজপ্রাসাদে নরোজা উৎসব সম্পাদন করিবেন, মোগল অন্তঃপুরের বিলাসিনীদের জন্য অমূল্য হীরামাণিক্যের অলঙ্কার প্রস্তুত করিবেন—এই বিপুল অর্থ সংগৃহীত না লইলে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের রক্ষা নাই; সুতরাং রাজারা শৌর্য্যবীর্য্য হারাইয়া জমিদারে পরিণত হইলেন, সে জমিজমার যতই কেন উন্নতি হউক না, রাজস্ব-সচিবের খরদৃষ্টি এড়াইয়া তাহা আর নিরুদ্বেগে ভোগ করা তাঁহাদের অসাধ্য হইবে। এই অর্থের জন্য উত্তরকালে "নরককুণ্ডে"র সৃষ্টি হইয়াছিল, ময়মনসিংহের সুকুমার রাজপুত্রদের দেহ বেত্রাঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া রক্তপ্লাবিত হইয়াছিল,—যাহার এই পরিণাম—সেই সর্ব্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের অঙ্গীয় হইয়া দুঃখলাঞ্ছনার চূড়ান্ত ভোগ করিতে হইবে, তাহা সম্ভবতঃ পাঠান-রাজ্যাবসানে বঙ্গের রাজগণ আভাসে টের পাইয়া মরিয়া হইয়া মোগলের বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। আরঙ্গজেব হিন্দুদের উপর বাহ্য অত্যাচার করিয়াছিলেন, কিন্তু আকবর প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্যের গিল্‌টি করিয়া যে সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খল গড়িয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা স্বর্ণশৃঙ্খল কিংবা স্বর্ণহার বলিয়া গলায় পরিয়াছিলেন তাঁহারাই চিরদাসত্ব বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই বারভূঞার পতনের পর বীর বাঙ্গালীজাতির প্রকৃত শৌর্য্যবীর্য্য লুপ্ত হইল। আকবরের পরিকল্পিত সাম্রাজ্যশক্তি-নিষ্পেষণে সেই বিক্রমবহ্নি একেবারে নির্ব্বাপিত হইল। প্রচণ্ড অগ্নিদাহের পর যেমন মাঝে মাঝে ভস্মস্তূপের মধ্যে দুই একটা স্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠে, তেমনি হিন্দু ও মুসলমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারদের সঙ্গে দুই একটা খণ্ডযুদ্ধের বিবরণ আমরা দেখিতে পাই। দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয় একটাকিয়ার জমিদারের সঙ্গে অপর কয়েকটি জমিদারের যুদ্ধ-বিগ্রহাদির বর্ণনা অতি কৌতূহলপ্রদ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু এগুলি নির্ব্বাপিততেজ অনলকুণ্ডের দুই একটি স্ফুলিঙ্গমাত্র। মোগল-রাজপ্রতিনিধি বঙ্গের নবাব যে পক্ষকে আশ্রয় দিয়াছেন, সেই পক্ষের বিজয়লাভে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় নাই। এই সকল আসন্ন দুঃখ-বিপদ্ বোধ হয় বারভূঞাগণ আভাসে উপলব্ধি করিয়াছিলেন—এজন্য তাঁহাদের বংশধরগণকে সেই অজগরতুল্য সাম্রাজ্য-নীতির বদন হইতে রক্ষা করিতে যাইয়া জীবনপণ করিয়াছিলেন। এই 'ভূঞা রাজাদের' পর একমাত্র সীতারাম রায় বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন—কিন্তু তিনি একক কি করিবেন? মোগলের সর্ব্বগ্রাসী বিজয়শক্তির বিরুদ্ধে ভূষণার বীরবরের জীবনপণ-বীরত্ব তৃণের মত ভাসিয়া গেল।

ভূঞাদের মনে মোগলবশ্যতা যে কিরূপ দুঃসহ ছিল, তাহা ঈশা খাঁর বংশধর (সম্ভবতঃ প্রপৌত্র) ফিরোজ খাঁর তরুণ যৌবনের কতকগুলি মনোভাবে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। ঈশা খাঁ ছিলেন রাজপুত কালিদাসের পুত্র। ক্ষত্রিয় রক্ত তাঁহার ধমনীতে বহিত। তিনি যদিও মানসিংহের সহিত বহু যুদ্ধ করিয়া অবশেষে মোগলদের সঙ্গে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন,

তথাপি তাঁহার বংশধরগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত মোগলদের বশ্যতা একান্ত ক্ষোভের কারণ বলিয়া মনে করিতেন। আমরা 'ফিরোজ খাঁ' শীর্ষক পল্লীগাথায় এই ভাব দেখিতে পাই।

তরুণ ফিরোজ খাঁ জঙ্গলবাড়ীর গদীতে উপবিষ্ট হইয়া একদা তাঁহার সুহৃদ্ ও সামন্তদিগকে তাঁহার সুবৃহৎ 'বারদুয়ারী' গৃহে আহ্বান করিলেন। তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "আমি দিনরাত আমার মহিমান্বিত পূর্ব্ব-পুরুষদের কথা স্মরণ করিয়া থাকি—তাঁহারা তো দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আমার পূর্ব্বপুরুষ এই দেওয়ানবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি ঈশা খাঁ এত বড় পরাক্রান্ত ছিলেন যে, স্বয়ং দিল্লীশ্বর তাঁহাকে ভয় করিতেন। আমি তাঁহারই বংশধর একথা একমুহূর্ত্তও ভুলিতে পারিতেছি না। আপনারা এখন আমার সঙ্কল্পের কথা শুনুন—ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করিয়া এই জঙ্গলবাড়ীতে পাঠাইয়াছেন। আমি এই প্রদেশের মালিক। আমি বৎসর বৎসর আমার সমস্ত রাজ্যের আয়ের অর্দ্ধাংশ দিল্লীতে পাঠাইয়া এই অপমানসূচক দেওয়ানগিরি আর রাখিতে চাই না। এখন আমি কি ঠিক করিয়াছি, শুনুন—আমি দিল্লীতে রাজস্ব দেওয়া এখন হইতে বন্ধ করিয়া দিব। আমি দিল্লীর দরবারে আর হাজিরা দিতে পারিব না। সম্রাটের সৈন্য আমায় যাহা ইচ্ছা করুক। আমার যদি মৃত্যু হয়—ঈশ্বর যদি তাহাই বিধান করেন, তবে সেই মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতে আমার কিছুমাত্র ভয় নাই। ইহাই আমার স্থির সঙ্কল্প, আমি মৃত্যুকে আমার গৃহদ্বারে ডাকিয়া আনিতেছি।"

ফিরোজ খাঁর প্রতিজ্ঞা।

যখন ফিরোজ খাঁ এই কথাগুলি শেষ করিয়াছেন সেই মুহূর্ত্তে অন্তঃপুর হইতে এক দাসী আসিয়া জানাইল যে তাঁহাকে রাজমাতা আহ্বান করিয়াছেন। ফিরোজ খাঁ সেদিনের জন্য দরবার শেষ করিয়া অন্তঃপুরে মাতার সঙ্গে দেখা করিতে চলিয়া গেলেন।

"অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অবিলম্বে তিনি তাঁহার মাতার সহিত দেখা করিলেন। দাসীরা তাঁহাকে সুস্নিগ্ধ সরবৎ আনিয়া দিল। তিনি তাহা পান করিয়া তৃপ্ত হইয়া কৌচের উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় উপবেশন করিলেন। বেগম তাঁহার উদীয়মান চন্দ্রিকার ন্যায় তরুণ কান্তি মুগ্ধনেত্রে দেখিয়া গৌরব অনুভব করিলেন। দেওয়ান মাতাকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি তাঁহাকে কেন ডাকিয়াছেন। বেগম গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন—"বৎস, আমার প্রতি নিষ্ঠুর হইও না। তোমার মুখখানি আমি যতবার দেখি ততবার আমি মনে করি, তোমার বিবাহ না হইলে আমি কিছুতেই সোয়াস্তি পাইব না। বিবাহ করিতে সম্মতি দাও; তোমার তরুণ যৌবন, কেন বল যে 'বিবাহ করিব না?' আমার বারংবারের অনুরোধ কি তুমি এইভাবে অগ্রাহ্য করিবে? আমার বয়স হইয়াছে, আমার বড় ইচ্ছা যে কবরে যাওয়ার পূর্ব্বেই আমি একটী সুন্দরী বউ দেখিয়া মরি।"

"দেওয়ান তাঁহার মাতার কথা শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সহিত শুনিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন—"আমার মনের কষ্ট মা তুমি বুঝিতে পারিবে না, আমার পূর্ব্বপুরুষ ঈশা খাঁকে দিল্লীশ্বর স্বয়ং ভয় করিতেন; তাঁহার শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রমের পরিচয় পাইয়া তিনি বাচিয়া

তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বরের অতি প্রসিদ্ধ সামন্তগণও তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। আমাদের এই মহাবংশে আরও অনেক বীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এখন আমার সঙ্কল্প শুনুন—আমি অবিবাহিত জীবন যাপন করিব। আমার রাজ্যের চিন্তা দিনরাত আমার সকল চিন্তার উপরে। আমি দিল্লীতে কিছুতেই রাজস্ব পাঠাইব না। আমি আর সম্রাটের দরবারে পাগড়ী পরিয়া হাজিরা দিতে যাইব না।"

মাতা এই কথা শুনিয়া প্রমাদ গণিয়া পুত্রকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন। (পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ।) পূর্ব্ববঙ্গের পয়ারের ভাষা কঠিন বলিয়া আমরা গদ্যানুবাদ করিয়া দিলাম। অনুবাদটি প্রায় আক্ষরিক হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ফিরোজসম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলিব। কেল্লা তাজপুরের দেওয়ান ওমর খাঁর কন্যা সখিনার সহিত ফিরোজ খাঁর প্রেম হয়। ফিরোজ খাঁ তাঁহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তাব করিয়া পাঠান,—ওমর খাঁ, জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানেরা হিন্দুবংশসম্ভূত, এই আপত্তি করিয়া প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করেন এবং ফিরোজ খাঁর বংশের নানারূপ নিন্দা করেন। ক্রোধের বশীভূত হইয়া ফিরোজ খাঁ কেল্লা তাজপুর আক্রমণপূর্ব্বক রাজধানী ধ্বংস করিয়া সখিনাকে লইয়া আসেন। সখিনা স্বেচ্ছায় তাঁহার অনুগামিনী হন;—বিবাহ হইয়া যায়। ওমর খাঁ দিল্লীশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া এই সমস্ত ঘটনা নিবেদনপূর্ব্বক সহায়তা যাচ্ঞা করেন। ওমর খাঁ ইহাও বলেন যে ফিরোজ বিদ্রোহী, সে রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। দিল্লীর এক সুবৃহৎ মোগলবাহিনী লইয়া আসিয়া ওমর ফিরোজ খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কেল্লা তাজপুরের সুবৃহৎ ময়দানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের সমস্ত বার্ত্তা যথাসময়ে জঙ্গলবাড়ীতে পৌঁছে। তখন সখিনা স্বামীর বিজয়সংবাদ শুনিতে উন্মুখী হইয়াছিলেন। এমন সময়ে দাসী দরিয়া দুঃসংবাদ-জ্ঞাপনার্থ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। তাঁহাকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া সখিনা স্বয়ং বলিলেন, "গত পরশু আমার স্বামী যুদ্ধে গিয়াছেন, তিনি অবশ্য আজ অপরাহ্ণে বিজয়ী হইয়া ফিরিবেন। দরিয়া, বাগানের বড় বড় গোলাপ সংগ্রহ করিয়া রাখ, আমার বিজয়ী স্বামীকে আমি ফুলের মালা দিয়া সংবর্দ্ধনা করিব। যুদ্ধক্লান্ত হইয়া স্বামী ফিরিবেন, দরিয়া, তুমি স্বর্ণ ভৃঙ্গারে সুবাসিত সুস্নিগ্ধ জল ভরিয়া রাখ, তিনি আসিয়া 'অজু' করিবেন। যুদ্ধশ্রম অপনোদনের জন্য সেবার দরকার হইবে, আভের পাখা কাছে রাখ। আমরা তাঁহাকে ব্যজন করিব।

"সুগন্ধি তৈল এবং গোলাপ জলের বোতলগুলি সাজাইয়া রাখ, সোনার পানের বাটা ভর্ত্তি করিয়া পান রাখ, পাঁচ পীরের দরগার পবিত্র মাটী আনিয়া রাখ; দরিয়া, তিনি আসিয়া সেই মাটী যে মাথায় ছোঁয়াইবেন। পীরদের পত্নীরা আমায় আশীর্ব্বাদ পাঠাইয়াছেন, দরিয়া, তাঁহার জয়সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।" এই কথা বলিতে বলিতে আনন্দে তাঁহার দুই রক্তিম গণ্ড উজ্জ্বল হইল। তিনি থামিয়া আবার বলিলেন—"দরিয়া, একি! আজ তোমার মুখের হাসি কোথায় গেল? তোমার মুখ ম্লান দেখাইতেছে কেন? কিন্তু জানিও আমার স্বামী আজ নিশ্চয়ই বিজয়ী হইয়া ফিরিবেন, তখন তুমি নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবে।"

দরিয়া আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিল না, সে কাঁদিয়া ফেলিল এবং বলিল, "আমাদের কপাল ভাঙ্গিয়াছে, রাজকুমারি, শোণিতার্দ্র পতাকাসহ দেওয়ানের ঘোড়া ফিরিয়া আসিয়াছে, আপনার পালঙ্কে শয্যার দিন ফুরাইয়াছে,—এখন ধরাশয্যা গ্রহণ করিতে হইবে, এখন হইতে বিধবার মলিন সাজ গ্রহণ করিতে হইবে, হাত হইতে কঙ্কণ ও চুড়ী খুলিয়া ফেলুন—হীরার হার আর কণ্ঠে শোভা পায় না; এখন মুখের হাসি ফুরাইবে, রাজকুমারি! আপনার যৌবনের আশা এখন প্রাতে ফোটাফুল যেমন সন্ধ্যায় ঝরিয়া পড়ে, তেমনই অল্প সময়ের মধ্যে ফুরাইল। সংবাদ আসিয়াছে, তরুণ দেওয়ান এখন কেল্লা তেজপুরের দুর্গে বন্দী।"

ক্ষণকাল সখিনার মুখে বৈশাখী মেঘের সমস্ত আঁধার কেহ ঢালিয়া দিল! তখন রাজমাতা ফিরোজা বিবি এবং অন্তঃপুরের নারীগণ ক্রন্দনশব্দে জঙ্গলবাড়ীর রাজপ্রাসাদ মুখরিত করিতেছিলেন। কিন্তু সখিনা কাঁদিলেন না, তিনি দরিয়াকে বলিলেন, "যোদ্ধার সাজ লইয়া আইস। তাঁহার একটা ঘোড়া আমাকে দাও, আমি পুরুষবেশ ধরিয়া যুদ্ধে যাইব। আমার সৈন্যদলকে বলিও আমি দেওয়ান সাহেবের সম্পর্কে শ্যালা।"

এই তরুণ বীরবেশধারী নেতার পশ্চাৎ জঙ্গলবাড়ীর অবশিষ্ট সৈন্য চলিল। দেওয়ানের প্রিয় ঘোড়া 'দুলালে'র পিঠে চড়িয়া সখিনা সৈন্যসহ দ্রুতগতিতে চলিলেন, এক দিনের পথ আধ ঘণ্টায় গেলেন, কারণ তিনি সমস্ত মনের আগ্রহ সহ সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। কেল্লা তেজপুরের মাঠে মোগল সৈন্যের সঙ্গে তিন দিন ব্যাপী তাঁহার যুদ্ধ চলিয়াছিল। এই তিন দিন তিনি লৌহবর্ম্ম পরিধান করিয়া অভুক্ত, অস্নাত, দিন রাত "দুলালে"র পিঠে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। "পিতাই আমার শত্রু" ইহা বলিয়া তিনি তৃতীয় দিবসে কেল্লা তাজপুরের রাজপ্রাসাদে আগুন জ্বালাইয়া দিলেন। বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা সশব্দে পুড়িয়া যাইতে লাগিল। সেই অমোঘ বীরত্বের নিকট তৃতীয় দিবস অপরাহ্নে মোগল সৈন্য পরাজিত হইল। তখনও তিনি অদম্য উৎসাহে ঘোড়ার পিঠ হইতে সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। আমি এই স্থানে পুনরায় মূলের গদ্যানুবাদ দিতেছি—

"সেই মুহূর্ত্তে তাজপুরের দুর্গ হইতে একটি সৈন্য উপস্থিত হইল। সে তরুণ বীরবেশী সখিনাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আপনি মহাবীর হানিফ হইতেও বড় যোদ্ধা। আমি জঙ্গলবাড়ীর সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। মোগলেরা জঙ্গলবাড়ীর প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। এই দুর্ভাগ্য রাজধানীর পক্ষে আপনি কে যুদ্ধ করিতেছেন, তাহা আমরা জানি না। ফিরোজ খাঁ এই চিঠি দিয়া আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি মোগলদের সঙ্গে যে সর্ত্তে সন্ধি করিয়াছেন, তাহা এই দলিলে আছে। তিনি আমাকে জানাইতে বলিয়াছেন—তিনি সখিনাকে তালাক দিয়াছেন—তাঁহারই জন্য সোণার জঙ্গলবাড়ী আজ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। সর্ত্তে আরও আরও যে প্রস্তাব আছে, তাহাতেও তিনি এই সন্ধ্যাহেই সম্মত হইবেন। সুতরাং যুদ্ধ শেষ হইয়াছে।" এই বলিয়া সে ফিরোজ সাহার স্বাক্ষরযুক্ত তালাকনামা সখিনার হাতে দিল।

এক মুহূর্ত্ত সখিনা সেই দলিলটির প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। তারপর সর্পদষ্ট মানুষ যেরূপ ঢলিয়া পড়ে, তেমনই ভাবে ঘোড়ার পিঠ হইতে ঢলিয়া পড়িলেন। তাঁহার মাথার সোণার মুকুট ভাঙ্গিয়া গেল—তিনি ভূতলে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া "দুলাল" ঘোড়াটা অশ্রুপাত করিতে লাগিল। চারিদিক্ হইতে সৈন্তেরা আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। একমুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যিনি সদর্পে ঘোড়ার পৃষ্ঠে বসিয়া ছিলেন, এখন তিনি ভূলুণ্ঠিতা। জঙ্গলবাড়ীর সহর আজ প্রকৃতই তিমিরাচ্ছন্ন হইল। তাঁহার সুদীর্ঘ কুন্তলরাজি এলাইয়া পড়িল। তাঁহার দেহ হইতে পুরুষের ছদ্মবেশ খসিয়া পড়িল। তাজপুর কেল্লায় এই সংবাদ তড়িদ্‌বেগে রাষ্ট্র হইল; সেনাপতি ও সৈন্তেরা রাজ্ঞীকে চিনিতে পারিল। ওমর খাঁ ফিরোজ খাঁকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া দেখাইলেন—পূর্ণচন্দ্র মাটিতে পড়িয়া ম্লান হইয়া গিয়াছে।

তারপর ওমর খাঁ ও ফিরোজ খাঁর অনুতাপ ও ২২ জন লোকের দ্বারা খাত সমাধিতে শবের শেষকার্য্য-সম্পাদনের বিবরণী আছে।

যে রমণী স্বামীর ভালবাসার জন্ত মোগলের শত শত গুলি সহ্য করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই সাক্ষাৎ শক্তিরূপিণী মহিলা একটা সাংঘাতিক গুলি সহ্য করিতে পারেন নাই,—তাহা অবিশ্বাসী নির্ম্মম স্বামীর স্বাক্ষরিত তালাকনামা। আজও কেল্লা তাজপুরের মাঠ পড়িয়া আছে, সেখানে সাধ্বীর মাথার সিন্দূরের স্তায় উজ্জ্বল—সখিনার স্মৃতি হয়ত এখন সেই দেশের আকাশে বাতাসে মিশিয়া গিয়াছে। এই কাহিনীর ভিত্তি যে ইতিহাসমূলক তাহা বিশ্বাস করায় বাধা নাই।

সব দিক্ দিয়া দেখিলে এই সকল পল্লীগানের কথা কতটা বিশ্বাসযোগ্য তাহা অবশ্য বলা যায় না। তবে বহু বাঙ্গালী নারী যে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাইয়াছেন, তাহার নিদর্শন আছে। "চৌধুরীর লড়াই" নামক পল্লীগীতির ভিত্তি ঐতিহাসিক, তাহাতে কয়েকটি মুসলমান রমণীর অসাধারণ রণপাণ্ডিত্যের কথা বর্ণিত আছে। "মাণিকতারা"নামক গীতিকায়ও সেইরূপ বীরত্বের দৃষ্টান্ত আছে। পাঠান-রাজত্বকালে যে স্ত্রীপুরুষ সকলেরই দেহে বল এবং হৃদয়ে সাহস ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—সেই সাহস ও বল লুপ্ত করিবার জন্ত ব্যাপকভাবে মোগলশক্তি বন্তার মত আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার পূর্ব্ব আভাস হৃদয়ঙ্গম করিয়া মোগলশক্তির বিরুদ্ধে দেশের লোকেরা দাঁড়াইয়াছিল। মোগল রাজনৈতিকগণ ক্রমাগত ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া প্রতিপক্ষদিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া শেষে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। 'ভূঞা রাজারা' যদি একত্র হইতে পারিতেন, তবে মানসিংহ কিংবা ইসলাম খাঁ এদেশে কিছুই করিতে পারিতেন না। যে একটি জিনিষের অভাবে তাঁহাদের শৌর্য্যবীর্য্য বিফল হইয়া গেল, তাহা—ঐক্য।

মোগলেরা এদেশে আসিয়া যে শুধু পাঠান ও ভূঞা রাজগণের প্রতিপক্ষতা নিবারণ করিয়াছিলেন তাহা নহে। প্রথমতঃ বঙ্গেশ্বর মজঃফর খাঁ পাঠান ওমরাদের জমিদারী কাড়িয়া লইয়া তাহা মোগলদিগকে প্রদান করিলেন। পাঠানেরা তো অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহী হইলই, পরন্তু মোগল ওমরাগণও প্রীত হইলেন না, কারণ তাঁহারা যে জায়গীর পাইলেন, তাহা

নির্ব্বিবাদে ভোগ করিবার সুবিধা পাইলেন না। মোগলসম্রাট্ কর্ত্তা করিয়াও কাহাকেও কর্ত্তৃত্ব ছাড়িয়া দেন নাই। বড় বড় রাজা হইতে ছোট ছোট ভূস্বামী পর্য্যন্ত সকলের টীকি তিনি এমন ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যে সকলেই এক মহাশক্তির অধীন এবং তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব যে নামমাত্র, তাহা সর্ব্বক্ষণ তাঁহারা বুঝিতেন। জায়গীরদারগণ রাজকীয় সৈন্যরক্ষার জন্য যে রাজস্বের দরকার তদতিরিক্ত সকল টাকাই বঙ্গেশ্বরের মারফৎ দিল্লীতে পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। শুধু ইহাই চূড়ান্ত নহে—পাছে কেহ দীর্ঘকাল জায়গীর ভোগ করিয়া কোন প্রদেশে পরাক্রান্ত হইয়া উঠে, সেই আশঙ্কায় মোগলদরবারে কোন জায়গীরদার বেশী দিন তাঁহার সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিতেন না। প্রায়ই জায়গীরগুলি হস্তান্তরিত হইত। এই সকল কারণে মোগল ওমরাগণও পাঠানদের জায়গীর পাইয়া সুখী হইতে পারেন নাই। শাসনকর্ত্তার উপর ঐ সকল বিষয়ে কড়া হুকুম ছিল ("He was ordered frequently to change the Jaigirs to prevent the troops establishing themselves in any one place."—Stewart). মোগল আমীরেরাও এই সকল কারণে একত্র হইয়া আকবরের বিদ্রোহী হইলেন। এই বিদ্রোহী মোগলদের নেতা ছিলেন—খলেদী খাঁ (জলেশ্বরবাসী) এবং বাবা খাঁ (ঘোড়াঘাটের শাসনকর্ত্তা), ইঁহারা শীঘ্রই গৌড় দখল করিয়া লইলেন। আকবর এই সংবাদ পাইয়া বঙ্গেশ্বর মজঃফর খাঁকে মোগল আমীরদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহারের দরুন কটাক্ষপাত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি করিতে আদেশ করেন। আমীরেরা ঐ আদেশের কথা শুনিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, আগে রাজস্ব বিভাগের কর্ত্তা ফিজবী খাঁ ও সেই বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী পুত্রদাস আসিয়া তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ ভাল করিয়া জানিয়া যাউন, তৎপরে মিটমাট হইবে। তদনুসারে উক্ত দুই প্রধান রাজকর্ম্মচারী তাঁহাদের শিবিরে আগমন করিলেন। আমীরেরা তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া কারাগারে প্রেরণ করেন এবং তাঁহাদের আস্পর্দ্ধা ও দাবী আরও বাড়িয়া যায়। অবশেষে বিদ্রোহীরা রাজধানী তাণ্ডা অবরোধ করিয়া মজঃফর খাঁকে হত্যা করিয়া আপনাদিগকে বঙ্গদেশের মালিক বলিয়া ঘোষণা করেন।

বিদ্রোহীদের দলে ৩০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল এবং বঙ্গেশ্বর মজঃফর খাঁর হত্যার পর এই দল ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। আকবর দেখিলেন—এত রক্তক্ষয়, এত কৃচ্ছ্রসাধন এবং চেষ্টার পর বঙ্গদেশের অধিকার—তাঁহারই স্বশ্রেণীস্থ লোক—তাঁহারই পূর্ব্বতন ওমরাহগণ তাঁহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইতেছে।

এই সময়ে আকবর রাজা তোদরমল্লকে বঙ্গের মসনদে স্থাপিত করিয়া মোগল-বিদ্রোহদমনের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করেন; আকবর তাঁহাকে ৫,০০,০০০ টাকা ডাকযোগে প্রেরণ করেন। এই টাকার অধিকাংশই উৎকোচাদি দিয়া প্রতিপক্ষকে বশীভূত করার জন্য। তিনি ভাগলপুরে আসিয়া বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হন। কয়েক মাস যাবৎ উভয় পক্ষ পরস্পরের সন্নিহিত হইয়া খণ্ড যুদ্ধ-বিগ্রহ করিলেও কোন বড় সংগ্রামে লিপ্ত হয় নাই। ইহার মধ্যে রাজা তোদরমল্ল হিন্দু জমিদারদিগকে নানাপ্রকার প্রলোভন এবং

কখনও কখনও উৎকোচে বশীভূত করিয়া এতটা হস্তগত করেন যে, বিদ্রোহীরা রসদ-সংগ্রহে অসমর্থ হইলেন। দুর্ভিক্ষজনিত নানারূপ বিপদে শত্রুশিবির বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। এই সময়ে ককেশিলানদের নেতা বাবা খাঁর মৃত্যু হয়, বিদ্রোহীদের অন্যতম মাসুম কাবুলী বিহারের দিকে অগ্রসর হন। আকবর লোক বশীভূত করিবার নানা উপায় জানিতেন। যে সকল ওমরা এককালে তাঁহার সভায় অবমানিত হইয়া দণ্ডিত হইযাছিলেন, এই বিপৎকালে তিনি তাঁহাদের কার্য্যদক্ষতা ও নানাগুণ স্মরণ করিয়া স্বয়ং বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া তাঁহাদিগকে বড় বড় কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এইভাবে আজিম খাঁ ও সেরিফ্ খাঁকে তিনি বশীভূত করিয়া সেনাপতিরূপে নিয়োগ করেন। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে আজিম খাঁ মৃজাকে বঙ্গেশ্বরস্বরূপ নিযুক্ত হইয়া উৎকোচের বলে ককেশিলানদিগের নূতন নেতা জরবর্দ্দিকে বশীভূত করেন, এবং অপরাপর বিদ্রোহীদের মধ্যে গৃহবিবাদের সৃষ্টি করেন। এইভাবে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের শেষ না হইতে হইতেই বঙ্গেশ্বর তাণ্ডা রাজধানী পুনরায় দখল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন অবশিষ্ট বিদ্রোহীরা ঘোড়াঘাটে অবস্থিত হইয়া যশোর অঞ্চলে উৎপাত করিতেছিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করেন। তাঁহারা জঙ্গলে লুকাইয়া ছিলেন—কিন্তু যুবরাজ জগৎসিংহ তাঁহাদিগকে সেখানেও নিষ্কৃতি দেন নাই। তিনি তাঁহাদের বড় বড় গোলাসকল দখল করিয়া লইলেন এবং তাঁহাদের অবশিষ্ট ৫৪ টি হস্তী অধিকার করিয়া দরবারে প্রেরণ করিলেন। মোগলদের প্রবল বিদ্রোহ এইভাবে নির্ম্মূল হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পর্ত্তুগীজ দস্যু, কুচবিহার-যুদ্ধ প্রভৃতি

উৎকোচ দেওয়া, বৈবাহিক আত্মীয়তা স্থাপন করা, শত্রুশিবিরে ভেদ সৃষ্টি করা, মিষ্ট ও শিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ করা ইত্যাদি নানা বিদ্যা আকবরের করায়ত্ত ছিল। যেঁখানে এইসকল বিদ্যা কার্য্যকরী হয় নাই, সেখানে দুর্জ্জয় সিংহের মত তিনি শত্রুকে আক্রমণ করিতেন। যে কোন প্রকারে সাম্রাজ্য বৃদ্ধি ও শত্রুশির হেঁট করিয়া সকল মাথার উপর স্বীয় মাথার প্রতিষ্ঠা করা—এই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। বিশাল সাম্রাজ্যের আয় দিয়া তাঁহার ভাণ্ডার পূর্ণ করা, ক্ষমতাশালী কাহাকেও একদণ্ড স্থির থাকিতে না দেওয়া—পাছে তিনি বড় হইয়া সেখানে প্রভাব বিস্তার করিয়া বিদ্রোহী হন, শাসনকর্ত্তাদিগকে ঘন ঘন একস্থান হইতে অপরস্থানে নিয়োগ, বড় ছোট

আকবরের নীতি।

সকলের ভাণ্ডারের দিকে খরদৃষ্টি এবং চিরস্থায়ী ভাবে সেই ভাণ্ডার হইতে শ্রেষ্ঠাংশগ্রহণ—এই ছিল তাঁহার রাজনীতি। কিন্তু নিতান্ত বাধ্য না হইলে কোন দেশ লুণ্ঠন করা, কিংবা বলপূর্ব্বক কাহারও সম্পত্তি গ্রাস করা—এসকল তিনি করেন নাই। পাঠানেরা যে ভাবে অর্থ সংগ্রহ করিতেন—লুণ্ঠনাদি ছিল তাঁহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক রাজকার্য্যের অঙ্গীয়,—এসকল বিগর্হিত কাজ তিনি করেন নাই। তিনি লুণ্ঠন করিতেন না, শোষণ করিতেন। নিতান্ত অবাধ্য না হইলে তিনি কাহারও নিকট পরাক্রম দেখাইতেন না। কিন্তু প্রীতির বন্ধনে বাঁধিয়া তিনি কোন সুদৃঢ় পত্রপুষ্পাচ্ছাদিত লতার ন্যায় এই প্রবল ভারত-বিটপীকে আসমুদ্রহিমাচল জড়াইয়া ধরিয়া নির্বীর্য্য ও অন্তঃসারশূন্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই সাম্রাজ্যনীতির ফলে সমস্ত জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়—লোকে খাইয়া পরিয়া সুখে থাকিয়াও জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এই বিরাট্ রাজধানীমুখী অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে মোগলদের সৃষ্ট রাজধানী ইন্দ্রের অমরাবতী কিংবা বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ-তুল্য হইয়াছিল, কিন্তু মোগল-শাসনের সময়ে বৃন্দাবনের কয়েকটী মন্দির ব্যতীত সমস্ত দেশে হিন্দুদের বিশেষ কোন কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হয় নাই। সম্রাটের মহাশক্তির আওতায় হিন্দুস্থানের জাতীয় শক্তির অপচয় ছাড়া শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে নাই। বিদেশীয় অধিকারে বঙ্গদেশের যাহা কিছু গৌরব—তাহা পাঠান আমলের। পাঠানগণ বিদেশী কারিগর আমদানী করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না—তাঁহাদের যাহা কিছু শিল্প—তাহা খাস বাঙ্গালী শিল্পী ও স্থপতিদের কার্য্যের নিদর্শন। আকবর এই সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠা হিন্দুদের সহযোগে করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বাদ দিয়া যুদ্ধজয় হইতে পারিত, কিন্তু এরূপ বিশাল সাম্রাজ্য কেহ স্থাপন করিতে পারিতেন না। তিনি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—ইহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ করেন নাই। হিন্দুদের প্রতি তাঁহার অনুরাগ শুধু মুখের অনুরাগ ছিল না—উহা আন্তরিক ও যথার্থ ছিল। রাজা বীরবল একজন সামান্য ভাট কবি ছিলেন, তাঁহাকে আকবর রাজপদে উন্নীত করিয়া অন্তরঙ্গ বন্ধু করিয়াছিলেন। বীরবলের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তিনি তিন দিন কাহারও সহিত কথা কহেন নাই—এবং মানসিংহের ভগিনীকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়া রাজাকে সাম্রাজ্যের প্রধান কাণ্ডারী স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মানসিংহ ৭,০০০ সৈন্যের মনসবদার হইয়াছিলেন, কোন মুসলমান আমীরও এত বড় পদ পান নাই। তিনি হিন্দুদের ধর্ম্মের অনুরাগী হইয়া 'এলাহীধর্ম্ম' নামক এক নব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি তিলক পরিতেন এবং অনেক সময়ে আমিষ ভক্ষণ করিতেন না। তিনি ব্রাহ্মণদ্বারা হাতে রাখি বাঁধিতেন এবং তাঁহার রাজপুত স্ত্রীদিগের মনস্তুষ্টির জন্য 'হোম' করিতেন।* তিনি খৃষ্টান

* "Akbar marked his forehead like a Hindu and wore jewelled strings tied to his wrist by Brahmins. He forbade slaughter of cows and the eating of their flesh. From early youth in compliment to his Rajput wives he burnt *hom* and prostrated himself before the sun."
—Nizamuddin Tabakati Akbari.

পাদ্রীদের মনেও বিশ্বাস জন্মাইয়াছিলেন যে তিনি তাঁহাদের ধর্ম্মের অনুরাগী। এই সকল বিবিধগুণসত্ত্বেও তিনি হিন্দুস্থানের জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি নিজের মাথা আকাশে ঠেকাইয়া অন্য সকলের মাথা হেঁট করাইয়াছিলেন—রাজ্যবিস্তারের চেষ্টায় তিনি ক্ষুদ্র বিদ্রোহীকেও তুচ্ছ করেন নাই। রাজকীয় সমস্ত সৈন্য লইয়া তিনি তৃণ-দুর্ব্বাকেও নিষ্পেষিত করিয়াছেন। অগ্নিকণার ন্যায় অতি ক্ষুদ্র বিদ্রোহকেও তিনি মারাত্মক মনে করিতেন, তাঁহার প্রভাবে দেশের সমস্ত জ্যোতির্ম্ময় শক্তি সূর্য্যের প্রভাবে নক্ষত্রের ন্যায় হীনপ্রভ হইয়া গিয়াছিল। আকবরের সময় হইতে হিন্দুস্থানের প্রকৃত দাসত্ব আরম্ভ হয়। এই দাসত্বের বেড়ী হাতে লইয়া মানসিংহ ও তোদরমল্ল দেশে দেশে ঘুরিয়াছিলেন। বাঙ্গলার প্রতাপ ঘৃণাভরে সেই বেড়ী ফিরাইয়া দিয়া দূতকে বলিয়াছিলেন, "বেড়ী দিও আপনার মনিবের পায়।" প্রতাপ শুধু যশোরের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন—ইহা সঙ্কল্প করেন নাই,—দিল্লী পর্য্যন্ত অভিযান করিয়া রাজধানী বিধ্বস্ত করিবেন—ইহা জানাইয়া বলিয়াছেন (তরবারিখানি রাখিয়া) "যমুনার জলে ধোব এই তরবারি।" যে অনৈক্যের বীজ বাঙ্গলার জাতীয় চরিত্রের মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল—সেই বীজ সম্রাটের কূট-নীতিতে অঙ্কুরিত হইয়া প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায়ের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল। হিন্দু রাজাদের কেহ ছিলেন এই ব্যাঘ্রবিক্রম সম্রাটের নখ, কেহ ছিলেন দন্ত। সাম্রাজ্যনীতির শ্রীবৃদ্ধির উপলক্ষ হইয়াছিলেন ইহারা,—কিন্তু ইহার উদ্ভাবনী শক্তি সমস্তই আকবরের।

আকবর ও অশোক।

অশোকের সার্ব্বভৌমত্ব বাহ্যদৃষ্টিতে আকবরেরই মত, কিন্তু দুইটী সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। মৌর্য্য-রাজার অনুশাসনে স্পষ্ট করিয়া লিখিত ছিল—"আমার পুত্র ও পৌত্রগণ যেন দেশ-বিজয় বাঞ্ছনীয় মনে না করেন, তাঁহারা যেন ধর্ম্ম-বিজয়কেই যথার্থ বিজয় মনে করেন।"

আমরা দেখাইয়াছি, আকবর কিরূপে পাঠানশক্তি নির্ম্মূল করিয়া স্বয়ং মোগল ওমরাদের প্রবল বিদ্রোহ দলন করিয়া—ভূঞারাজগণের দুর্দ্দমনীয় শক্তি নিরস্ত করিয়া বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় মোগল-আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে তিনি ভেদনীতি ও উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করার কৌশল যথেষ্ট প্রয়োগ করিয়াছেন। যেখানে দরকার হইয়াছে, সেখানে যুদ্ধাদি-ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছেন, অগ্নির শেষ ও শত্রুর শেষ রাখিতে তিনি দেন নাই। জাহাঙ্গীর তাঁহার পিতার পথেই চলিয়াছিলেন, তবে আকবর তাঁহার সাম্রাজ্য-বৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য নিষ্ঠুরতা পরিহার করিয়াছিলেন, জাহাঙ্গীরের রাজত্বে সে দয়াটুকু ছিল না। পরাজিত শত্রুকে তিনি ক্ষমা করেন নাই। আকবর ইশা খাঁর সহিত সখ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু জাহাঙ্গীর প্রতাপাদিত্য, মুকুন্দ রায়, তৎপুত্র সত্রাজিৎ এবং কেদার রায়কে অব্যাহতি দেন নাই। এই সার্ব্বভৌমত্বের চেষ্টা সাজাহান পর্য্যন্ত চলিয়াছিল; আকবরের পর হইতে এই সাম্রাজ্যনীতির রথ অতি দুর্দ্ধর্ষভাবে চলিয়াছিল, আগ্রার দেওয়ানি-খাসের দ্বারের উপরিভাগে লেখা আছে "স্বর্গ যদি থাকে, তাহা এইখানে—এইখানে।" দিল্লীশ্বর লোকমতে জগদীশ্বরের স্থান লইয়াছিলেন—"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা'—এই মোগল বাদসাহত্রয় হিন্দু-মুসলমানে প্রভেদ জানিতেন না। শেষোক্ত দুই জনের ধমনীতে হিন্দুরক্ত প্রবাহিত ছিল। কিন্তু আকবর

অযথা নির্ম্মমতা করিতেন না—বশ্যতা স্বীকার করিয়া রাজস্বের শ্রেষ্ঠভাগ মোগল দরবারে পাঠাইলে তিনি কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতেন না, শত্রুপক্ষকে বশীভূত করিবার জন্ত ডাকযোগে অর্থ পাঠাইতেন। আমরা দেখিয়াছি রাজা তোদরমল্লকে তিনি পাঁচলক্ষ টাকা এই জন্ত পাঠাইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের স্থায়-অস্থায়বোধ অনেক সময়ে লুপ্ত হইত। নৌরজা উৎসবে আকবর মাতাল হইয়া নানারূপ দুষ্কার্য্য করিতেন, কিন্তু জাহাঙ্গীর যে ভাবে সের আফগানকে হত্যা করিয়াছিলেন এমন অন্যায় আকবর স্বপ্নেও প্রশ্রয় দিতে পারিতেন না।

পাঠান-শত্রু-দলন, ভূঞা রাজগণের শক্তিধ্বংস এবং মোগল শিবিরের পরাক্রান্ত ওমরাদের বিদ্রোহদমনের কথা আমরা লিখিয়াছি; কিন্তু ইহা ছাড়া এক প্রবল শত্রু বঙ্গের পূর্ব্বদক্ষিণ সীমান্তে মোগল সম্রাটের শত্রু হইয়া অত্যাচার করিয়া দেশ ছারখার করিতেছিল। ইহারা পর্ত্তুগীজ দস্যু, লৌকিক ভাষায় হার্ম্মাদ ("আরমাডা" হইতে উদ্ভূত)। মগেরা শেষ সময়ে এই জল-দস্যুদের সঙ্গে যোগ দিয়া পূর্ব্ববঙ্গে লুণ্ঠন, অপহরণ, স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার প্রভৃতি অবাধে চালাইতেছিল—এই জন্য হার্ম্মাদ শব্দ প্রথমতঃ পর্ত্তুগীজ দস্যুদিগকে বুঝাইলেও শেষে মগদিগের প্রতিও প্রযুক্ত হইত। পল্লীগীতিকাসমূহে এই হার্ম্মাদদিগের সম্বন্ধে বহু স্থানে উল্লেখ আছে (চতুর্থ খণ্ড, 'নসির মালুম' দ্রষ্টব্য)। ইহাদের গায়ে লাল কুর্ত্তা এবং মাথায় নানা বর্ণের পাগড়ী থাকিত (এই পাগড়ী সম্ভবতঃ মগদস্যুরা ব্যবহার করিত)। ইহাদের হাতে দূরবীণ থাকিত। শ্যেনপক্ষীর ন্যায় ইহারা সেই দূরবীণযোগে বহুদূর হইতে সমুদ্রগামী জাহাজ লক্ষ্য করিত, এবং অকস্মাৎ অতর্কিতভাবে বাণিজ্যদ্রব্য-বোঝাই জাহাজগুলি আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিত। কবিকঙ্কণ ষোড়শ শতাব্দীতে ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমন্ত সদাগরের নাবিকেরা "রাত্রিদিন বাহি যায় হার্ম্মাদের ডরে।" ইহারা সময়ে সময়ে সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান-সমূহে অবতরণ করিয়া অকথ্য অত্যাচার করিত। চট্টগ্রামের উপকূলের বাণিজ্য-তরীগুলি ইহাদের উৎপাতে সমুদ্রে একা যাইতে সাহস করিত না। উক্তরূপ বহুসংখ্যক জাহাজ একত্র হইয়া মিছিল বাঁধিয়া যাইত। এই তরণীর মিছিলকে "বহর" বলিত, ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধের নানা বিষাক্ত অস্ত্রশস্ত্র থাকিত, এবং বহরের মধ্যে যিনি রণপণ্ডিত থাকিতেন তাঁহারই নির্দ্দেশে জাহাজের গতি-বিধি এবং নজর প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হইত। এই প্রধান ব্যক্তির উপাধি ছিল "বহরদার"। তৎকালে সমুদ্রতীরবর্ত্তী লোকদের সাহস ও বীর্য্যবত্তা একেবারে লুপ্ত হয় নাই। হার্ম্মাদদের সঙ্গে মাঝে মাঝে অধিবাসীদের লড়াই চলিত। একটি পল্লীগীতিতে দেখিতে পাই—জেলেরা একত্র হইয়া তাহাদের বৃদ্ধ দলপতির পরামর্শ অনুসারে হঠাৎ পশ্চাৎ দিক্ হইতে আসিয়া হার্ম্মাদদের প্রত্যেকের চক্ষে মুষ্টি মুষ্টি লঙ্কার গুঁড়া নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে পালাইয়া যাইতে বাধ্য করিতেছে। হার্ম্মাদেরা ছোট ছোট ক্ষিপ্রগতি ডিঙ্গিতে আসিয়া মধুর মাছি বা পঙ্গপালের ন্যায় বণিক্‌দের জাহাজ ঘিরিয়া ধরিত। পল্লীগ্রামে ইহারা যে লুণ্ঠনকার্য্য চালাইত, তাহা দেশবাসীদের অসহ্য হইয়াছিল। সুন্দরী গৃহস্থ-বধূদের দুর্দ্দশাসম্বন্ধে আমরা অনেক পল্লীগাথা পাইয়াছি। কোন কোনটিতে বর্ণিত আছে—হৃতা রমণী তাঁহার স্বামীকে

পর্ত্তুগীজ জলদস্যু 'হার্ম্মাদ'।

স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতেছেন, "অভাগিনীকে মনে রাখিও। ঘাটে আমার কলসী পড়িয়া রহিল, আমার হাতের কঙ্কণ ফেলিয়া আসিয়াছি; আমাকে মনে করিয়া দুঃখ হইলে কঙ্কণ ও কলসী তোমার হাত দুখানি দিয়া ছুঁইও—তাহাতে আমি জুড়াইব। আর সুন্দরী দেখিয়া একটি মেয়ে বিবাহ করিও। আমি যে আদর ও স্নেহের জন্য পাগল ছিলাম, তাহা তাহাকে দিও, হতভাগিনীর অদৃষ্টে তাহা নাই।" বার্নিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্তে দেখিতে পাওয়া যায়—পর্ত্তুগীজ দস্যুরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রুতগামী জাহাজে শুধু সমুদ্রে বা উপকূলে নহে, কখনও শতাধিক মাইল দূর পর্য্যন্ত স্থলপথে যাইয়া লুণ্ঠন করিত। বিবাহ-বাসরে এবং অপরাপর উৎসবে ইহারা হঠাৎ যমদূতের ন্যায় উপস্থিত হইয়া অকথ্য অত্যাচার করিত। ইহাদের ভয়ে সমুদ্রের তীরবর্ত্তী অনেক দ্বীপ ও নগরী জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল। যদুনাথ সরকার মহাশয় অক্সফোর্ড লাইব্রেরীর তালীসের গ্রন্থের পরিশিষ্ট (Persian MS., Bod 569, Entry No. 240) হইতে এই দস্যুদের একটি বিবরণী দিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়—ইহারা বন্দীদিগের হাতের তালু ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে সরু বেত চালাইয়া দিয়া শত শত স্ত্রীপুরুষকে পশুর মত টানিয়া আনিয়া জাহাজের পাটাতনের নীচে রাখিত এবং লোকে যেরূপ পাখীদের জন্য শস্য ছড়াইয়া দেয়—সেইভাবে তণ্ডুলমুষ্টি হতভাগ্যদের সম্মুখে ছড়াইয়া দিত। অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইত। যাহারা বাঁচিত, তাহাদিগকে দাক্ষিণাত্যের ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী বণিকের নিকট বিক্রয় করিত। কোন কোন সময়ে তমলুক ও বালেশ্বর বন্দরেও তাহাদিগকে বিক্রয় করা হইত। পাদ্রী ম্যানরিকের বর্ণনায় পাওয়া যায়, "প্রত্যেকেই জানেন এই পর্ত্তুগীজ দস্যুরা কিরূপ প্রতিবৎসর বাকলা, শালিমাবাদ, যশোর, হুগলী, হিজলী, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্য আক্রমণ করিয়া (মোগল) শত্রুর শক্তি নাশ করিয়াছে। এমনও বৎসর গিয়াছে, যে বৎসর তাহারা এই রাজ্যের এগার হাজার পরিবারকে আনিয়া বিক্রয় করাইয়াছে" (Bengal Past and Present, 1916, Part II, p. 58)। এই দস্যুরা এক সময়ে পাঁচ বৎসরের মধ্যে ১৮,০০০ লোক ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। মগদস্যুরা এই পর্ত্তুগীজদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া দেশে যে অরাজকতার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা অতি ভয়াবহ। তাহাদের স্পর্শদোষে অনেক ব্রাহ্মণ-পরিবার এখনও পতিত হইয়া আছেন। বিক্রমপুরে 'মগব্রাহ্মণ'দের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। মগ ও পর্ত্তুগীজদের ঔরসজাত অনেক সন্তানে এখনও বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ। ফিরিঙ্গীদের সংখ্যা চট্টগ্রাম, খুলনা ও ২৪-পরগনার উপকূলে, নোয়াখালীতে, হাতিয়া ও সন্দীপে, বরিশালে, গুণসাখালি, চাপলি, নিশানবাড়ী, মউধোবি, খাপড়াভাঙ্গা, মগপাড়া প্রভৃতি স্থানে অগণিত। ঢাকায় ফিরিঙ্গিবাজারে, তাহা ছাড়া কক্সবাজারে ও সুন্দরবনে হরিণঘাটার মোহানায় অনেক দুঃস্থ ফিরিঙ্গী বাস করিতেছে। বাঙ্গলাদেশে পর্ত্তগীজদের কীর্ত্তি এইখানেই শেষ হয় নাই। অনেক পর্ত্তুগীজ শব্দ বাঙ্গলার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা এই জাতির বাঙ্গলাদেশে ব্যাপক প্রভাব প্রতীয়মান হয়। আনারস, পেঁপে, পেয়ারা, জামরুল, কামরাঙ্গা, নোনা, আতা, রাঙ্গাআলু প্রভৃতি আমরা পর্ত্তগীজদের নিকট হইতে পাইয়াছি। এখনও এদেশে 'ফিরিঙ্গী খোপা' প্রচলিত।

পাঁউরুটির পূর্ব্ব নাম ছিল "ফিরিঙ্গী রুটি।" কড়ি-বরগা, জানেলা, গরাদিয়া, কামরা, বারেন্দা, আলমারি, কেদারা (chair), মেজ, আলপিন্, ফিতা, চাবি, বোতাম, বয়েম, বোতল, বাতি, বাসন, কামান, পিস্তল, লস্কর, বজরা, বয়া, মাস্তুল, তুফান, মিস্ত্রী, কামিজ, ইস্ত্রী, কাপড়, কুঠি, আয়া, ছাপা, জোলাপ, নীলাম প্রভৃতি শব্দের অনেকগুলিই বোধ হয় পর্ত্তুগীজ ভাষা হইতে আমদানী। হালহেড সাহেব লিখিয়াছেন, এক সময়ে ভদ্রলোকেরা এই সকল বিদেশী শব্দের যত বেশী মিশ্রণদ্বারা বাঙ্গলাভাষায় কথা কহিতেন, ততই তাঁহাদের বাহাদুরী ছিল। (মদ্রচিত Bengali Prose Style এবং সতীশ মিত্র মহাশয়ের যশোর ও খুলনার ইতিহাস দ্রষ্টব্য। এই শেষোক্ত পুস্তক হইতে আমি অনেক সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।) পর্ত্তুগীজগণ তাহাদের নির্ব্বিচার ও অবাধ ব্যভিচারদ্বারা বাঙ্গলাদেশে কতকগুলি ব্যাধির সৃষ্টি করিয়াছিল। ভাবপ্রকাশে "ফিরিঙ্গী ব্যাধি" নামক রোগের উল্লেখ আছে। এই দুঃসাধ্য-পীড়ার ফলে গলিতকুষ্ঠাদি জন্মে। "গন্ধরোগঃ ফিরঙ্গোঽয়ং জায়তে দেহিনাং ধ্রুবম্" (শব্দকল্পদ্রুম—ফিরঙ্গ শব্দ, ২৮০-৪ পৃঃ)।

ভাস্কোডিগামার সময় হইতে পর্ত্তুগীজগণ এদেশে আসিতে থাকে। কালিকটের এক মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভাস্কোডিগামা এক দুর্গাদেবীর মন্দিরকে মেরীর মন্দির মনে করিয়া পাণ্ডাদের গঙ্গাজলকে জরডনের জল ভাবিয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। হুসেন সাহের সময়ে বাঙ্গলায় ইহাদের প্রথম আবির্ভাব। কোয়েলেহ, সিলভিয়া প্রভৃতি পর্ত্তুগীজ নেতৃগণ আসিয়া এদেশে দস্তুরমত আড্ডা স্থাপন করেন। ১৫২৮ খৃঃ অব্দে ইহাদের অধিনায়ক মেলো বাণিজ্যের ছলে অত্যাচার করার অপরাধে অনেকদিন গৌড়ে বন্দী হইয়া থাকেন। কালে চট্টগ্রাম, সপ্তগ্রাম ও হুগলী ইহাদের বাণিজ্য-কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। শের খাঁর সময়ে ইহারা মামুদ সাহের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। ১৫৮৮ খৃঃ অব্দে চট্টগ্রাম ইহাদের সম্পূর্ণ অধিকৃত হয়। ইহারা বিচ্ছিন্নভাবে বঙ্গের নানা স্থানে আড্ডা স্থাপন করিয়া দেশবাসীদের উপর অত্যাচার চালাইত। কোন স্থায়ী অধিকার বা সর্ব্বজনসম্মত নেতা বা শাসনপদ্ধতি ইহাদের ছিল না। একসময়ে ইহারা আরাকানপতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল—ইহাদের নৌবল যথেষ্ট ছিল। মগদিগের সঙ্গে শেষে ইহাদের বেশ ভাব হইয়া যায়। তখন মগ ও পর্ত্তুগীজ একত্র হইয়া বঙ্গদেশ লুটপাট করিয়া খাইত। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে আরাকান-রাজ তাঁহার রাজ্যের সমস্ত পর্ত্তুগীজকে নিহত করিতে আদেশ দেন। তখন ইহারা অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা সন্দ্বীপের মোগল শাসনকর্ত্তা ও সেই স্থানবাসী পর্ত্তুগীজদিগকে নিহত করে। ইহাদের অত্যাচারে ফতে খাঁ (সন্দ্বীপের শাসনকর্ত্তা) ইহাই চূড়ান্ত ব্যবস্থা মনে করিয়া পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদিগকে একেবারে নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে যুদ্ধ-জাহাজ লইয়া দক্ষিণ সাহাবাজপুরে উপস্থিত হন। কিন্তু পর্ত্তুগীজগণ জলযুদ্ধে বিশেষ ওস্তাদ ছিল। সিবাস্তিয়ান গঞ্জালেস নামক এক নেতার অধীনে জলদস্যুগণ ফতে খাঁর সহিত অতি বিক্রমসহ যুদ্ধ করিয়া মোগল-সেনাপতি ও তাঁহার সমস্ত সৈন্য ধ্বংস করে। গঞ্জালেসের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পায়, এবং তিনি সন্দ্বীপ দখল করিয়া তথাকার রাজা হন। সেখানকার মুসলমানদিগকে

তিনি একেবারে নির্মূল করেন। পার্শ্ববর্ত্তী রাজারা তাঁহার আকস্মিক সফলতায় আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্বস্থাপনের জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন—কিন্তু গঞ্জালেস অহঙ্কারে দৃপ্ত হইয়া সেই সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এদিকে আরাকান-রাজের ভ্রাতা অনাপরম তাঁহার রাজভ্রাতার দ্বারা কোন অপরাধের জন্ত দণ্ডিত হন। তিনি গঞ্জালেসকে বহু অর্থ ও তাঁহার ভগিনীকে পত্নীস্বরূপ দিয়া আরাকান-রাজ্য জয় করিতে ষড়যন্ত্র করেন, কিন্তু গঞ্জালেস ও অনাপরমের অভিযান ব্যর্থ হয়—আরাকান-রাজের সঙ্গে ইঁহারা পারিয়া উঠেন না। তথাপি অনাপরমের দত্ত বহু অর্থ পাইয়া পর্ত্তুগীজ বীর প্রীত হন এবং উক্ত যুবরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি স্বয়ং আত্মসাৎ করেন। ১৬১০ খৃঃ অব্দে আরাকানের রাজা গঞ্জালেসের সঙ্গে বাঙ্গলাদেশে আসিয়া লক্ষ্মীপুর পর্য্যন্ত দখল করিয়া লন। মোগলেরা এক প্রকাণ্ড বাহিনী সঙ্গে আনিয়া উঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন, আরাকানরাজ ও গঞ্জালেস উভয়েই বহুকষ্টে প্রাণরক্ষা করিয়া পলায়ন করেন। গঞ্জালেস অতি বড় দুর্বৃত্ত ছিলেন, ইনি এই সময়ে মগরাজের কয়েকজন অমাত্যকে সন্ধির একটা প্রস্তাব করিবার ছলে নিজ জাহাজে আনিয়া নিহত করেন এবং পরে গোয়ার শাসনকর্ত্তার অধীনত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহাকে আরাকানরাজ্য অধিকারের লোভ দেখাইয়া তথা হইতে ডন ফ্রান্সিস নামক সেনাপতির অধীনে একদল সৈন্ত আনয়ন করেন। ইঁহারা আরাকানরাজ্যের প্রান্তভাগ লুণ্ঠন করিতে থাকেন। আরাকানের রাজা ওলন্দাজদের সহায়তায় পর্ত্তুগীজদিগকে সম্পূর্ণ-রূপে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধে ডন ফ্রান্সিস নিহত হন এবং গঞ্জালেস পালাইয়া যান। আরাকানরাজ অনায়াসে সন্দ্বীপ দখল করিয়া লন (১৬১৮ খৃঃ অব্দ)। ১৬৬৩ খৃঃ অব্দে নবাব সায়েস্তা খাঁ আরাকানরাজকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া হুসেনবেগ সেনাপতির দ্বারা মোগলের নষ্ট ক্ষমতা উদ্ধার করেন। প্রায় ৫০ বৎসর কাল এই মগেরা এবং পর্ত্তুগীজ দুর্ব্বৃত্তেরা মিলিত হইয়া বঙ্গদেশে যে অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে তাহার কতক কতক বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে; বার্নিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করিলে তৎসম্বন্ধে আরও অনেক ভয়াবহ কথা জানিতে পারা যায়। এই পর্ত্তুগীজ দস্যুরা গর্ব্ব করিয়া বলিত, "পাদ্রীরা ১০ বৎসরের চেষ্টায় যত লোককে খৃষ্টান করিয়াছে আমরা এক বৎসরে তদপেক্ষা বেশী করিয়াছি।" ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে সায়েস্তা খাঁর সেনাপতি ওমেদ খাঁ ও হুসেনবেগ চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ দখল করেন। মগেরা ১,২২৩টি কামান ফেলিয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশ ধনরত্ন ভূনিম্নে প্রোথিত করিয়া যাওয়াতে মোগলেরা আশানুরূপ অর্থ পাইতে পারেন নাই। আরাকানরাজের সঙ্গে একত্র হইয়া ইহারা মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করিত। আরাকানরাজের সৈন্তগণের মধ্যে অনেক পর্ত্তুগীজ সৈন্ত ছিল, কিন্তু ইহারা কোন বেতন পাইত না। বাঙ্গলা দেশটা আরাকান-রাজের অনুমতিক্রমে ইহারা জায়গীর বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। সেখানে বারমাস ইহারা লুণ্ঠন, হরণ এবং অত্যাচার চালাইত (J. A. S. B., 1907, No. 6, p. 425)।

ইসলাম খাঁ তাঁহার রাজধানী ঢাকায় স্থাপন করিলেন। এই মগ ও পর্ত্তুগীজদিগকে দমন করাই তাঁহার এই রাজধানী-পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ ছিল। তৎপূর্ব্বে প্রতাপাদিত্য

মগ ও পর্ত্তুগীজদের দৌরাত্ম্য অনেক পরিমাণে দূর করিয়াছিলেন। এমন কি ছলনাপূর্ব্বক সন্দ্বীপের শাসনকর্ত্তা কার্ভালোকে ধুমঘাটে আনিয়া অবিচারে নিহত করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় পর্ত্তুগীজদের মহা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। অনেক পর্ত্তুগীজ পাদ্রী এদেশ হইতে পালাইয়া যান। ইসলাম খাঁ পর্ত্তুগীজদিগের অত্যাচার অনেকটা নিবারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী সায়েস্তা খাঁ ইহাদিগকে একেবারে সায়েস্তা করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজ ও মগেরা সায়েস্তা খাঁর অভিযানে চট্টগ্রাম হইতে যেভাবে পালাইয়া যান, তাহাতে পর্ত্তুগীজ ও ফিরিঙ্গীগণ একেবারে শক্তিহীন হয়; এবং "মগের মুল্লুকের" বঙ্গবিশ্রুত অত্যাচার একেবারে গল্পের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। মগেরা যে ক্ষিপ্রকারিতার সহিত চট্টগ্রাম হইতে পালাইয়া গিয়াছিল—তাহার স্মৃতি এখনও তদ্দেশীয় লোকের স্মৃতিতে জাগরূক আছে। মগ-দিগের পলায়ন জেনোফোনের "Retreat of the Ten Thousand" এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। লৌকিক কথায় এই পলায়নের নাম "মগ-ধাওনি।" মগেরা পালাইবার সময়ে তাহাদের দেববিগ্রহ ও অতুল ঐশ্বর্য্য মৃত্তিকার নীচে পুঁতিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। আরাকানে যাইয়া সেই গচ্ছিত ধন ও দেবমূর্ত্তি প্রোথিত করিবার স্থানের একটা সাঙ্কেতিক মানচিত্র তাহারা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। বহুকাল পরে যখন দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছিল, তখন মগ-পুরোহিতেরা সেই মানচিত্রহস্তে ধূমকেতুর মত চট্টগ্রামে উদিত হইয়া সেই গুপ্ত দেববিগ্রহ ও মণিরত্নমোহরপূর্ণ কুম্ভ উঠাইয়া লইয়া যাইতেন। এখন পর্য্যন্ত নাকি মগ-পুরোহিতেরা সে সন্ধান ত্যাগ করেন নাই, তাঁহারা মানচিত্র লইয়া মাঝে মাঝে দেখা দেন। সম্প্রতি চট্টগ্রামের দেয়াঙ্গ পাহাড়তলীতে বহু বুদ্ধ ও অপরাপর বিগ্রহ ভূনিম্নে পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি অটুট ও উৎকৃষ্ট অবস্থায় আছে—ইহারা যে সেই মগ-ধাওনির সময়কার পরিত্যক্ত বিগ্রহ, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বহুকাল পূর্ব্বে আমি মগ-ধাওনির সময়কার কয়েকখানি বুদ্ধ ও গণেশমূর্ত্তি পাইয়াছিলাম, তাহার একখানি আমি জয়নগর-মজিলপুর-বাসী প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানী কালিদাস দত্ত মহাশয়কে দিয়াছি। 'নছর মালুম' নামক পল্লীগাথায় (পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড) মগ-পুরোহিতগণ কিরূপে চট্টগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া সেই সকল গুপ্তধন পুনরুদ্ধার করিতেন, তাহার একটি কৌতুকাবহ কাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে।

সায়েস্তা খাঁ এই ভাবে মগদিগের হস্ত হইতে চট্টগ্রাম উদ্ধার করিয়া উহাকে 'ইসলামবাদ' নামে পরিচিত করেন। মগ ও পর্ত্তুগীজ দস্যুর অত্যাচার বিশেষভাবে সেই সময় হইতে নিবারিত হইলেও, পর্ত্তুগীজদের সাময়িকভাবে এখানে-সেখানে দস্যুতার কথা ইংরেজ আমলেও শুনা যাইত। লঙ্গ সাহেব লিখিয়াছেন—১৮২৪ খৃঃ অব্দেও মগ দস্যু-কলিকাতাবাসীরা ভয় করিত। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট গঙ্গার একটা বাঁধ তৈরী দিগকে করিয়া মগ ও পর্ত্তুগীজ দস্যুদের আসিবার পথ বন্ধ করিয়া দেন। বর্ত্তমান "উদ্ভিদ্-বীথিকার" (Botanical Garden) কাছে এই বাঁধ ছিল।

পাঠান ও ভূঞারাজগণের প্রতিপক্ষতা ও খাস মোগল শিবিরের বিদ্রোহদমন এবং পরিশেষে মগ ও পর্ত্তুগীজ দস্যুদের অত্যাচার-নিবারণের পর বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যাতে

মোগল-সাম্রাজ্যের অধিকার মেঘনির্মুক্ত আকাশের স্তায় পরিষ্কার হইয়া গেল। তখন দিল্লীশ্বরের একাধিপত্য। যে সকল বীর আগ্রা পর্য্যন্ত অভিযান করিয়া যমুনার জল মোগলরক্তে রঞ্জিত করিয়া তাঁহাদের জয়ী খড়্গ সেই জলে ধৌত করিবেন, এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তখন সেই সকল উচ্চাভিলাষী বীরের বংশধরেরা সম্রাটের প্রতিনিধির দরবারে কুর্নিশ করিতে করিতে যাইয়া রাজস্বদানপূর্ব্বক কুর্নিশ করিতে করিতে দরবার ত্যাগ করিতেন। প্রবল দস্যু, প্রবল রাজা, প্রবল পাঠান, প্রবল মোগল—ইহারা সকলেই কেহ-বা শির দিয়া, কেহ-বা শির হেঁট করিয়া স্বীয় অধিকারভ্রষ্ট হইলেন। আকবরের চাল-বাজিতে মোগল শক্তির এইভাবে জয় হইল। ইহার পরে রাষ্ট্র-বৃদ্ধির কথা। তাহাও আমরা সংক্ষেপে বলিয়া যাইব।

কুচবিহার রাজ্যের পূর্ব্বসীমায় ব্রহ্মপুত্র নদ, দক্ষিণে ঘোড়াঘাট, পশ্চিমে ত্রিহুত এবং উত্তরে আসাম ও তিব্বতের পর্ব্বতমালা। এই পার্ব্বত্য প্রদেশ বহুকাল হইতে স্বাধীন ছিল।

কুচবিহার রাজ্য।

১৪২২ শকে (১৫০০ খৃঃ) বর্ত্তমান রাজবংশের আদিপুরুষ বিশু সিং বা বিশ্বনাথ সিংহ জন্মগ্রহণ করেন; প্রবাদ ইনি শিবপুত্র। ষ্টুয়ার্ট সাহেব মোগলদিগের সঙ্গে কোচরাজাদের যে সংঘর্ষের বিবরণ দিয়াছেন তাহা এই :—১৫৯৫ খৃঃ অব্দে কুচবিহারের রাজা লক্ষ্মণনারায়ণ মানসিংহের সহিত দেখা করিয়া স্বেচ্ছায় মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। এই রাজার একলক্ষ পদাতিক সৈন্য, ৪,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ৭০০ হস্তী এবং ১,০০০ রণতরী ছিল। মোগলদিগের সঙ্গে এই অহেতুকী প্রেম ও দাসত্বের নাগপাশ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লওয়াতে তাঁহার আত্মীয়, সুহৃৎ এবং পার্শ্ববর্ত্তী রাজারা অত্যন্ত বিরক্ত হন; তাঁহারা একত্র হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজা স্বীয় দুর্গে আশ্রয় লইয়া বঙ্গাধিপের নিকট স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপনপূর্ব্বক সাহায্য প্রার্থনা করিয়া চিঠি লিখেন। মোগলেরা এই সুবর্ণ-সুযোগ কেনই বা ছাড়িবেন? জেহাজ খাঁর অধীন একদল মোগল সৈন্য যাইয়া রাজশত্রুদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে মুক্তি দান করে—এই ভাবে কুচবিহার রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয়।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কুচবিহারের রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়, তৎকালে তাঁহার পুত্র হরেন্দ্রনারায়ণ শিশু ছিলেন। প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্ব প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপক ছিল। ইহার খাস মুন্সী জয়নাথ ঘোষ (মুন্সী) রাজার রাজ্যভার গ্রহণের সময়ে কুচবিহাররাজ্যের একখানি ইতিহাস লিখিতে আদিষ্ট হন। যোগিনীতন্ত্র প্রভৃতি পুস্তকে উক্ত রাজ্যের পূর্ব্বতন ইতিহাস লিখিত ছিল, এরূপ জানা যায়। জয়নাথ মুন্সীর ইতিহাস ১৫০০ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ। ১৫২৩ খৃঃ অব্দে মহারাজ বিশ্বসিংহ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এই দুর্লভ পুস্তকখানির একখানি পাণ্ডুলিপি আমি পাইয়াছি, ইহা এপর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। অনুমান ১৮১০ খৃষ্টাব্দে এই ইতিহাসের লেখা সুরু হইয়াছিল। প্রাচীন কালের ধরনে ইহাতে আজগুবি গল্পের অভাব নাই, কিন্তু রাজাদের রাজনৈতিক জীবন এবং রাজত্বের প্রধান প্রধান

ঘটনা এই পুস্তকে যথাযথরূপে বিবৃত হইয়াছে। জয়নাথ মুন্সী রাজবাড়ীর সমস্ত কাগজপত্র, প্রাচীন দলিল দেখিয়া এবং বহু বৃদ্ধ ব্যক্তির বাচনিক বিবরণগুলি শুনিয়া ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। 'প্রত্যক্ষ' খণ্ড অর্থাৎ হরেন্দ্রনারায়ণ ও তৎপরবর্ত্তী রাজার ইতিহাস তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার চোখে দেখা। তন্মধ্যে কোন ভুল আছে বলিয়া আমার মনে হয় না।

মোগলদিগের সঙ্গে কুচবিহারের যে সংঘর্ষের বিবরণ ষ্টুয়ার্ট দিয়াছেন, তাহার অনেকটাই সম্ভবতঃ মুসলমান ঐতিহাসিকগণকর্ত্তৃক প্রদত্ত কাহিনী হইতে সংগৃহীত। এই বিবরণের সঙ্গে জয়নাথ মুন্সীর কথিত বৃত্তান্তের অনেকাংশে মিল নাই। প্রথমতঃ রাজার নাম লক্ষ্মণ-নারায়ণ নহে,—লক্ষ্মীনারায়ণ। এসম্বন্ধে রাজবাড়ীর সুদীর্ঘকালের কর্ম্মচারী রাজানুগৃহীত লেখক রাজাদেশে লিখিত পুস্তকে রাজার বংশাবলীসম্বন্ধে ভুল করিবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। লক্ষ্মীনারায়ণ ১৫৮৭ খৃঃ সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া ১৬২১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। জয়নাথ মুন্সীকৃত "রাজাবলী"তে দৃষ্ট হয়, মোগল সেনারা কুচবিহারে আসিয়া উৎপাত করে। রাজা স্বয়ং রণক্ষেত্র অপেক্ষা অন্দরমহলই বেশী আরামপ্রদ মনে করিতেন, এজন্য স্বয়ং যুদ্ধে না যাইয়া সেনাপতিদিগকে প্রেরণ করিলেন,—তাঁহারা মোগল সৈন্যদের দ্বারা পরাস্ত হইলেন। মোগলেরা রাজ্যের অনেক ক্ষতি ও লুণ্ঠনাদি করিয়া চলিয়া গেল। রাজার দুই পুত্র বজ্রনারায়ণ আর ভীমনারায়ণ অসীম দৈহিক শক্তিশালী ছিলেন, কিন্তু রাজা বিলাসী ও অলসপ্রকৃতি ছিলেন। একদা মুকুন্দ সার্ব্বভৌম নামে এক মহাপণ্ডিতকে রাজা অবমানিত করেন। এই ব্যক্তি মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীরের নিকট যাইয়া নালিশ করেন। জাহাঙ্গীর হিন্দুর দৌহিত্র, তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে আদর করিতেন। মুকুন্দ পণ্ডিত তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন, তাঁহার প্রবর্ত্তনায় কুচবিহার দখল করিবার জন্য তিনি গৌড়ের রাজপ্রতিনিধিকে আদেশ করেন। মোগল সৈন্যগণ কুচবিহার আক্রমণ করে, কিছু সময় ব্যাপিয়া যুদ্ধ হইতে থাকে। কোন কোন যুদ্ধে মোগলেরা পরাস্ত হইলেও মোটের মাথায় তাহারাই জয়ী হইয়া রাজ্য লণ্ডভণ্ড করিতে থাকে। উপায়ান্তর না দেখিয়া মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন। দিল্লী থাকা কালীন তৎপুত্রদ্বয় বজ্রনারায়ণ ও ভীমনারায়ণ-কর্ত্তৃক কতকগুলি অলৌকিক কার্য্য সাধিত হয়—তাহাতে দরবারে তাঁহাদের বীরত্বের কথা প্রচারিত হয়। এই সকল ঘটনা নিছক গল্প বলিয়া মনে হয়। একটা ক্ষুদ্র গলি দিয়া রাজা যাইতেছিলেন—একটা হাতী বিপরীত দিক্ হইতে আসিতেছিল। রাজাদের ফিরিয়া যাইবার প্রথা নাই,—সুতরাং রাজা অগ্রসর হইতে থাকেন। পথ হাতীকে ফিরাইবার যোগ্য প্রশস্ত ছিল না; মাহুত কি করিবে? এমন সময়ে কুমার বজ্রনারায়ণ "হস্তীর দুই দন্ত ধারণ করিয়া পিছু পানে এমন করিয়া ঠেলিয়া দিলেন যে হস্তী চীৎকার করিয়া পশ্চাদ্গামী হইল।" আর একদিন রাজা যমুনাতে স্নান করিয়া তর্পণ ও আহ্নিক করিতেছেন—এমন সময়ে একটি ১৬ দাঁড়ী নৌকা সেই ঘাটে বেগসহকারে উপস্থিত হইল, রাজা হয়ত গলুইয়ের আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত

হইতেন কিন্তু ভীমনারায়ণ তাঁহার কবাটতুল্য বিশাল বক্ষ দ্বারা নৌকাটা অভিমুখে ফিরাইয়া দিলেন। তৃতীয় গল্পটি এই যে রাজা যাহাতে মাথা হেঁট করেন এজন্য তাঁহার পথে জাহাঙ্গীর একটা ক্ষুদ্র তোরণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন শিববংশীয় নৃপতিরা কাহারও নিকট মাথা হেঁট করিবেন না, এই তাঁহাদের পণ। বজ্রনারায়ণ "ঐ দ্বার মস্তকে ধারণ করিয়া আরো উচ্চ করিলেন—রাজা ও ভীমনারায়ণ মাথা নত না করিয়া স্বচ্ছন্দে প্রবিষ্ট হইলেন।

জয়নাথ মুন্সী লক্ষ্মীনারায়ণের এই সকল কাহিনী দিয়াছেন, তাহা তাঁহার সময় হইতে দুইশত বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। ভীমনারায়ণ ও বজ্রনারায়ণ অবশ্যই বীরপুরুষ ছিলেন, কিন্তু এই সকল গল্পগুজব এই দুই শত বৎসরের মধ্যে সৃষ্ট হইয়া কুচবিহাররাজ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। রাজপুত্রদের দেহে শক্তির প্রবাদের উপর খুব মোটা তুলিতে রং ফলান হইয়াছিল। জাহাঙ্গীরের সঙ্গে রাজার দেখা-শুনার কথাটা বোধ হয় সত্য। জয়নাথ মুন্সী-কথিত রাজা ও সম্রাটের সঙ্গে সন্ধির সর্ত্ত ঠিক বলিয়াই মনে হয়। গ্রন্থকার সম্ভবতঃ উহা রাজকীয় দলিল-পত্রের মধ্যে পাইয়াছিলেন। সর্ত্ত অনুসারে মোগলেরা কুচবিহার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া কোনরূপ অত্যাচার করিতে পারিবে না। কিন্তু তদবধি "রাজার নারায়ণী মুদ্রা পূরা থাকিবে না, অর্দ্ধমুদ্রাতে মোগল সম্রাটের নাম অঙ্কিত থাকিবে।" এইরূপে মহারাজ লক্ষ্মী-নারায়ণ দিল্লীশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণের এই বশ্যতা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। মধ্যে মধ্যে মোগলদের সঙ্গে সংঘর্ষ এবং সাময়িকভাবে বিজিত হইলেও কুচবিহার ১৭০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। তাঁহাদের নারায়ণী মুদ্রা একই ভাবে সদর্পে প্রচলিত হইত। কুচবিহারের পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলি ভীষণ আত্মকলহ, ভুটিয়াদের সহিত সংগ্রাম প্রভৃতির বিবরণে পূর্ণ।

মুণ্ডমালা ও তুরুককাটা।

পঞ্চবর্ষবয়স্ক মহারাজ মহীন্দ্রনারায়ণের সময়ে অমাত্যগণ স্বস্ব প্রধান হইল। ঢাকার এব্রাহিম খাঁ এবং তৎপুত্র জবরদস্ত খাঁর সঙ্গে তাঁহারা মিলিত হইয়া কিঞ্চিৎ কর দিতে স্বীকৃত হইয়া তখন ঘোড়াঘাটে যে ফৌজদার থাকিত তাহারই অনুগত হইতে লাগিল। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে মহীন্দ্রনারায়ণের সেনাপতি মুসলমানদিগের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। "মোগল-সৈন্য এক যুদ্ধ জয় করিয়া রাজসৈন্যের মস্তক কাটিয়া মালা গাঁথিয়া বাঁশের উপর লটকাইয়া রাখিয়াছিল,—ইহাতেই সেই স্থানের নাম হইল 'মুণ্ডমালা'। রাজসৈন্য প্রতিশোধ লইতে ছাড়ে নাই, তাহারাও একস্থানে অনেক যবনের শিরশ্ছেদ করিয়াছিল, সে স্থলের নাম হইল 'তুরুককাটা'। জয়নাথ মুন্সীর বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে ষ্টুয়ার্ট সাহেবের উক্তির অনেক স্থলেই মিল নাই। কিন্তু এই সকল যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস মুন্সী মহাশয় এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন যে তাঁহার কথা আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না। আমরা দেখিতেছি যে ষ্টুয়ার্ট সাহেব পুনঃ পুনঃ কুচবিহার-জয়ের কথা লিখিয়াছেন (১৯১, ২১৪, ২৭৪, ৩২৪, ৩২৫, ৩৬৯ ও ৪০৫ পৃঃ, বঙ্গবাসীর সংস্করণ)। কিন্তু একবার জয় হইলে তাহার পরে যে রাজারা পুনরায় স্বাধীন কি ভাবে হইয়াছিলেন—সেই অবকাশ

পূরণ করেন নাই। মুসলমান লেখকেরা তাঁহাদের পরাজয়ের কথা সাধ্যমত গোপন করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ঢাকার ফৌজদার মহম্মদ আলি মহারাজ রূপনারায়ণের (১৬৮৪-১৭৬৩ খৃঃ) সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া রংপুরে পালাইয়া গিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, একথা মুসলমানেরা কোন ইতিহাসে উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। ১৬৮৪-৮৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাঙ্গলার নবাব জবরদস্ত খাঁর সহিত মহারাজ রূপনারায়ণের এক সন্ধি হইয়াছিল। মহারাজ হারিয়া গিয়া এই সন্ধিতে দস্তখত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরে ঢাকাতে ছিলেন নবাব জবরদস্ত খাঁ, তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন, চাকলে বোদা ও চাকলে পাটগ্রাম ও চাকলে পূর্ব্বভাগ মহারাজের অধিকারে থাকিবেক সুবাকে কিছু কর দিবেন। ছত্রধারী—গজসিকার রাজা, অন্যকে কর দেওয়া কর্ত্তব্য নহে এমতে শান্তনারায়ণ নাজির দেও বনামে ইজারা লিখিয়া ঐ নামে কর দিতেছিলেন।" কিন্তু সুবেজাতের সেরেস্তাতে শান্তনারায়ণের মারফৎ চাকলে বোদা ও গয়রহ্ তরফ রূপনারায়ণ মহারাজা বেহার এই প্রকার লেখা হইত। ১১১৮ সনে (১৭১০ খৃঃ) এই প্রকার বন্দোবস্ত হইল। তখনও মহারাজ নিজনামাঙ্কিত মুদ্রা চালাইতেন ও ছত্রদণ্ডধারী ছিলেন, অপরকে রাজকর দেওয়া অকর্ত্তব্য মনে করিতেন। ষ্টুয়ার্ট সাহেব সম্ভবতঃ এই সন্ধির কথাই মুরসিদ কুলি খাঁর কুচবিহারের স্বাধীনতা-লোপের নিদর্শন মনে করিয়াছেন। মিরজুমলা ১৬৬১ খৃঃ অব্দে কুচবিহার জয় করিয়া উহার নাম দিয়াছিলেন "আলমগীর নগর"—(ষ্টুয়ার্ট, ৩১৮ পৃঃ।) এই উক্তির কোন ভিত্তি নাই। এই নাম হয়ত মুসলমান সময়কার সরকারের দলিলপত্রেই ছিল। এই সময়ে কুচবিহারের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল, এই যুদ্ধে মিরজুমলা যে কিছুতেই পারিয়া উঠিতে-ছিলেন না, তাহা ষ্টুয়ার্ট সাহেব লিখিয়াছেন, যদিও মুসলমান-লিখিত ইতিহাসের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করাতে তিনি সাময়িক সন্ধি বা জয়, যাহা মুসলমানের পক্ষে গৌরবজনক, তাহারই উপর জোর দিয়াছেন। জয়নাথ ঘোষ এই সকল বিষয়ে অকপটে সত্য লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ইতিহাসখানি খুব মূল্যবান্। আমার নিকট যে পাণ্ডুলিপি আছে তাহা ৪৬৯ পৃষ্ঠা ব্যাপক (ফুলস্কেপ কোয়ার্টো সাইজ)। বস্তুতঃ মোগলেরা সময়ে সময়ে কুচবিহারের রাজস্ব ও বশ্যতার নিদর্শন পাইলেও এই রাজ্য সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে পারেন নাই। মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণ ভুটিয়াদের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া ইংরাজের শরণাপন্ন হন। পারলিঙ্গ (Mr. Parling) সাহেবের অধীনে কতকগুলি সিপাহী কুচবিহারের সৈন্যসহ মিলিত হইয়া ভুটিয়াদিগকে পরাস্ত করে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে কুচবিহারের যে সর্ত্ত হয়, তাহাতে রাজসরকার হইতে বৎসর বৎসর লক্ষ-টাকার কিঞ্চিৎ ন্যূন রাজস্ব দেওয়া এবং অপরাপর কথা নির্দ্ধারিত হইয়া রাজ্য ইংরেজদের দখলে আসে।

আসামের সৈন্য ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে আসিয়া ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া বঙ্গের অনেক পল্লী ও নগর লুণ্ঠন করে। তাহারা সুবৃহৎ ৫০০ রণতরী লইয়া আগমন করে। ইসলাম খাঁ ইহাদিগকে পরাস্ত করিয়া পলায়নপর রাজসৈন্যের পশ্চাদ্ধাবনপূর্ব্বক আসামে প্রবেশ করে।

এবং রাজার ১৫টি দুর্গ অধিকার করেন। কিন্তু বর্ষা আসিয়া পড়াতে রসদের অভাবে দুর্গগুলির একশেষ ভোগ করিয়া পালাইয়া রক্ষা পান।

১৬৬২ খৃঃ অব্দে মিরজুমলা আসামের স্বাধীনতা লুপ্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্তু আসামের জঙ্গলে রসদের অভাবে ও শত্রুদের অবিশ্রান্ত শরবর্ষণে তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। বর্ষার অবসানে রাজা পালাইয়া পাহাড়ে যাইতেন—তখন মিরজুমলা জয়ের আশায় উৎফুল্ল হইতেন। কিন্তু বর্ষায় আবার বিড়ম্বনা আরম্ভ হইত। কিন্তু পরিশেষে মিরজুমলার জয় হইল। রাজা তাঁহাকে ২০,০০০ তোলা সোনা, ১০,০৮,০০০ তোলা রৌপ্য, ৪০টি হস্তী এবং রাজান্তঃপুরের দুইটি সুন্দরী কুমারী প্রদান করিয়া অব্যাহতি পান। তিনি বাৎসরিক একটা নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হন, এবং এই রাজস্ব রীতিমত দেওয়া হইবে—তাহার জামিনস্বরূপ চারটি রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া আসেন। মোগলদিগের সঙ্গে ত্রিপুরেশ্বরেরও সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। মোগলেরা যে কোন উপলক্ষ পাইলেই তাঁহাদের সাম্রাজ্যবৃদ্ধির সুবিধা খুঁজিতেন। পাঠানেরা যেরূপ অর্থের অভাব হইলে বা প্রতিহিংসানিবন্ধন নিকটবর্ত্তী রাজ্যে উৎপাত করিয়া লুণ্ঠনদ্বারা ভাণ্ডার ভর্ত্তি করিয়া আনিতেন এবং বিজিত রাজ্য এইভাবে লাঞ্ছিত করিয়া খোস মেজাজে চলিয়া যাইতেন—মোগলদের রাষ্ট্রনীতি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে, তাঁহারা রন্ধ্রপথ পাইলেই তৎসূত্রে প্রবেশপূর্ব্বক রাজ্যটি চিরকালের তরে আত্মসাৎ ও পদানত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইতেন। কিন্তু কুচবিহার, ত্রিপুরা ও আসাম বহুদিন এই দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর আক্রমণ ও তৎকর্ত্তৃক রাজ্যের অধিকার ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। আমরা স্বতন্ত্রভাবে এই তিন রাজ্যের সম্বন্ধে আলোচনা করিব, এজন্য এখানেই এই প্রসঙ্গ শেষ করিলাম। ত্রিপুরেশ্বরের প্রধান পুরোহিত বাদশাহের নিকট-আত্মীয় এক মুসলমান যোদ্ধাকে কালীমন্দিরে বলি দিয়াছিলেন। এসকল কথা আমরা এই পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে বর্ণনা করিব।

ত্রিপুরা ও আসাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মোগলাধিকারে বঙ্গীয় শাসনকর্ত্তৃগণ

বঙ্গদেশে মোগলেরা ধীরে ধীরে সমস্ত শত্রুপক্ষ জয় করিয়া আত্মশিবিরের বিদ্রোহ দলনপূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের প্রায় সকলগুলিকে তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া সার্ব্বভৌম অধিকার পাইয়াছিলেন; তাহার ইতিহাস সংক্ষেপে দিলাম। আকবর যাহা করিয়াছিলেন, জাহাঙ্গীর ও সাজাহান সেই নীতিই মূলতঃ অনুসরণ করিয়াছিলেন। আকবর

মিষ্ট ও শিষ্ট ব্যবহার দ্বারা ভারতবর্ষকে করতলগত করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী হইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তিনি খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন, তথাপি তিনি যুদ্ধ ভালবাসিতেন না; যেখানে ক্ষমা ও মিষ্ট ব্যবহার ব্যর্থ হইত, সেখানে তিনি এক টুকরা জমির জন্যও তাঁহার বিপুল বাহিনীকে জীবন পণ করিয়া যুদ্ধ করিতে নিযুক্ত করিতেন। অধীন ব্যক্তিরা সদয় ব্যবহারের মুক্ত পরিবেষণে তৃপ্ত হইতেন। কিন্তু যিনি মাথা হেঁট করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন, তাঁহাকে তিনি উপেক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দিতেন না। তাঁহার সার্ব্বভৌম পদগৌরবের কণামাত্র ক্ষুণ্ণ করিতে তিনি সম্মত হইতেন না। শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে যদি কেহ ক্ষমাগুণের একটু বেশী পরিচয় দিতেন, তবে তিনি তাহা ক্ষমা করিতেন না। শত্রুকে যে যতটা বেশী দলন করিতে পারিত, তাহার উপর তিনি ততটা সন্তুষ্ট হইতেন। শাসনের শিথিলতা তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। বঙ্গের রাজপ্রতিনিধি সাহাবাজ খাঁ মোগলবিদ্রোহী ককেশিলানদের নেতা এবং পাঠান কতলু খাঁর প্রতি একটু বেশী সদয় হইয়া সন্ধি করিয়াছিলেন (১৫৮৫-৮৬ খৃঃ), এজন্য আকবর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে কার্য্যচ্যুত—এমন কি উৎকোচ-গ্রহণের সন্দেহ করিয়া তিন বৎসর তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। অধীন ব্যক্তির প্রতি দয়ার আদর্শ—অধীন যোগ্য ব্যক্তির গুণগ্রাহী সম্রাট্ আকবর লৌহমুষ্টিতে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের প্রতি স্বভাবতঃ বিরাগসম্পন্ন—অথচ এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অটল, অধ্যবসায়শীল যোদ্ধা জগতের ইতিহাসে বেশী দেখা যায় না। ১৫৮৯-৯০ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ উড়িষ্যার পাঠানদের সঙ্গে কতকটা তাহাদের অনুকূলে সন্ধি করাতে আকবর বিরক্ত হইয়াছিলেন। ("The Emperor was displeased at the want of energy evinced by the Raja on the occasion."—Stewart, Bangabasi edition, p. 209.) আকবর যথাসাধ্য ন্যায়পর হইতে চেষ্টা পাইতেন। সের আফগানকে বলিয়াছিলেন, মেহেরুন্নেসাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দিবেন. কিন্তু শেষে যখন জানিলেন, সেলিম তাঁহার জন্য পাগল—হয়ত ইহাকে না পাইলে তাঁহার জীবন ব্যর্থ হইবে, তখনও তিনি যুবরাজের মুখের দিকে না চাহিয়া যে কথা দিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিলেন; মেহেরুন্নেসা সের আফগানের পত্নী হইলেন। তাঁহার বাক্যের মর্য্যাদারক্ষা রাজোচিত। শত্রুকে সমূলে ধ্বংস করিতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন, সেখানে ক্ষমা অথবা শিথিলতা-প্রদর্শন তাঁহার নীতিবিরুদ্ধ—সে শত্রু যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন, আকবর বহ্নির শেষের ন্যায় শত্রুর শেষকে আপৎসঙ্কুল মনে করিতেন। এই সাম্রাজ্যনীতিতে তদায়ত্ত ভারতবর্ষের বিশাল অধিকার তাঁহার অঙ্গুলীসঞ্চালনে চলিত। তিনি নিজে নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু আবুল ফজল, তান সেন, মানসিংহ, তোদরমল্ল প্রভৃতি বিজ্ঞ ও প্রতিভাপন্ন লোককে তিনি ইঙ্গিতমাত্রে চালাইতেন। এতবড় রাষ্ট্রপ্রতিভার দৃষ্টান্ত জগতে খুব বেশী নাই। কিন্তু তিনিই হিন্দুস্থানের বলক্ষয় করিয়াছেন, হিন্দুস্থানের রণশার্দ্দূলদিগকে নিধন করিয়া তিনি সমস্ত শক্তি দিল্লীর কেন্দ্রমুখী করিয়াছেন—যখন তাঁহারা মেষ বনিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহারা তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন।

আকবরের নীতি।

এইভাবে প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ আবার জাঁকিয়া উঠিয়াছিল—ভারতবর্ষের সমস্ত শক্তি দিল্লী অভিমুখী হইয়াছিল, তদবধি ভারতবর্ষ দিল্লীর আওতায় পড়িয়া গেল। চারিদিকে অসংখ্য নক্ষত্র এমন কি চন্দ্রতুল্য জ্যোতিষ্ক সূর্য্যোদয়ে বিলুপ্ত হওয়াতে একমাত্র প্রখর মোগলশাসন রৌদ্রের মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। আমরা এখানে বঙ্গেশ্বরগণের সংক্ষিপ্ত একটা তালিকা দিব।

১।	হুসেন কুলি খাঁ, খান জিহান	... ...	১৫৭৮-১৫৮০ খৃঃ
২।	রাজা তোডরমল্ল	... ...	১৫৮০-১৫৮৫ খৃঃ
৩।	খান আজিম মির্জ্জা কোক্	... ...	১৫৮২-১৫৮৪ খৃঃ
৪।	সাহাবাজ খাঁন কুমবো	... ...	১৫৮৪-১৫৮৭ খৃঃ
৫।	উজির খান হেরেবি	... ...	১৫৮৭ খৃঃ (অকালমৃত্যু)
৬।	সৈয়দ খাঁন	... ...	১৫৮৭-১৫৮৯ খৃঃ
৭।	মানসিংহ	... ...	১৫৮৯-১৬০৪ খৃঃ
৮।	আবদুল-মজিদ আসফ খাঁ	... ...	১৬০৪-১৬০৮ খৃঃ
৯।	মানসিংহ	... ...	১৬০৯-১৬১০ খৃঃ

আকবর পীড়িত হইয়া পড়াতে জাহাঙ্গীরের পুত্র খসরু যাহাতে দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইতে পারেন, মানসিংহ সেই চেষ্টা করিতেছিলেন ; কারণ খসরু মানসিংহের ভাগিনেয় ছিলেন। এদিকে জাহাঙ্গীর (সেলিম) আকবরের রাজত্বের শেষের দিকে কতকটা অবাধ্যতাপ্রদর্শন এমন কি পিতার প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিতে উদ্যত ছিলেন। মানসিংহ এই সুবিধা পাইয়া ষড়যন্ত্রটি কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টিত ছিলেন।

কুতুবুদ্দিন খাঁ কোকুলটাস কোকা—১৬০৬-১৬০৭। ইঁহার সময়ে বঙ্গদেশে বর্দ্ধমান জেলায় বিখ্যাত সের আফগানের হত্যা হয় এবং মেহেরুন্নেসা বর্দ্ধমান হইতে জাহাঙ্গীরের রাজান্তঃপুরে নীত হইয়া নুরজাহান (জগতের আলো) নাম গ্রহণ করিয়া ভারত-সম্রাজ্ঞী হন। এইখানে আমরা সংক্ষেপে নুরজাহানের কাহিনী বর্ণনা করিব।

দক্ষিণ তাতারে তাজা আয়াস নামক সম্রান্ত কুলোদ্ভব এক ব্যক্তি অবস্থার বিড়ম্বনায় ভাগ্যপরীক্ষার জন্ত ভারতবর্ষে আসিতে সঙ্কল্প করেন। তাঁহার স্ত্রী পরমা সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারও পিতৃকুল অতি নিঃস্ব ও দরিদ্র ছিল, এই দম্পতী ভারতবর্ষের পথে দুরবস্থার চরমে উপনীত হন। আয়াসের স্ত্রী অন্তঃসত্বা ছিলেন ; তাঁহাকে একটি ঘোড়ায় চড়াইয়া স্বামী বল্গা ধরিয়া আস্তে আস্তে হাঁটিয়া যাইতেছিলেন। দম্পতী তিন দিন উপবাসী ছিলেন, তাঁহাদের সমস্ত সংস্থান ফুরাইয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায় রমণীর সন্তানপ্রসবের কাল উপস্থিত হইল, এবং যিনি কালে জগতের মহীয়সী মহিলাদের অন্যতম হইয়া ভারত-সম্রাজ্ঞী হইবেন, সেই 'জগতের আলো' তথায় আবির্ভূত হইলেন। তখন রজনী আসন্ন, নিকটে দ্বিতীয় ব্যক্তি

নাই, তাজা আয়াস ও তাঁহার পত্নী এত দুর্ব্বল যে তাঁহারা আর চলিতে পারেন না। নবজাত শিশুসহ চলা অসম্ভব দেশ ছাড়িয়া দুরাশায় বিদেশে আসার জন্য পত্নী পতিকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। সে স্থান হিংস্রশ্বাপদপূর্ণ, রাত্রি হইলে মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া দম্পতী কোন দয়ার্দ্রচিত্ত আগন্তুকের ভরসায় তাঁহাদের সুন্দরী নবজাত কন্যাকে ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শিশুটিকে লতাপাতা দিয়া কতকটা ঢাকিয়া একটি বৃক্ষের নিম্নে রাখিয়া গিয়াছিলেন। এক মাইল চলিয়া যাওয়ার পর সেই গাছটি যখন জননীর অদৃশ্য হইল, তিনি তখন ভূলুণ্ঠিত হইয়া শিশুর জন্য কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে উঠিয়া বসিতে পারিলেন না। তাজা আয়াস পত্নীকে শান্ত করিবার জন্য এবং বাৎসল্যবশতঃ পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া এক রোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিতে পাইলেন।

নুরজাহানের জন্মকথা।

তিনি দেখিলেন এক প্রকাণ্ড কৃষ্ণসর্প শিশুটিকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে ও তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য ভীষণ বদন ব্যাদান করিয়াছে। সেইখানে দ্রুতবেগে আসিয়া সোর গোল করাতে সাপটা হঠাৎ ভয় পাইয়া শিশুকে ছাড়িয়া গেল। তিনি তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া নিরাপদে স্ত্রীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তখন কয়েকটি লাহোরযাত্রী বণিক্ সেই পথে চলিতেছিল, তাহারা এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিয়া বিপন্ন পরিবারকে সাহায্য করিয়া তাহাদের সঙ্গে লইয়া গেল। তখন আকবর লাহোরে ছিলেন। আসফ খাঁ নামে তাঁহার এক প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে তাজা আয়াসের সম্পর্ক ছিল, ইহার আনুকূল্যে এই দরিদ্র ব্যক্তি ক্রমশঃ রাজ-দরবারে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি মোগল দরবারে রাজস্বসচিব হইলেন। সেই নবজাত কন্যার রূপলাবণ্য দর্শনীয় বিষয় হইল। তাঁহার নাম হইল মেহেরুন্নেসা অর্থাৎ "রমণীকুলমিহির", কারণ তাঁহার সৌন্দর্য্য সত্যই সূর্য্যের ন্যায় চক্ষে ধাঁধা দিত। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে নানাগুণে গুণবতী হইয়া উঠিলেন। সঙ্গীতে, চিত্রবিদ্যায়, কবিতারচনায় ও নর্ত্তনে তিনি রমণীসমাজে অদ্বিতীয়া হইলেন। তাঁহার মূর্ত্তি দীর্ঘ ও সুগঠিত, কথা চাতুরীপূর্ণ অথচ সম্ভ্রমাত্মক, হাস্য মধুর ও দিগ্বিজয়ী ছিল। কোন নিমন্ত্রণ-সভায় সেলিম তাঁহাকে দেখিলেন, তাঁহার রূপ তাঁহাকে আবিষ্ট করিল, তাঁহার গানে তিনি তন্ময় হইয়া গেলেন। যুবতীরও চেষ্টা ছিল যুবরাজের হৃদয় জয় করা। হঠাৎ যেন অতর্কিতে তাঁহার অবগুণ্ঠন মুখ হইতে অপসারিত হইল, তখন তাঁহার সলজ্জ-রক্তিম গণ্ড, স্ফুরিতাধর ও কুন্তলাবৃত কপোল এবং চকিতহরিণীবৎ দৃষ্টি সেলিমের বুকে যাইয়া শেলের মত বিঁধিল। ("Then, as by accident, she dropt her veil and shone upon him at once with all her charms. The confusion which she could well feign on the occasion heightened the beauty of her face. Her timid eye by stealth fell upon the prince and kindled all his soul into love."—Stewart, p. 232.) সেলিম সমস্তদিনটা কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে পারিলেন না। কিন্তু তাজা আয়াস ইহার পূর্ব্বেই প্রসিদ্ধ সের আফগানের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিবেন, এইরূপ বাগ্‌দান করিয়া-

ছিলেন। নিরুপায় হইয়া সেলিম তাঁহার পিতার নিকট প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু ন্যায়ের অবতার আকবর বাদশাহ তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারীর প্রতি শত স্নেহসত্বেও বাগ্‌দত্তা কন্যার বিবাহে বাধা জন্মাইতে সম্মত হইলেন না। আকবরের জীবদ্দশায় সেলিম সের আফগানের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করিতে পারিলেন না। কিন্তু সেলিম ও নূরজাহানের প্রেম লইয়া এতটা নিন্দা জনসমাজে প্রচারিত হইল যে, সের আফগান বিরক্ত হইয়া আগ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক বঙ্গদেশে আসিলেন এবং বঙ্গাধিপের আনুকূল্যে বর্দ্ধমান জেলার শাসনকর্তৃত্ব লাভ করিলেন।

আকবরের মৃত্যুর পর যে আগুন চাপা ছিল, তাহা আবার জ্বলিল। তরুণবয়সে যে ফুলশর বক্ষে আসিয়া পড়ে, তাহা সহজে যায় না। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া সের আফগানকে বঙ্গদেশ হইতে ডাকাইয়া আনিলেন, তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করিলেন; সের আফগানও নিতান্ত উপেক্ষণীয় লোক ছিলেন না। তরুণবয়সে তিনি পারস্যরাজ সফিবিবংশের তৃতীয় রাজা সা ইসমাইলের একজন প্রিয় সঙ্গী ছিলেন এবং আকবরের সময়ে নানা যুদ্ধে অতিশয় কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন; বিশেষতঃ অপরিমিত দৈহিক বলের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সিন্ধু-বিজয়কালে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া আকবর ইঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ইঁহার নাম ছিল আস্তা জিল্লো, কিন্তু একটি ব্যাঘ্র বধ করিয়া তিনি সের আফগান নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ইঁহার হৃদয় উদার এবং সাহসের খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রচারিত ছিল—সুতরাং ইনি সেই সময়ে সর্ব্বজনপ্রিয় ও রাজদরবারে সকলের সম্মানিত ছিলেন। ঈদৃশ ব্যক্তির পত্নীকে জাহাঙ্গীর কি করিয়া বল বা ছলনাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন? তাহাতে নিন্দা ও বিপদের উভয়বিধ আশঙ্কাই ছিল। কিভাবে মেহেরুন্নেসাকে পাইবেন, সম্রাট্ তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু নানাজনের নানাকথায় সের আফগান কর্ণপাত করিতেন না, তাঁহার উদার অন্তঃকরণে সন্দেহের কালিমা থাকিতে পারিত না। সম্রাটের বাহ্য-সৌজন্য তিনি প্রকৃত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। একদিন একটা ব্যাঘ্রের উৎপাতে লোকজন বড়ই উৎপীড়িত হইতেছিল, সম্রাট্ উহা শিকার করিতে গেলেন, অন্যান্য ওমরাদের সহিত সের আফগানকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন। ব্যাঘ্র যেখানে ছিল সেই স্থানটা কেন্দ্র করিয়া একটা বৃহৎ পরিধি নির্দ্দেশপূর্ব্বক সম্রাটের লোকজন পশুকে ঘিরিয়া ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহারা ব্যাঘ্রের এত সন্নিহিত হইল যে উহার লাঙ্গুল-আস্ফোটন, গর্জ্জন ও লম্ফঝম্পের শব্দ পরিষ্কার শোনা যাইতে লাগিল। সম্রাট্ বলিলেন, "আমার ওমরাদের মধ্যে কে আছেন, যিনি একাকী যাইয়া বাঘটি নিধন করিয়া আসিবেন?" সম্রাট্ ভাবিয়াছিলেন, সের আফগান অবশ্য প্রস্তুত হইবেন। এদিকে সের আফগান ভাবিলেন, "কিছুকাল দেখা যাক্; ওমরাদের মধ্যে এরূপ সাহসী কেহ নাই, তাঁহারা পশ্চাৎপদ হইলে তখন আমি প্রস্তুত হইব।" এই ভাবিয়া তিনি নীরব ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনজন ওমরা লজ্জার দায়ে উপস্থিত হইয়া সম্মতি জানাইলেন। তখন সের আফগান

সের আফগানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।

দেখিলেন, তাঁহার প্রাপ্য যশ অন্যে লইয়া যায়, তিনি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ব্যাঘ্রের যে বল ভগবান্ দিয়াছেন, আমাদেরও তাহাই দিয়াছেন। নিরস্ত্র অবস্থায় কে যাইতে পারেন?" ওমরাগণ এ প্রস্তাবে বিমুখ হইলেন, তখন সের আফগান নিরস্ত্র হইয়া স্বয়ং ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে অনুমতি চাহিলেন। সম্রাট্ বাহ্য অনিচ্ছা দেখাইয়া দুএকবার নিষেধ করিয়া শেষে মনে মনে আনন্দের সহিত অনুমতি দিলেন। রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত-দেহে সের আফগান ব্যাঘ্রটিকে হত্যা করিয়া সম্রাট্-শিবিরে ফিরিলেন। অসম্ভব সম্ভব হইল এবং সের আফগানের বীরত্বখ্যাতি সমস্ত সহরে মুখে মুখে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

কিন্তু জাহাঙ্গীর পুনরায় চক্রান্ত করিলেন। তাঁহার একটা প্রকাণ্ড হাতীর মাহুতের উপর গোপনে আদেশ হইল যে, কোন ক্ষুদ্র অলিগলির ভিতর দিয়া যখন সের আফগান যাইবেন, তখন 'হাতীটা পাগল হইয়াছে' এই ভাব দেখাইয়া সের আফগানকে উহার পদতলে ফেলিয়া মারিতে হইবে। কিন্তু সের আফগানের কি অপূর্ব্ব বীরত্ব! তিনি হাতীটার শুঁড়ের মূলে এমনই জোরে খড়্গাঘাত করিলেন যে, শুঁড় ছিন্ন হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল এবং হস্তী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। জাহাঙ্গীর রাজপ্রাসাদের এক জানালা দিয়া উদ্গ্রীব হইয়া দেখিতেছিলেন; তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। হয়ত এই মহামনা বীরের প্রতি এরূপ নীতিবিরুদ্ধ দুষ্ট ব্যবহারে অনুতপ্ত হইয়া সম্রাট্ ছয়মাস নিরস্ত ছিলেন। ইহার পরে সের আফগান বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিলেন। এবার কুতুবুদ্দিন যিনি নাকি জাহাঙ্গীরকে ক্রমাগত উস্কাইয়া দিতেছিলেন, তিনিই বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন; সম্ভবতঃ তাঁহার বঙ্গের মসনদ পাওয়ার একটা সর্ত্ত ছিল, সের আফগানকে বধ করা। সের আফগান রাত্রে অস্ত্রধারী কোন দেহরক্ষক রাখিতেন না, দরজা খুলিয়া রাত্রে শুইয়া থাকিতেন, তাঁহার আবাসগৃহে একটি বৃদ্ধ চাকর থাকিত, অপরাপর দাসদাসীরা সন্ধ্যার পর যার যার বাটীতে চলিয়া যাইত। ৪০জন অস্ত্রধারী লোক একরাত্রে ঘুমন্ত সেরের গৃহে প্রবেশ করে, তন্মধ্যে একজন বৃদ্ধ সৈনিক বলিয়া উঠিল, "ঘুমের মানুষকে মারিতে নাই।" তখন তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে,—তিনি বৃদ্ধ সৈনিককে ধন্যবাদ দিয়া সিংহবিক্রমে এই ৪০জন সশস্ত্র লোককে আক্রমণ করিলেন, অনেকে হত হইল, অনেকে আহত হইল, এবং জীবিতদের মধ্যে সকলেই পালাইয়া গেল। কুতুবুদ্দিনের ষড়যন্ত্র বিফল হইল। কিন্তু এই ঘটনায় সের আফগানের খ্যাতি অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গেল। তিনি যে পথ দিয়া যাইতেন তাঁহাকে দেখিবার জন্য রাস্তায় ভিড় হইত। রাজধানী নিরাপদ্ মনে না করিয়া সের আফগান বর্দ্ধমানে চলিয়া আসিলেন,—ইচ্ছা মেহেরুন্নেসাকে লইয়া বাকী জীবন নিশ্চিন্তভাবে কাটাইয়া দিবেন। তাঁহার অপূর্ব্ব সফলতার সম্ভাবনা, ভাবী জীবনের উন্নতি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা—এ সব বিসর্জ্জন দিয়া নির্ব্বিঘ্ন দাম্পত্যজীবনের শান্তির জন্য লালায়িত হইয়া তিনি বর্দ্ধমানে আসিলেন। কিন্তু নিষ্ঠুর, নীতিবিগর্হিত, ষড়যন্ত্রকারী কুতুব নিরস্ত হইলেন না। আকবর হইলে এরূপ অসাধু ব্যক্তিকে একটা রাজ্যশাসনের ভার কখনই দিতেন না। জাহাঙ্গীরকে তুষ্ট করিবার জন্য তিনি প্রকাশ্যভাবে বলিতেন, সের আফগানকে নিহত করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। সহজ

সৌহার্দ্দ্যের ছলনায় তিনি রাজমহল ঘুরিয়া বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলেন, সেখানে সের আফগানের সঙ্গে মিত্রভাবে মিশিয়া পথে যাইতে লাগিলেন—কিন্তু একটা সৈনিকের উপর হঠাৎ সেরকে হত্যা করার আদেশ ছিল। অহেতুক ভাবে সের আফগানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাতে সের আফগান তাহাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিলেন। কুতুবুদ্দিনের ষড়যন্ত্র সেদিন এতটা প্রকাশ্যভাবে ধরা পড়িয়াছিল যে, সের আফগানের উদার হৃদয়ও এই উদ্দেশ্য অনুভব করিতে পারিয়াছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ কুতুবুদ্দিনকে তরবারীর আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিলেন। জাহাঙ্গীরের প্রীতির জন্ম যে ব্যক্তি ক্ষিপ্ত কুকুরের মত লোককে দংশন করিতে পারিত, সেই হীনচরিত্র শাসনকর্ত্তা নিজের জালে নিজে পড়িয়া মারা গেল। কিন্তু সম্রাটের ওমরারা সের আফগানকে ঘিরিয়া ফেলিল—সের আফগান একক সেদিন চারিটী ওমরাকে হত্যা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একজন পাঁচহাজারী মনসবদার ছিলেন। কিন্তু সশস্ত্র বহু যোদ্ধা তাঁহাকে আক্রমণ করিল, কেহ তীর, কেহ গুলি ছুঁড়িতে লাগিল। সের ডাকিয়া বলিলেন, "তোরা এক একজন করিয়া আয়, দেখি বল কার বেশী" কিন্তু সে কথা কেহ শুনিল না। সপ্ত রথী ঘিরিয়া যেরূপ অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিল,—এই বীরশ্রেষ্ঠ তেমনই ভাবে অসম ও অন্যায় যুদ্ধে নিহত হইলেন। মৃত্যুকালে তিনি পশ্চিমমুখী হইয়া জলের অভাবে রাস্তার ধূলি মাথায় ছড়াইয়া তর্পণ করিলেন। তাঁহার শরীরে ছয়টি গুলি প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ১৬০৬ খৃঃ অব্দে আকবরের মৃত্যুর এক বৎসর পরে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। নুরজাহান স্বামীর হনন-সংবাদ পাইয়া বিচলিত হন নাই। তিনি নাকি এমন কথাও বলিয়াছিলেন যে তাঁহার স্বামী, তাঁহার নিশ্চিতমৃত্যু পূর্ব্ব হইতে অনুমান করিয়া, তাঁহাকে বিনা আপত্তিতে সম্রাটের অঙ্কশায়িনী হইবার অনুমতি দিয়া গিয়াছেন। কুতুবুদ্দিনের মৃত্যুসংবাদে জাহাঙ্গীর এরূপ বিশ্বস্ত ও প্রিয় কর্ম্মচারী মারা পড়িলেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, মেহেরুন্নেসার মুখ তিনি দর্শন করিবেন না; কিন্তু তারপর মেহেরুন্নেসা নুরজাহান হইলেন। তাঁহার নাম সম্রাটের নামের সঙ্গে মুদ্রায় ও রাজকীয় দলিলপত্রে মুদ্রিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের যুগলনামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রায় এই কথাগুলি উৎকীর্ণ থাকিত :—

"বহুক্ত শাহ জহাঙ্গীর যাফৎ সদ জেবর
বনামে নুরজহাঁ বাদসহে বেগম জর॥"

কুলি খাঁ কাবুলী আগে বেহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইহার চরিত্র লীলাময়। ইনি সর্ব্বদা একশত মৌলভী সঙ্গে রাখিতেন। তাঁহাদের প্রত্যেকে কোরান আবৃত্তি করিতেন। প্রতি আবৃত্তির পর তাঁহাদিগকে বলিতে হইত—"এই আবৃত্তির পুণ্য-ফল বাদশাহ পাইবেন।" তিনি পাঁচবার নমাজ পড়িতেন, কিন্তু সেই সময়ে মুখের ভঙ্গী ও করসঞ্চালন দ্বারা কাহাকেও বেত্রাঘাত, কাহাকেও ফাঁসি দেওয়া অথবা শিরশ্ছেদের হুকুম দিতেন। যখন বাহির হইতেন, তখন সঙ্গে একশত ঢাকী থাকিত। কোন বিবাদ-বিসংবাদের স্থলে উপস্থিত হইলে তিনি সেই

জাহাঙ্গীর; কুলি খাঁ কাবুলী ১৬০৭ খৃঃ।

এক শত ঢাকীকে ঢাক বাজাইতে আদেশ করিতেন, সেই বিরাট্ শব্দে অন্যান্য বিবাদের গোলমাল চাপা পড়িয়া যাইত। তাঁহার সঙ্গে এক শত অব্যর্থসন্ধানী ধনুর্দ্ধর সৈন্য থাকিত, ইহারা কাশ্মীরবাসী ছিল এবং আকাশে উড্ডীয়মান ক্ষুদ্রতম পাখীটিকেও মারিয়া মাটীতে ফেলাইতে পারিত—কোন ভিড়ের মধ্যে কাহাকেও বধ করিবার জন্য তাহারা সর্ব্বদা রাজাদেশ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। বঙ্গদেশ শীঘ্রই এই পাগলামীর হাত হইতে ত্রাণ পাইয়াছিল, তিনি একটি বৎসরের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সেখ আলাউদ্দিন ইসলাম খান	...	...	১৬০৮-১৬১৩ খৃঃ
কাশীম খাঁ	...	...	১৬১৩-১৬১৮ খৃঃ
ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ	...	...	১৬১৮-১৬২২ খৃঃ
সাজাহান	...	...	১৬২২-১৬২৬ খৃঃ

জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহী হইয়া সাজাহান বঙ্গদেশ অধিকার করেন। তিনি ঢাকায় আসিয়া বঙ্গের তৎকালীন শাসনকর্ত্তার সম্পত্তি ও সরকারী রাজস্ব হস্তগত করেন। তৎপরে পাটনা বিজয় করিয়া রোটাস দুর্গ দখল করেন। দরাব নামক কোন ব্যক্তিকে এই সময়ে তিনি বঙ্গদেশের মসনদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। কতকগুলি যুদ্ধবিগ্রহের পর সম্রাটের সহিত সাজাহানের প্রীতির ভাব পুনঃ স্থাপিত হইয়াছিল।

মহাবাৎ খাঁ	...	অল্প সময়ের জন্য	... ১৬২৬ খৃঃ
খানজেদ খাঁ	...	ঐ	

মুকুরেম খাঁ—ইনি ঢাকায় বাস করিতেন; সম্রাটের পুত্র আসিয়াছেন শুনিয়া রাজদূতকে অতি শ্রদ্ধার সহিত সংবর্দ্ধনা করিয়া আনিতে যাইয়া ইনি ধলেশ্বরীগর্ভে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

ফিদাই খাঁ	...	...	১৬২৭-১৬২৮ খৃঃ
কাশীম খাঁ যোবানি	...	...	১৬২৮-১৬৩২ খৃঃ

ইহার সময়ে পর্ত্তুগীজগণ হুগলী হইতে অধিকারভ্রষ্ট এবং তাড়িত হয়।

আজিম খাঁ—১৬৩২ খৃঃ-১৬৩৭ খৃঃ—ইহার সময়ে ইংরেজেরা বাঙ্গলায় বাণিজ্য করিতে অনুমতি পান এবং পিপলি বন্দরে (বালেশ্বরে) তাঁহাদের প্রথম কুঠি স্থাপিত করেন।

ইসলাম খাঁ মুসেদি	...	...	১৬৩৮-১৬৩৯ খৃঃ
সুজা বাদশাহ (সুলতান মহম্মদ সুজা)	...	...	১৬৩৯-১৬৪৭ খৃঃ

২৪ বৎসর বয়সে সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজা বঙ্গের মসনদে প্রতিষ্ঠিত হন (১৬৩৯ খৃঃ)। কিন্তু পাছে ইহার শক্তি অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় সাজাহান শায়েস্তা খাঁকে (নুরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্র) বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। এই সময়ে সাজাহানের এক কন্যার সর্ব্বাঙ্গ আগুনে পুড়িয়া যায়—গেব্রিয়েল বাউটন (Gabriel

Boughton) নামক এক ইংরেজ-ডাক্তার তাহাকে আরোগ্য করাতে পুরস্কারস্বরূপ সম্রাট্ তাঁহার প্রার্থনামত বঙ্গদেশে ইংরেজদিগকে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দেন। বাউটন রাজমহলে আসিয়া সুজার সঙ্গে দেখা করেন; তখন রাজান্তঃপুরে এক মহিলা গুরুতররূপে পীড়িতা ছিলেন—বাউটন তাঁহাকেও আরোগ্য করেন। সুজা বাদশাহ ইংরেজ-জাতির উপর বিশেষ সদয় হন এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে মিঃ ব্রিজম্যানকর্ত্তৃক বালেশ্বর ও হুগলীতে ইংরেজদের কুঠি স্থাপিত হয় (১৬৪০ খৃঃ)।

সুজা রাজমহলে রাজধানী পরিবর্ত্তিত করেন, তিনি বিলাসী ও জাঁকজমকপ্রিয় ছিলেন। রাজমহলকে তিনি প্রায় দিল্লীর মত সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। মানসিংহকর্ত্তৃক নির্ম্মিত দুর্গগুলির তিনি সংস্কার করিয়াছিলেন এবং সেই নবনির্ম্মিত রাজধানীর নানারূপ শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে মনোযোগী হইয়াছিলেন; কিন্তু বৎসর ঘুরিয়া যাইতে না যাইতেই এক ভীষণ অগ্নিদাহে নগরী দগ্ধ হইয়া যায়, এমন কি অতিকষ্টে বাদশাহের পরিবারবর্গ মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পান। পরবৎসর আবার রাজধানীর কতক অংশ গঙ্গাগর্ভস্থ হয়, কিন্তু সুজা বাদশাহের প্রাসাদের কতকগুলি প্রকোষ্ঠ এখনও বিদ্যমান আছে।

সুজা মোটের উপর উন্নতমনা, ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন; দারার মত উদার ও মুক্তপ্রাণ ছিলেন না, তিনি কূটনীতির পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু প্রজারা তাঁহার শাসনকালে খুব সুখী ছিল। ১৬৩৯ হইতে ১৬৪৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজত্বকাল রাম রাজ্যের যুগ ছিল। তাঁহার প্রভাব বঙ্গদেশে বেশী হইয়াছে আশঙ্কা করিয়া সাজাহান তাঁহাকে কাবুলের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান, কিন্তু সুজা ইহাতে প্রীত হন নাই। এক বৎসর পরে তিনি বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়া স্বীয় মসনদ অধিকার করেন। এই সময়ে সাজাহানের শঙ্কটাপন্ন রোগ হওয়াতে সুজা তাঁহার মৃত্যুসংবাদ রটাইয়া বাদশাহের সিংহাসনে তাঁহার দাবী প্রতিপন্ন করিবার জন্য বহু সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দারার সহিত তাঁহার চিরশত্রুতা ছিল, সুতরাং দারা সম্রাট্ হইলে যে তাঁহার মৃত্যু অবধারিত—ইহাই আশঙ্কা করিয়া তিনি এই বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। সাজাহান তাঁহাকে অনেকগুলি চিঠি লিখিয়া জানাইলেন যে, তিনি মরেন নাই, ভাল হইয়াছেন, কিন্তু সুজা প্রচার করিলেন সেগুলি সমস্ত জালচিঠি, দারা তৈরী করিয়াছেন। রাজকীয় সৈন্যের সঙ্গে তাঁহার কাশ্মীরের নিকটে সংঘর্ষ হয়। জয়সিংহ এবং দারার পুত্র সোলেমান সম্রাটের সৈন্যের নেতা ছিলেন। জয়সিংহ সুজার সঙ্গে সন্ধি করিলেন, কিন্তু তরুণবয়স্ক সোলেমান সেই সন্ধি অস্বীকার করিয়া অতর্কিতভাবে সুজার শিবির আক্রমণ করেন। বাহাদুরপুরের নিকটে যুদ্ধ হয়, সুজার বিশাল বাহিনী পরাস্ত হয়, সুজা পাটনা অঞ্চল ত্যাগ করিয়া মুঙ্গেরের দৃঢ় দুর্গ আশ্রয় করেন। এই সময়ে সংবাদ আসে, দারা পরাস্ত হইয়াছেন, সম্রাট্ বন্দী এবং আরঙ্গজেব সিংহাসন দখল করিয়াছেন। সোলেমান বঙ্গদেশ ছাড়িয়া দিল্লী অভিমুখে রওনা হইয়া গেলেন, এদিকে সুজা আরও শুনিলেন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদ সিংহাসনের দাবী করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। সুজা পুনরায় এক মহতী বাহিনীর পুরোভাগে আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে এলাহাবাদের

কুদগা নামক স্থানে এক মহাযুদ্ধ ঘটিয়াছিল। সুজার দূরদর্শিতা এবং নির্ভীকত্ব সত্ত্বেও কার্য্য-তৎপরতার অভাব এবং আরঙ্গজেবের দৃঢ়সঙ্কল্পিত অদ্ভুত কর্ম্মশীলতা বিজয়লক্ষ্মীর গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। সুজার অনেক সুবিধা ছিল, বঙ্গদেশের সৈন্যেরা তাঁহাকে ভালবাসিত এবং তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে দাঁড়াইয়াছিল; তাঁহার হস্তী, অশ্ব ও ঐশ্বর্য্যের অভাব ছিল না, এদিকে আরঙ্গজেবের সৈন্যগণ তাঁহার প্রতি খুব অনুরক্ত ছিল না; এক সময়ে এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে, তাঁহার সৈন্যের কতক অংশ সুজার সঙ্গে যোগদান করিবে কিনা, এই দ্বিধার ভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার অন্যতম প্রধান সেনাপতি যশোবন্ত সিংহ প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। সুজা এসকল সংবাদ রাখিতেন কিনা জানা যায় নাই। কিন্তু তাঁহার এই গুরুতর বিষয়গুলির প্রতি অবহিত থাকার একান্ত প্রয়োজন ছিল। তিনি অনায়াসে যশোবন্ত সিংহকে ও তৎসহ আরঙ্গজেবের সৈন্যের বহু অংশ স্বপক্ষে টানিয়া আনিতে পারিতেন—তাহা হইলে যুদ্ধের ফল অন্যরূপ হইত। এদিকে আরঙ্গজেবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরজুম্লা অকুতোভয়ে শ্যেনদৃষ্টিতে শত্রুশিবিরের প্রত্যেক কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিলেন। যশোবন্ত সিংহের বিদ্রোহে অগণিত রাজপুত সৈন্য আরঙ্গজেবের বিপক্ষ হইয়া তাঁহার শিবির আক্রমণপূর্ব্বক লুটপাট করিতে লাগিল। সম্রাট্ প্রমাদ গণিলেন, কিন্তু সুজা চোখ বুজিয়া এই সুবিধাগুলি হারাইলেন। যুদ্ধ অতি ভীষণ হইল, সুজার জয় একরূপ নিশ্চিত, এই সময়ে যখন তাঁহার ক্লান্ত হস্তীর উপর হইতে আরঙ্গজেব নামিয়া আসিতেছিলেন তখন মীরজুম্লার স্বর তাঁহার কাণে পৌঁছিল—"আরঙ্গজেব কি করিতেছ? তুমি তোমার সিংহাসন হইতে নামিতেছ।" চতুর সম্রাট্ তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণপণ করিয়া সেই ক্লান্ত হস্তীর উপরই চাপিয়া বসিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এদিকে সুজা বাদশাহের প্রকাণ্ড হস্তীটা অবাধ্য হইয়া উঠিল। আরঙ্গজেবকে শুঁড় দিয়া ধরিয়া পিষিয়া মারিতে যতই মাহুত তাহাকে তাড়না করিতে লাগিল, ততই সেই পশু গুলিগোলার শব্দে ও যুদ্ধের কলরবের মধ্যে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল এবং ঘামিতে লাগিল। সে এক পা অগ্রসর হইল না,—হইলে আরঙ্গজেবের জীবন শেষ হইত এবং সুজা বাদশাহই ভারতেশ্বর হইতেন। হস্তীর বল কে কাড়িয়া লইল, কে তাহার গতিরোধ করিল?—দৈব; সেই অকর্ম্মণ্য হস্তীর উপর হইতে সুজা নামিয়া অশ্বারোহণ করিলেন, এই তাঁহার কাল হইল। বহু পূর্ব্বে আলেকজাণ্ডারের সহিত যুদ্ধে পুরুরাজ (পোরাস্) হস্তীর উপর হইতে নামিয়া আসায় তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া তিনি হত এই মনে করিয়া তাঁহার বিশাল সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে দারা হস্তী হইতে নামিয়া যাওয়াতে তদীয় সৈন্যেরা যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়াছিল। এবারও তাহাই হইল,—সৈন্যেরা তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পালাইতে লাগিল। কথিত আছে, মীরজুম্লার ঘুষে বশীভূত হইয়া আলিবর্দ্দী খাঁ নামক সুজার এক সেনাপতি তাঁহাকে হস্তী হইতে নামিয়া আসিতে পরামর্শ দিয়াছিল এবং তাঁহার মৃত্যুসংবাদ রাষ্ট্র করিয়াছিল। জনপ্রবাদ এই "সুজা জেৎ বাজি, আপনা হাত হারা" (সুজা বাজি জিতিয়া আপনার হাতে

হারিলেন)। সুজা মুঙ্গেরের দুর্গে আশ্রয় লইলেন, মীরজুম্লা এবং আরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এখানে সুজা পুনরায় যুদ্ধের প্রচুর আয়োজন করিতেছিলেন এবং ছয়দিন পর্য্যন্ত মুঙ্গের দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে অবস্থা সুবিধাজনক না বুঝিয়া রাজমহলে চলিয়া আসিলেন। সঙ্গে পরিবারবর্গ ও বিশ্বস্ত সৈন্যগণ ছিলেন। কিন্তু এই সময়ে বর্ষার ভয়ানক দুর্য্যোগ বৃদ্ধি পাওয়াতে সম্রাটের বাহিনী তাঁহাকে আর অনুসরণ করিতে পারে নাই। এই সময়ে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। আরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদের সঙ্গে সুজার এক কন্যার বিবাহ-প্রস্তাব বহুদিন পূর্ব্ব হইতে স্থির ছিল। কন্যা বাগ্‌দত্তা ছিলেন। পিতার এই বিপদের সময়ে কন্যা রাজকুমার মহম্মদকে তাঁহার ভালবাসা এবং বিবাহের কথা স্মরণ করাইয়া এক পত্র লিখিলেন। ইহাতে তিনি তাঁহার অদৃষ্টকে নিন্দা করিয়া যাঁহাকে তিনি মনে মনে স্বামিপদে বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের আশঙ্কায় অনেক মর্ম্মান্তিক দুঃখ জ্ঞাপন করিলেন। এই পরমসুন্দরী রূপসীর পত্র পাইয়া মহম্মদের সুচিরপোষিত ভালবাসা জাগিয়া উঠিল। তিনি আরঙ্গজেবের পক্ষ ত্যাগ করিয়া সুজার সঙ্গে মিলিত হইলেন। তাঁহার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, তিনি তাঁহার বাগ্‌দত্তা স্ত্রীকে ত্যাগ করিবেন না, এই পণ করিলেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সুজা বাদশাহ নিরতিশয় সুখী হইয়া খুব ধূমধামের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। আরঙ্গজেব এই সময়ে এক অমোঘ চাতুরী খেলিয়া এই প্রীতির সম্বন্ধ ভেদ করিয়াছিলেন। তিনি মহম্মদকে একখানি চিঠি লিখিলেন—যেন উহা রাজকুমারের পত্রের উত্তর। তাহাতে লিখিত ছিল, "তুমি যে অনুতপ্ত হইয়া আমাদের দরবারে আত্মসমর্পণ করিতে চাহিয়াছ এবং ঈশ্বরের নাম করিয়া ক্ষমা চাহিতেছ—এজন্য ক্ষমা পাইবে। আমরা মনে করিয়াছিলাম তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি অনুসারে সুজা বাদশাহের শিবিরে বন্ধুভাবে যাইয়া তাঁহাকে কৌশলে বন্দী করিয়া আনিবে—কিন্তু দেখিতেছি তুমি রূপের জালে ধরা পড়িয়াছ এবং স্ত্রীর হাসিমুখ দেখিয়া কর্ত্তব্যের পথ ভুলিয়াছ।" পত্রখানি আরঙ্গজেব গোপনে পাঠাইলেন, কিন্তু যাহাতে সুজা বাদশাহের গুপ্তচরদের হাতে তাহা ধরা পড়ে এরূপ কৌশল ও ব্যবস্থা ছিল। যথাসময়ে পত্রখানি ধৃত হইয়া সুজার হাতে পড়িল, তাহাতে আরঙ্গজেবের রাজকীয় শীলমোহর ছিল এবং পত্রের ভাষা এরূপ সরল ও নিপুণ ছিল যে উহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে কাহারো কোন সন্দেহ থাকিতেই পারে না। যুবরাজ মহম্মদ ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া শপথ করিলেন, তিনি কোন পত্র তাঁহার পিতাকে লিখেন নাই,—এই তথাকথিত প্রত্যুত্তর পিতার চালবাজি মাত্র। কিন্তু কিছুতেই সুজার মনে আর জামাতার উপর বিশ্বাস ফিরিয়া আসিল না, তাঁহার অমাত্যগণও একবাক্যে বলিলেন এই পত্র জাল বলিয়া বোধ হয় না। সুজা জামাতাকে কোন শাস্তি দিলেন না। তাঁহাকে কন্যাসহ ধনরত্ন দিয়া স্বশিবির হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। কন্যা ও জামাতা কাঁদিতে কাঁদিতে সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন। পিতার নিকট ফিরিয়া আসিলে হতভাগ্য পুত্রকে ক্রূর ও নির্ম্মম পিতা বন্দী করিয়া সেলিমগড়ের দুর্গে আবদ্ধ রাখেন। ১৬৭৩ খৃঃ অব্দে ইহার মাসিক ব্যয় ১০০০৲

ধার্য্য হয়—কিন্তু পরে ইহাকে ২০,০০০ সেনার অধিনায়কত্বে নিযুক্ত করা হয়। ১৬৭৬ খৃঃ অব্দে ইনি কিত্তবারের রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন এবং ১৬৭৮ খৃঃ অব্দে ইহার মৃত্যু হয়। ১৬৫০ খৃঃ অব্দে সুজা সুতি নামক স্থানে পুনরায় মীরজুম্লার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। বহু বাঙ্গালী সৈন্য নিহত হয় এবং সুজা তাঁহার অবশিষ্ট ১,৫০০ অশ্বারোহী সৈন্যকে বিদায় করিয়া চট্টগ্রামে পালাইয়া যান। এইখান হইতে তিনি আরবে যাইয়া অবশিষ্ট জীবন মক্কায় যাপন করিতে সঙ্কল্প করেন। কিন্তু সে বৎসর অত্যন্ত দুর্য্যোগ হওয়াতে আরব-যাত্রী একখানি জাহাজও পাওয়া যায় নাই। অগত্যা তিনি তাঁহার সমস্ত অনুচরবর্গ বিদায় দিয়া শুধু পরিবারবর্গ ও দাসদাসী সমেত আরাকানের দিকে যাত্রা করেন। ১৬৬১ খৃঃ নাফ্ নদী উত্তীর্ণ হইয়া তিনি স্থলপথে আরাকানের সীমান্তে উপস্থিত হন। তাঁহার এক দূত পূর্ব্বেই তথাকার রাজাকে তাঁহার আগমনের কথা জানাইয়াছিল। রাজা তাঁহার এক প্রধান কর্ম্মচারী পাঠাইয়া সেই সীমান্তপ্রদেশ হইতে তাঁহাকে সংবর্দ্ধিত করিয়া স্বীয় রাজধানীতে লইয়া আসেন। সুজা আরাকানের রাজার আতিথ্যে কিছু কাল সুখস্বাচ্ছন্দ্যে ছিলেন। কিন্তু সহসা রাজার ভাবের পরিবর্ত্তন হইল। হয়ত বঙ্গের রাজ-প্রতিনিধির উৎকোচে বশীভূত হইয়া নতুবা কতকগুলি গুজবে বিশ্বাস করিয়া সুজার সহিত শত্রুবৎ ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং নানারূপে তাঁহাকে অপদস্থ করিয়া এক কড়া হুকুম জারি করিলেন যে, অবিলম্বে তিনি তাঁহার রাজ্য হইতে চলিয়া যাউন। সুজা বলিলেন যে, সে সময়ে ঘোর বর্ষা, জাহাজ পাওয়া যাইবে না, যদি তিনি এই বর্ষা ঋতু পর্য্যন্ত সেখানে থাকার অনুমতি পান, তবে আরাকান-রাজের সৌজন্যের প্রতিদান ও মূল্য তিনি দিবেন। (তাঁহার হাতে তখন অনেক মণিমুক্তা ও ধনরত্ন ছিল।) আরাকানরাজ তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। তাইমুরের বংশীয় দিল্লীশ্বরের পরিবারের কন্যা বিধর্ম্মী মগ-রাজের হাতে দেওয়া—এত বড় একটা অপমানজনক প্রস্তাব সুজা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। রাজা তখন, সুজা আরাকান অধিকার করিবেন এইরূপ ষড়যন্ত্র করিতেছেন—এই একটা অভিযোগ দিয়া সুজার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। আমরা কবি আলোয়ালের লিখিত আত্মচরিত হইতে জানিতে পারি যে, কবি সুজার এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন—মৃজা নামক সাক্ষীর এই মিথ্যা অভিযোগে আরাকানরাজ তাঁহাকে সাতবৎসরের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। সুজা তাঁহার পরিবারবর্গ ও পরিকরদিগকে বলিলেন, "তোমরা ভারতবর্ষে ফিরিয়া গিয়া আরঙ্গজেবের শরণাপন্ন হও। আমি এখানে নিহত হইলে আরঙ্গজেব খুব সম্ভব তোমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইবেন।" কিন্তু তাঁহারা কেহই সুজাকে এই বিপৎকালে ফেলিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইয়াছিল। মুষ্টিমেয় মোগল অগণিত আরাকানবাসীর বিরুদ্ধে কি করিবে? অনেকেই নিহত হইলেন, সুজা বাদশাহ ও তাঁহার পরিবারবর্গ আহত হইয়া ধৃত হইলেন। সুজার পরমসুন্দরী কন্যা পরীবানু, যিনি সঙ্গীতবিদ্যা, নর্ত্তন, চিত্রাঙ্কন ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মোগল অন্তঃপুরের সেরা রমণী ছিলেন, তাঁহাকে জোর করিয়া আরাকানরাজ বিবাহ করিতে চেষ্টা পাইলেন।

রাজকুমারী বক্ষঃস্থিত ছুরিকা দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করিতে চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া নিজে আত্ম-হত্যা করিলেন। সাহ সুজাকে জলগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হইল। সুজার ষোড়শ-বর্ষীয় পুত্র যুদ্ধ করিয়া হত হইলেন, তাঁহার অপর দুই কন্যা রাজান্তঃপুরে বন্দী হইয়া আরাকান-রাজের ভোগতৃষ্ণা-নিবারণের জন্য নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা অত্যল্পকালের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন,—বেশীদিন এই অপমান সহ্য করেন নাই। পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকায় সুজা-সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে। আরাকানের অরণ্যে ও রেঙ্গুনের সমুদ্রকূলে পরীবানু-সম্বন্ধে শত শত গান আছে—আমরা তাহাদের মধ্যে দুইটি মুদ্রিত করিয়াছি। গীতোক্ত কাহিনীর পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিক বিবরণের সঙ্গে অনেকটা ঐক্য হইলেও কিছু কিছু বিভিন্ন। আমরা তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

দেওয়ান ইশা খাঁর পুত্র দেওয়ান মুসা খাঁ, মুসা খাঁর পুত্র মাচুম খাঁ (১৬৬৭ খৃঃ), মাচুম খাঁর পুত্র মনুর খাঁ। মনুর খাঁ ইশা খাঁর বৃদ্ধ-প্রপৌত্র। ইহার সম্বন্ধে আমরা একটি নাতিক্ষুদ্র গ্রাম্য-গাথা পাইয়াছি। এই গাথাটি এখনও প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু ইহার সারাংশ সঙ্কলন করিয়া আমরা Eastern Bengal Ballads পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ভাগের ভূমিকায় দিয়াছি। এই গীতিকায় সুজা বাদশাহ সম্বন্ধে আরও কতকগুলি কথা আমরা পাইয়াছি; মোটামুটি সেগুলি ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই মনে হয়। ইনি স্ত্রীলোকের সঙ্গ বেশী কামনা করিতেন এবং বিলাসী ছিলেন—ষ্টুয়ার্ট সাহেবের এই উক্তির সহিত গীতি-কথিত বর্ণনার বেশ সঙ্গতি আছে। ঢাকায় সম্ভ্রান্তবংশীয় নবাব-উপাধিধারী আমির আলী নামক এক জমিদার বাস করিতেন। "সোনাই" (চলিত নাম বলিয়া মনে হয়) নামে নবাব সাহেবের এক সুন্দরী কন্যা ছিলেন। সুজা বাদশাহ ইহাকে দেখিয়া বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হন এবং কন্যাপণ দুইলক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করেন। এসময়ে সুজা বাদশাহের শরীরটা একটু অতিরিক্ত মাত্রায় মোটা হইয়াছিল। নবাব-নন্দিনী ইহাকে পছন্দ করেন নাই। ইহার মধ্যে কার্য্যগতিকে মনুর খাঁ দেওয়ান ঢাকায় আসিয়া কোন উপলক্ষে সোনাইকে দেখিতে পান, তিনি সোনাইকে পাইতে জীবনপণ করিয়া বসেন। নর্ত্তকীর ছদ্মবেশে মনুর খাঁ নবাবের অন্তঃপুরে ঢুকিয়া নাচিয়া গাহিয়া নবাব-নন্দিনীর মন হরণ করেন। নর্ত্তকী যে মনুর খাঁ একথা জানিতে পারিয়া সোনাইও এই তরুণবয়স্ক সুন্দর যুবকের প্রতি অনুরাগিণী হন। তাঁহার জননী দেওয়ানের প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হন না। কোথায় সাহান শা সাজাহান বাদসার প্রিয় পুত্র বঙ্গেশ্বর সুজা বাদশা, আর কোথায় জঙ্গলবাড়ীর ক্ষুদ্র এক দেওয়ান। মাতা কন্যার ভাব বুঝিয়া বিশেষ বিরক্ত হন। কিন্তু মনুর খাঁ কৌশলে সোনাইকে হস্তগত করিয়া মহাসমারোহে তাঁহাকে বিবাহ করেন। আহত অভিমানে এবং নিজের মনোনীত পাত্রীকে তাঁহার অধীন এক সামন্ত-নেতা এইভাবে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে শুনিয়া সুজা আগুনের মত জ্বলিয়া উঠেন। তিনি নিজের সৈন্যসহ এবং মুরসিদাবাদের কতকগুলি লোককে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া মনুর খাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ

ধাবিত হন। মসুর খাঁ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়নব্যতীত উপায়ান্তর না দেখিয়া নদীর বক্র শাখা ধরিয়া স্বীয় ক্ষুদ্র নৌবাহিনীর সহিত ছুটিতে থাকেন। ৩২ দাঁড়ি এক নৌকায় তিনি ঢাকার নিকট ডেমরা নামক স্থানে উপনীত হন। তথা হইতে বিশালতোয়া শীতলাক্ষার বক্ষে প্রধাবিত হন। এপর্য্যন্ত সোনাইকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে তাঁহাকে লইয়া চলা নিরাপদ্ নহে বুঝিয়া স্ত্রীকে জঙ্গলবাড়ী পাঠাইয়া দেন। শীতলক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া দেওয়ান ক্যাটারা নামক স্থানে উপস্থিত হন। কিন্তু সুজার অনুচরগণের গতি লক্ষ্য করিয়া ফিরিয়া নারায়ণগঞ্জ আসেন। এই সংবাদ পাইয়া চল্লিশটি রণতরীর সহিত সুজা নারায়ণগঞ্জের দিকে ধাবিত হন। এবার মসুর খাঁ বরিশালে পলায়ন করেন। সুজা বরিশালের দিকে আসিতেছেন শুনিয়া দেওয়ান ঝালকাঠীতে উপস্থিত হন। ঝালকাটী হইতে খুলনা এবং তথা হইতে কেশবপুর—এই ভাবে অনুসৃত এবং অনুসরণ-কারীর সঙ্গে নৌকাদৌড়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে। কেশবপুর হইতে মসুর খাঁ আরও কয়েকটি স্থানে গমন করেন। এই অনুসরণ-ব্যাপারে সুজা ক্লান্ত হইয়া পড়েন, কারণ প্রায় এক বৎসর কাল তিনি এইরূপ ছুটাছুটি করিতেছিলেন। তাঁহার নৌবাহিনীর রসদ সংগ্রহ করা অসুবিধাজনক হইয়া পড়িল, যেহেতু নিতান্ত দূর ও অতি ক্ষুদ্র পল্লীর নিকট দিয়া তাঁহাকে অনেক সময়ে যাইতে হইয়াছিল। এবার তিনি ৫০টি মাত্র শ্রেষ্ঠ বীর পুরুষ বাছিয়া লইয়া দেহরক্ষী নিযুক্ত করিলেন এবং অপর সকলকে বিদায় করিয়া দিলেন। কিন্তু নবাবনন্দিনীর অপহরণে তিনি এরূপ নিদারুণ মনস্তাপ পাইয়াছিলেন যে, কিছুতেই তিনি মসুর খাঁর অপরাধ ভুলিতে পারিলেন না। এইবার দেওয়ান সন্দ্বীপে আশ্রয় লইয়াছিলেন, কোন ক্রমে এই সংবাদ পাইয়া হঠাৎ সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে তিনি তথায় মসুর খাঁকে আক্রমণ করেন। একেবারে নিরুপায় হইয়া মসুর খাঁ তথাকার এক মসজিদে আশ্রয় লইলেন। সুজা মসজিদের অবমাননা করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, হয়তো অনাহারে মারা যাইবে নচেৎ শত্রু আত্মসমর্পণ করিবে। অনেক দিন গত হইল, মসজিদে যে কেহ আছে এমন কোন চিহ্ন বাদশাহ পাইলেন না। তিনি ভাবিলেন মসুর খাঁ না খাইয়া মরিয়া গিয়াছে। এই বিশ্বাসে মসজিদের কবাট বলপূর্ব্বক খোলা হইল, কিন্তু একি দৃশ্য! উপবাসকৃশ অথচ এক বীরমূর্ত্তি দরজার পাশে হইতে অসি লইয়া যুদ্ধ করিতে দাঁড়াইল। মসুর খাঁর প্রিয়দর্শন বেশরূপ দেখিয়া সুজা মুগ্ধ হইলেন। অথচ তাঁহার সিংহবিক্রমে কোন যোদ্ধা অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, পঞ্চাশজন সহচরের অনেকেই আহত হইয়াছে। তিনি সোনাইর স্বামিনির্ব্বাচনের কারণ ভালরূপেই উপলব্ধি করিয়া তাঁহার বিশাল বক্ষের দ্বারা মসুর খাঁকে আলিঙ্গন করিয়া সদ্ভাবের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলেন। উভয়ে মিলিত হইয়া চট্টগ্রামের রাজা রহনগামের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। মসুর খাঁর বিক্রম ও কৌশলে উক্ত রাজা নিহত হইলেন; তখন সুজা বাদশাহ তাঁহার নব বন্ধুবরের সহিত রাজভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া বহু ধনরত্ন পাইলেন। নানাদিক্ হইতে বহু মুসলমান আনাইয়া তথায় বাসস্থান নিরূপিত করিয়া তাঁহাদিগকে লাখেরাজ দিলেন। লুণ্ঠিত ধনরত্নের এক

ভাগ মসুর খাঁ পাইলেন ; ধনরত্নে বোঝাই দুই নৌকা জঙ্গলবাড়ীতে প্রেরিত হইল। ইহার পর সাহ সুজা রাজমহলে এবং মসুর খাঁ জঙ্গলবাড়ীতে চলিয়া গেলেন। গীতিকারক লিখিয়াছেন, "এইবার সুজা বাদশাহের জীবনের এক নূতন অধ্যায় দুঃখের মধ্য দিয়া আরম্ভ হইল" ; ইতিহাস-লেখকেরা তাহা সকলেই জানেন।

ত্রিপুরার রাজমালায় পাওয়া যায়, এই সময়ে ছত্র মাণিক্যের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য আরাকান-রাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন। আরাকান রাজ সুধর্ম্মা এবং গোবিন্দ মাণিক্য দুই সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময়ে সুজা উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গোবিন্দ মাণিক্য সিংহাসন ছাড়িয়া তাঁহাকে সেই সিংহাসনে বসাইলেন। রাজা সুধর্ম্মা গোপনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এই বিদেশীকে এতটা সম্মান দেখাইলেন কেন ? উত্তরে গোবিন্দ মাণিক্য বলিলেন, "আমার ও আপনার মত ইহার অনেক সামন্ত রাজা আছে।"

পথে গোবিন্দ মাণিক্যকে সুজা বলিলেন—"আপনি এই দেশী রাজার সভায় আমাকে বিশেষ সম্মানিত করিয়াছেন। আমার এখন আর কি আছে, যাহা এই বন্ধুত্বের প্রতিদানস্বরূপ দিতে পারি ?" এই বলিয়া তাঁহার কোষ হইতে বহুমূল্য হীরকখচিত একটি ছুরিকা ও একটি মূল্যবান্ হীরকাঙ্গুরীয় তাঁহাকে বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ প্রদান করিলেন। গোবিন্দ মাণিক্য ত্রিপুরার রাজ্য পুনর্ব্বার লাভ করিয়া কুমিল্লাতে সেই অঙ্গুরীয়টির বিক্রয়-লব্ধ টাকাতে সুজার নামে এক মসজিদ স্থাপন করিয়া তাহার উপস্বত্ব ঐ মসজিদে প্রদান করেন। কুমিল্লায় এখনও সেই মসজিদ বিদ্যমান এবং সুজানগরের উপস্বত্ব এখনও মসজিদের প্রয়োজনে ব্যয়িত হইয়া থাকে।

এই পল্লীগীতিকার একটিতে সুজা বাদশাহের সহিত আরাকান-রাজের (সুধর্ম্মার যে সংঘর্ষের বিবরণ দেওয়া আছে—তাহা ষ্টুয়ার্টপ্রদত্ত বিবরণের সহিত রেখায় রেখায় মিলিয়া যায় না। পল্লীগাথায় দৃষ্ট হয়—সুজা আরাকান-রাজ সুধর্ম্মার এক কন্যাকে বিবাহ করেন। সুজা আরাকান রাজ্য দখল করিবার উদ্দেশ্যে রাজকন্যাকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার অছিলায় ৪০খানি পাল্কী রাজবাড়ীর অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দেন। এই পাল্কীগুলির প্রত্যেকখানিতে দুইজন করিয়া সশস্ত্র যোদ্ধা ছিল। রাজাকে অন্তঃপুরে নিহত করা ইহাদের অভিপ্রায় ছিল। ছয় দেউড়ী পার হইয়া যখন পাল্কীগুলি সপ্তম দেউড়ীতে পৌঁছিল, তখন তথাকার প্রধান দ্বাররক্ষকের মনে সন্দেহ হইল, এত পাল্কী অন্তঃপুরের ভিতর যায় কেন ? ফলে সন্ধান আরম্ভ হওয়াতে যোদ্ধবর্গ বাহির হইল। তাহাদের সঙ্গে দ্বাররক্ষক ও রাজার সৈন্যের ছোটখাট যুদ্ধ হইল। সুজার লোকেরা নিহত হইল এবং সুজা স্বয়ং ধৃত হইয়া সমুদ্রগর্ভে নিহত হইলেন। এই বিবরণটি বিশ্বাসযোগ্য নহে। সুজা বিপদে পড়িয়া যাঁহার আতিথ্য লাভ করিয়া প্রাণ পাইয়াছিলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে যে হীন ষড়যন্ত্র করিবেন এরূপ মনে হয় না। বরং ষ্টুয়ার্টের উক্তির সহিত সুজাতনয়া পরীবানুর যে সকল বারমাসী প্রচলিত আছে—তাহার সঙ্গে ঐক্য দৃষ্ট হয়। আরাকানের নিকটে সমুদ্রতটে চট্টগ্রামের পূর্ব্বে সুজা ও পরীবানুসম্বন্ধে

অনেক গাথা প্রচলিত আছে। কৈলাস সিংহ মহাশয় তাঁহার রাজমালায় এই গাথাগুলির অস্তিত্বের কথা লিখিয়াছেন, আমরা তাহার দুইটি প্রকাশিত করিয়াছি। সুধর্ম্মার কন্যাকে যে সুজা বাদশাহ বিবাহ করিয়াছিলেন এ কথা তাহাতে নাই। উহা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয়। এই গাথা দুইটিতে দৃষ্ট হয়—(১) সুজা ও তাঁহার পত্নী সমুদ্রে পড়িয়া মারা যান, (২) তাঁহাদের সঙ্গে বহুমূল্য ধন ও মণিমুক্তা ছিল, তাহা আরাকান-রাজ লুণ্ঠন করেন, (৩) পরীবানু সুধর্ম্মার অন্তঃপুরে নীত হন, "নাপ্পী" খাইতে যাইয়া তাঁহার ঘৃণায় সর্ব্বদেহ কণ্টকিত হইয়া যায়, সোণার "নাগং" কাণে পরাইতে যাইয়া দশজন সহচরী তাঁহাকে জ্বালাতন করে, (৪) ব্রহ্মদেশের পোষাক তাঁহার অসহ্য হয়, তিনি তাঁহাদের পাচিকার রান্না খাইতে স্বীকৃত হন না। এই গীতিকায় ব্রহ্মদেশবাসীদের আচার-ব্যবহারের প্রতি একটু কটাক্ষ আছে। কিন্তু মূলতঃ এগুলি বড়ই করুণ, পরীবানুর দুঃখে আর্দ্র হইয়া গ্রাম্য কবিরা উহা রচনা করিয়াছিলেন। ষ্টুয়ার্টের বিবরণ অনুসারে পরীবানু সুধর্ম্মাকে হত্যা করিতে অসমর্থ হইয়া নিজে আত্মঘাতী হন। এই গাথা দুইটিতে তাঁহার মনোভাবের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে ঐরূপ করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। ষ্টুয়ার্ট মুসলমানদিগের ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন—সুজা চট্টগ্রাম হইতে স্থলপথে আরাকান রাজ্যে প্রবেশ করেন, কিন্তু বার্‌নিয়ার বলেন, তিনি একখানি জাহাজে আরাকান গিয়াছিলেন। ষ্টুয়ার্টের কথাই সত্য। চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার মিঃ লুইন, যে স্থানটিতে আরাকান-রাজের প্রতিনিধি সুজাকে সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিয়াছেন; উহা নাফ নদীর তীরে। সুজার মৃত্যুর বহু পরেও আরঙ্গজেব তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ গল্প শুনিয়া অনিদ্র রজনী যাপন করিতেন। কেহ কেহ বলিত, সুজা কনষ্টান্টিনোপলে গিয়াছেন, তথা হইতে বহু সৈন্য লইয়া দিল্লী আক্রমণ করিবেন। সম্রাট্ কখনও শুনিতেন, সুজা পারস্যদেশ পর্য্যন্ত অভিযান করিয়া আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে আসিতেছেন, আর একটি জনরব রটিয়াছিল যে, সুজা পেগু এবং শ্যাম-দেশের রাজাদের দত্ত দুইটি সশস্ত্র সৈনিকপূর্ণ বৃহৎ রণতরী লইয়া রওনা হইয়াছেন; তাঁহার জাহাজের নিশান রক্তবর্ণ।

কিন্তু কয়েক দিন পরে তাঁহার পুত্রকন্যাসহ সমূলে নিধনের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। বন্দী সাজাহান রাজা এই সংবাদ শুনিয়া সাশ্রুনেত্রে বলিয়াছিলেন, "হতভাগ্যের একটি বংশধরও প্রাণ রক্ষা করিতে পারিল না যে, সেই বর্ব্বর রাজাটার প্রতিশোধ লইতে পারিত!"

মীরজুমলা—১৬৬১-১৬৬৪ খৃঃ

ইনি পারস্যবাসী ছিলেন। ইনি তেলিঙ্গনার (দাক্ষিণাত্যে) রাজার অধীনে সেনানায়ক হইয়া গোলকুণ্ডার খনিলব্ধ বহু অর্থের মালিক হন। কিন্তু ইঁহার পুত্র মীর মহম্মদ আমীন অহঙ্কৃত ও মদ্যপায়ী হইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করেন। কথিত আছে মদ খাইয়া একদিন তিনি রাজার শয্যায় শুইয়াছিলেন। নানারূপ দুর্ঘটনার পর মীরজুমলা আরঙ্গজেবের আশ্রয় লাভ করেন। সুজা বাদশাহের পর ইনিই বাঙ্গলার গদি অধিকার করেন। ইঁহার সময়কার

প্রধান ঘটনা—কুচবিহার-রাজ বিষ্ণুনারায়ণের সঙ্গে বাদ-বিসংবাদ, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। ইনি আরঙ্গজেবের অতি বিশ্বস্ত ওমরা ছিলেন।

সায়েস্তা খাঁ—১৬৬৪-১৬৭৭ খৃঃ (প্রথম বার)*

আরাকান-রাজের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ এবং মগদিগের দৌরাত্ম্য-নিবারণ ইহার রাজত্বের প্রধান ঘটনা। ইহার সময়ে ইংরেজদের বাণিজ্যের খুব শ্রীবৃদ্ধি হয়, বাণিজ্যের জন্ম ইহাদের কোন কর দিতে হইত না। কিন্তু সায়েস্তা খাঁ মাঝে মাঝে ইংরেজদিগকে উৎপীড়ন করিতেন। ১৬৭৭ খৃঃ অব্দের ৭ই মে তারিখের এক পত্রে মাদ্রাজের গভর্নর সায়েস্তা খাঁর নিকট কয়েকটি অভিযোগ করেন—(১) ইংরেজদের নিকট হইতে হিন্দু প্রজাদের মত বাণিজ্যকর লওয়া হইতেছে। (২) আরাকান-রাজের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে বলপূর্ব্বক ইংরেজ সৈন্যের সাহায্য লওয়া হইতেছে, (৩) রাজ-কর্ম্মচারীরা অশেষরূপ নির্য্যাতন করিয়া ইংরেজ বণিকদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতেছে। গভর্নর সাহেব উপসংহারে ভয়-প্রদর্শনপূর্ব্বক লিখিলেন, "যদি এই সকল অত্যাচার নিবারিত না হয়, তবে তাঁহারা বাঙ্গলা হইতে সমস্ত ব্যবসায় তুলিয়া চলিয়া যাইবেন" (threatening if the English are not better treated, they will entirely withdraw from Bengal.—Stewart, p. 332).

ফিদাই খাঁ আজিম খাঁ—১৬৭৬-১৬৭৮ খৃঃ

রাজকুমার সুলতান মহম্মদ আজিম—১৬৭৮-১৬৭৯ খৃঃ

রাজা যশোবন্ত সিংহের শিশুসন্তানদিগকে নানা ছলে যোধপুরের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা, হিন্দুদের অসম্ভবরূপ করবৃদ্ধি, হিন্দুবিগ্রহ ও মন্দির ভঙ্গ করা প্রভৃতি কারণে সমস্ত রাজপুতনা আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তখন সম্রাট্ শিবাজিকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত। এই সময়ে রাজকুমার আজিম বঙ্গের শাসনকর্ত্তৃত্বের ভার অপর লোকের হাতে ন্যস্ত করিয়া ঢাকা হইতে এক বিপুল সৈন্যদল লইয়া রাজপুতনার দিকে অভিযান করেন, সঙ্গে তাঁহার নয়বৎসরবয়স্ক পুত্র বেদার বক্ত ছিলেন। প্রায় ৫০ দিনে তিনি যোধপুরের নিকটবর্ত্তী হন। শেষের একদিন তিনি ৭০ ক্রোশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। এই অভিযান ও শিশুকুমারের সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে। আরঙ্গজেব রাজকুমারকে রাজপুতনার বিরুদ্ধে যে বিপুল বাহিনী অগ্রসর হইতেছিল তাহার সেনাপতিত্ব প্রদান করেন।

সায়েস্তা খাঁ—১৬৭৯-১৬৮৯ খৃঃ (দ্বিতীয় বার)

ইংরেজ বাণিজ্যের এই সময়ে অনেকটা অবস্থান্তর হয়। ইংরেজেরা নবাবের কর্ম্মচারীদের দ্বারা নানারূপে উত্ত্যক্ত হইয়া বিলাতে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া পত্র লিখেন। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে হুগলী হইতে মিঃ গাইফোর্ড সায়েস্তা খাঁকে সমস্ত অভিযোগ নিবেদন করিয়া কতকগুলি প্রার্থনা করেন, তন্মধ্যে গঙ্গার উপকূলে একটি দুর্গ নির্ম্মাণের অনুমতির প্রার্থনা ছিল।

সায়েস্তা খাঁ উহা মঞ্জুর করেন নাই। ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় জেম্‌স—এ্যাডমিরাল নিকলসনের অধীনে এক রণতরী পাঠাইবার আজ্ঞা দেন, উদ্দেশ্য ছিল,—আরাকানের রাজা ও অসন্তুষ্ট হিন্দুপ্রজাদের সহিত যোগ দিয়া মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। আরঙ্গজেবের আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইয়া সায়েস্তা খাঁ বঙ্গদেশে হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর প্রচলন করেন এবং তাঁহাদের অনেক দেবমন্দির ভগ্ন করেন, এজন্য হিন্দুরা একান্ত উত্তেজিত হইয়াছিল। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে চার্নক সাহেবের নেতৃত্বে কিছু কিছু যুদ্ধবিগ্রহ হয়। ইংরেজেরা প্রথমতঃ সুতানুটিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন. কিন্তু মোগলসৈন্যকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া উলুবেড়িয়া ও তৎপরে ইঞ্জিলি নামক গঙ্গার এক উপদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মোগল সেনাপতি আব্দুল সমাদ খাঁ মিঃ চার্নককে এই উপদ্বীপ হইতে তাড়াইতে ইচ্ছা করিলেন না, তিনি জানিতেন সেখানকার জলবায়ু এত খারাপ যে আবহাওয়াই তাঁহার শত্রুপক্ষের ধ্বংসসাধন করিবে। ফলে তাহাই হইল। অর্দ্ধেকের উপরে ইংরেজ সৈন্য তিনমাসের মধ্যে কালাজ্বরে প্রাণত্যাগ করিল। এদিকে আরাকানের রাজার সঙ্গে প্রস্তাবিত সন্ধি ব্যর্থ হইল। ক্রমাগত ইংরেজেরা তাঁহার আদেশ অমান্য করায় আরঙ্গজেব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। বিশেষ তিনি যখন জানিতে পারিলেন, ইংরেজেরা তাঁহার বদ্ধ শত্রু শম্ভুজির সহিত যোগদানের চেষ্টা করিতেছেন, তখন তিনি বিষম উত্তেজিত হইয়া ইংরেজদিগের মুসলিপত্তনের বিস্তৃত কারবারগৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং তথাকার সমস্ত ইংরেজকে হত্যা করিলেন, ইহা ছাড়া ভিজগাপট্টমের তাঁহাদের দোকান-পাট এবং কারবারগৃহ লুণ্ঠিত হইল। সায়েস্তা খাঁ সম্রাটের আদেশে ঢাকার সমস্ত ইংরেজকে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন। আরঙ্গজেব আদেশ করিয়াছিলেন—ইংরেজদিগকে তাঁহার রাজ্যে সর্ব্বত্র সমূলে ধ্বংস করিতে।

সায়েস্তা খাঁর সময়ে বিহারের জমিদার গঙ্গারাম বিদ্রোহী হইয়া পাটনা অঞ্চলে অনেক লুটপাট করেন। সায়েস্তা খাঁর নির্ম্মিত অনেকগুলি হর্ম্ম্যের ধ্বংসাবশেষ এখনও ঢাকায় দৃষ্ট হয়।

নওয়াব ইব্রাহিম খাঁ—১৬৮৯-১৬৯৭ খৃঃ

ইব্রাহিম খাঁর সময়ে সম্রাট্ আরঙ্গজেব ইংরেজদের প্রতি কিছুকালের জন্য প্রসন্ন হইয়াছিলেন, যেহেতু ইংরেজদের বাণিজ্য দ্বারা রাজকোষে একটা আয় হইত, তাহা ছাড়া ইংরেজদের রণতরীর মক্কাযাত্রীদের উপর উৎপাত করিবার সম্ভাবনা ছিল। এই প্রসন্নতার ফলে ইব্রাহিম খাঁ মাদ্রাজ হইতে চার্নক সাহেবকে এদেশে আসিয়া পুনরায় বাণিজ্যাদি করিতে আমন্ত্রণ করেন। তাঁহারা মাত্র বৎসর ৩০,০০০৲ টাকা দিবেন—তাঁহাদিগকে বাণিজ্যের জন্য আর কোন শুল্ক দিতে হইবে না এই প্রস্তাব হইল। কিন্তু ইংরেজেরা এসম্বন্ধে অত্যন্ত দ্বিধা বোধ করিতে লাগিলেন। যেহেতু একটা দুর্গ না হইলে তাঁহারা কিছুতেই নিজদিগকে নিরাপদ্ মনে করেন নাই। বারংবার চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা এই অনুমতি পান নাই। এবার আকস্মিকভাবে একটা সুযোগ ঘটিল। শোভাসিংহ নামক বর্দ্ধমানের এক জমিদার

বৰ্দ্ধমান-রাজের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া বহু সৈন্ত সংগ্রহ করেন। সেই নির্ব্বাপিত পাঠানবহ্নি যাহা একেবারে নিরস্ত হইয়া গিয়াছিল—তাহার একটা স্ফুলিঙ্গ তখনও দেশের এক কোণায় ছিল। পাঠান-শক্তির এই শেষ দীপটি হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল। রহিম সেখ পুনরায় বঙ্গে মোগলশক্তি বিলোপ করিয়া পাঠান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে সঙ্কল্প করিয়া শোভাসিংহের সঙ্গে যোগ দিলেন। ইঁহারা বৰ্দ্ধমানরাজ কৃষ্ণরামকে বধ করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিলেন। কৃষ্ণরামের এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিলেন, শোভা সিংহ তাঁহার বিলাস চরিতার্থ করিবার জন্ত তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে যাওয়ায় রাজকুমারীর ছুরিকাঘাতে প্রাণ দিলেন। তাঁহার ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহ পাঠানদের সহযোগে দেশ লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। সৈন্যসামন্তেরা একবাক্যে রহিমকে তাহাদের নেতৃত্বে বরণ করিল। রহিম অপ্রতিহত গতিতে মালদহ হইতে রাজমহল এবং মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থান দখল করিয়া লইলেন। শেষোক্ত স্থানে নিয়ামৎ খাঁ নামক এক জমিদার তাঁহাকে প্রবল বাধা দিয়াছিলেন। কিন্তু রহিম তাঁহাকে নিহত করিয়া বিলাতের লোকেরা বাণিজ্য দ্বারা অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন জানিয়া সুতানুট, চুঁচুড়া এবং চন্দননগর লুটপাট করিলেন। সাহেবেরা ইঁহাকে বিশেষরূপে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবং এই সুযোগে তাঁহাদের কারবারখানার দুর্গগুলি দিনরাত লোক খাটাইয়া খুব সুদৃঢ় করিয়া লইলেন। এদিকে কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম নবাব ইব্রাহিম খাঁকে সমস্ত ব্যাপার জানাইলেন, অলসপ্রকৃতি নবাব যশোরের ফৌজদার নুরউল্লাকে একটা হুকুম দিয়া ক্ষান্ত রহিলেন। নুরউল্লা অর্থসংগ্রহে যেরূপ পটু, সামরিক ব্যাপারে তদ্রূপ ছিলেন না। তিনি তিন হাজার সৈন্ত লইয়া কিছুই করিতে পারিলেন না। বিদ্রোহীদের আস্পর্দ্ধা বাড়িয়া গেল। ইব্রাহিম খাঁর কর্ণে চতুর্দ্দিক্ হইতে সংবাদ পৌছিতে লাগিল, তিনি উপেক্ষার ভাবে তাঁহার পুত্র জবরদস্ত খাঁ এবং মন্ত্রীদিগকে বলিলেন, "এসকল ঘরাও যুদ্ধ ভাল নহে, ইহাতে বলক্ষয় হয় মাত্র। করুক না কেন—পাঠানেরা কিই বা করিবে? এর পরে আপনা হইতেই নিরস্ত হইয়া যাইবে। কিছু রাজস্বের ক্ষতি হইতেছে এই মাত্র।" এদিকে তখন সমস্ত বাঙ্গলা দেশটা পুনরায় পাঠানদের প্রায় দখলে আসিয়াছে। আরঙ্গজেব এই বৃত্তান্ত প্রথম শুনিয়া বিষম বিচলিত হইলেন এবং তখনই তাঁহার পৌত্র কুমার আজিম ওস্মানকে বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার গদিতে অভিষিক্ত করিয়া এবং নবাব ইব্রাহিমের পুত্র জবরদস্ত খাঁকে সেনাপতিত্ব প্রদান করিয়া বিদ্রোহ-দমনে নিযুক্ত করিলেন।

সুলতান আজিম ওস্মান—১৬৯৭-১৭০৭ খৃঃ

জবরদস্ত খাঁ ১৬৯৭ খৃঃ অব্দে পাঠানদিগকে পরাস্ত করেন। রাজমহলের যুদ্ধে রহিম খাঁর সেনাপতি খিরেট খাঁ নিহত হন। জবরদস্ত খাঁ ইংরেজ ও ডাচ্‌দিগের কারবার-গৃহগুলি উদ্ধার করেন, কিন্তু পাঠানদের লুণ্ঠিত ধনরত্ন ফিরাইয়া দিতে অস্বীকার করেন। এই সময়ে মুরসিদকুলি খাঁ নামক এক প্রতিভাপন্ন ব্যক্তিকে আরঙ্গজেব রাজস্ব বিভাগের কর্ত্তা 'দেওয়ান' করিয়া পাঠান। মুরসিদকুলি খাঁ যৌবনে মুসলমানদের হাতে পড়িয়া হাজি সুফিয়া নামে

ইসপাহানে নীত হন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু বলপূর্ব্বক তাঁহাকে মুসলমান করা হইয়াছিল। তখন ইঁহার নাম হইয়াছিল মহম্মদ হাদি। ইনি প্রথমতঃ হায়দ্রাবাদে কাজ করেন, তখন নাম হয় জাফর খাঁ। হায়দ্রাবাদে ইনি আরঙ্গজেবের সুনজরে পড়িয়া দেওয়ান হন, তখনকার নাম করতলব খাঁ। বঙ্গের দেওয়ান হইয়া ইঁহার নাম মুরসিদকুলি খাঁ হইল। ইনি বাঙ্গলার তৎকালীন রাজস্ব-বিভাগের গোলমাল মিটাইয়া সেরেস্তা পর্য্যন্ত দুরস্ত করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাটের প্রিয়, এজন্য সুলতান ইঁহাকে ঈর্ষা করিতেন। কিন্তু যতবার ইঁহার সহিত আজিম ওস্মানের সংঘর্ষ হইয়াছে, ততবার সম্রাট্ রাজকুমারকে লাঞ্ছিত ও অবমানিত করিয়াছেন। সুতরাং সুলতান ইঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। জবরদস্ত খাঁ পাঠানদিগকে পরাস্ত করার পর সুলতানের সহিত দেখা করিতে যান, কিন্তু আজিম ওস্মান তাঁহাকে অত্যন্ত তুচ্ছ করিয়া উপেক্ষার ভাব দেখান। জবরদস্ত খাঁ পদত্যাগ করেন। পাঠানেরা আবার মাথা জাগাইয়া লুটপাট করিতে আরম্ভ করে। সুলতানের সহিত শেষ যুদ্ধে পাঠানেরা জয়ী হওয়ার মধ্যে আসিয়াছিল, এবং আজিম ওস্মানেরও মৃত্যু প্রায় অবধারিত হইয়াছিল, কিন্তু হামিদ খাঁ নামক মোগল পক্ষের এক আরব হঠাৎ বিদ্রোহি-নেতা রহিম সেককে নিহত করায় পাঠানেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে।

ইংরেজরা মিঃ ওয়ালসের দ্বারা সুলতানের নিকট অনেক আবেদন নিবেদন করিয়া পাঠান, তাঁহারা কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর এই তিনটি স্থানসম্বন্ধে নানারূপ সুবিধা প্রার্থনা করেন এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে থাকেন। এই সকল বিষয়ের মীমাংসা হইবার পূর্ব্বে একটা অবস্থান্তর হয়। ১৬৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা উইলিয়াম আরঙ্গজেবের নিকট উইলিয়াম নরিস্ নামক এক রাজদূত প্রেরণ করেন—ইনি বহু কষ্টে সম্রাটের সঙ্গে দেখা করিয়া ইংরেজদের পক্ষে অনেকটা সুবিধা করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু এই সময়ে সংবাদ আসিল যে তিনখানি মোগলাই জাহাজ মক্কাযাত্রীদিগকে ফিরাইয়া দেশে লইয়া আসিতেছিল, ইংরেজ দস্যুরা তাহা আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিয়াছে। সম্রাটের ক্রোধ দাবানলের মত জ্বলিয়া উঠিল। তিনি রাজদূতকে ("He must know his way back to England" Stewart, p. 382.) ইংলণ্ডের পথ চিনিয়া বাড়ী যাইবার হুকুম দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, যদি তিনি এরূপ প্রতিশ্রুতি দেন যে, ভবিষ্যতে কোন ইংরেজ দস্যু আর জলপথে মক্কাযাত্রীদের উপর দৌরাত্ম্য করিবে না—তবে তিনি তাঁহার বিষয়টি সুবিবেচনা করিবেন এবং এই সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াও তিনি অনুগ্রহ বিতরণ করিতে পারেন, কিন্তু রাজদূত এরূপ দায়িত্ব লইতে স্বীকার করিলেন না। ইংরেজ দস্যুদের উৎপাত জলপথে ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। সম্রাট্ হুকুম দিলেন যে, তাঁহার রাজ্যে যত য়ুরোপবাসী আছে তাহারা সকলেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবে।

মুরসিদকুলি খাঁকে সুলতান ষড়যন্ত্র করিয়া রাস্তায় হত্যা করিবার জন্য আবদুল বাহিদ নামক এক গুণ্ডাকে নিযুক্ত করেন। মুরসিদকুলি দেওয়ান হইয়া সমস্ত রাজস্ব-বিভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন। সম্রাট্প্রদত্ত ক্ষমতার বলে জমিদারগণ তাঁহার

আদেশ অমান্ত করিতে পারিতেন না। তিনি তাঁহাদের দেয় রাজস্ব অনেকগুণে বাড়াইয়া সম্রাটের অতীব প্রিয় হইয়াছিলেন, রাজকুমার সুলতান আজিম ওস্মানের আদেশ মান্ত না করিয়া দেওয়ানকে তাঁহারা ভয়ে ভয়ে মানিয়া চলিতেন। এই কারণে এবং ঈর্ষার বশীভূত হইয়া তিনি যাহা করিয়াছিলেন, মুরসিদকুলির উপস্থিতবুদ্ধি ও সাহসের জন্ত সেই অভিসন্ধি ব্যর্থ হইল; বরং মুরসিদকুলি সর্ব্বসমক্ষে ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া তাঁহার সহিত সম্মুখদ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান করিলেন। কুমার ভয় পাইয়া অনেকরূপে নিজদোষ গোপন করিতে চেষ্টা পাইলেন। আরঙ্গজেব এই ঘটনা জানিতে পারিয়া পৌত্রকে অত্যন্ত তীব্রভাবে ভৎ‌র্সনা করিয়া এবং নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া পত্র লিখিলেন, বাঙ্গলা ছাড়িয়া তাঁহাকে বিহারে থাকিতে আদেশ দিলেন। মুরসিদকুলি রাজস্ব-বিভাগের সমস্ত কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া—সুলতানের বিনা অনুমতিতে ঢাকা হইতে মুরসিদাবাদ চলিয়া আসিলেন।

সম্রাটের আদেশ অনুসারে রাজমহলে বহু ইংরেজ বন্দী হইলেন। ৫১ দিন তাঁহারা কারাবাস করিয়াছিলেন, মুরসিদ কুলির কড়া অনুশাসনে হুগলীতে তাঁহারা ভীত হইয়া পড়িলেন। সুজা-দত্ত মূল সনদ তাঁহারা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, সুতরাং ইংরেজেরা দেওয়ান সাহেবের সেক্রেটারীকে অনেক উৎকোচ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এদেশের কারবার একেবারেই উঠিয়া যাইত, কিন্তু সুলতান আজিম ওস্মান তাঁহাদের প্রতি সদয় ছিলেন, এবং মুরসিদকুলিও তাঁহার কড়া শাসন একটু শিথিল করিলেন। সুলতান রাজমহলে বন্দী ইংরেজদিগকে মুক্তি দিয়া তাঁহাদিগকে কলিকাতায় আসিতে অনুমতি দিলেন। তাঁহাদের বাণিজ্য আবার বাড়িয়া চলিল। এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দুই দলের মধ্যে ঝগড়া মিটিয়া যাওয়াতে এবং মাদ্রাজের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্যুত হওয়াতে তাঁহাদের ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি হইল। কোম্পানির দুইদল একত্র হইলেন এবং তাঁহাদের সঞ্চিত বহু অর্থ ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে মজুত রহিল।

এই সময়ে (১৭০৭ খৃষ্টাব্দে) আরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। তিনি মরিবার পূর্ব্বে তাঁহার রাজ্য তিন ভাগ করিয়া তিন পুত্রকে দিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাহা মান্ত না করিয়া ঝগড়া করিতে লাগিলেন। আজিম সাহ দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন; বঙ্গের মসনদ ত্যাগ করিয়া আজিম ওস্মান সিংহাসনের দাবী করিয়া অগ্রসর হইলেন। আগ্রার শাসনকর্ত্তা আজিম সাহের শ্বশুর আজিম ওস্মানের গতিরোধ করিলেন এবং আজিম সাহ বঙ্গদেশ হইতে প্রেরিত এককোটি টাকা রাজস্ব দখল করিয়া শাসনকর্ত্তাকে পরাভূত করিয়া বন্দী করিলেন। তাঁহার নিজ তহবিলে এক কোটী টাকা ছিল। এই বিপুল অর্থে তিনি অসংখ্য সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া আগ্রার নিকটে জাজু নামক স্থানে আজিম সাহের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। যুদ্ধে আজিম সাহ ও তাঁহার দুই পুত্র বেদার বক্ত এবং বালখা নিহত হইলেন (১৭০৭ খৃঃ)। আজিম ওস্মানের পিতা মহম্মদ মজিয়াম "সাহ আলম" উপাধি গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। আজিম ওস্মান বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার অধিপতি হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

সাহ আলমের মস্তিষ্ক খারাপ হওয়াতে সাম্রাজ্যের ভার অনেকটা আজিম ওস্মানের

উপর পড়িল। ১৭১২ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইল। আজিম ওস্মানের ব্যবহারে আমির উল ওমরা প্রভৃতি মন্ত্রীরা চটিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার তিন ভ্রাতা ময়জদ্দিন, জিনসাহ এবং রাফা হুসেনের সঙ্গে যোগ দিলেন। আবার সিংহাসন লইয়া যুদ্ধ বাধিল। ভীষণ আহবে আজিম ওস্মানের আহত হস্তী ক্ষিপ্ত হইয়া রবি নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল, সেই সঙ্গে আজিম ওস্মানের জীবনলীলা শেষ হইল। ময়জদ্দিন "জাহান্দার সাহ" উপাধি লইয়া আগ্রার তক্তে বসিলেন।

মুরসিদকুলি খাঁ—১৭০৭-১৭২৫ খৃঃ

১৭০৭ খৃঃ অব্দের অনেক পূর্ব্ব হইতে মুরসিদকুলি খাঁ বাঙ্গলার একরূপ কর্ত্তা ছিলেন। আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর আজিম ওস্মান আগ্রার যুদ্ধবিগ্রহ এবং তৎপরে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; তিনি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার নামে মাত্র সুলতান হইয়া এদিকে বেশী মনোযোগ দিতে পারেন নাই, মুরসিদকুলিই প্রকৃত শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে আজিম ওস্মানের মৃত্যু হইলে মুরসিদকুলিই নবাব হন। তিনি মুরসিদাবাদ রাজধানীই তাঁহার স্থায়ী বাসস্থানে পরিণত করেন। ভূপতি রায় এবং কেশরী রায় নামক দুইটি ব্রাহ্মণ যুবককে (সম্ভবতঃ তাঁহার আত্মীয়) তাঁহার বিশ্বস্ত সহকারিস্বরূপ নিযুক্ত করেন। তিনি হিন্দু-জমিদারদের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করেন। ক্রমাগত রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া তিনি ইতিপূর্ব্বে হিন্দু জমিদারদিগকে হয়রান করিয়াছিলেন। এখন নবাব হইয়া তাঁহাদের জমিজমা একরূপ কাড়িয়া লইলেন। সমস্ত জমির মাপ হইল। প্রজার সঙ্গে কোন সম্পর্কই জমিদারের রহিল না, নবাব সরকারের লোকেরা রাজস্ব প্রজাদের হাত হইতে আদায় করিতে লাগিল, যাহা কিছু সামান্য জমি তাঁহাদের রহিল, ক্রমাগত রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া তাহার উপস্বত্ব ভোগ করার অধিকার লুপ্ত করা হইল। রাজকর্ম্মচারীরা রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদারদিগকে লাঞ্ছনা ও কষ্টজনক চরম শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন। এই জাতীয় কর্ম্মচারীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন নাজির আহম্মদ ও রেজা খাঁ। নাজির আহম্মদ জমিদারদিগকে ধরিয়া আনিয়া কখনও তাঁহাদিগকে পা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া, কখনও বা কোঁড়া প্রহারে নির্য্যাতন করিতেন। গ্রীষ্মকালে রৌদ্রে খাড়া করিয়া রাখা এবং শীতকালে শীতল জলে নিমজ্জন প্রভৃতির কথাও শোনা যায়। তিনি পুরীষাদিপূর্ণ এক খাতের নাম রাখিয়াছিলেন "বৈকুণ্ঠ" এবং উহাতে জমিদারদিগকে নিমজ্জিত করা হইত—সেই ভয়ে তাঁহারা সর্ব্বদাই কম্পান্বিত থাকিতেন। (যশোর খুলনার ইতিহাস, ৫৮১ পৃঃ)। মুরসিদকুলি খাঁ হিন্দুদিগের প্রতি এরূপ অত্যাচার করিয়াও রাজভাণ্ডার বাড়াইয়াছিলেন, এজন্য রাজসভায় তাঁহার এত প্রতিষ্ঠা। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ইনি হিন্দুদের প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতে পারিতেন বলিয়াই বোধ হয় আরঙ্গজেবের তিনি এত প্রিয় হইয়াছিলেন। তাঁহার শাসন যে খুব কড়া ছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, যেহেতু তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করিবার দরুন তিনি স্বীয় পুত্রকে হত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যে হিন্দুদিগের প্রতি কিরূপ সদ্বিচার করা হইত, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

চুনাখালির জমিদার বৃন্দাবনের নিকট এক মুসলমান ফকির সাহায্য চাহিতে আসে। ইহার ব্যবহার অত্যন্ত গর্ব্বিত ও বিরক্তিকর দেখিয়া জমিদার তাহাকে কিছু না দিয়া তাড়াইয়া দেন। ফকির কতকগুলি ইট সংগ্রহ করিয়া একটা ছোট মসজিদের মত ঘর তৈরী করে। বৃন্দাবনের বাড়ীর কাছে এই কাণ্ডটা করে। ঐখানে দাঁড়াইয়া ফকির বিকট চীৎকার করিয়া লোকজনকে নমাজ পড়িতে আহ্বান করিত। বৃন্দাবন ঐ পথে যাইবার সময়ই ফকির বিশেষ করিয়া ঐরূপ চীৎকার করিত। বিরক্ত হইয়া বৃন্দাবন খান-কয়েক ইট ফেলিয়া দিয়া ঐ ফকিরকে তাড়াইয়া দেন। ফকির মুরসিদকুলি খাঁর নিকট নালিশ করে। কাজি মহম্মদ শরীফ্ এবং অপর একজন আইনজ্ঞ মুসলমান বিচারক এই মোকদ্দমার বিচারের ভার গ্রহণ করেন। কাজি মহম্মদ শরীফ্ প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়া স্বহস্তে বৃন্দাবনকে বধ করেন। সদয়হৃদয় মুরসিদকুলি নাকি বৃন্দাবনের পক্ষে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কাজি ফকিরের প্রতি এত বড় গর্হিত অত্যাচারের মার্জ্জনা করিতে কিছুতেই সম্মত হন নাই। কুমারিকা হইতে হিমাদ্রি পর্য্যন্ত শত শত সুবর্ণমণ্ডিত দেব-মন্দির ভাঙ্গা যাহাদের নিত্যকর্ম্ম ছিল, তাহাদের মসজিদ-নামধেয় ইষ্টক-স্তূপের একখানি ইট সরাইলে সে অপরাধের মার্জ্জনা ছিল না। স্বয়ং আজিম ওস্মান যখন এই সংবাদটা আরঙ্গজেবের নিকট জানাইলেন, তখন আরঙ্গজেব লিখিলেন, "কাজি যাহা করিয়াছেন, তাহা ঈশ্বরানুমোদিত।" যখন এই কাজি শরীফ্ বার্দ্ধক্যের জন্য অবসর প্রার্থনা করিলেন, তখন এই সদ্বিচারককে রাখিবার জন্য সরকার হইতে বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাজা সীতারাম রায়

মুরসিদকুলি খাঁর রাজত্বের প্রধান ঘটনা—সীতারামের অভ্যুদয় ও পতন। সীতারামের পূর্ব্বপুরুষ রামদাস খাঁ গজদানী বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। ইহারা কায়স্থ দাস, কাশ্যপগোত্রীয়। রামদাস খাঁ এত বড় লোক ছিলেন যে তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধে স্বয়ং রাজা গণেশ ও যদু উপস্থিত হইয়াছিলেন। কান্দী মহকুমার কুলিয়া গ্রামে ইহার বাস ছিল। তথায় ইহার নির্ম্মিত দীঘি ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। অনন্তরাম এই রামদাসের পুত্র। অনন্তরামের দুই পুত্রের মধ্যে সীতারাম ধরাধরের ধারায় জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তরাম হইতে ষষ্ঠস্থানীয় হিমকর দাসের পুত্র শ্রীরামদাস মুসলমান সরকার হইতে "খাঁ বিশ্বাস" উপাধি প্রাপ্ত হন

সীতারাম "খাঁ বিশ্বাস" মহাশয়ের প্রপৌত্র ও উদয়নারায়ণের পুত্র। ইহারা উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। রামদাস গজদানীর পর হইতে ইহাদের অবস্থার কতকটা অবনতি হইয়াছিল। সীতারামের পিতামহ হরিশ্চন্দ্র মোগল সরকারে কাজ করিয়া "রায় রাঁয়া" উপাধি লাভ করেন, তখন হইতে আবার এই পরিবারের অবস্থার উন্নতি আরম্ভ হয়।

বার ভূঞার অন্যতম ভূষণার রাজা মুকুন্দ রায় ও তৎপুত্র সত্রাজিতের মোগলদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও নিহত হওয়ার কথা আমরা পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি। সত্রাজিতের মৃত্যুর পর উক্ত পরগনা তথাকার ফৌজদারের হাতে পড়ে। তখন মোগল সরকারের এক বিশ্বস্ত ক্ষত্রিয় সেনাপতি সংগ্রামসিংহ ভূষণার উপস্বত্ব ভোগ করিয়া রাজানুগ্রহে প্রবল হইয়া উঠেন। ইনি জোর করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্য-সমাজে মিশিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাঁহাদের পুত্র-কন্যা ইনি জোর করিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারা "হাম বৈদ্য" নামক এক পৃথক্ থাক হইয়া বৈদ্যসমাজে কলঙ্কলাঞ্ছিত হইয়া আছেন।* মোগল সরকারে উদয়নারায়ণের বেশ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তিনি ভূষণার কতকাংশ জমা লইয়া তথায় সুপ্রতিষ্ঠিত হন। সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশে তেমন কেহ ছিলেন না এখনও নালিয়া, মথুরাপুরী প্রভৃতি স্থানে সংগ্রাম-সিংহের অনেক মন্দির দৃষ্ট হয়। এই সময়ে মগ, পাঠান ও পর্ত্তুগীজ দস্যুগণের দ্বারা ভূষণা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। অনুমান ১৬৫৮-৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে উদয়নারায়ণের ঔরসে দয়াময়ীর গর্ভে সীতারামের জন্ম হয়।

উদয়নারায়ণ তহসিলদারের কার্য্য করিতেন, সীতারাম বাল্যকাল হইতে লেখাপড়ায় অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র লইয়া খেলা শিক্ষা করাই তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। প্রতিভা চাপা থাকে না। তাঁহার অসাধারণ সাহস ও বিক্রমের কথা শীঘ্রই প্রচারিত হইল। তখন ভূষণা পরগনায় একদিকে মগদস্যু, অপরদিকে পাঠানবিদ্রোহী সীতারামের নিকট পরাভূত হইয়াছিল। সায়েস্তা খাঁ প্রীত হইয়া সীতারামকে ভূষণার অন্তর্গত নলদি পরগনা জায়গীর দিলেন।

এই পরগনা খুব বড় ছিল, কিন্তু দস্যুতস্করের অত্যাচারে ইহা একরূপ জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল। সীতারাম ইহার শ্রী একেবারে ফিরাইয়া দিলেন। মুকুন্দরায় ও সত্রাজিতের পর ভূষণা প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষপূর্ণ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল। সীতারাম দস্যু-তস্করের যমস্বরূপ ছিলেন। সে দেশের এক বড় দস্যু ছিল—তাঁহার নাম বক্তার খাঁ; এই দস্যুপতিকে পরাস্ত করিয়া সীতারাম যশস্বী হইলেন। বক্তার খাঁ সীতারামের সাহস ও অমিতবিক্রম দেখিয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বীয় দলবল লইয়া সীতারামের সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন। অন্যান্য দস্যুরা সীতারামের ভয়ে দূর দূরান্তরে চলিয়া গেল। নলদি পরগনায় শত শত লোক আসিয়া বাস করিতে লাগিল। সীতারাম বহু দীঘি খনন

* কথিত আছে, বঙ্গদেশে আসিয়া ইনি জিজ্ঞাসা করেন, "এদেশে ব্রাহ্মণের পরে কোন্ জাতি শ্রেষ্ঠ?" উত্তরে শুনিলেন—"বৈদ্যজাতি"। তখন নিজ পরিচয়স্থলে ইনি বলিলেন, "হাম্ বৈদ্য।"

করাইয়াছিলেন—প্রবাদ এই যে, এই দীর্ঘিকা-খনন-ব্যাপারের অন্যতম উদ্দেশ্য সৈন্য সংগ্রহ করা। প্রকাশ্যভাবে সৈন্য সংগ্রহ করিলে উহা নবাবের নজরে পড়িতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি দীর্ঘি-খননকারী সহস্র সহস্র লোককে রাত্রে সামরিক শিক্ষা প্রদান করিতেন। একদল লোকের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে তাহাদিগকে বিদায় করিয়া নূতন দল নিযুক্ত করিতেন। এই ভাবে রাজ্যের বহু লোক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার শিখিয়াছিল। প্রয়োজন হইলে তাহারা সীতারামের আহ্বানে একত্র হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইত। তাঁহার পরগনায় মগ, পাঠান ও দস্যুদের অত্যাচার নিবারিত হইয়া শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সায়েস্তা খাঁ সীতারামের বিক্রম ও দস্যু-নিবারণের কথা শুনিয়া বরং প্রীত হইলেন। তিনি আরঙ্গজেবের নিকট হইতে 'রাজা' উপাধির সনন্দ আনাইয়া তাঁহাকে দিলেন। অনুমান ১৬৮৭-৮৮ খৃঃ অব্দে সীতারাম এই 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন।

নলদি পরগনা বহুজননিবাসে পরিণত হওয়াতে ইহার আয় খুব বাড়িয়া গিয়াছিল, তাহা ছাড়া সাতৈর পরগনার অনেকটা তিনি তালুক হিসাবে লইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতাপ এখন প্রবাদবাক্যের ন্যায় লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইল। তিনি বিপুল উৎসবে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন। সেকালে এই ব্যাপারে তাঁহার ২৮,৯৫২, টাকা ব্যয় হইয়াছিল। সতীশ মিত্র বলেন, "এখনকার দিনে উহা অন্যূন দুই লক্ষ টাকার সমান।" (৫৩৯ পৃঃ)। রাজা উপাধি প্রাপ্তির পর ইনি মহম্মদপুরে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক যেরূপ বহু ঘটার সহিত অভিষেকোৎসব করিয়াছিলেন, বহুদিন কোন হিন্দু রাজা বাঙ্গলায় সেরূপ করেন নাই। লোকে মুখে মুখে গাহিয়া বেড়াইত—"ধন্য রাজা সীতারাম বাঙ্গলা বাহাদুর। যাঁর বলেতে চুরি ডাকাতি হয়ে গেল দূর॥ বাঘ মানুষে একুই ঘাটে সুখে জল খায়। রামী-শ্যামী পুঁটলী বাঁধি গঙ্গাস্নানে যায়॥"

শৈশব হইতে শিবাজির মত সীতারাম সার্ব্বভৌম হিন্দুরাজ্যপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্যসাধনে কয়েকজন অক্লান্তকর্ম্মা মহাবীর তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন, ইহাদের একজনের নাম "মেনা হাতী।" বস্তুতঃ তাঁহার বিরাট হৃষ্টপুষ্ট দেহ ও বলিষ্ঠ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখিলে তাঁহাকে ছোটখাট একটি হাতী বলিয়াই মনে হইত। দস্যুরা ইঁহার নাম শুনিলেই অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া পালাইত। ইঁহার প্রকৃত নাম রামরূপ ঘোষ (আকনার দক্ষিণ-বাড়ীর ঘোষবংশীয়)। অপর একজনের নাম মুনিরাম বোষ—খুলনা জেলার বঙ্গজ কায়স্থ। মুনিরামের দুঃসাহসিক মন্ত্রণা ও মেনা হাতীর দৈহিক বল ও অদম্য বীরত্ব—সীতারামকে সর্ব্বকার্য্যে প্রবুদ্ধ করিত। ইহা ছাড়া পাঠান বক্তার খাঁ, মোগল আমল বেগ, রূপচাঁদ ঢালী ও ফকিরা (মাছকাটা) প্রভৃতি সেনাপতিও যুদ্ধকালে তাঁহার দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিল। এই নবগঠিত বীরদলের মধ্যে অনেকে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, ইহাদের মধ্যে সীতারামের জীবনীলেখক অন্ধ যদুবাবু রখো, রামা, গুন্তো, শ্যামা, বিশে, হরে, কালা, নিমে, দীনে, ভুলো, জগা ও মেধো—এই বারজন প্রধান দস্যুবীরের উল্লেখ করিয়াছেন, সকলেই বাঙ্গালী ছিল এবং শেষে সীতারামের দলভুক্ত হইয়াছিল। রাজা সীতারাম পাঞ্জাব

হইতে শিখ, নেপাল হইতে গুর্খা আমদানী করেন নাই। বাঙ্গালী রাজা বাঙ্গলার ভাইদের লইয়া দেশের অনাচার-নিবারণের জন্য লড়াই করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু-মুসলমানে ভেদ দেখেন নাই। এসম্বন্ধে পল্লীকবি সেই সময়ে এই গানটি বাঁধিয়াছিলেন—"শুন সবে ভক্তিভরে করি নিবেদন। দেশ গাঁয়েতে যাহা হইল তার বিবরণ॥ রাজাদেশে হিন্দু বলে মুসলমানে ভাই। বাজে লড়াই কাটাকাটির নাহিক বালাই॥ হিন্দু বাড়ীর পিঠে কাসন (কাসন্দী) মুসলমানে খায়। মুসলমানের নস (রস) পাটালী হিন্দুর বাড়ী যায়॥ রাজা বলে আল্লা হরি নহে দুইজন। ভজন পূজন যেমন ইচ্ছা করুক সে তেমন॥ মিলে মিশে থাকা সুখে, তাতে বাড়ে বল। ডরেতে পলায় মগ ফিরিঙ্গীর দল॥ চুলে ধরে নারী লয়ে চড়তে নারে নায়। সীতারামের নাম শুনিয়া পলাইয়া যায়॥" (যদুবাবুর—সীতারাম ১১২ পৃঃ)। সীতারাম হিন্দুরাজ্যের আদর্শ লইয়া যে সুখ-শান্তির সাম্রাজ্যের পত্তন করিয়াছিলেন তাহা এই দেশে টিঁকিল না। এই ভ্রাতৃবিরোধখিন্ন, স্বার্থান্ধ, পরশ্রীকাতর—ঐক্যহীন উষর মরুভূমিতে স্বর্গের কল্পতরুর চারা বাড়িবে কিরূপে?

সীতারাম ক্রমশঃ তাঁহার রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সত্রাজিতের মৃত্যুর পর ভূষণা পরগনার অনেকাংশ অবশেষে কালীনারায়ণ নামক এক ব্যক্তির হস্তগত হয়। ইহার পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদের মৃত্যু হইলে সেই জমিদারীর শিশু মালিকগণের পক্ষে সীতারাম অভিভাবক হইয়া রূপাপাত, লোকভানী, রকনপুর প্রভৃতি পরগনা শাসন করেন। মামুদসাহী পরগনার ভূস্বামী রামদেবের জমিদারীর পূর্ব্বাংশ সেনাপতি মেনা হাতী বলপূর্ব্বক দখল করেন। উত্তরে মাগুরার নিকটবর্ত্তী নান্দুয়ালীতে শচীপতি মজুমদার নামক এক বৈদ্য জমিদার ছিলেন, সীতারাম তাঁহাকে স্বপক্ষে আনয়ন করেন। "উত্তরে পদ্মা পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারিগুলি সীতারামের হস্তে আসে" (সতীশ বাবু—৫৫৭ পৃঃ)। সাতৈরের উত্তরে নসিব ও নসরৎ নামক দুই পাঠান বিদ্রোহী হইয়াছিল। সীতারাম নবাবকর্ত্তৃক ইহাদিগকে দমন করিবার ভার প্রাপ্ত হন। এই সুযোগে তিনি অনেকগুলি নূতন দুর্গ ও মহম্মদপুরে কামান প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করেন। পাঠানেরা সহজেই পরাভূত হয়, এবং নবাব সরকারে তাঁহার প্রতিপত্তি খুব বাড়িয়া যায়। চাঁচড়ার রাজা মনোহর রায়, মীর্জ্জানগরের ফৌজদার নূরউল্লা খাঁর সাহায্যে সীতারামের রাজধানী আক্রমণের চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু পরাভূত হইয়া পলায়ন করেন। তখন সীতারাম তাঁহার দুর্গতির একশেষ করিয়াছিলেন (১৭০৩ খৃঃ)। সুন্দরবনের জায়গীর সীতারামের ছিল, কিন্তু কতিপয় জমিদার প্রজাদিগকে বিদ্রোহী হইতে উত্তেজিত করেন। রাজা স্বয়ং তথায় যাওয়াতে সকলে নিরস্ত হইয়া যায়। এই সূত্রে নলদী, তেলিহাটী ও মকিমপুর তাঁহার হস্তগত হয়। জানকী বিশ্বাস মজুমদার নামক এক বৈদ্যজমিদারের বংশধরেরা সুলতানপুর খড়ড়িয়া পরগনার মালিক ছিলেন। সীতারাম এই সমস্ত জমিদারের নিকট হইতেই রাজস্ব আদায় করিয়াছিলেন। বাগেরহাট-রামপালে বিদ্রোহী জমিদারদের সঙ্গে তাঁহার একটা খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি রামপাল জয় করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রদত্ত সনদে তাহা পাওয়া যায়। পরমধুদিয়ার নিকটে "রণভূম" বা রণের মাঠ নামক একটা স্থান

আছে, সম্ভবতঃ এইস্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল। সীতারাম এইবার চিরুলিয়া, মধুদিয়া প্রভৃতি পরগনা অধিকার করিয়া লইলেন।

যশোর খুলনার ইতিহাস-লেখক সতীশ বাবু বলেন "সীতারামের রাজ্য পদ্মার উত্তর পার হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গোপসাগরের তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।" (৫৬৩ পৃঃ)। উত্তরে পাবনা, দক্ষিণে ভৈরব নদ, পশ্চিমে মামুদসাহী পরগনা—তেলিহাটী পরগনার শেষ। এই এক অংশ, আর দ্বিতীয় অংশ—দক্ষিণে সুন্দরবনের আবাদী মহল, উত্তরে ভৈরব নদ হইতে আবাদ শেষ, পূর্ব্বে বালেশ্বর হইতে বরিশালের কতকাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিস্তৃত অধিকার ৪৪টি পরগনায় বিভক্ত ছিল এবং ইহার আয় তখনকার দিনে এককোটী টাকার উপরে হইত।

মোগলেরা সীতারামকে এতদিন পর্য্যন্ত প্রশ্রয় দিয়াছিলেন কেন?—তাহার একমাত্র কারণ—তাঁহারা হিন্দুজমিদারদিগকে নগণ্য মনে করিয়াছিলেন, জনশ্রুতিতে যত কিছু শোনা যাইত, নবাব তাহা কাণে আনিতেন না। সীতারামের সুশাসনে মুসলমানেরা প্রীত ছিল। তৎকালে নবাবেরা পাঠানদিগকে ও মগদিগকে আশঙ্কা করিতেন। সীতারাম নবাবের পক্ষ হইয়া দুর্দ্দান্ত পাঠান ও মগদিগকে দলন করিয়াছিলেন, ইহাতে সায়েস্তা খাঁ-প্রমুখ শাসনকর্ত্তারা বরং তাঁহার উপর প্রীতই হইয়াছিলেন। সীতারাম যে রাজস্ব দিতেন না—ইহাতে তাঁহারা এই কারণে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধির একটা সীমা আছে, সীতারাম যখন সে সীমানা লঙ্ঘন করিয়া গেলেন, তখন তাঁহার প্রতি নবাব সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

পাঠান-নির্যাতনের অছিলায় সীতারাম বহু দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, দীর্ঘিকা-খননের উপলক্ষে তিনি রাজ্যের শতসহস্র প্রজাকে সামরিক শিক্ষা দিয়াছিলেন, দস্যুদলন-প্রচেষ্টায় তিনি বহু দস্যুকে করতলগত করিয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্যশ্রেণীতে হিন্দু, পাঠান, মোগল প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের লোক রাজভক্তিপরায়ণ ও সন্তুষ্টচিত্ত ছিল।

এইভাবে বলসঞ্চয়পূর্ব্বক সীতারাম রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি মহম্মদপুরের দুর্গকে অতি দুর্গম করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিশাল অরণ্য ও তিনদিকে বিল পরিবেষ্টিত থাকায় নিভৃত প্রদেশে তিনি স্বদেশী কর্ম্মকারকর্তৃক বড় বড় কামান প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। মহম্মদপুর বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইল। রাজার আয় বাড়িয়া গেল। রাজা নিজে বিদ্বান্ ছিলেন। শৈশবে তিনি টোলে সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন, তিনি বাঙ্গলা ও উর্দ্দু খুব ভাল জানিতেন। জয়দেব ও চণ্ডীদাসের পদ খুব ভাল করিয়া আবৃত্তি করার পুরস্কারস্বরূপ তিনি জগন্নাথ চক্রবর্ত্তীকে জমি দান করিয়াছিলেন—সেই সনন্দে লিখিত ছিল—"পরমপূজনীয় জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীচরণেষু—আমার জমিদারি পরগনে মাহিমসাহীর হোগলডাঙ্গা ও কল্যাণপুর গ্রামে বার পাখী ও পরগণে নলদীর নারায়ণপুর ও নহাটি গ্রামে আট পাখী জমি আপনার চণ্ডীদাস ও জয়দেবের মুখস্থ কবিতা শুনিবার জন্য ব্রহ্মোত্তর দিলাম—আপনি পুরুষানুক্রমে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভোগদখল করুন। সন ১১১৩, তাং ৫ই বৈশাখ (১৭০৭ খৃঃ)। মহম্মদপুর অঞ্চলে

পূর্ব্ব হইতেই শিল্পের খ্যাতি ছিল। সীতারাম শিল্পের পরম উৎসাহদাতা ছিলেন। এখনও নালিয়া গ্রামে সাত হাত উচ্চ নানারূপ কারুকার্য্যশোভিত চিনির মঠ, রথ, ময়ূরপঙ্খী প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য পাওয়া যায়—ময়রারা চিনির যে কদ্‌মা এখনও তৈরী করিয়া থাকে—তাঁহার অধিকারে তাহার বেড় দুই হাত এবং উচ্চতায় দেড় হাত হইত। এই জিনিষটা তুলার ন্যায় হাল্কা, কাজ এত সূক্ষ্ম ও সুন্দর যে মনে হয় এত বড় কদ্‌মাটা ফু দিলে উড়িয়া যাইতে পারে। তাঁহারই রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থানে অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈরী হইত, এখন তাহার লুপ্ত গৌরবের চিহ্ন আছে। সাতৈরের পাটী ও মাদুর একসময়ে ভারতবিশ্রুত ছিল। কয়েক বৎসর মাত্র অতীত হইল তখনও এমন কারিগর বর্ত্তমান ছিল যে ৫০০৲ টাকা মূল্যের মাদুর তৈরী করিতে পারিত। তাঁহারই মন্দিরাদির ইটে যে কারুকার্য্য দৃষ্ট হয়, তাহা বঙ্গে সূক্ষ্ম শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কাঠের উপর, কাগজের উপর তাঁহার সময়ের যে কত সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্যের নমুনা আমরা পাইয়াছি তাহাতে মনে হয়, বীর সীতারাম রায় কেবল যুদ্ধবিগ্রহে দেবসেনাপতির পূজা করিতে অর্ঘ্য প্রস্তুত করিয়া ক্ষান্ত রহেন নাই, তিনি স্বর্ণপদ্মের ডালি অর্ঘ্য দিয়া বঙ্গের কলালক্ষ্মীর পূজা করিতেন। ভূষণা পরগনা পূর্ব্ব হইতে বস্ত্র ও কাগজ প্রস্তুত করার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল ("বনাত-মখমল-পটু ভূষণাই খাসা। বুটাদার ঢাকাই দেখিতে তামাসা॥" রামপ্রসাদ—বিদ্যাসুন্দর।) ভূষণাই কাগজ সেকালে বঙ্গের সর্ব্বত্র সুপরিচিত ছিল। আমরা ইতিপূর্ব্বে এই অঞ্চলের যে শিল্পমণ্ডিত ঘরের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও সীতারামের রাজধানীর অনতিদূরবর্ত্তী। মহম্মদপুরে এখনও কাচারু নামক একজাতীয় লোক বাস করে, তাহারা কাচের চুড়ী প্রস্তুত করিত। গালা, মোম, তামা, পিত্তল, কাঁসা এবং সোণারূপার কারুশিল্পের জন্য সীতারামের ভূষণা বিখ্যাত ছিল। মুরসিদাবাদ নবাববাড়ীর যে সুবৃহৎ কামান আছে—তাহা ঢাকার জনার্দ্দন কামার ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, পিত্তলফলকে এই কথাই উৎকীর্ণ আছে। এই কামানের নাম "জাহান-কোষা" বা "জগজ্জয়ী"। সীতারাম এই জনার্দ্দন কর্ম্মকারের স্বজাতীয় শিল্পীদিগকে ঢাকা হইতে আনিয়া মহম্মদপুরে উপনিবিষ্ট করেন। তাঁহারাই তাঁহার সুবিখ্যাত "কালু খাঁ ও ঝুমঝুম খাঁ" নামক কামান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঢাকায় উক্ত নামধেয় কামানদ্বয়ের মত একটি বৃহৎ কামান আছে, তাহা সীতারাম রায়ের কি না বলিতে পারি না। সীতারামের বহু পুষ্করিণী ও দীঘি এখনও বিদ্যমান। ইষ্টকমন্দির নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই সকল দীঘির পুণ্য নীর এখনও সুপেয়। সর্ব্বাপেক্ষা বড় দীঘি "রামসাগর", এখনও পাহাড় লইয়া তাহার বেষ্টনী ৬,০০০ হাতের কম হইবে না, ইহার বর্গফল অন্যূন ২০০ বিঘা। "সুখসাগর" নামক দীঘিতে গুরুতর রাজ্যশাসন ও যুদ্ধবিগ্রহের শ্রান্তি দূর করিবার জন্য নানা কারুশিল্পমণ্ডিত "ময়ূরপঙ্খী" নৌকাতে বহু রমণী-পরিবৃত হইয়া 'বিলাসী' সীতারাম নৌবিহার করিতেন। অতি জটিল ও কঠিন রাজনৈতিক সমস্যাপূর্ণ যাঁহার জীবন, যিনি দরিদ্র অবস্থা হইতে সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাঁহাকে 'বিলাসী' বলা মূর্খতা, তবে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও রুচি অনুগত "একপত্নীক" ধর্ম্ম তখনও বঙ্গদেশে প্রচলিত

হয় নাই, নর্ত্তন, গান, স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আমোদপ্রমোদজনিত ক্ষণিক সুখভোগে তখনকার বড়লোকেরা নৈতিক বিভীষিকা দেখিতেন না। 'সুখসাগর' ছাড়া 'কৃষ্ণসাগর' ও অন্যান্য দীঘিও এই মহাপ্রাণ ব্যক্তির সাধারণের হিতকামনায় নিদর্শনস্বরূপ রহিয়াছে।

সীতারামের রাজসভা বহুপাণ্ডিতমুখরিত ছিল। তাঁহার রাজ্যে বারুইপাড়া, মালিয়া, নহাটা, বাটাজোর প্রভৃতি স্থান বৈদিক ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের কেন্দ্রস্থান ছিল। পণ্ডিত নহাটার প্রসিদ্ধ ভাস্করানন্দ আগমবাগীশ, বৈষ্ণবচূড়ামণি কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামী প্রভৃতি পণ্ডিতেরা তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিতেন। আগমবাগীশ মহাশয় তৎসম্বন্ধে বাঙ্গলায় এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন; "ভাস্করে উদয়ভাস, উদয়নারায়ণ দাস, তনয় রাজেন্দ্র সীতারাম। গুণেন্দ্র, দেবেন্দ্র তদি, ভূ-অধিপতি, ভুবনে ভূষিত গুণগ্রাম।" "বৈদ্যকুল-প্রদীপ" অভিরাম কবীন্দ্র-শেখর কবিরাজ রাজসভার অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি রাজার নিকট হইতে "মহোপাধ্যায়" উপাধি পাইয়াছিলেন (সতীশবাবু, ৫৩৮ পৃঃ)। "অভিরামঃ কবীন্দ্রোঽসৌ সীতারামাদ্ধি ভূপতেঃ। মহোপাধ্যায়পদবীং সৎসপুর্ব্বামবাপ্তবান্" (রামতনু হড়—কুলপঞ্জী)। সীতারামের সভায় দর্শন, সাহিত্য, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রের সর্ব্বদা আলোচনা চলিত। "তিনি মুসলমান প্রজাদের শিক্ষার জন্য মৌলভী দ্বারা বহুসংখ্যক মক্তব খুলিয়াছিলেন" (সতীশবাবু, ৫৬৯ পৃঃ)।

সীতারামের "দোলমঞ্চ", "দশভুজার মন্দির", "কৃষ্ণজীর মন্দির", "রামচন্দ্রবাটী", "পঞ্চরত্ন" প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। তাঁহার মালঞ্চী গ্রামের প্রসিদ্ধ দুর্গ, কালিকাপুরের গড়, এমন কি মহম্মদপুরের দুর্গ এখন ঢিপিতে পরিণত।

একটি দরিদ্র বালক সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বীয় প্রতিভাবলে আদর্শ হিন্দু-সাম্রাজ্য গড়িতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। প্রথমজীবনে তাঁহার দুই অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন, রামজীবন ও রামরূপ (মেনা হাতী), ইঁহারা তাঁহার আজীবন-সঙ্গী। কত গভীর রজনীর পরামর্শ, কত উদ্যোগ, কত জীবন-পণ যুদ্ধ, মগ-পাঠান-হিন্দু-দস্যুর সহিত সংঘর্ষ, কত কষ্ট ও বিপৎসঙ্কুল অভিযান ও বিলবেষ্টিত স্থানে দুর্গম রাজধানীতে কামান-নির্ম্মাণ, দীঘি-খননোপলক্ষে দুর্দ্ধর্ষ বাঙ্গালী সৈন্যের সৃষ্টি—একটা অজ্ঞাত অরণ্যপ্রদেশকে সহসা যাদুমন্ত্রপ্রভাবে যেন রত্ন-মেখলা সৌধকিরীটিনী লঙ্কার মত করিয়া গড়া এবং বিদ্যা, শিল্প, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের প্রতিষ্ঠা এবং বাণিজ্যের বিলাসক্ষেত্ররূপে গড়িয়া তোলা—প্রজাদিগকে রামরাজ্যের স্বপ্ন সফল করিয়া প্রদর্শন—১৬৯০ খৃঃ হইতে ১৭১২ খৃঃ—এই স্বল্প দ্বাবিংশতি-বর্ষব্যাপী অধ্যবসায়ে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"—সেই শাহান শা সম্রাটের বিরুদ্ধে অটল প্রতিজ্ঞায় দাঁড়ানো—এভাবে এতটা বড় স্বপ্ন আর কোন্ বাঙ্গালী গত চারিশত বৎসরের মধ্যে এতটা সফলতার দিকে আনিতে পারিয়াছেন? হিন্দু-মুসলমানে এই প্রীতি, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে গুণগ্রাহিতা, কায়স্থ হইয়া বৈদ্য পণ্ডিতকে "মহোপাধ্যায়" উপাধিপ্রদান, মন্দির ও মসজিদ, চতুষ্পাঠী ও মক্তব একত্র প্রতিষ্ঠা, জয়দেব ও চণ্ডীদাসের গীতি শুনিয়া নিষ্কর জমিদান, শিল্পের প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং রাজধানীর "মহম্মদপুর" নামকরণ—এমনভাবে প্রতাপাদিত্যের পরে আর কে

করিয়াছেন? অপর মহাবীরেরা কেবল যুদ্ধবিগ্রহ লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, কিন্তু সীতারাম তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের গঠন-শক্তি সর্ব্বদিকে সপ্রমাণ করিয়াছেন। যখন মুরসিদকুলি খাঁ রাজস্ব দেওয়ায় দেরি হইলে ব্রাহ্মণ জমিদারদিগকে ধরিয়া ধরিয়া 'বৈকুণ্ঠে' নিক্ষেপ করিতেন, সেখানে পুরীষমিশ্রিত জল তাঁহাদিগকে গলাধঃকরণ করিতে হইত, তখন সীতারাম অটলভাবে দাঁড়াইয়া জমিদারদিগকে বলিতেন, "রাজস্ব দেওয়া বন্ধ কর।" তিনি জানিতেন—এই সংঘর্ষ শুধু মুরসিদাবাদের সঙ্গে নহে, সমস্ত ভারত-সাম্রাজ্যের মালিকের—হিমাদ্রিপ্রমাণ গুরুতর রাষ্ট্র-শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ, সেই বিশাল যন্ত্রের নিষ্পেষণে তাঁহার মহম্মদপুর বুদ্বুদের মত বিলীন হইবে। পতঙ্গ যেমন অগ্নিকুণ্ডে স্বেচ্ছায় ঝাঁপাইয়া পড়ে—সেইরূপ তিনি এই বিপদকে বরণ করিয়া লইলেন। এ যুদ্ধ দাউদের সঙ্গে আকবরের যুদ্ধ নহে—দ্বাদশ ভৌমিকের সমবেত শক্তির সহিত মানসিংহের যুদ্ধ নহে, জয়পরাজয় সে সকল ক্ষেত্রে অনিশ্চিত ছিল, এই যুদ্ধ নগণ্য মহম্মদপুরের সঙ্গে দিল্লীর বাদশাহের। এ সকল জানিয়াও তিনি মুরসিদকুলি খাঁ-কৃত হিন্দুজমিদারদের অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না, ফৌজদার তরপ খাঁকে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি রাজস্ব দিবেন না। মেনা হাতীর সঙ্গে যুদ্ধে তরপ খাঁ নিহত হইলেন। যে সকল হিন্দু জমিদার তাঁহার শাসনে গরুড় পক্ষীর ন্যায় হইয়া ছিলেন, তাঁহারাই রং বদলাইয়া মুরসিদকুলি খাঁর পক্ষাশ্রয়পূর্ব্বক সীতারামকে টিট্‌কারী দিতে লাগিলেন। স্বয়ং দয়ারাম রায় বক্‌সার খাঁর সঙ্গে যোগ দিয়া মোগল সৈন্যের নেতা হইয়া মহম্মদপুরে অভিযান করিলেন, গুপ্ত গুণ্ডা লাগাইয়া মেনা হাতীকে অতর্কিতভাবে বধ করিলেন। মুরসিদকুলি শত্রু হইলেও ততটা হীন ছিলেন না, তিনি সেই বিশাল নরমুণ্ড দেখিয়া বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা কি করিয়াছ? এরূপ বিশালকায় বীরকে না মারিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনা উচিত ছিল।" ("The Nawab seeiug the huge head said, 'A man like that you should have brought alive and not killed!' He directed the head to be taken back to Muhammudpur and it was there buried and a great tomb raised over it." Westland's Report, p. 27.) সীতারামের সহিত বারাসিয়ায় মোগলদের যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে ৬০০ মুসলমান সৈন্য নিহত হয়।

দয়ারামের দ্বারাই সীতারামের পতন ঘটে। শেষ পর্য্যন্ত মহম্মদপুরের দুর্গ সমাশ্রয় করিয়া তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বন্দী হইয়া তিনি মুরসিদাবাদে নীত হন। তাঁহার বহু পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ব্বে নিরাপদ্ স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার তিন বিবাহিতা পত্নীর মধ্যে একজন শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। কোন ফিরিঙ্গী লেখক আপনাকে সীতারামের বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া পর্ত্তুগীজ ভাষায় বই লিখিয়াছিলেন। তাঁহার অন্দরমহলের বহু রমণীর মধ্যে দুই একজন ফিরিঙ্গী সম্প্রদায়ভুক্ত থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

তাঁহার দেশীয় লোকের শত্রুতার ফলে তাঁহার পতন হইয়াছিল, তাঁহার রাষ্ট্রনীতি আদর্শ-নরপতির যোগ্য ছিল। তাঁহার সংগঠনী-প্রতিভা সম্রাটের যোগ্য ছিল। অদম্য বীরত্ব, সাহস, ন্যায়বোধ প্রভৃতি গুণে তিনি জগন্মান্য মহাবীরদের পর্য্যায়ভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত।

তিনি নিজের দোষে বিনষ্ট হন নাই। "জাতি যদি অভিরোষে, গরুড়ের পাখা খসে—" নিজের লোক যদি পর হয়—স্বজাতি যদি দ্রোহী হয়—তবে বিনাশ অনিবার্য্য. ভারতের ইতিহাস—বিশেষ হিন্দুজাতির ইতিহাস পুনঃ পুনঃ এই কথাটা প্রমাণ করিয়াছে। যেদিন তাঁহার শৈশবসঙ্গী, নিত্যসহচর, উচ্চাকাঙ্ক্ষার অংশীদার, রাজ্যের প্রধান ভিত্তি "মেনা হাতী"র মৃত্যু হইল—যাঁহার সহায়তায় তিনি শত দস্যুর অত্যাচার হইতে বঙ্গদেশকে বাঁচাইয়াছেন—যিনি জগতে ন্যায়রাজ্যস্থাপনের জন্য রাউণ্ড টেবেলের নাইটের ন্যায় আর্থারতুল্য রাজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, কতদিন রাত্রিতে জল্পনা করিয়া পরদিনই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সেই চিরসুহৃদ্ মেনা হাতীর মৃত্যুসংবাদ যখন পৌঁছিল, সেদিন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া যে দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়াছিল—তাহার দূরকম্পন আজও আমরা আমাদের হৃদয়ে অনুভব করিতেছি। ১৭১২ খৃঃ অব্দে সীতারামের মৃত্যু হইয়াছিল। জন্ম ১৬৫৮(৬০)—মৃত্যু ১৭১২, সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৪ অথবা ৫২ বৎসর হইয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরবর্ত্তী বাদসাহগণ

মুরসিদকুলি খাঁর সময়ে ইংরেজদের বাণিজ্যসংক্রান্ত অনেক গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইংরেজেরা বৎসরে শুধু ৩,০০০৲ টাকা দিয়াই মুক্তি চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দুদের ও অন্যান্য প্রজাদের প্রতি যে ব্যবহার, তাহা হইতে বেশী সুব্যবস্থা চাহিয়াছিলেন। মোগল এবং আরব বণিকেরা যেরূপ সর্ব্বদা শুল্ক হইতে মুক্ত, ইংরেজেরা সেইরূপ মুক্তি পাইতে আবদার করিয়াছিলেন। নবাব এই আবদারের প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি সুজা বাদশাহের মঞ্জুরী-পত্র অগ্রাহ্য করিলেন। তিনি জানিতেন উৎকোচ দিয়া ইংরেজ বণিক্ রাজকর্ম্মচারীদের বশীভূত করিয়া অনেক সুবিধা করিয়া লইয়াছিলেন। সুজার মঞ্জুরী দলিল যখন নবাব একখণ্ড ছিন্ন কাগজের মত উড়াইয়া দিলেন, তখন তাঁহারা স্বভাবতঃই ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট্ ফেরোক্‌সেয়ারের নিকট আবেদন করিলেন। এই উপলক্ষে জন সুরম্যান সম্রাট্‌কে যে বহুমূল্য উপঢৌকন পাঠাইলেন, তাহার মূল্য ৩০,০০০ পাউণ্ডের কম নহে। ইংরেজদের পক্ষীয় খোজা সরহাদ সম্রাটের নিকট ঐ মূল্যকে অতিরঞ্জিত করিয়া ১,০০,০০০ পাউণ্ড বলিয়া বর্ণনা করিলেন, সম্রাট্ সেগুলি যাহাতে নিরাপদে পৌঁছিতে পারে, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন; কিন্তু এত খরচ করিয়াও ইংরেজেরা খুব সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। নবাব দেখিলেন, ইংরেজেরা তাঁহাকে ডিঙ্গাইয়া খুব অন্যায়রূপ দাবী করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এবং ওমরাদিগকে বিস্তর উৎকোচ দিয়া কাজ উদ্ধার করিতে উদ্যোগী। তিনি তাঁহার ভ্রাতা প্রধান মন্ত্রী হুসেন আলি খাঁর দ্বারা আবেদনের বিরুদ্ধতা করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন, কিন্তু

এই সময়ে দৈব ইংরেজদের সহায় হইল। ফেরোক্‌সেয়ার রাজপুতরাজগণের অন্যতম রাজসিংহের সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিবেন, সব ঠিকঠাক, এমন কি কন্যা রাজধানীতে আনীত হইয়াছেন,—এই সময়ে সম্রাট্ গুরুতর পীড়াগ্রস্ত হইলেন, দেশী চিকিৎসকেরা হার মানিল। ইংরেজদের ডাক্তার হ্যামিলটন অস্ত্রোপচার করিয়া সম্রাট্ ফেরোক্‌সেয়ারকে শীঘ্র আরাম করিয়া দিলেন। তিনি পরিতুষ্ট হইলেন, ডাক্তার যাহা চাহিবেন তাহাই দিবেন। ডাক্তার নিজের স্বার্থ না খুঁজিয়া তাঁহাদের আবেদন-মঞ্জুরীর প্রার্থনা করিলেন। বিবাহোৎসবের গোলমালে ছয়মাস কাটিয়া গেল। ফেরোক্‌সেয়ার হ্যামিলটনকে অনেক বহুমূল্য উপহার ও আবেদনের কয়েক দফা মঞ্জুর করিয়া দিলেন, কিন্তু বাণিজ্যসংক্রান্ত বিষয়গুলিসম্বন্ধে [illegible] রিপোর্ট করিতে বলিলেন। আবেদন যাইয়া পড়িল হুসেন আলি খাঁর কাছে। সুতরাং আবার বিভ্রাট। অন্তঃপুরের এক খোজাকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করা হইল। মন্ত্রসিদ্ধকের দত্ত ঔষধের মত এই উৎকোচের ক্রিয়া তখনই দেখা গেল। কিন্তু নবাব বাঙ্গলাদেশে তাহা কার্য্যে পরিণত হওয়ার পথে, প্রকাশ্যভাবে না পারিয়া, নানারূপ বাধা জন্মাইতে লাগিলেন। একটা দফা এইরূপ ছিল যে, ইংরেজগণ কলিকাতার পার্শ্বে ৩৮টি নগর কিনিতে পারিবেন। সর্ব্বনাশ, তাহা হইলে তাঁহারা এত বড় হইয়া উঠিবেন যে ফোর্ট উইলিয়ামের জোরে পদে পদে তাঁহারা নবাবের প্রতিপক্ষতা করিতে সাহস করিবেন। নবাব জমিদারদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, যত মূল্যই দিক না কেন তাঁহারা যেন বিদেশীদিগের নিকট জমি বিক্রয় না করেন। তবে কলিকাতায় মুরসিদকুলি খাঁ ফেরোকসেয়ারের মঞ্জুরী দলিলের বলে যে সকল সুবিধা দিলেন, তাহাতে তাঁহাদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইল।

এই সময়ে ফেরোক্‌সেয়ার নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন (১৭১৯ খৃঃ)। মহম্মদাবাদের পাঠানেরা পুনরায় বিদ্রোহী হইয়াছিল, কিন্তু হুগলীর ফৌজদার আসান আলি খাঁ তাহাদিগকে দমন করেন। তাহারা মুরসিদাবাদের নিকট সরকারী ৬০,০০০ টাকা লুট করিয়াছিল। মুরসিদকুলি খাঁ সেই টাকা পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারদিগের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইলেন। তাঁহারা কেন পাঠানদিগকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—এই অপরাধে পাঠানদের সমস্ত জমিদারি তিনি তাঁহার প্রিয় রামজীবন নামক এক হিন্দুকে প্রদান করেন। রামজীবন রাজসাহীর জমিদার ছিলেন। নবাব ত্রিপুরা, আসাম ও কুচবিহারের রাজাদের সঙ্গে প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, এই সকল রাজারা একরূপ স্বাধীনই ছিলেন। নবাবের অত্যাচারে বঙ্গের হিন্দুজমিদারদের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল; কেবল বীরভূম ও বনবিষ্ণুপুরের রাজারা অনধিগম্য আরণ্য-রাজধানীতে কতকটা নিরাপদ্ হইতে পারিয়াছিলেন।

মুরসিদকুলি খাঁ হিন্দু ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়া হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে গোঁড়ামি দেখাইয়াছেন, তাহা ধর্ম্মদ্রোহী, অপর ধর্ম্মাশ্রয়িগণই সর্ব্বদা দেখাইয়া থাকেন। তিনি মোগল-সম্রাট আরঙ্গজেবের প্রিয় ওমরাহ ছিলেন এবং দোষেগুণে সেই নৃপতিই তাঁহার আদর্শ ছিলেন। তিনি ২০,০০০ মৌলভী ও গায়ক রাজসভায় নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা সদাসর্ব্বদা তাঁহার কাছে

কোরান আবৃত্তি করিতেন। মুসলমানী উৎসবগুলি তিনি খুব জাঁকজমকের সহিত সম্পাদন করিতেন। কথিত আছে, তিনি একস্ত্রী-নিষ্ঠ ছিলেন, আহারে, বিহারে ও পরিচ্ছদে সংযত ছিলেন—কথা বলিয়া তিনি কখনই তাহা লঙ্ঘন করেন নাই। মুসলমান লেখকেরা তাঁহার খুবই প্রশংসা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার সদ্গুণগুলি একমাত্র গোঁড়াদলই বেশী দেখিতে পাইতেন,—বাহিরের লোক—বিশেষতঃ হিন্দুরা - তাঁহার উদ্ভাবিত 'বৈকুণ্ঠ' নামক নরক ও শত প্রকার অপমান ও যন্ত্রণাদায়ক বিধানের ভয়ে সশঙ্ক থাকিতেন। কাফেরের দুঃখ দুঃখ নয়—কাফের ও বলির পশুর চীৎকার উপেক্ষণীয়—উহারা প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণের হাতে নিহত হইলে অক্ষয় স্বর্গলোক পাইবে—সুতরাং তাহাদের জন্য যাহারা দুঃখ করে—তাহারা বুদ্ধিহীন।—এই সকল গোঁড়া মুসলমানের ধর্ম্মবিশ্বাসগুলির পার্শ্বে হাফেজের এই উক্তি সোণা দিয়া লিখিয়া রাখা উচিত—"মদ খাও, কোরান পুড়াইয়া ফেল, কাবা-মন্দিরে আগুন ধরাইয়া দাও, পৌত্তলিকেরা যেখানে বাস করে সেইখানে যাইয়া গৃহ নির্ম্মাণ কর—কিন্তু ভাই মানুষের মনে ব্যথা দিও না"—সকল মন্দির, সকল মসজিদের চূড়া ডিঙ্গাইয়া এই কথাগুলি স্বর্গের তোরণের উপর লিখিত হওয়ার যোগ্য।

নবাব মুরসিদকুলি খাঁ ১৭২৫ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

সুজা উদ্দীন খাঁ—১৭২৫-১৭৩৯ খৃঃ

সুজা উদ্দীন খাঁ মীরজুমলার এক মাত্র কন্যা জিন্নতন্নেসাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মৃত নবাবের ইচ্ছা ছিল তাঁহার দৌহিত্র সরফরাজ খাঁ নবাব হন; কিন্তু সম্রাটের আদেশে সুজা উদ্দীন নবাব হইলেন।

সুজা উদ্দীন নবাব হইয়া বন্দী হিন্দুজমিদারদিগকে মুক্তি দিলেন। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার রাজকুমার নির্ব্বাসিত হইয়া নবাবের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সুযোগে নবাব-সৈন্য অতর্কিতভাবে আগরতলায় প্রবেশ করিয়া রাজাকে রাজ্যচ্যুত করেন, আশ্রিত রাজকুমার মোগলসম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ষ্টুয়ার্ট সাহেব এই কথা লিখিয়াছেন। এই সময়ে জার্ম্মানেরা নবাবের সনন্দ পাইয়া ওয়েষ্টেণ্ড কোম্পানির নামে বাঁকিবাজারে (কলিকাতা হইতে ১৫ মাইল দূরে) তাঁহাদের এক বিস্তৃত কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ডাচ্ ও ইংরেজগণ ইহাদের বিপক্ষতা করিয়া নবাবের কর্ম্মচারীদিগকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করাইয়া জার্ম্মানদের নামে মিথ্যা অভিযোগ প্রমাণিত করেন। ফলে নবাব-সৈন্যদল বাঁকিবাজারের কারখানাটি ধ্বংস করিয়া বঙ্গদেশে জার্ম্মান বাণিজ্যের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদন করেন। এই নবাব বঙ্গের রাজস্ব এক বৎসরের মধ্যে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা হইতে এক কোটি আটচল্লিশ লক্ষ টাকায় পরিণত করেন। জমিদারদের প্রতি ভূতপূর্ব্ব নবাবের কড়া শাসনে যাহা হয় নাই—সুজা উদ্দীনের উদারনীতির ফলে তাহা হইল। ইনি মীরজুমলার অত্যাচারের সহায় নাজির আহাম্মদ ও মোরাদ এই ওমরাহদ্বয়কে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ইহার ৫০০ রাজকর্ম্মচারীর

মধ্যে দুইটি হিন্দুকে তিনি খুব ভালবাসিতেন। তাঁহাদের একজন রায় আলমচাঁদ, ইঁহাকে নবাব "রায় রাঁয়া" উপাধি দিয়াছিলেন, অপর জগৎ শেঠ; ইঁহাদের পরামর্শে কাজ করিয়াই ইনি সরকারী আয় এত বাড়াইতে পারিয়াছিলেন। ইঁহারা নবাবের এত প্রিয় ছিলেন যে মৃত্যুর পূর্ব্বে যে সকল চুক্তিতে স্বীকার করাইয়া পুত্র সরফরাজ খাঁকে উত্তরাধিকারি- পদে মনোনীত করেন, তাহার প্রধান এক দফাএই যে, তিনি সর্ব্ববিষয়ে রায়রাঁয়া ও জগৎ শেঠের মত লইয়া কাজ করিবেন। মীরজুমলা যেরূপ অতিরিক্ত পরিমাণে মিতব্যয়ী ছিলেন, সুজা উদ্দীন তেমনই অপরিমিত বিলাসী ছিলেন, তিনি তাঁহার রাজধানী যাহাতে দিল্লীর সঙ্গে সমকক্ষতা করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৭৩৮ খৃঃ তাঁহার সেনাপতি আলিবর্দ্দী খাঁ পাটনার দস্যুদের অত্যাচার নিবারণ করেন এবং ঐ সময়ে মির হবিব নামক তাঁহার অন্য এক সেনাপতি ত্রিপুরার রাজভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া তাঁহাকে অনেক অর্থ দেন। কথিত আছে, সুজা উদ্দীনের সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের একাংশের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া 'রোসনাবাদ' হইয়াছিল।

সরফরাজ খাঁ—১৭৩৯-৪০ খৃঃ

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে সুজা উদ্দীনের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র সরফরাজ খাঁ বঙ্গের মসনদে অধিষ্ঠিত হন। সরফরাজ খাঁ ১৭৩৯-৪০ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সৌখীন নৃপতির অন্দর মহলে ১,৫০০ রমণী ছিলেন, ইঁহাদের লইয়া তিনি প্রমত্তাবস্থায় দিন রাত্রি কাটাইতেন কিন্তু তিনি সুরাপায়ী ছিলেন না। কোন সুন্দরী রমণীর কথা শুনিলে তিনি অসহিষ্ণু হইয়া ন্যায়-অন্যায় বোধ হারাইতেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি নাদির সাহের আক্রমণে দিল্লীর দুরবস্থার কথা শুনিতে পাইলেন। ভয় পাইয়া ইনি বাঙ্গলার তিন সনের বাকী খাজনা নাদির সাহকে পাঠাইলেন, শুধু তাহাই নহে—নাদির সাহের নামাঙ্কিত করিয়া তিনি মুদ্রার প্রচলন করিলেন। এই ঘটনা পরিশেষে তাঁহার শত্রুরা যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়া উত্তরকালে দিল্লীশ্বর সম্রাট্ মহম্মদ সাহার মন নবাবের প্রতি বিমুখ করিয়া দিয়াছিল। যে তিন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতে তাঁহার পিতা বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হাজি আহম্মদ একজন, বাকী দুইজন আলমচাঁদ ও জগৎ শেঠের কথা পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি। প্রথম প্রথম নবাব ইঁহাদের কথামত চলিতেন। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাচারী হইয়া ইঁহাদের দুইজনকে বিষম চটাইয়া দেন। হাজি আহম্মদের নাতি ও নাতিনীর মধ্যে একটি বিবাহ সুস্থির হইয়াছিল, ইনি তাহা ভাঙ্গাইয়া দিয়া কন্যাটিকে তাঁহার নিজের ছেলের সঙ্গে জোর করিয়া বিবাহ দেন। জগৎ শেঠের পুত্রের সঙ্গে একটি অপূর্ব্ব-রূপসী কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। জগৎ শেঠ তাঁহার পুত্রবধূকে নবাবের অন্তঃপুরে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যদিও নবাব কোন ব্যভিচার করিতে সুবিধা পান নাই। এই ঘটনায় জগৎ শেঠের পরিবারে যে কলঙ্কের দাগ পড়িয়াছিল, তাহাতে শেঠজীর উচ্চ-কুলগর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া গিয়াছিল। নবাবের শত্রুগণ মহম্মদ সাহের দরবারে এই সকল কথা এবং নাদির সাহের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব ও সম্রাট্কে অবজ্ঞা করার কথা অতিরঞ্জিতভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন

বং হাজি আহম্মদের ভ্রাতা আলিবর্দ্দী খাঁকে নবাব করিলে সম্রাট্‌কে যে তিনি অপরিমিত অর্থ দিবেন তাহার এমন একটা লোভনীয় প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, সম্রাট্ পাটনার শাসনকর্ত্তা আলিবর্দ্দী খাঁকে গোপনে বাঙ্গলার গদি দখলের জন্য নিয়োগপত্র দিলেন। এদিকে হাজি মহম্মদ ও জগৎ শেঠ নবাবকে কুপরামর্শ দিয়া ব্যয়-সঙ্কোচের উপলক্ষে তাঁহার বহু সৈন্য বিদায় করিয়া দিলেন। নবাবের মাঝে মাঝে সন্দেহ হইত, কিন্তু আলিবর্দ্দী খাঁ নানারূপ বাহ্য-রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়া পত্র লিখিতেন ও হাজি মহম্মদ এবং জগৎ শেঠ মিষ্ট কথা বলিয়া নবাবকে ভুলাইয়া রাখিতেন, তারপরে ভোজপুরীদের বিদ্রোহদমনের ভান করিয়া আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁহার বিপুল বাহিনীর সঙ্গে পাটনা হইতে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তিনি একজন মৌলভির হাতে কোরান ও একজন ব্রাহ্মণের হাতে গঙ্গাজলের ঘটি ও তুলসীপত্র দিয়া সমস্ত সেনাপতি ও সৈন্যদিগকে আহ্বান করিলেন। মুসলমান কোরান ও হিন্দু গঙ্গাজল ও তুলসী স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল—আলিবর্দ্দী যাহা বলিবেন, ন্যায় হউক অন্যায় হউক তাহারা তাহা করিবে। এই প্রতিশ্রুতির পরে, আলিবর্দ্দী যে নবাবের বিরুদ্ধে যাইতেছেন তাহা তাহাদিগকে জানাইলেন। হাজি মহম্মদ, আলিবর্দ্দী ও জগৎ শেঠ মন্ত্রগুপ্তি এত চাতুর্য্যের সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন যে, যখন আলিবর্দ্দী সৈন্য লইয়া একেবারে রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী, তখনও নবাব সম্যক্ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে সত্যসত্যই ষড়যন্ত্র করিতেছেন। শেষ মুহূর্ত্তে যখন শত্রুপক্ষের শিবির হইতে কামান গর্জ্জন করিয়া বলিল যে আলিবর্দ্দী তাঁহার শত্রু, তখন নবাব হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মাহুত বলিল, এ অসম যুদ্ধে অগণিত শত্রুর মধ্যে প্রাণ দেওয়ার কোন সার্থকতা নাই, বরঞ্চ হাতী দ্রুতবেগে ছুটাইয়া দিই,—বনবিষ্ণুপুরের রাজার প্রবল সাহায্যে হয়ত তিনি শত্রুদলনে সমর্থ হইবেন। নবাব সে কথা শুনিলেন না, বিশ্বাসঘাতক আলিবর্দ্দীর বিরুদ্ধে মহাবীরের ন্যায় যাত্রা করিয়া রণক্ষেত্রে তিনি মহাপ্রয়াণ করিলেন (১৭৪০)।

আলিবর্দ্দী খাঁ—১৭৪০-১৭৪৬ খৃঃ

নবাব সরফরাজ খাঁকে হত্যার পর মুরসিদাবাদে প্রবেশ করিয়াই আলিবর্দ্দী মৃত নবাবের মাতা জেন্নতঅলনিস্সার দর্শনপ্রার্থী হইয়া স্বয়ং তাঁহার গৃহদ্বারে যাইয়া সংবাদ পাঠাইলেন— "আমি নবাবকে হত্যা করিয়া অকৃতজ্ঞতার অনুতাপে পুড়িয়া মরিতেছি। আমি ক্ষমার্হ নহি, তথাপি ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছি। আমি প্রতিশ্রুতি দিতেছি এই ঘোর পাপকার্য্যের পর আপনার মনে আর কোন কষ্ট দিব না, সর্ব্ববিষয়ে আপনার আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিব।" অনেকক্ষণ আলিবর্দ্দী দ্বারে অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু শোকসন্তপ্তা মাতা কোন জবাবই দিলেন না। সুতরাং পুত্রহন্তা নবাবকে তাঁহার সঙ্গে দেখা না করিয়াই ফিরিয়া আসিতে হইল। পাপটি কম গুরুতর নহে—নবাব সরফরাজ খাঁ স্বয়ং তাঁহার অন্তরঙ্গ সুহৃৎ আলিবর্দ্দীকে বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন—তাঁহাকে হত্যা করা।

কিন্তু সিংহাসনপ্রাপ্তির জন্য এই সকল গুরুতর অপরাধ, স্বগৃহে ডাকিয়া আনিয়া বন্ধুত্বের ভান করিয়া অতর্কিতভাবে হত্যা করা—এই সকল গর্হিত ও নিষ্ঠুর কার্য্য মোগল ইতিহাসে বারংবার দৃষ্ট হইয়াছে। সাম্রাজ্যের লোভ অতি প্রবল, এজন্য শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, "মুক্তিমিচ্ছসি রে তাত, বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ।"

আলিবর্দ্দী নবাব হইয়া সম্রাট্‌দের রাজত্বে অহর্নিশ-সংঘটিত এই সকল ক্রূর ব্যবহারের একটিও বাদ দেন নাই। কিন্তু শত্রু ও যাঁহাদিগকে তিনি শত্রু বলিয়া মনে করিয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গে "মারি অরি, পারি যে কৌশলে" নীতি চালাইয়াও তিনি অপর সকলের সঙ্গে অবাধ ও মুক্ত প্রাণের উদারতা, সূক্ষ্ম ন্যায়-অন্যায়বোধ ও প্রজাহিতৈষণা প্রভৃতি মহৎ গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন। এই সকল বাদশাহদের অনেকেই বীরত্বের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। কিন্তু আলিবর্দ্দী ছিলেন বীরশ্রেষ্ঠ। তিনি বহু যুদ্ধ করিয়াছেন, শত্রুর শেষ না করিয়া তিনি ছাড়েন নাই, কিন্তু কোন যুদ্ধেই তিনি পরাজিত হন নাই। বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি একপদও হটিয়া যান নাই, এবং প্রাণপ্রিয় অন্তরঙ্গ সুহৃৎ যাঁহাদিগকে তিনি প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের উর্দ্ধতম শিখরে লইয়া গিয়াছেন—তাঁহারা যখন অকৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার বিদ্রোহী হইয়াছেন তখন সেই অপ্রত্যাশিত দুর্ব্যবহারে তিনি তিলমাত্র ধৈর্য্য-চ্যুত হন নাই। বাঙ্গলার বাদশাহদের মধ্যে আলিবর্দ্দী সামরিক ব্যাপারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে আসন গ্রহণের উপযুক্ত। শেষবয়সে যখন তাঁহার স্নেহের নন্দদুলাল, পরমসুন্দর, তরুণ সিরাজুদ্দৌলা বিদ্রোহী হইয়া পাটনা দখল করিতে অভিযান করিলেন—তখন সেই চিরস্নেহপালিত বালক তাঁহার কি অপকার করিবেন, তাহা মুহূর্ত্তমাত্রও ভাবিলেন না, পাছে তাহার অনিষ্ট হয়, গায়ে কাঁটার আঁচড়ের দাগ লাগে সেই ভাবনায় বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে লাগিলেন।

তিনি রাজত্বের প্রথমেই সরফরাজ খাঁর পরিবারবর্গকে ঢাকায় পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহাদের জন্য প্রচুর বৃত্তির ব্যবস্থা করিলেন। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী নবাবগণের সঞ্চিত বহু অর্থ লাভ করিয়া অকাতরে ও মুক্তহস্তে তাহা ব্যয় করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ মহম্মদকে এককোটি টাকা নগদ ও সত্তর লক্ষ টাকার উপযোগী উপঢৌকন নজরানা পাঠাইলেন। নবাব বিহার ও উড়িষ্যার শাসনভার তাঁহার আত্মীয়দিগের মধ্যে বিতরণ করিলেন। এইভাবে যখন স্থির হইয়া কেবল সিংহাসনে বসিয়াছেন, তখন শুনিতে পাইলেন সম্রাট্ মহম্মদ সাহ তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া যাহা পাইয়াছেন তাহাতে খুসী না হইয়া আরও অপরিমিত দাবী দিয়া মুরাদ খাঁ নামক এক প্রতিনিধিকে পাঠাইয়াছেন! আলিবর্দ্দী এই লোকটিকে প্রচুর উৎকোচে বশীভূত করিয়া, একটা হিসাব দাখিল করিয়া এবং সম্রাটের জন্য আর একটি মূল্যবান্ উপঢৌকনের ব্যবস্থা করিয়া মুরাদকে রাজমহল হইতে বিদায়পূর্ব্বক পুনরায় সিংহাসনে স্থির হইয়া বসিলেন। (১৭৪১ খৃঃ।)

ইহার পরে সুজা উদ্দীন বাদসাহের জামাতা মুরসিদ খাঁকে উড়িষ্যার শাসনকর্তৃত্ব হইতে বিদায় করিয়া নবাব তৎস্থলে তাঁহার ভ্রাতা হাজি মহম্মদের পুত্র সৈয়দ মহম্মদকে নিযুক্ত করিতে

সঙ্কল্প করিলেন। তিনি তদনুসারে মুরসিদ খাঁকে লিখিলেন—তিনি যদি স্বেচ্ছায় উড়িষ্যা ত্যাগ করেন, তবে তাঁহার সমস্ত ধন-রত্ন ও পরিবারবর্গ লইয়া যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারেন, যাহাতে তাঁহার অবসরগ্রহণ ও উড়িষ্যা হইতে প্রয়াণ নিরাপদ্ হয় তাহার সমস্ত ব্যবস্থা তিনি করিবেন। এই প্রস্তাবে সম্মত না হইলে যুদ্ধ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। মুরসিদ খাঁ শান্তিপ্রিয় ভালমানুষ ছিলেন—তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে উদ্যত হইলে তাঁহার স্ত্রী দুর্দ্দনা বেগম সিংহীর মত বিক্রমে তাঁহাকে কাপুরুষতার জন্য ভৎ‍সনা করেন। তাঁহার আমীরগণও শেষপর্য্যন্ত লড়াই করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। সুতরাং যুদ্ধ হইল, আলিবর্দ্দীর জয় হইল। মুরসিদ পালাইয়া দাক্ষিণাত্যে যাইয়া মসলিপত্তনের ফৌজদার আনোয়ার উদ্দী খাঁর আশ্রয় লাভ করিলেন; সৈয়দ মহম্মদ উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। গোলমাল এখানেই থামিল না, সৈয়দ মহম্মদ তাঁহার নিষ্ঠুর ব্যবহার এবং সুন্দরী রমণী-সংগ্রহাদি ব্যাপারদ্বারা প্রজাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন, তাঁহারা মুরসিদ খাঁকে পুনরায় আসিয়া শাসনভার লইতে আমন্ত্রণ করিল। কিন্তু তিনি এই গোলমালের মধ্যে আসিয়া পড়িতে স্বীকৃত না হওয়াতে বখর খাঁকে নেতা করিয়া অতি গোপনে একদল লোক সৈয়দ মহম্মদকে বন্দী করিয়া ফেলিল। বখর খাঁ উড়িষ্যা দখল করিয়া বসিলেন, এদিকে সৈয়দ মহম্মদের জন্য নবাবের ভ্রাতা হাজি মহম্মদ ও পরিবারবর্গ ভাবিয়া আকুল, তাঁহারা সৈয়দকে নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিবার সর্ত্তে সন্ধি করিতে নবাবকে উপদেশ দিলেন। কিন্তু আলিবর্দ্দী কোনকালেই ভয়প্রদর্শন কিংবা স্বীয় বিপদের আশঙ্কায় দুর্ব্বলতা দেখাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। বখর খাঁ সৈয়দ মহম্মদকে এমন ভাবে বন্দী করিয়া রাখিলেন যে, যুদ্ধে যদি বখর খাঁ পরাস্ত হন, তবে রক্ষকদিগের উপর আদেশ ছিল, যেন তাহারা তখনই বন্দীর মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলে। যুদ্ধ হইল, বখর খাঁ পরাস্ত হইলেন, কিন্তু দৈবক্রমে সৈয়দ মহম্মদ নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ মহম্মদ মসুম খাঁর উপর উড়িষ্যাশাসনের ভার দিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে মৃগয়া করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে অকস্মাৎ সংবাদ আসিল, ভাস্কর পণ্ডিত-প্রমুখ বর্গীরা বাঙ্গলাদেশে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহারা বঙ্গাধিপের কাছে 'চৌথ' অর্থাৎ রাজস্বের চতুর্থাংশ দাবী করিয়া বসিল (১৭৪১-৪২ খৃঃ।) নবাব টাকা দিতে অস্বীকার করায় তাহারা অতি দ্রুত অভিযানপূর্ব্বক আলিবর্দ্দীর অবস্থা শঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিল। নবাব বর্দ্ধমানে আশ্রয় লইলেন, তাঁহার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইল এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা চারিদিকে লুণ্ঠনকার্য্য চালাইতে লাগিল। দৃঢ় অধ্যবসায় এবং বিপদে সর্ব্বদা উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াও আলিবর্দ্দী খাঁ চারিদিকে সরিষাফুল দেখিতে লাগিলেন। তিনি দশলক্ষ টাকা দিয়া ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে সন্ধি করিতে চাহিলেন, কিন্তু সুচতুর বর্গী অবস্থা বুঝিয়া এককোটি টাকা এবং নবাবের সমস্ত হস্তী চাহিয়া বসিল। এরূপ অপমানজনক প্রস্তাবে আলিবর্দ্দী কিছুতেই সম্মত হইলেন না। যে দশলক্ষ টাকা বর্গীদিগকে দিবেন বলিয়া মজুত রাখিয়াছিলেন, তিনি তাহা সৈন্যসংগ্রহে ব্যয় করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এদিকে ভাস্কর পণ্ডিতকে তিনি সেই

একরকোটী টাকার প্রস্তাবের উত্তরে হাঁ, না, কিছু না বলিয়া—কথার ছলে ভাঁড়াইয়া রাখিতে লাগিলেন। ভাস্কর ইহার মধ্যে প্রায় মুরসিদাবাদের কাণের কাছে পলাশী ও দাউদপুর প্রভৃতি গ্রাম লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। তিনি নবাবের বিদ্রোহী কর্ম্মচারী মীরহবিবের সহায়তায় হুগলী ও হিজিলি হইতে আরম্ভ করিয়া বর্দ্ধমান জেলার সমস্ত অংশ এবং উড়িষ্যা বালেশ্বর পর্য্যন্ত, এতদ্ব্যতীত পূর্ণিয়া, বীরভূম ও রাজমহল প্রায় দখল করিয়া লইলেন, সুতরাং মুরসিদাবাদ ও তাহার সমীপবর্ত্তী কয়েকটি পল্লীছাড়া গঙ্গার পশ্চিম পারে নবাব আলিবর্দ্দীর আর কিছুই রহিল না। এই সময়ের রচিত বাঙ্গলার ছড়া "খোকা ঘুমাল, পাড়া জুড়াল, বর্গী এল দেশে। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দিব কিসে?"—সকল বাঙ্গালীই জানেন। স্নেহের দুলালকে ঘুম পাড়াইবার সময়ও মাতা বর্গীর বিভীষিকা ভুলিতে পারেন নাই।

এই সময়ে নবাব আলিবর্দ্দীর অনুমতিক্রমে ইংরেজেরা কলিকাতা অঞ্চলের চারিদিকে একটা পরিখা খনন করিতে লাগিয়া গেলেন। এই পরিখা সাত মাইল ব্যাপক হইবার কথা ছিল, ছয় মাসে তিন মাইল পর্য্যন্ত খনন করা হইয়াছিল, কিন্তু কলিকাতার দিকে বর্গীরা না আসাতে তাপর আর খননকার্য্য চলে নাই।

নবাব এবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। নৌসেতু দ্বারা ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সহসা মারহাট্টা শিবিরের নিকটবর্ত্তী হইলেন। এই আক্রমণের জন্য ভাস্কর পণ্ডিত প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া অতি দ্রুত পালাইয়া বিষ্ণুপুরের বনবহুল দুর্গমস্থানে আশ্রয় লইলেন। এদিকে নাছোড়বান্দা আলিবর্দ্দী যত জোরে শত্রুসৈন্য পালাইতেছিল, তত জোরে তাহাদিগকে অনুসরণ করিতেছিলেন। ভাস্কর পণ্ডিত স্থির হইয়া কোনস্থানে থাকিতে পারেন নাই। বিষ্ণুপুরের লোকেরা মনে ভাবিল, বর্গীরা তাঁহাদের রাজধানী লুট করিবে। রাজাকে তাহারা সমস্ত অবস্থা জানাইল, রাজা বলিলেন, "আমি জানি কি? তোমাদের কথা মদনমোহনকে জানাও;" এই বলিয়া তিনি ধন্না দিয়া স্বয়ং মন্দিরের দ্বারে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়িয়া রহিলেন। পাণ্ডা শেষ রাত্রে দেখিল এক দীর্ঘাকৃতি কৃষ্ণহয়ারূঢ় শ্যামমূর্ত্তি পুরুষবর বর্গীদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিতেছেন। প্রাতে সকলে দেখিল বর্গীরা অনেক গোলাগুলি নিকটবর্ত্তী স্থানে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। পাণ্ডা মন্দিরদ্বার খুলিয়া দেখিল, মদনমোহন-বিগ্রহের সর্ব্বাঙ্গে বারুদ, হস্তপদ বারুদের কালী মাখা। বাঙ্গলার ছড়াটির মর্ম্ম এই যে, বর্গীরা পলায়নের পথে বিষ্ণুপুরে উঁকি মারিয়া গিয়াছিল। প্রজারা ভাবিল স্বয়ং ভগবান্ তাহাদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া বর্গীদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। অকস্মাৎ অজ্ঞাতভাবে বিপদ্ হইতে মুক্তি পাইয়া তাহারা ইহা ভগবানের কৃপা এবং তাঁহারই বাহুবলের আশ্রয়ের ফল মনে করিয়া সেই সুন্দর ভক্তি ও কারুণ্যমিশ্রিত ছড়াটি রচনা করিয়াছিল (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ)। মেদিনীপুরে ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে নবাবের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে বর্গীরা হারিয়া যায়।

কিন্তু বর্গীর হাঙ্গামা এখানেই শেষ হইল না। রঘুজী ভোঁসলা তাঁহার সেনাপতির পরাজয়-সংবাদে চটিয়া গিয়া বহু সৈন্য স্বয়ং লইয়া বঙ্গদেশে অভিযান করিলেন। সকলেই

জানেন মারহাট্টাদের ইহার মধ্যেই আত্মকলহ উপস্থিত হইয়াছিল। বেরার অঞ্চলের নেতা ছিলেন রঘুজী ভোঁসলা এবং পুনার নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি বালাজীর অধিকৃত ছিল। যখন রঘুজী ভোঁসলা আলিবর্দ্দীর বিরুদ্ধে আগমন করেন, সেই সময়ে বালাজীও নবাবের নিকট হইতে সম্রাট্‌প্রদত্ত সনন্দের বলে এগার লক্ষ টাকা চৌথের দাবী করিয়া বৃহৎ সৈন্যের সহিত বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। এই দুই দলের লুণ্ঠনাদিব্যাপারে সোণার বাঙ্গলা ছারখার হইবার দশায় উপস্থিত হইল, এবং আলিবর্দ্দী দুই দলকে সামলাইতে না পারিয়া বালাজীকে তাঁহার প্রার্থিত দাবী মিটাইয়া দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন, এই সন্ধিসূত্রে বালাজী নবাবকে রঘুজীর বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন, এবং শত্রুশিবিরের লুণ্ঠনলব্ধ ধনরত্নের অর্দ্ধেকটা তাঁহার হইবে, আলিবর্দ্দী এই প্রতিশ্রুতি পাইলেন। রঘুজী এই দুই শত্রুর হাত হইতে নিরাপদ্ হইবার মানসে তৃতীয় পন্থা অর্থাৎ পলায়নবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। যদিও যুদ্ধে নবাবের জয় হইল, তথাপি বর্গীকর্ত্তৃক লুণ্ঠনের ফলে তাঁহার রাজস্বের বিস্তর ক্ষতি হইল।

এই মহারাষ্ট্র হাঙ্গামার সময়ে মুস্তাফা খাঁ আলিবর্দ্দীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই বীরত্ব ও সাহসে আলিবর্দ্দী জয়ী হইয়াছিলেন, এজন্য নবাব কৃতজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু মুস্তাফা খাঁর আস্পর্দ্ধা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল। বিহার প্রদেশের যুদ্ধে ইঁহার নিকট পূর্ব্ব ঋণ স্মরণ করিয়া তিনি সেই দেশও তাঁহাকে দিতে মনন করিয়াছিলেন কিন্তু মুস্তাফা খাঁ তাঁহার অধীন থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া তথাকার স্বাধীন নৃপতি বলিয়া স্বীকৃত হওয়ার দাবী করিলেন। ইহার পর এই ব্যক্তি বাঙ্গলাদেশও দখল করিতে চাহিতে পারে—এই আশঙ্কায় নবাব ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইঁহাকে খুসী করিবার জন্য নবাব অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে সকল জমিদারের প্রতি তিনি প্রতিকূল আদেশ দিতেন, মুস্তাফা খাঁ তাঁহাদের নিকট প্রচুর উৎকোচ পাইয়া নবাবকে তাঁহার আদেশ পরিবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিতেন। নবাব সমস্ত জানিয়া শুনিয়া শুধু খাঁ সাহেবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নিজের হুকুম বদলাইয়া ফেলিতেন। কিন্তু শেষে উভয়পক্ষই পরস্পরকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন এবং কতকগুলি কারণে তিনি মনে করিলেন, নবাব তাঁহাকে হত্যা করিতে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। তিনি নবাবকে প্রকাশ্যভাবে অভিযুক্ত করিয়া বেহারের শাসনকর্ত্তৃত্বের দাবী ছাড়িয়া দিলেন এবং নানারূপ হিসাব দেখাইয়া নবাবের নিকট সতের লক্ষ টাকা দাবী করিলেন, এবং প্রকাশ করিলেন যে ইহা পাইলেই তিনি নবাবের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া চলিয়া যাইবেন। এই প্রস্তাবে নবাব মনে মনে খুসী হইয়া তখনই হিসাব না দেখিয়া তাঁহাকে সেই দাবীর টাকা মিটাইয়া দিলেন। কিন্তু মুস্তাফা খাঁ নবাবের পাঠান সেনাপতি সমসের খাঁ ও রহিম খাঁকে লোভ দেখাইলেন যে, আলিবর্দ্দীকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পুনরায় বাঙ্গলাদেশ পাঠানদিগকে দেওয়াইবেন, তাঁহারা যদি যোগ দিয়া মুস্তাফার সঙ্গে মিলিত হন। তাঁহারা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। মুস্তাফা বর্গীদের সঙ্গে একযোগে আলিবর্দ্দীর বিরুদ্ধে অভিযান করিবেন, এই ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল।

মুস্তাফা খাঁর দাবী।

১৭৪৫ খৃঃ অব্দে মুস্তাফা খাঁ রাজমহল লুণ্ঠন করিয়া মুঙ্গের হইয়া পাটনায় জিনউদ্দিনের রাজধানী আক্রমণ করেন। যদিও জিনউদ্দিনের সৈন্যসংখ্যা অল্প ছিল, তথাপি তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করেন। একটা তীর লাগিয়া মুস্তাফার ডান চক্ষুটা নষ্ট হইয়া যায়। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাঁহাকে কষ্টে আনা হয়—ইহার পর তিনি বেশী দিন বাঁচেন নাই।

কিন্তু সমসের পাঠানও বেশীদিন বিশ্বস্ত রহিলেন না। তিনি গোপনে রঘুজীর সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। একসময়ে নবাবসৈন্য রঘুজীকে অনায়াসে বন্দী করিতে পারিত, কিন্তু সমসের তাঁহাকে পালাইতে সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী সমস্তই জানিতে পারিলেন। সমসের হঠাৎ পাটনায় যাইয়া জিনউদ্দিনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং নির্দ্দয়ভাবে জিনউদ্দিনকে নিহত করিলেন; তাঁহার ভূ-প্রোথিত সত্তরলক্ষ টাকা ও বহু মণি-মাণিক্য সমসেরের হাতে পড়িল। সমসের এতদ্ব্যতীত জিনউদ্দিনের পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল, ইঁহাদের মধ্যে বেগম আমনাও (আলিবর্দ্দীর কন্যা) ছিলেন।

এদিকে রঘুজীর পুত্র জানোজী কটকের নিকট লুণ্ঠনাদি চালাইতে লাগিলেন। আলিবর্দ্দী ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য বহু সৈন্যসহ সেনাপতি মীরজাফরকে মেদিনীপুর অঞ্চলে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু মীরজাফর ভয়ে মেদিনীপুর হইতে বর্দ্ধমানে পালাইয়া গেলেন এবং তাঁহার ধনরত্ন ও হস্তীগুলি বর্গীরা সহজেই লুণ্ঠন করিয়া লইল। মীরজাফরকে একেবারে অকর্ম্মণ্য দেখিয়া আলিবর্দ্দী আতাউল্লা নামক এক কর্ম্মঠ সেনাপতিকে নিযুক্ত করিলেন। ইনি প্রথম জানোজীর একদল সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া কার্য্যতৎপরতা দেখাইলেন, কিন্তু এক পাগলা ওমরাহ গণিয়া বলিল যে, তিনি শীঘ্রই বাদসাহ হইবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া আতাউল্লার মুণ্ড ঘুরিয়া গেল এবং তিনি নবাবের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। মীরজাফরকে তিনি নবাব হইয়া বেহারের শাসনকর্ত্তৃত্ব দিবেন—এই লোভ দেখাইয়া নিজের দলে টানিয়া লইলেন।

আলিবর্দ্দীর গুপ্তচরেরা এ সমস্ত সংবাদই তাঁহাকে দিয়াছিল। তিনি সময় নষ্ট না করিয়া এই দুই সেনাপতিকে অবমানিত করিলেন; তিনি মীরজাফরকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু এই ব্যক্তি তাঁহাকে হিসাব-নিকাশ দিতে অসম্মত হওয়াতে তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। ইহার পরে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে নবাব জয়ী হন, সমসের নিহত হন এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ও পরিবারবর্গ নবাবের হস্তগত হয়। নবাব তাঁহার কন্যাকে আশাতীতরূপে ফিরিয়া পাইয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে জিনউদ্দিনের মৃত্যুর পর নবাব জানকীরামকে বেহারের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করেন।

তখন আলিবর্দ্দীর বয়ঃক্রম ৭২ বৎসর; জানোজীর আক্রমণ তখনও থামে নাই। অবশেষে উভয় পক্ষই দীর্ঘকালের যুদ্ধবিগ্রহে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বর্গীদের সঙ্গে সন্ধি করিয়া নবাব এই বিবাদ মিটাইয়া ফেলিলেন; সন্ধির সর্ত্তানুসারে বর্গীদিগকে কটক প্রদেশের অধিকার ছাড়িয়া দিলেন এবং

বর্গীদের সঙ্গে শেষ সন্ধি।

বঙ্গদেশ হইতে বৎসরে বারলক্ষ টাকা মহারাষ্ট্র-সরকারে পৌঁছাইয়া দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হইলেন (১৭৫১ খৃঃ)। ইহার পর বর্গীরা আর কোন উপদ্রব করে নাই।

আলিবর্দ্দী এত বড় বীর হইয়াও স্নেহজনিত দুর্ব্বলতা এড়াইতে পারেন নাই। তিনি সিরাজকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন এবং এই সুশ্রী কিশোরবয়স্ক দৌহিত্রের শত অপরাধ মার্জ্জনা করিতেন। সিরাজের বিবাহে তিনি এমন ঘটা এবং বিপুল অর্থব্যয় করিয়াছিলেন যে, বহুদিন পর্য্যন্ত এই সমারোহ-ব্যাপারের কথা বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বত্র আলোচিত হইত।

যখন আলিবর্দ্দী খাঁ এইভাবে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা সুশাসন করিয়া বার্দ্ধক্যে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি সিরাজউদ্দৌলাকেই তাঁহার উত্তরাধিকারিরূপে মনোনীত করিলেন। মাতামহের আদরে সিরাজউদ্দৌলা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন, আলিবর্দ্দী তাঁহার শত দোষ দেখিতেন না। সিরাজউদ্দৌলা যাঁহাকে তাঁহার দাদা মহাশয় বা তাঁহার ভাইদের প্রিয় মনে করিতেন, তাঁহাকেই হত্যা করিতেন। এই ভাবে হুসেনকুলি খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করিলেন। নবাব তাঁহার স্নেহের দুলালকে কোন দণ্ড দিলেন না। প্রজারা সিরাজউদ্দৌলার প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিল। ইহাই শেষ নহে—হঠাৎ সিরাজ মুরসিদাবাদ হইতে কতক সৈন্য লইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন, নবাবকে লিখিলেন, "আপনি আমাকে পুতুলের মত আদর দিয়া রাখিয়াছেন, কোন রাজ্যের শাসনভার দেন না, সুতরাং আমি আপনার সঙ্গে লড়াই করিব এবং বলপূর্ব্বক রাজ্য কাড়িয়া লইব।" সিরাজ পূর্ণিয়ার দিকে সসৈন্যে যাইয়া তথাকার শাসনকর্ত্তা জানকীরামের শাসনভার তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়ার দাবী করিয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে নবাব তাঁহার দুলালটি পাছে এইরূপ অস্বাভাবিক যুদ্ধবিগ্রহে আহত হন,—তাঁহার অধিকার নষ্ট হওয়া অপেক্ষা উহাই তাঁহার বেশী ভাবনার বিষয় হইল। তিনি অতি স্নেহের সহিত তাঁহাকে জানাইলেন—"তুমি এই সিংহাসন পাইবে, ফিরিয়া এস" ইত্যাদি। সিরাজ সে সকল স্নেহের বাক্যে ভুলিলেন না। জানকীরাম দেখিলেন, সিরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করিলে পাছে তিনি হত বা আহত হন, ইহাও যেরূপ ভাবনার বিষয় হইল, এদিকে নবাবের বিনা অনুমতিতে তিনি সিরাজকেই বা কি করিয়া শাসনকর্তৃত্ব ছাড়িয়া দেন—এই সমস্যায় বিচলিত হইয়া পড়িলেন; অবশেষে যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন। সিরাজের প্রধান পরামর্শদাতা মাধি নিস্পার খাঁ যুদ্ধে নিহত হইল এবং সিরাজ দূর এক পল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। জানকীরাম কৌশলে তাঁহাকে বন্দী করিয়া তাঁহার বাসস্থানের জন্য মস্ত বড় এক প্রাসাদ নিয়োজিত করিয়া দিলেন এবং অল্প পরেই তাঁহাকে শরীররক্ষকগণ-পরিবৃত করিয়া মুরসিদাবাদে নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। নবাব তাঁহাকে কিছুমাত্র তিরস্কার না করিয়া অক্ষতদেহে যে তিনি তাঁহাকে ফিরিয়া পাইলেন, এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। নবাবের ভ্রাতা হাজি মহম্মদের ছেলেরা একে একে দুইজন এই সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাঁহারা উভয়েই জনপ্রিয় ছিলেন। নবাবদুহিতা ঘেষেটি বেগম বিস্তর টাকাকড়ি লইয়া মতিঝিলে বাস করিতে লাগিলেন এবং যাহাতে সিরাজ না হইয়া তিনিই পিতৃ-রাজ্যের

অধিকারী হন, তাঁহার মতবশ্য করিতে লাগিলেন। মুর্শিদাবাদে হাজি মহম্মদের পৌত্র সৈয়দ আহম্মদের পুত্র শওকতজঙ্গ শাসনভার গ্রহণ করিলেন। আলিবর্দ্দী ৮০ বৎসর বয়সে শোথরোগে দেহত্যাগ করিলেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি সিরাজউদ্দৌলাকেই তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া গেলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে অন্দর মহলের বেগমেরা তাঁহাদের পক্ষে নবাব সকাশে সিরাজকে কিছু বলিয়া যান এই অনুরোধ করিলে আসন্নমৃত্যু নবাব বলিলেন, "হায়! যদি তিনটি দিনও সিরাজ ভাল হইয়া থাকিত ও তাঁহার মাতামহীর সহিত ভাল ব্যবহার করিত, তবে এই অপরাধের ফল প্রত্যাশা করা যাইত।" ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের ৯ই এপ্রিল বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার মালিক, মহাবীর, ধীরস্বভাব সর্ব্বজনপ্রিয় নবাব ১৬ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁহাকে জমিদারেরা এতটা বিশ্বাস করিতেন যে বর্গীর হাঙ্গামার সময় তাঁহাকে তাঁহারা সাহায্যার্থ এককোটি টাকা তুলিয়া দিয়াছিলেন।

সিরাজউদ্দৌলা —১৭৫৬-৫৭ খৃঃ

যখন শৈশবে আমরা নবাব সিরাজউদ্দৌলার কথা শুনিতাম, তখন মনে হইত তিনি একরোখা, অকর্ম্মণ্য এক মহা অত্যাচারী দানবপ্রকৃতির লোক। তখনকার দিনের ইতিহাস ও জনশ্রুতি তাঁহাকে যে ভাবে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা হইতে অনেকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। সিরাজউদ্দৌলা যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম উনিশ বৎসর মাত্র। তিনি চৌদ্দ মাস মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি অতি প্রিয়দর্শন এবং বৃদ্ধ নবাবের চোখের মণির ন্যায় ছিলেন। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় (ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের অধ্যাপক) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাজ "কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত" নামক যে পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাহাতে লিখিত আছে—সিরাজ সিংহাসনে উঠিয়া গর্ভবতী রমণীর পেট চিরিয়া সন্তান কিরূপে থাকে তাহা দেখিতেন, গঙ্গাগর্ভে নৌকা ডুবাইয়া লোকে কি রূপে মরে তাহা দেখিয়া হৃষ্ট হইতেন। আমাদের দেশের একটা রীতি আছে, যদি তাঁহারা কোন সাধুর জীবন বর্ণনা করেন তবে পূর্ব্ববর্ত্তী সাধুরা যে সকল অলৌকিক কাণ্ড ও লীলাখেলা করিয়াছেন সেগুলির সমস্ত তাঁহার জীবনে আরোপ করেন; সেইরূপ কোন দুষ্ট চরিত্র বর্ণনা করিতে যাইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী অসাধুগণ যাহা কিছু করিয়াছে—তাহাও বর্ত্তমান চরিত্রে আরোপ করিয়া থাকেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ভাবেই সিরাজচরিত্রে এই সকল কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন। ইহা কোন মুসলমানের ইতিহাসে নাই, কোন সাহেবের বর্ণনায় নাই। মুতাক্ষরিন ও ষ্টুয়ার্টের ইতিহাস এবং অপরাপর লেখকেরা—যাহারা সিরাজের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ সকল কথা লিখিয়াছেন—তাঁহারা কেহই ঐরূপ অদ্ভুত কথা লিখেন নাই। কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত-লেখক যত পাড়াগেঁয়ে আজগুবি কথা শুনিয়াছেন, সবই নির্ব্বিচারে লিখিয়া গিয়াছেন।

সিরাজ, তরুণ বয়সে—যখন হয়ত তাঁহার ঈষৎ গোঁফের রেখা উদয় হইয়াছিল তখন তিনি বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার অধিপতি হইয়া চারিমাসের কিছু ঊর্দ্ধকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এই চারিমাস বিদেশীদিগের সঙ্গে মনোমালিন্য এবং স্বীয় দরবারের ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি একটি দিনও শান্তিতে নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। এই অল্প সময়ে তিনি এত কি অত্যাচার করিতে পারিতেন যে জগতের ইতিহাসে তাঁহাকে 'নিরো'র পার্শ্বে স্থান দিতে হইবে? জগৎ শেঠের অন্দরে রমণীর বেশে প্রবেশ করিয়া তিনি সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগকে অপমান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে এবং নবীনচন্দ্র সেন "বেগমের বেশে পাপী পশি অন্তঃপুরে" ইত্যাদি সরোষ উক্তি শেঠজীর মুখ হইতে বাহির করিয়াছেন, কিন্তু আমরা দেখিতে পাইয়াছি, ঐরূপ একটা দুষ্কার্য্য নবাব আহম্মদ করিয়াছিলেন। গোলাম হুসেন নবাব আহম্মদ সম্বন্ধে এই কথা লিখিয়াছিলেন। সিরাজের সম্বন্ধে এই অপবাদ সম্পূর্ণ অমূলক। অন্ধকূপ হত্যাটা অমূলক নহে, কিন্তু উহা নিশ্চয়ই অত্যন্ত অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে শত্রুপক্ষের বন্দীদিগকে কেহই রাজপ্রাসাদে স্বর্ণখট্টায় শোয়াইয়া রাখেন না। হয়ত সেখানে কর্ম্মচারীরা কিছু অত্যাচার করিয়াছিল, কিংবা বন্দীদিগের অভাব-অভিযোগের দিকে কর্ম্মচারীরা মনোযোগী হয় নাই। ঠিক ঘটনার সময়ে এই বিষয়টা এত অকিঞ্চিৎকর ছিল যে তাহা সাহেবেরা প্রথম দিক্‌কার রিপোর্টে উল্লেখ করেন নাই, শেষকালে উহার একটি অতিরঞ্জিত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে বলিয়াছেন, নবাব উহার কিছুমাত্র খবর রাখিতেন না। এখনই কি বড়লাট ভারতবর্ষের কোন্ জেলে কোন্ বন্দীর প্রতি কি অত্যাচার হইতেছে, কাহার কি অসুবিধা হইতেছে ইহার সকল সংবাদ রাখেন? জেলের কর্ম্মচারীরা কি বন্দীদিগের সহিত ব্যবহারে প্রত্যেক বিষয়ে বড়লাটের মঞ্জুরী লইয়া কাজ করেন? আমাদের বিশ্বাস অন্ধকূপ-হত্যা ব্যাপারটা একেবারে অমূলক নহে, কিন্তু শেষকালে তিলকে তাল করিয়া লেখা হইয়াছে। রাজীবলোচন, যিনি ইংরেজদের পক্ষ হইয়া কেরি সাহেবের প্রেরণায় তাঁহার পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, তিনিও এই ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হয় এবং ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত লণ্ডনে ছাপা হয়;—ইহাতে সিরাজের সম্বন্ধে অতি বীভৎস বহু মিথ্যাকথা—যাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি—লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। মাত্র ৫০ বৎসর পরের লিখিত এই বিবরণটিতেও সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে নানা দোষারোপ থাকা সত্ত্বেও অন্ধকূপের কথা একবারও উল্লিখিত হয় নাই। যুদ্ধবিগ্রহের সময় এইরূপ সকল ঘটনা এত সচরাচর দৃষ্ট হয় যে তাহা কেহ অত্যাচারের দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করে না। এই ঘটনা অত্যাচারমূলক স্বীকার করিলেও নবাবকে এ সম্বন্ধে অভিযুক্ত করা সঙ্গত হইবে না।

তবে নবাব যে জনপ্রিয় হইতে পারেন নাই, তাহা নিশ্চিত কথা। তিনি তাঁহার দাদা-মহাশয়ের আদরে অত্যন্ত প্রশ্রয় পাইয়াছিলেন, তিনি গুরুতর অপরাধ করিলেও বৃদ্ধ নবাব তাঁহাকে শাসন করেন নাই এজন্য তিনি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতেন। প্রজাদিগকে অযথা পীড়ন করিতেন, লোকে জানিত সিরাজ যাহা করিবেন, তাহার উপরে নালিশ চলিবে না। সুতরাং জনসাধারণ এই অতিরিক্ত প্রশ্রয়প্রাপ্ত খামখেয়ালী তরুণ যুবকের প্রতি বীতরাগ

হইয়াছিল। নিশ্চয়ই তিনি সুন্দরী স্ত্রীলোক খুঁজিয়া বেড়াইতেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নবাব ওস্তাদ ছিলেন, তাঁহার রাজত্বকালে তিনি এইভাবে বহু অপরাধ করিয়াছেন, কিন্তু সিরাজ ৪ মাস কালের মধ্যে এরূপ অপরাধ কতটাই বা করিতে পারিয়াছিলেন? নাটোরের মহারাণী ভবানীর কন্যা তারাসুন্দরী রাজসাহী-বাজুরাগ্রামবাসী রঘুনাথ লাহিড়ীর পত্নী ছিলেন, তিনি নিরুপমা সুন্দরী ছিলেন, তিনি বালবিধবা; তাঁহার দিকে সিরাজের লোভ ছিল। এসম্বন্ধে দেশব্যাপী এত প্রবাদ আছে যে তাহা অবিশ্বাস করা চলে না।

তারাসুন্দরী।

তারাসুন্দরীকে লইয়া রাণী ভবানী এতটা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার একটা মূর্ত্তি গড়িয়া তাহা শ্মশানে পোড়াইয়া তাঁহার মৃত্যু প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আদুরে ছেলে তাঁহার অভিভাবক গুরুজনের যত আদর পায় সেই পরিমাণে সে অপরাপর লোকের চক্ষুঃশূল হইয়া থাকে। এই হিসাবে সিরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্ব হইতেই লোকের বিষচক্ষে পড়িয়াছিলেন। অবশ্যই হুসেনকুলি ও তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া বিনা শাস্তিতে ক্ষমা লাভ করাতে এবং পূজনীয় মাতামহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাতে অত্যধিক আদরে নষ্ট এই বালককে দেখিতে না পারার জন্য আমরা জনসাধারণকে দোষ দিতে পারি না। তিনি লোকশ্রদ্ধা এতটা হারাইয়াছিলেন যে, তাঁহার নিষ্ঠুর মৃত্যু এবং তাঁহার বিরুদ্ধে হেয় ষড়যন্ত্র—লোকে জানিলেও তাঁহার স্মৃতি কোন কারুণ্যের সৃষ্টি করে নাই, এমন কি যে ফকির তিনদিনের উপবাসী নবাবকে খাবার দেওয়ার লোভে ডাকিয়া আনিয়া মীরজাফরের লোকের হাতে ধরাইয়া দিল, তাহার বিরুদ্ধে লোকে একটা কথাও বলিল না। কয়েক দিনের নিরম্বু উপবাসের পর ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর হতভাগ্য নবাব যখন আহারে বসিলেন, তখন ধৃত হইয়া হত্যার জন্য মীরজাফর-গৃহে নীত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শব হস্তিপৃষ্ঠে রাজপথে নীত হইলে তাঁহার মা আমনা বেগম আর্ত্তনাদ করিয়া সেই হস্তীর পদতলে পতিত হইলেন। যে প্রিয়দর্শন কিশোর তাঁহার দাদামহাশয়ের আদরের দুলাল ছিলেন, তাঁহার অনাহার-অনিদ্রাক্লান্ত দেহের উপর নির্ম্মম খড়্গাঘাত ও রাজনন্দিনীর পরিতাপে বোধ হয় পাষাণও বিগলিত হইত, কিন্তু তাঁহার এই করুণ শোচনীয় পরিণাম উপলক্ষে পল্লীকবিরা একটা ছড়া বা গীতিকা রচনা করিল না। পলাশীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে চাষারা যেরূপভাবে হলচালনা করিত, সেইভাবেই কৃষি-কার্য্য চলিল, কোন পল্লী-কবি এরূপ শোকাবহ ব্যাপার লইয়া একটি গান বাঁধিল না, ইহার কারণ কি? অথচ ইংরেজদের গুণগানে আকাশ-বাতাস পূর্ণ হইয়া গেল, চারিদিকে জয়জয়কার পড়িল—এই বিসদৃশ কাণ্ডের অর্থ কি? নবাব জনমত অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছেন—অত্যাচার করিয়াছেন—এবং প্রজারা এমন কি রাণী ভবানীর ন্যায় পূজনীয়া সম্ভ্রান্ত মহিলারাও তাঁহার ভয়ে আতঙ্কে নিশা যাপন করিয়াছেন। সেনবংশের রাজত্বনাশের পরেও তৎসম্বন্ধে পল্লীকবিরা নীরব ছিলেন, নিম্ন সম্প্রদায়ের শতসহস্র লোকের প্রীতি তাঁহারা আকর্ষণ করিতে পারেন নাই, শুধু ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহাদের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষাকে ইতরের ভাষা বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন, বাঙ্গলা ভাষায় শাস্ত্রপ্রচার ও ইতরশ্রেণীর সম্বন্ধে

ছোঁয়াচে রোগের চূড়ান্ত সীমা দেখাইয়া জনসাধারণকে সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পথ হইতে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা সেনবংশের কীর্ত্তিকে তাঁহাদের পল্লীগাথার অন্তর্বর্ত্তী করেন নাই। কিন্তু সহস্র দোষসত্ত্বেও হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলাকে রাজনীতিক্ষেত্রে কোনরূপ দোষ দেওয়া চলে না।

সিরাজউদ্দৌলার মাসী ঘেসিটি বেগম [illegible] মতিঝিলে বাস করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর পর তিনি কতকগুলি ওমরাহকে হাত করিয়া সিরাজকে নষ্ট করিবার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। সিয়ার মুতাক্ষরীণের লেখক লিখিয়াছেন—এই দুশ্চরিত্রা এবং বুদ্ধিহীনা রমণী যদি সিরাজকে নিজের ছেলের মত দেখিতেন, তবে কত ভাল হইত। তাঁহাকে যাহারা উৎসাহ দিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করিয়াছিল, সেই সকল ওমরাহ—মীর নজর আলি, দোস্ত মহম্মদ এবং রহিম খাঁ—সেই অর্থে নব নব প্রাসাদ-নির্ম্মাণপূর্ব্বক সুখে বাস করিতে লাগিলেন, এবং সিরাজ তাঁহার বিপুল অর্থ নিজ ভাণ্ডারে আনিয়া তাঁহাকে মতিঝিল হইতে বন্দীবাসে প্রেরণ করিলেন।

সিরাজ প্রাচীন কর্ম্মকর্ত্তাদিগের কয়েকজনকে বিদায় দিয়া বাকী কয়েকজনের মাথার উপরে—স্বীয় মনোনীত দুই তিনটি প্রধান কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন। কথিত আছে ইঁহাদের স্পর্দ্ধা ও অহঙ্কারে প্রবীণ কর্ম্মচারী ও ওমরাহেরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি আলোচনা করিলে সিরাজ যে অবিবেচনার কাজ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। যাহাদিগকে তিনি বিদায় করিয়াছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন মীরজাফর। ইনি আলিবর্দ্দী খাঁকে সিংহাসনচ্যুত করিবার চেষ্টা অনেকবার করিয়াছেন, বৃদ্ধ নবাব তথাপি ইঁহাকে দুই একবার কর্ম্মচ্যুত করিয়াও শেষে ক্ষমা করিয়াছিলেন। সিরাজ কুসঙ্গীদিগের সঙ্গে মিশিয়া অত্যাচার করিতেন—এই অভিযোগ তাঁহার রাজকার্য্যে সমর্থিত হয় না, বরঞ্চ তিনি যাহাদিগকে পদমর্য্যাদা দিয়া দায়িত্বভার দিয়াছিলেন—তাঁহাদের একটিও অবিশ্বাস্য বা অযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার [illegible] বরং যাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়াছেন তাঁহারাই প্রায় সকলেই বিশ্বাস হারাইয়া বিদ্রোহী হইয়াছেন, কিন্তু সিরাজ এদিকে চতুর ছিলেন। মীরজাফরকে তিনি প্রথম হইতেই অবিশ্বাস করিয়াছিলেন। যে দুই ব্যক্তিকে নবাব শাসনবিভাগের সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন মোহনলাল। ইনি সিরাজের পারিবারিক বিভাগের দেওয়ান বা প্রধান সরকার ছিলেন; সিরাজ ইঁহাকে "মহারাজা" উপাধি দিয়া সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রীর পদ (Prime Minister-ship) দিয়াছিলেন। রাজার-সরকার দপ্তরের কর্ত্তা হইলেন, তারপর তিনি কাফের। প্রবীণ ওমরাহদের দল তাঁহার নামে যেসকল কথা রাষ্ট্র করিল, তাহা সত্য কি না কে বলিবে? হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি ভাবের উত্তেজনায় মানুষ অনেক মিথ্যা কথার সৃষ্টি করিয়া থাকে। কথিত আছে, মোহনলালের একটি ভগিনী ছিলেন, তিনি প্রাচ্য আদর্শ-অনুসারে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ছিলেন—সে আদর্শের কথা আমরা সংস্কৃত, বাঙ্গলা, পারসী প্রভৃতি অনেক ভাষায় লিখিত দেখিতে পাই; "দীর্ঘকেশী [illegible]"—পদ্মিনীলক্ষণাক্রান্ত নারীর বর্ণনায় পাওয়া

যায় ; "কৃশোদরী," "ক্ষীণমধ্যা," "ক্ষীণকটি"—ইত্যাদি বিশেষণ বাল্মীকি সীতার প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন ; কালিদাসের "মধ্যে ক্ষামা"ও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বাঙ্গলায় কৃত্তিবাস "মুষ্টিতে ধরিতে পারি সীতার কাকলী" লিখিয়া এই সৌন্দর্য্যতত্ত্ব আরও জটিল করিয়াছেন। পার্শীতে জেলেখার রূপ-বর্ণনায় কবি বলিয়াছেন, "জেলেখার কটিদেশ চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম, বরং তাহারও অর্দ্ধেক।"—আমরা বুঝিতে পারি এই সকল বর্ণনায় কবিরা কোন সুন্দরী রমণীর দিকে চাহিয়া রূপবর্ণনা করেন নাই—তাঁহারা অলঙ্কারশাস্ত্রের কেরামত ও বুদ্ধির কসরৎ দেখাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন, তথাপি একথা নিশ্চয় যে চীনা রমণীর ক্ষুদ্রপদের মত ভারতীয় কিংবা পারস্যের রমণীদের ক্ষীণ কটি ও দেহ প্রশংসিত।

কথিত আছে মোহনলালের ভগিনীটি ওজনে শুধু ২২সের ছিলেন এবং পান খাইলে মাত্র তাঁহার ঠোঁট দুইটি লাল হইত না, তাঁহার কণ্ঠের খানিকটা অংশ পর্য্যন্ত আরক্তিম হইয়া উঠিত। ইনি নর্ত্তকী ছিলেন—ইহাকে নাকি মোহনলাল সিরাজউদ্দৌলাকে দিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ইনি সিরাজউদ্দৌলার এক শ্যালকের সঙ্গে ব্যভিচারে ধৃত হন। নবাব তাঁহাকে বলিলেন, "কুমারি ! আমি দেখিতেছি, আপনি একটি গণিকা মাত্র।" সুন্দরী জানিতেন, এবার তাঁহার রক্ষা নাই, সুতরাং ভারতরমণীর স্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়া তিনি ঘৃণার সহিত উত্তর করিলেন, "হাঁ নবাব সাহেব, আমি গণিকাই বটে, আমি নর্ত্তকী—গণিকাবৃত্তি আমার ব্যবসায়," তৎপরে সিরাজের মাতা আমনা বেগমের সম্বন্ধে একটা ক্রূর ব্যঙ্গ করেন। (অবশ্য সিরাজের মাতা আমনা বেগম সম্বন্ধে নানারূপ কুৎসা প্রচলিত ছিল।) সিরাজ এই কুমারীকে জীবিত অবস্থাতেই চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া বদ্ধ করিয়া মৃত্যুর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সত্য মিথ্যা জানি না, মুতক্ষরিনে যেরূপ বর্ণিত আছে, আমি অবিকল তাহাই লিখিলাম (সিয়ার মুতক্ষরিন, ২য় খণ্ড, ১৮৭ পৃঃ)। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, এই রমণী আদবেই মোহনলালের ভগিনী ছিলেন না।

মোহনলালের ভগিনীসম্বন্ধে এই সকল কথার মূলে যাহাই থাকুক না কেন, একথা কখনই স্বীকার্য্য নহে যে মোহনলাল সেই হতভাগিনী রূপসীর খাতিরে নবাবের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, তিনি নবাবের বাল্যসখা ছিলেন, দক্ষতা, বীরত্ব ও বিশ্বস্ততায় যে তাঁহার দ্বিতীয় ছিল না—তাহা ইতিহাসে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় ওমরাহ যাঁহার উপর সিরাজ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন, তিনি ছিলেন ঢাকানিবাসী মীরমদন। ইহারও অনেক মহা গুণের কথা ইতিহাসে লিখিত আছে। সুতরাং সিরাজ যে তাঁহার দুষ্ট কুসঙ্গীদিগকে বড় বড় পদ দিয়াছিলেন, একথা গ্রাহ্য নহে। বরং যখন প্রবীণ মন্ত্রী ও ওমরাহের দল চিরকাল তাঁহার নুন খাইয়া বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তখন এই দুই চিরবিশ্বস্ত, রণনিপুণ ও বীর আপদ্-বিপদে সম্পূর্ণ নির্ভীক ব্যক্তি সিরাজকে রক্ষা করিবার জন্য অসাধ্য সাধন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

সিরাজ তাঁহার মামাত ভাই পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা সকৎজঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। সকৎজঙ্গ হাজি মহম্মদের পৌত্র এবং সৈয়দ মহম্মদের পুত্র। এই যুবকের বুদ্ধির প্রাখর্য্য

সম্বন্ধে তাঁহার একান্ত অন্তরঙ্গগণও প্রশংসাপত্র দিতে পারিবে না। সিয়ার মুতক্ষরিনের লেখক গোলাম হুসেন স্বয়ং ইঁহার এক ওমরাহ ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে সকৎজঙ্গের ব্যবহারের অনেক রহস্যজনক ঘটনা উক্ত পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। পূর্ণিয়ার এই তরুণ নবাবের নাম-দস্তখতের মত বিদ্যাও ছিল না। সুতরাং গোলাম হুসেন তাঁহার আদেশমত যে সকল পত্রের মুসাবিদা করিতেন, তাহা তাঁহাকে বুঝাইতে যাইয়া অনেক বিভ্রাট উপস্থিত হইত। কোন্ অক্ষর কেমন করিয়া লিখিতে হইবে, কোথায় নোক্তা, কোথায় বক্ররেখা বা সরল রেখা দিতে হইবে, প্রতি পদে নবাবকে তাহা বলিয়া দিতে হইত। এইরূপ করিতে যাইয়া গোলাম হুসেন একদিন দেখিলেন, নবাব কলম ফেলিয়া দিয়া দূরে যাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার ওমরাহ আর কি করেন, এক ঘণ্টা তিনিও চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার কি অপরাধে নবাব বিরক্ত হইয়াছেন ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। আর একদিন নবাব বলিলেন, "দেখ, তুমি আমার ওমরা, তুমি আমার মাষ্টার নও, তবে তুমি আমার লেখাপড়া লইয়া এত মাথা ঘামাও কেন?" গোলাম হুসেন সতর্ক হইয়া গেলেন, ইহার কিছুদিন পরে সকৎজঙ্গ আবার ইঁহাকে সামুনয়ে অনুরোধ করিলেন, "তোমায় আমাকে কিছু লেখাপড়া শিখাইতে হইবে বৈকি? অমন চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে কেন?" যুদ্ধকালে ওমর খাঁ নামক এক মন্ত্রী তাঁহাকে সুপরামর্শ দিতে গিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি বহুবৎসর নিজামুলমুলুকের অধীনে কাজ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এবং নবাব যে ভাবে সৈন্য পরিচালনা করিতেছেন, তাহা যুদ্ধরীতিসঙ্গত নহে। তখন নবাব নিজামুলমুলুককে গালাগালি দিয়া বলিলেন "আমি কোন উপদেশ শুনিতে চাহি না, আমি তিনশত যুদ্ধে দক্ষতা দেখাইয়াছি।" সিরাজউদ্দৌলা রাজা রাসবিহারীকে পূর্ণিয়ায় পাঠাইয়া দুইটি পরগনাসম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বঙ্গেশ্বর শুনিয়াছিলেন, মীরজাফর এবং অপর কয়েকজনের প্রবর্ত্তনায় সকৎজঙ্গ তাঁহার অধীনত্ব অস্বীকার করিয়া অনেক রকম কাণ্ড করিতে উদ্যোগ করিতেছেন। সিরাজের পত্রখানি খুব ভদ্রভাবে লিখিত হইলেও তাহার ভিতরে একটা রাজনৈতিক চাল ছিল। এই পত্রের উত্তর যাহা দিতে হইবে, গোলাম হুসেন সকৎজঙ্গের আদেশমত তাহার একটা খসড়া করিয়া রাজসভায় উপস্থিত করিলেন। এই খসড়াটায় খুব রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় ছিল; স্পষ্ট জবাব বলিয়া কিছু ছিল না, কিন্তু নানা অছিলায় দেরী করিয়া সময় লইবার অভিসন্ধি ছিল। সিরাজউদ্দৌলা সেই গুপ্ত উদ্দেশ্য যাহাতে না বুঝিতে পারেন সেইরূপ লিপিকৌশলের সঙ্গে মুসাবিদাটি করা হইয়াছিল, সকৎজঙ্গ উহা শুনিয়া খুবই খুসী হইলেন। কিন্তু যখন সভাসদেরা গোলাম হুসেনের চিঠির অতিরিক্ত মাত্রায় প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তখন "ঋদ্ধিযুক্তা হি পুরুষা ন সহন্তে পরন্তবম্,"—নবাব নিতান্ত চটিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, "ইহার (গোলাম হুসেনের) অবশ্যই বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমার বুদ্ধির সঙ্গে ইহার তুলনা হয়? ইহার ঘটে যদি দশ হাজার লোকের বুদ্ধি থাকে, তবে আমার ঘটে লাখ লোকের বুদ্ধি আছে, আমি ইহার লেখাটা অনুমোদন করিব না।" সুতরাং তিনি অন্য এক মন্ত্রীর বুদ্ধিতে সিরাজকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আমি দিল্লী

হইতে তিন প্রদেশের সনন্দ পাইয়াছি, তদনুসারে আমি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের মালিক। কিন্তু যেহেতু আপনার সঙ্গে আমার নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে, তজ্জন্ত আপনার প্রাণের উপর হস্তক্ষেপ করিতে আমার ইচ্ছা নাই। আপনি এই পত্র পাওয়া মাত্র ঢাকা কি অন্য প্রদেশে গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত জায়গীর গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাউন, কিন্তু খবরদার, আপনি মুর্সিদাবাদের রাজপ্রাসাদ হইতে একটি কপর্দ্দক বা কোন দ্রব্যসামগ্রী লইতে পারিবেন না, এই পত্রের উত্তরের জন্য আমি ঘোড়ার পাদানিতে পা দিয়া অপেক্ষা করিতেছি।" সত্যসত্যই কতকগুলি নির্বুদ্ধি আমীরের মন্ত্রণায় সকৎজঙ্গ বহু টাকা খরচ করিয়া সম্রাট্ দ্বিতীয় আলমগীর হইতে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার মালিকানির সনন্দ আনাইয়াছিলেন, উক্ত সম্রাট্‌কে এক কোটী টাকা বৎসরে রাজস্ব দেওয়ার সর্ত্ত তাহাতে ছিল। মুতক্ষরিনে লিখিত আছে—এই সনন্দ পাইয়া "তিনি ছিলেন চন্দ্রলোকে, লাফ দিয়া একেবারে উঠিলেন সূর্য্যলোকে," বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার অধিকার পাইয়া তিনি কি কি করিবেন, তাঁহার বিশ্বস্ত মন্ত্রীদিগের সহিত তাহা আলোচনা করিয়া বলিতেন, "আমি তাহার পর সুজা উদ্দিন খাঁ ও সাহেবুদ্দিনকে দমন করিব, তারপর ইচ্ছামত একজন সম্রাট্‌কে আমার হাতের পুতুলের মত আগ্রার সিংহাসনে বসাইব। অতঃপর আমি লাহোর ও কাবুল হইয়া কান্দাহার ও খোরাসানে যাইয়া বাস করিব, যেহেতু বাঙ্গলার হাওয়া আমার একেবারেই সহ্য হয় না।" আলানাস্কারের মত এই ক্রমোন্নতির পরিকল্পনা করিতে যাইয়া তাঁহার পুর্ণিয়া রাজ্যটি একটা খেলানার মত ভাঙ্গিয়া গেল। মীর আলি খাঁ নামক এক ফৌজদার একদা তাঁহাকে "জগতের একমাত্র আশ্রয়" বিশেষণ দিয়া চিঠি দিয়াছিলেন। সকৎজঙ্গের এই উপাধিটি এত ভাল লাগিয়াছিল যে সরকারী সমস্ত দলিলপত্রে ও সনন্দে তিনি ঐ উপাধি ব্যবহার করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি তাঁহাকে ঐ উপাধি ছাড়া চিঠিপত্র লিখিত, তাঁহার পত্র তিনি না পড়িয়াই টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেন। সেরূপ কোন পত্র নবাবের সেরেস্তায় গৃহীত হইত না। তিনি সমস্ত প্রবীণ ও তাঁহার পিতার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদিগকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়া চটাইয়া দিলেন। এমন কি রণস্থলেও তিনি তাঁহার বড় বড় ওমরাহদিগকে এইরূপ ভাষায় তাড়া করিতেন,—"গুলিগোলার লক্ষ্য হইয়া থামের মত দাঁড়াইয়া আছ কেন? দেখছ না হিন্দু শ্যামসুন্দর কতটা এগিয়া গেল?" বয়স্থ যোদ্ধগণ এইরূপ সম্বোধনে এরূপ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে যখন সিরাজের সঙ্গে প্রকৃত সংঘর্ষ আরম্ভ হইল—তখন খুব অল্পলোককেই তিনি স্বীয় অনুচরস্বরূপ পাইলেন। মীরজাফর লোভ দেখাইয়া তাঁহাকে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে গোপনে চিঠি পাঠাইয়াছিলেন। তিনিও কার্য্যকালে তাঁহার কোন সহায়তা করিলেন না। সমস্ত মন্ত্রী ও ওমরাহ তাঁহার উপর বিরক্ত ছিল, তিনি তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী লালীকে তাড়াইয়া দিয়া তাঁহার দুই দিন বয়স্ক পুত্রকে হাতীর পিঠে চড়াইয়া তাহাকেই সেনাপতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। লালীকে তিনি বেত্রাঘাত করিতে হুকুম দিয়াছিলেন, সমস্ত মন্ত্রী ও ওমরাহগণ একত্র হইয়া নিবেদন করিলেন—এরূপ উচ্চ রাজকর্ম্মচারীকে এভাবে দণ্ডিত করা নীতিবিরুদ্ধ,

তাই শালী রেহাই পাইয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে তিনি এত মদ খাইয়াছিলেন যে, খলিতপদে টলিতে টলিতে মাহুতের কাঁধে ভর করিয়া কোনরূপে হাতীর পিঠে চড়িয়াছিলেন এবং শত্রুশিবিরের গুলিতে যখন তাঁহার মাথাটা উড়িয়া যায়, তখন সে মাথায় মদের নেশা ছাড়া কোন বুদ্ধি এমন কি বেদনা-বোধটাও ছিল কিনা সন্দেহ।

অনেক ঐতিহাসিক সকৎজঙ্গের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার তুলনা করিয়াছেন; মাসতুতো ভাইদের প্রকৃতি কতকটা একরূপ ইহাই তাঁহারা বলিয়া থাকেন, একথা সর্ব্বৈব ভুল। একটা বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল, উভয়েই জনমতকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন এবং প্রাচীন কর্ম্মচারী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের পদ-মর্য্যাদানুসারে তাঁহাদের সহিত ব্যবহার করিতেন না। কিন্তু সিরাজ অবিশ্বাসীদিগের প্রতিই ঐরূপ আচরণ করিয়াছিলেন—সকৎজঙ্গ নির্ব্বিচারে সকলকে অপদস্থ করিয়া গালাগালি করিতেন। সিরাজের সঙ্গে তাঁহার তুলনাই হয় না।

ঢাকার সহকারী শাসনকর্ত্তা রাজবল্লভ নানা উপায়ে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তিনি সিরাজউদ্দৌলার বিপক্ষদের সঙ্গে মিশিয়াছিলেন, সিরাজের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল; সুতরাং কোন্ মুহূর্ত্তে খামখেয়ালী নবাব তাহার প্রতিশোধ লইবেন, তাহার ঠিকানা নাই;—এই ভয়ে তিনি তৎপুত্র রাজা কৃষ্ণবল্লভকে বহু অর্থসহ ইংরেজদের আশ্রয়ে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। ড্রেক সাহেবের তখন কলিকাতায় অসীম প্রতিপত্তি। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে কৃষ্ণবল্লভ তাঁহার সমস্ত ভাণ্ডারসহ নিরাপদ্ হইলেন। নবাব এই সংবাদ গুপ্তচরের নিকট পাইয়া ড্রেক সাহেবের নিকট উমিচাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভকে তাঁহার অর্থাদির সহিত মুর্সিদাবাদে পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিয়া চিঠি লিখিলেন। ড্রেক অস্বীকার করিলেন। নবাব ক্ষেপিয়া গেলেন। তিনি বঙ্গদেশে ইংরেজ-বাণিজ্য একেবারে উন্মূলিত করিতে সংকল্প করিয়া পূর্ণিয়া হইতে অবিলম্বে বাঙ্গলাদেশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অন্যতম প্রধান মন্ত্রী দুর্লভরাম এবং অপরাপর প্রধান অমাত্যগণ ইংরেজদের পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি তাঁহাদের কাহাকেও অনুরোধ করিলেন না, ইংরেজের কারখানা আক্রমণ করিয়া মিঃ ওয়াটকে বন্দী করিলেন। ড্রেক সাহেবের স্পর্দ্ধিত উত্তরে তিনি যে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা উক্ত সাহেব বুঝিতে পারিয়া প্রথমতঃ চুঁচুড়ায় ডাচ্ ও তৎপরে চন্দননগরে ফরাসীদের নিকট সাহায্য চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা কোন সাহায্য দিলেন না। সুতরাং সাহেব পলায়নপর হইলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, সিরাজ তাঁহাকে হত্যা করিবেন—তিনি প্রথমতঃ ১,৫০০ বন্দুকধারী বাঙ্গালী সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার বারুদ ভিজিয়া যাওয়াতে বন্দুকগুলি অকর্ম্মণ্য হইয়াছিল, সুতরাং তিনি কতকগুলি সাহেববিবি লইয়া কলিকাতা হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী গোবিন্দপুরের জাহাজে উঠিয়া মান্দ্রাজে প্রয়াণ করিলেন। এদিকে হাউএল সাহেব খুব বীরত্বের সহিত দুর্গরক্ষা করিতে চেষ্টা পাইয়া যখন ১৯০ জন মাত্র ইংরেজ অবশিষ্ট—তখন নবাবের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। এইখানে বন্দীদের জন্য ভাল বন্দোবস্তই হইয়াছিল—তাঁহারা বারান্দায় থাকিবেন এই কথা ছিল। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত-

ইংরেজ-সংঘর্ষ।

কর্ম্মচারী বলিলেন, খোলা জায়গায় বন্দীদিগকে রাখা নিরাপদ্ নহে, আর কোন স্থান আছে কিনা খুঁজিয়া দেখ, অধীন কর্ম্মচারীরা বলিল, "দুরন্ত কয়েদীদের জন্ত একটা কামরা আছে।" প্রধান কর্ম্মচারী না দেখিয়াই বলিলেন, "বেশ, সেইখানেই রাখা হউক।" এই ঘরটিই ইতিহাসবিশ্রুত অন্ধকূপ। ইহার সংবাদ সিরাজউদ্দৌলা দূরে থাকুক, তাঁহার ওমরাহদের কেহও জানিতেন না। এখানে যে গ্রীষ্মকালে তৃষ্ণা ও গরমে আর্ত্ত হইয়া সাহেবেরা প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা ইংরেজদের প্রাথমিক রিপোর্টে লিখিত হয় নাই। সুতরাং এই ঘটনা যুদ্ধের আনুষঙ্গিক একটা অতি ক্ষুদ্র ঘটনা বলিয়া ধরা হইয়াছিল। যুদ্ধবিগ্রহ তো মৃত্যুর শয্যা পাতিয়াই রাখিয়াছে—রণক্ষেত্রে, কি যুদ্ধের পরক্ষণেই অবরোধ-গৃহে মৃত্যুটা খুব একট অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। অনেকেই প্রমাণ করিয়াছেন যে স্বল্পপরিসর গৃহে, যতগুলি লোক মরিয়াছে বলিয়া ধরা হইয়াছে—তাহা সম্ভবপর নহে, তাহা প্রথমতঃ বঙ্গবাসীর সম্পাদক ৺বিহারীলাল এবং পরে ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন। ঘটনাটি নিশ্চয়ই খুব অতিরঞ্জিত করিয়া শেষে বর্ণিত হইয়াছে। এখন এদেশী লোকের অপরাধে পতিত এক বিন্দু ইংরেজরক্তের যতটা মূল্য—যুদ্ধসম্পর্কিত ব্যাপারে তখন সেই রক্ত তত মহামূল্য ছিল না। এখনকার পাশ্চাত্ত্য মাপকাঠির দ্বারা এই বিষয়ের ওজন নিরিখ করা ঠিক হইবে না। এ বিষয়ে কাহারও কোন ইচ্ছাকৃত নিষ্ঠুরতা হয় নাই। নিম্ন কর্ম্মচারীদের অনবধানতার দরুনই এই অনর্থটি ঘটিয়াছিল। ("The prisoners were at first ordered to draw up in the Verandah, but the officer commanding the guard, thinking that they would not be sufficiently secure there—inquired where was the prison of the fort." (Stewart, p. 539.) সেটা ইংরেজদিগেরই দুর্গ এবং সেই বন্দীখানার একটি গৃহে তাহাদের স্থান করা হইয়াছিল। অধ্যক্ষ মহাশয় "without examining the extent of the apartment"—সেই গৃহের আয়তন পরীক্ষা না করিয়াই সেখানে তাহাদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইংরেজদিগের প্রাথমিক ঘটনার বিবরণীতে ইহার উল্লেখ নাই। রাজীবলোচনের মত ইংরেজের ভক্ত এবং সিরাজউদ্দৌলার বিপক্ষপক্ষীয় লেখকও ইহার উল্লেখ করেন নাই। এমন কি গোলাম হুসেন, যিনি সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার পরিবারবর্গকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন—এই অভিযোগ দিয়া যেখানে-সেখানে উক্ত নবাবের নিন্দাবাদ ও সাহেবদের সুখ্যাতি করিতেন, তিনি তাঁহার মুতক্ষরিনের মত সিরাজের রাজত্বের সুবিস্তৃত ইতিহাসে এই অন্ধকূপ হত্যার উল্লেখমাত্র করেন নাই। সুতরাং এবিষয়ের জন্য নবাবকে দায়ী করা কতটা ন্যায়-সঙ্গত তাহা বিবেচনা করা উচিত।

মন্ত্রীরা সকলেই সিরাজউদ্দৌলার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। মীরজাফর আলিবর্দ্দীর সময় হইতে বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া মাঝে মাঝে লাঞ্ছিত হইয়াছেন। কিন্তু দয়ার সাগর বৃদ্ধ নবাব তাঁহাকে তাড়াইতে যাইয়াও তাড়ান নাই। সিরাজউদ্দৌলা মীরজাফরকে ও প্রধান মন্ত্রী দুর্লভরামকে ডিঙ্গাইয়া মীরমদন ও মোহনলালকে সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া শাসন-বিভাগের

কর্তৃত্ব দিয়াছিলেন। এজন্য এই দুইজনের ইহার বিরুদ্ধে জাতক্রোধ ছিল। বৃথা-প্রজ্ঞাভিমানিনী ঘেসেটি বেগমের মাথায় হাত বুলাইয়া মীরজাফর যে বিপুল অর্থ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিবার জন্য তিনি সৈন্যসংগ্রহে এবং সৈন্যদিগকে সম্পূর্ণ হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে ব্যয় করিয়াছিলেন। পূর্ণিয়ায় সকৎজঙ্গকে সিরাজের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম তিনিই নাচাইয়া তুলিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। দাদামহাশয়ের আমলের লোক—এবং আত্মীয়, এইজন্য সিরাজ তাঁহার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিয়াও তাঁহাকে শাসন করিতে পারেন নাই। এমন কি পলাশীর যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে মীরজাফর ও দুর্লভরাম যে ইংরেজদের সঙ্গে একযোগ হইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ-সাধনের চেষ্টা পাইতেছে—একথা জানিয়াও তিনি তাঁহাদিগকে দণ্ডিত করিতে সাহস পান নাই। সেই সময়ে মুঁসিও লাস (ফরাসী সেনাপতি) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "নবাব সাহেব, আপনার আমলা ও ওমরাহ সকলে আপনার শত্রু—ইহাদের ইচ্ছা ফরাসীদের তাড়াইয়া আপনি ইংরেজদের হাতে যাইয়া পড়েন। তখন আপনার সর্ব্বনাশ ইহারা সহজেই করিতে পারিবেন। আমাকে যদি আপনার অধীনে কাজ দেন, তবে আমি ও আমার সৈন্যদল প্রাণপণে আপনার জন্য যুদ্ধাদি করিব" (মুতক্ষরিন, ২য় খণ্ড, ২২৭ পৃঃ)। লাস সাহেব ফরাসী এবং ইংরেজের শত্রু,— এদিকে নবাব স্পষ্ট বুঝিলেন দুই একটি লোক ছাড়া সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত; এজন্য কতক মীরজাফরের ভয়ে, কতক ইংরেজেরা চটিয়া যাইবেন এই আশঙ্কায় তিনি বিশ্বাসী ফরাসী সেনাপতিকে নিযুক্ত করিতে পারিলেন না। লাস সাহেব ঠিক বুঝিয়াছিলেন, ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে নবাব অচিরাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন, এজন্য যখন নবাব অত্যন্ত দ্বিধার সহিত বলিলেন, "সময় হইলে আপনাকে আহ্বান করিব," তখন সাহেব স্পষ্টাক্ষরে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আপনার সহিত আমার আর দেখা হইবে না।" শেষমুহূর্ত্তে যখন বিপদ্ আসন্ন, তখন তিনি চারিদিক্ অন্ধকার দেখিয়া লাসকে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু অনিবার্য্য বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া লাসের আসিতে গৌণ হইল, যখন আসিলেন, তখন সিরাজ আর মর্ত্ত্যলোকে ছিলেন না। লাসকে ইংরেজেরা তাড়া করিয়া ধরিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কোনক্রমে তিনি ভাগ্যবলে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

ষড়যন্ত্র।

ইংরেজেরা নবাবের সঙ্গে সন্ধি করিলেন। কিন্তু ইহার মধ্যে ক্লাইভ আসিয়া পুনরায় যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সন্ধি অনুসারে যে টাকা দেওয়ার কথা ছিল, নবাব তাহা দিতে বিলম্ব করিয়াছিলেন, এইরূপ অজুহাতের অভাব হইল না। মোট কথা মীরজাফর, দুর্লভরাম, কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎ শেঠ প্রভৃতি দেশের প্রধান ব্যক্তিরা ইংরেজদিগকে উস্কাইতে ছিলেন। এদিকে কলিকাতার দুর্গধ্বংসের ব্যাপারে তাঁহারাও মনে মনে প্রতিশোধ লওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। চতুর ক্লাইভ বুঝিতে পারিলেন,—মুর্সিদাবাদে নবাবের মিত্র নাই, সকলেই শত্রু। মীরজাফরাদির পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্রুতি তিনি অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। এদিকে মীরজাফরের প্রবর্ত্তনায় ঘেসেটি বেগম আসিয়া সিরাজ তাঁহার প্রতি

কত অত্যাচার করিয়াছেন, তাহার বিবরণ দিয়া সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করিলেন। সিরাজের ধনভাণ্ডার কুবেরের ভাণ্ডারের মত, ষড়যন্ত্র সফল হইলে তাঁহারা একদিনে এত দীর্ঘকালের তপস্যা সফল করিতে পারিবেন—ষড়যন্ত্র বিফলই বা কেন হইবে? নবাবের বিশালকায় কামানগুলি—অসংখ্য সৈন্যবল—ইহারা তো মীরজাফরের করতলগত। যাহা অসাধ্য—অভাবনীয়, তাহা সহজেই দৈবানুগ্রহে সিদ্ধ হইবে।

নবাব পূর্ণিয়ার যুদ্ধ জয় করিয়া ঘেসেটি বেগমের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া ভাবিয়াছিলেন—তাঁহার ভয়ের কারণ নাই; কলিকাতার দুর্গ ধ্বংস করিয়া ভাবিয়াছিলেন—তাঁহার একমাত্র শত্রু ইংরেজের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন; সুতরাং যখন জানিলেন, জগৎ শেঠ, দুর্লভরাম ও মীরজাফর সকৎজঙ্গকে উত্তেজিত করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতেছেন, তখন প্রথমতঃ নগণ্য মনে করিয়া তাঁহাদিগকে দণ্ড দেন নাই, বরং রাজদরবারে তাঁহাদের যে স্থান ছিল কিছু ভয়প্রদর্শনাদির পর তাহাতেই তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি ও দৈন্য দেখিয়া কোন কোন সময়ে তাঁহার এমনও মনে হইত যে, ইহারা নির্দ্দোষ, কিন্তু তথাপি নির্দ্দোষ ব্যক্তিরা যে ব্যবহার পায় ইহারা নবাবের কাছে সে ব্যবহার পাইতেন না। তিনি মীরজাফরের বাড়ীর দিকে মুখ করিয়া একটা বৃহৎ কামান রাখিয়া দিয়াছিলেন, উহা নবাবের ভ্রূকুটির মত মীরজাফরের গৃহের দিকে সর্ব্বক্ষণ বদ্ধলক্ষ্য ছিল। জগৎ শেঠকে তিনি সুন্নৎ করিয়া মুসলমান করাইবেন, সর্ব্বদা এই ভয় দেখাইতেন। দুর্লভরাম অন্যতম প্রধান মন্ত্রী—ইহার কোন কথাই তিনি শুনিতেন না—ইহারা তলে তলে ইংরেজের সঙ্গে চক্রান্ত করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন,—এজন্য নবাবের এই সকল ব্যবহার অসঙ্গত মনে করিতে পারা যায় না। তাঁহার দোষ তরুণ বয়সের; তিনি ক্রুদ্ধ হইলে অতি তীব্র ভাষায় ইহাদিগকে অপমান করিতেন এবং বড় বড় মন্ত্রীদিগকে মীরমদন ও মোহনলালের ন্যায় তরুণবয়স্ক প্রিয় মন্ত্রীদের দ্বারা অপদস্থ করাইতেন। অথচ তাঁহাদিগকে দণ্ড দিয়া নিরস্ত করা, কিংবা কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখার মত তাঁহার মনের সাহস বা দৃঢ়তা ছিল না। তাহার ফলে এই দাঁড়াইল যে, তাঁহাদের বাহিরের ঠাট বজায় থাকাতে তাঁহারা প্রাসাদে বসিয়াই ষড়যন্ত্রটি পাকাইবার বেশী সুবিধা পাইলেন। তিনি মীরজাফর, জগৎ শেঠ ও দুর্লভরামসম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে যে সকল সংবাদ পাইতেছিলেন, বিশেষ মুঁসিয়ার লাস তাঁহার নিকট যে সকল গুপ্ত রহস্য ভেদ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ইহাদিগকে পিপীলিকার ন্যায় পিষিয়া মারিলে শ্রাদ্ধ আর বেশী দূর গড়াইত না। কিন্তু নষ্টা বধূকে যেরূপ ঘোর শাসন করিয়াও কোন কোন স্বামী ছাড়িতে পারেন না—সেইরূপ ইনি এই সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্ভ্রম নষ্ট করিয়াও ইহাদিগকে ছাড়িতে পারেন নাই। নষ্টবধূর ন্যায়ই ইহারা এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লাভ করিয়া স্বীয় প্রভুর সর্ব্বনাশ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহারা নবাবের নানাদোষ সাধারণের নিকট প্রচার করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বজননিন্দিত ও সকল লোকের অপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। ঘরের শত্রু যাহা পারে, বাহিরের শত্রু অত্যন্ত প্রবল হইলেও তাহা করিতে পারে না। রাণী ভবানীর কন্যার প্রতি নবাবের লোভের ব্যাপার সমস্ত রাজা ও ওমরাহদলের মনে আতঙ্ক উপস্থিত করিয়াছিল।

এইজন্য নবদ্বীপের কৃষ্ণচন্দ্রও আসিয়া এই দলে ভিড়িয়া গেলেন। তিনি তাঁহার বংশের পূর্ব্বসংস্কার ও ব্রাহ্মণসমাজের গুরুর স্থান অধিকার করার দরুন বহু ব্যয় করিতেন,—পূজার্চ্চনা, দানধ্যান, বার মাসে তের পার্ব্বণ খুব জাঁকিয়া করিতেন, এইজন্য তিনি একজন চির-দেউলিয়া জমিদার ছিলেন। বণিক্ ও অর্থশালী ব্যক্তিদের কাছে, ঋণগ্রহণের ব্যপদেশে তাঁহাকে সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত—ইংরেজদের সঙ্গে সম্ভবতঃ এই সূত্রে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। মুর্সিদাবাদে যখন মীরজাফর, দুর্লভরাম ও জগৎ শেঠ এই ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, তখন কৃষ্ণচন্দ্রের ডাক পড়িল। মীরজাফর রাজাকে তথায় আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। রাজীবলোচন বিস্তারিত ভাবে এই দৌত্যের বিবরণ লিখিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র সহসা এরূপ একটা ব্যাপারে মাথা দিতে দ্বিধা বোধ করিলেন, তিনি তাঁহার প্রধান অমাত্যকে প্রথমতঃ পাঠাইয়া দিলেন। দুর্লভরামের সাহায্যে অমাত্য নবাবের দেখা পাইয়া বলিলেন, "আমাদের রাজা হুজুরের সঙ্গে সিংহাসন পাইবার পর দেখা করেন নাই—একবার দর্শনপ্রয়াসী,—হুজুরের অনুমতির জন্য আসিয়াছি।" তাঁহার হঠাৎ মুর্সিদাবাদে আসা যদি কোন সন্দেহের সৃষ্টি করে, এই আশঙ্কায় নবাবদর্শনের অছিলায় কৃষ্ণচন্দ্র রাজধানীতে আগমন করিলেন। এদিকে কিরূপে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করা যাইতে পারে, ধূর্ত্তত্রয় সেই বিষয়ে প্রতি রাত্রে জটলা করিতেছিলেন। কেহ বলিলেন—ইঁহাকে গুপ্তভাবে হত্যা করা যাউক। কেহ বলিলেন, আমরা প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করি, কেহ বলিলেন, যবনের অধিকার আর কোনরূপে সহ্য করা যায় না—অপর একজন মীরজাফরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন? এখানে যে মীরজাফর উপস্থিত, তাহা কি ভুলিয়া গেলেন।" তখন একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, কৃষ্ণচন্দ্র অতি চতুর ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া পরামর্শ করা হউক; তিনি ধীর স্থির-বুদ্ধি, এ সমস্যার তিনি যে সমাধান করিবেন, তাহাই গৃহীত হইবে। এই অবস্থায় কৃষ্ণচন্দ্র আসিয়া বুদ্ধি দিলেন, "ইংরেজদের সঙ্গে একযোগে কাজ করা হউক, আমি কালীঘাটে মায়ের দর্শনকামনায় (বোধ হয় ঋণ পাওয়ার চেষ্টায়ও বটে) প্রায়ই কলিকাতায় যাইয়া থাকি। তাঁহারা মান্য, বদান্য, বুদ্ধিমান্, রণনিপুণ, তাঁহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ লাগাইয়া আমরাই দাবার চাল চালিব, শেষ পর্য্যন্ত নবাব আমাদের হাতে কলের পুতুলের মত থাকিবেন, আমরাই যুদ্ধ চালাইব; 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'-নীতি অবলম্বন করিলে কেহ আমাদিগকে সন্দেহ করিতে পারিবে না, অথচ অভীষ্টসিদ্ধি অতি সহজেই হইবে, মীরজাফরকে আমরা নবাব করিব।" এই যুক্তি শুনিয়া সভায় "বাহবা" পড়িয়া গেল। তখন মীরজাফরের সঙ্গে ক্লাইভের গোপনে চিঠি-পত্র চলিতে লাগিল। এদিকে নবাবকে জব্দ করিবার জন্য ক্লাইভ ও ইংরেজেরা নানা উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সুবর্ণ-সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। এদিকে মীরজাফর অর্থের যে লোভ দেখাইলেন, তাঁহাদের অবাধ বাণিজ্য ও নবাবের অপরিমিত ধনভাণ্ডারের বখরার যে আশা দিলেন, তাহাতে নিতান্ত উদাসীন ব্যক্তিরও মাথা ঘুরিয়া যাইতে পারিত। ইংরেজ-সৈন্য দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে "সাজ সাজ" রব পড়িয়া গেল।

সিরাজের তেজ, বিক্রম, বুদ্ধি সকলই ছিল,—এত অল্পবয়সে এরূপ বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও লোকচরিত্র বুঝিবার শক্তি বোধ হয় আলিবর্দ্দীরও ছিল না। তাঁহার দোষ ছিল—তিনি মাতামহের আদরে একেবারে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন, চারিদিকের লোকজনকে কীটের মত গণ্য করিতেন, কাহাকেও হস্তগত করিয়া কার্য্য উদ্ধার করিবার শক্তি তাঁহার আদৌ ছিল না। আলিবর্দ্দী তাঁহার অমায়িক ব্যবহার দ্বারা শত্রুকেও মিত্র করিতে পারিতেন। এক রাত্রির কথা মনে পড়ে। আলিবর্দ্দীর প্রধান সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ ও অপরাপর পাঠান সামন্তগণ নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তাঁহারা শত্রুদের সঙ্গে যোগ দিয়া আলিবর্দ্দীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে প্রস্তুত,—গুপ্তচরের মুখে নবাব সমস্ত কথা শুনিয়া বিনা অস্ত্রে শরীর-রক্ষী ছাড়া একাকী সিরাজের হাত ধরিয়া দ্বিপ্রহর রাত্রে মুস্তাফা খাঁর শিবিরে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে এই অবস্থায় নবাবকে দেখিয়া পাঠান সেনাপতি বিস্মিত হইয়া গেলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ বলিলেন, "আপনাকে আমি আমার প্রধান সহায় বলিয়া জানিতাম, আপনি আমার অনেক উপকার করিয়াছেন। এখন জানিতে পারিলাম আপনি আপনার নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। অতি নিঃসহায়, নিরস্ত্র ও অসমর্থ অবস্থায় বৃদ্ধ নবাব আপনার দ্বারস্থ; আপনি অনায়াসে এখানে তাঁহাকে হত্যা করিতে পারেন, তাহা হইলে যুদ্ধ করিয়া লোকক্ষয় করিবার প্রয়োজন হয় না। আমার প্রাণ আপনার হাতে দিতে আমি আসিয়াছি, আর (সিরাজকে দেখাইয়া) যদি আমার প্রাণ অপেক্ষা বেশী প্রিয় কিছু থাকে, তবে এই সিরাজ, যদি ইচ্ছা করেন, তবে ইহাকেও হত্যা করিতে পারেন; আমি অকপট হৃদয়ে আমার জীবন, জীবনাধিক প্রিয়বস্তু ও সর্ব্বস্ব আপনার হাতে দিয়া আপনার বন্ধুত্বপ্রার্থী হইয়া এই অসময়ে আপনার নিদ্রা ভঙ্গ করিলাম।"

সিরাজের দোষ।

মুস্তাফা খাঁ ও আলিবর্দ্দী।

এই কথার পরে পাঠানদের সমস্ত বিদ্রোহভাব তৃণের মত ভাসিয়া গেল। মুস্তাফা খাঁ প্রতিশ্রুত হইলেন, "যে পর্য্যন্ত আমি জীবিত থাকিব, সে পর্য্যন্ত নবাব সাহেবের নিম্নতম সৈনিকের ঘোড়ার খুরে আমার মাথা বাঁধা রহিল। যে পর্য্যন্ত দেহে প্রাণ থাকিবে, সে পর্য্যন্ত আলিবর্দ্দী, তাঁহার সন্তান ও পরিবারবর্গের হিতার্থ আমার জীবন অর্পণ করিলাম।" (সিয়ার মুতক্ষরিন, ১ম খণ্ড, ৩৮৪ পৃঃ)।

আলিবর্দ্দীর এই রাজনৈতিক কায়দা ও চাল সিরাজ একেবারেই জানিতেন না। যখন শেষ মুহূর্ত্তে বিপদ্ আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল, তখন তিনি মীরজাফরের পায়ে পাগড়ী ফেলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু সে অসময়ের কান্না! যদি সময়ে মিষ্ট ব্যবহার করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট রাখিতেন, তবে তাঁহার কেশ স্পর্শ করা সহজ হইত না। একদিকে দুর্লভরাম বিষ ছড়াইতেছিলেন, অপরদিকে জগৎ শেঠ—যাঁহার বিপুল অর্থ বহুলোকের টাঁকি তাঁহার ভাণ্ডারের দ্বারে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল—তিনি জনমত সিরাজের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতেছিলেন। চিরশত্রু, ক্রূর ও কূটচক্রী মীরজাফর—সমস্ত সৈন্যগণকে ঘেসেটি বেগমের অর্থে করতলগত করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র আসিয়া জুটিলেন। সমস্ত বঙ্গদেশ এই

অনতিক্রান্ত-কৈশোর বালকের নিন্দাবাদে মুখরিত হইতে লাগিল। হঠাৎ তিনি একদিন দেখিলেন, চারিদিকে কেহই তাঁহার মিত্র নহেন, ঘেসেটি বেগম হইতে ক্ষুদ্র সৈনিকেরা পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছে,—এমন কি তাঁহার শ্বশুর পর্য্যন্ত বিপদের দিনে তাঁহাকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইলেন না। মাত্র মীরমদন প্রাণ দিয়া মুমূর্ষুশয্যায় তাঁহাকে শুনাইয়া গেলেন, তিনি দুধ দিয়া কালসাপ পুষিয়াছিলেন—মাত্র মোহনলাল রণক্ষেত্রে রোষ-কষায়িত নেত্রে মীরজাফরের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া অসমর্থ হইয়া প্রাণ দিলেন—মাত্র ফরাসী সেনাপতি লাস হতভাগ্য বালক-নবাবের দুঃখে পরম দুঃখ পাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার বৃথা চেষ্টা করিলেন।

আর পলাশীর যুদ্ধ—উহা যুদ্ধ নহে, দৈবের খেলা। যাঁহারা বিলাসী, অত্যাচারী, স্বেচ্ছাতন্ত্র এবং অলস—তাঁহাদের হাত হইতে ভগবান্ ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মীর প্রকৃত সেবক, স্বার্থ-বিস্মৃত, জাতীয়স্বার্থসর্ব্বস্ব, গিরি-সাগর-লঙ্ঘী, অদম্য-উৎসাহশীল, নবগঠিত, নব তেজোদৃপ্ত একটি জাতির হাতে এই বিশাল সাম্রাজ্য প্রদান করিলেন, পলাশী উপলক্ষমাত্র। উহা রাজলক্ষ্মীর কৌটা—একটা ময়দানে বসিয়া যুদ্ধের ছলে ভাগ্যলক্ষ্মী তাহা তাঁহার যোগ্য সন্তানদিগকে দিলেন। মীরজাফর আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটা দিকের প্রতীক। শকুনি, জয়চন্দ্র, মীরজাফর প্রভৃতি ব্যক্তির যুগে যুগে অভ্যুদয় হইয়াছে—ভারতবর্ষ যে এখনও স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য হয় নাই, তাহা প্রমাণ করিতে। আমাদের রক্তের মধ্যেই মীরজাফর ও জয়চন্দ্র রহিয়াছে—উহা বহুদিনের ব্যাধি।

সিরাজউদ্দৌল্লা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কোন নিষ্ঠুরতা করিয়াছেন একথা ইতিহাসের কোথাও নাই, বরঞ্চ সর্ব্বত্র তাঁহার উদারতার প্রমাণ আছে তিনি হুসেন কুলি খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছিলেন, উহা সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব্বে—তখন তিনি বালক, এবং এই ব্যাপারে ঘেসেটি বেগম ও অপরাপর বয়োবৃদ্ধ লোকের বিশেষরূপ হাত ছিল; তথাপি উহা অতি গর্হিত কর্ম্ম এবং এজন্য যে তিনি কত অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মৃত্যুকালীন কাতরোক্তি হইতে জানা যায়। রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভের জন্যই ইংরেজদের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ অন্যায় উপায়ে লব্ধ অপরিমিত ঐশ্বর্য্য লইয়া রাজবল্লভ ঢাকায় ছিলেন এবং ঘেসেটি বেগমের সহিত সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, তথাপি সিরাজ রাজবল্লভকে কিছু বলেন নাই। কিন্তু মনে পাপ থাকিলে ভিতরে সোয়াস্তি থাকে না। রাজবল্লভ তাঁহার অর্থের এক বিপুল অংশ রাজা কৃষ্ণবল্লভের হাতে দিয়া কলিকাতায় ইংরেজদের নিরাপদ্ আশ্রয়ে পাঠাইয়াছিলেন। এ অবস্থায় মুল্লুকের অধিপতির এই দাবী ন্যায়সঙ্গত, তিনি কৃষ্ণবল্লভকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে ড্রেক সাহেবকে চিঠি লিখিলেন, ড্রেক স্বীকৃত হইলেন না। নবাব কলিকাতা দুর্গ দখল করিয়াই ইহাকে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত করিতে বলিলেন। নবাবের আর একজন বিদ্রোহী প্রজা ছিলেন উমিচাঁদ। তিনিও ইংরেজের আশ্রয়ে গা-ঢাকা দিয়াছিলেন। নবাব

সদয় ব্যবহার।

উত্তরকেই আনিতে আদেশ করিলেন। Stewart সাহেব তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, "He (Nawab) immediately ordered Umichand and Krishnaballabh to be brought before him and received them with civility" (p. 538). (তিনি তখনই উমিচাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভকে তাঁহার নিকটে আনিতে আদেশ করিলেন এবং তাঁহাদিগের সহিত ভদ্রব্যবহার করিলেন); তিনি এ অবস্থায় কৃষ্ণবল্লভের টাকাকড়িগুলি অন্ততঃ আত্মসাৎ করিতে পারিতেন, অন্য কেহ হইলে শুধু টাকাকড়ি গ্রহণ নহে, তাঁহার অধিকার অগ্রাহ্য করিয়া তদ্‌বিরুদ্ধপক্ষ আশ্রয় করার জন্য তাঁহার একটা ন্যায়সঙ্গত দণ্ডও হইতে পারিত। কিন্তু নবাব তাঁহাকে আদরে আপ্যায়িত করিয়া গ্রহণ করিলেন। হলওয়েল সাহেব তাঁহার রাজ্যে বাস করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস করিয়াছেন—ইহাতো একটা গুরুতর অপরাধ—তাঁহার সহিত ব্যবহারসম্বন্ধে Stewart সাহেব লিখিয়াছেন: "He dismissed him with assurance of safety"(p. 538). (তাঁহার ভয় নাই, তিনি নিরাপদে থাকিবেন, এই আশ্বাস দিয়া নবাব তাঁহাকে বিদায় দিলেন)। কলিকাতায় ইংরেজেরা বাণিজ্য করিয়া অনেক টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, অথচ তাঁহাদের দুর্গ অধিকার করিয়া তিনি মাত্র ৫০,০০০৲ টাকা পাইলেন। তাঁহার সন্দেহ করিবার কারণ যথেষ্ট ছিল যে হয়ত হলওয়েল সাহেব টাকাপয়সা গুপ্ত স্থানে রাখিয়াছেন, এজন্য তিনি তাঁহাকে কতকটা ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন: "However finding that no discoveries could be obtained concerning the treasures which he supposed to be buried in Calcutta he released Mr. Holwell and other English prisoners" (p. 541). (কিন্তু যখন সেইরূপ কোন গুপ্তসম্পত্তির সন্ধান পাওয়া গেল না তখন তিনি মিঃ হলওয়েল এবং অপরাপর ইংরেজ বন্দীদিগকে মুক্তি দিলেন।) ক্লাইভ মীরজাফরের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিতে প্রথমতঃ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন নাই। যখন সেই সকল বন্ধুত্বসূচক চিঠির বলে তিনি সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন,—তখন রোজ তিনি চন্দননগর হইতে গোপনে চিঠি পাঠাইতে লাগিলেন, কিন্তু একখানির মাত্র জবাব পাইলেন, তাহাতে লিখিত ছিল—মীরজাফর নবাবের সঙ্গেই সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইবেন, কিন্তু ঠিক সময়ে তিনি ক্লাইভকে সাহায্য করিবেন। চিঠিটা যেমন তিনি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তেমন নহে, তাহাতে আগ্রহ বেশী দেখা গেল না, তখন ক্লাইভ মহা ভাবনায় পড়িয়া গেলেন,—হয়ত নবাবের মন্ত্রী তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিয়া শেষে প্রভুর শত্রুর প্রতিশোধ লইবেন! ইহার পরে ক্লাইভ মন্ত্রীর নিকট হইতে আরও দুইখানি চিঠি পাইলেন, কিন্তু কতকটা আশ্বস্ত হইলেও মীরজাফরকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করার মতন মনের ভাব তখন ইংরাজদের মধ্যে কাহারও ছিল না।

সবৎজঙ্গ।

ভারতবর্ষে ক্লাইভ "সবৎজঙ্গ" নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলেন; ক্লাইভ বলিলে তাঁহাকে অল্প লোকেই চিনিত। তাঁহার অধীনে ৮০০ ইংরেজ পদাতিক সৈন্য, ১০০ কামান-চালক, ৫০ জন কামান লইয়া যাইবার নৌসেনা। এই কামানের মধ্যে মাত্র ছয় পাউণ্ড বারুদ ধরে এমন আটটি কামান ছিল;

তাহা ছাড়া পর্ত্তগীজ ও ২,১০০ সিপাই ছিল। নবাবের সঙ্গে ১,৮০০ সুদক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য, ৫০,০০০ পদাতিক, তাহাদের হাতে বন্দুক, বর্শা, ধনু, বোমা ইত্যাদি অস্ত্র ছিল। ইহা ছাড়া ৪০টি কামান ছিল, তাহার মধ্যে অধিকাংশেই ২৪ হইতে ৩২ পাউণ্ড বারুদ ধরিত। এই অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মীরজাফরের সম্পূর্ণ আশ্বাস না পাইলে অগ্রসর হওয়া বাতুলতা। মীরজাফর আশ্বাস দিয়াছিলেন, কিন্তু তেমন আগ্রহাতিশয় দেখান নাই! তারপর নবাবের সৈন্যের নেতা হইয়া যিনি আসিয়াছেন, তিনি যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন, তবে ত সর্ব্বনাশ। ক্লাইভ (সবৎজঙ্গ) তাঁহার ২০ জন প্রধান কর্ম্মচারীকে লইয়া একটা সভা করিলেন। তিনি বলিলেন, "মীরজাফরের কথার উপর নির্ভর করিয়া নবাবকে আক্রমণ করা—এই পথ খোলা আছে। দ্বিতীয় পথ—আমরা কাটোয়া হইতে অনেক খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি—এখানে অনায়াসে কয়েক মাস প্রতীক্ষা করা চলে, ইহার পর বর্ষাশেষে মারহাট্টারা আসিবে, তখন তাহাদের সঙ্গে একত্র হইয়া নবাবকে আক্রমণ করা যাইতে পারে।"

পলাশীর যুদ্ধ।

২০ জনের মধ্যে ১৩ জন অপেক্ষা করার পক্ষপাতী হইলেন। ৭ জন তখনই নবাব-শিবির আক্রমণ করার পরামর্শ দিলেন। ক্লাইভ কিছু না বলিয়া নিকটস্থ তরুকুঞ্জে যাইয়া গভীর চিন্তায় এক ঘণ্টাকাল নিবিষ্ট ছিলেন। অবশেষে যাহা স্থির করিলেন, তাহা বীরের মত; এতদূর অগ্রসর হইয়া এখন আর দ্বিধার ভাব ভাল নহে; যে করিয়া হউক যুদ্ধ করিতে হইবে। নদী পার হইয়া তখনই তিনি দূরে—৮০০ গজ দীর্ঘ এবং ৩০০ গজ প্রস্থ আমবাগে শিবির স্থাপন করিলেন, এই আমবাগই সুপ্রসিদ্ধ পলাশীক্ষেত্র। তিনি তথায় যাইয়া দেখেন নবাবের মানকরে যাইবার যে কথা ছিল তিনি সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিও সৈন্যদল লইয়া অতি নিকটেই আছেন।

নবাবের অবস্থা তখন শোচনীয়; তিনি দেখিলেন যেন তাঁহার লোকেরা আর কেহ তাঁহার নহে। তাঁহার পরিকরবর্গ নমাজ পড়িবার ছলে সকলেই চলিয়া গিয়াছে। এমন কি সেই শিবির এরূপ জনশূন্য যে একটা চোর তথায় ঢুকিয়াছিল। একটি পরিচারককে তিনি ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "তোরা কি ভাবিয়াছিস্ যে আমি এখনই মরিয়াছি?"

পরিজন-বর্জ্জিত নবাব।

এদিকে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, মীরমদন ও মোহনলাল সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; মোহনলাল ২৫,০০০ সৈন্য লইয়া তুমুল রণোদ্যমে মাতিয়া গেলেন। একটা গোলা লাগায় মীরমদন অবসন্ন হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় সিরাজের শিবিরে আনীত হইলেন, তিনি মরিতে মরিতে বলিয়া গেলেন, "নবাব সাহেব, আপনার নিজের লোকই আপনার সর্ব্বনাশ করিতেছে, সকলেই আপনার শত্রু। আমি প্রাণ দিয়াও আপনাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না।" এই বিপদে সিরাজউদ্দৌলা মীরজাফরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, দূতের পর দূত গেল, 'আসছি,' 'যাচ্ছি' করিয়া মীরজাফর অনেক বিলম্বে নবাবের নিকট আসিলেন। নবাব তাঁহার পায়ের নীচে নিজের পাগড়ী ফেলিয়া বহু অনুনয় বিনয় করিলেন, তাঁহার পূর্ব্বকৃত অপরাধ মার্জ্জনা

করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মীরজাফর পাথরের মত নিশ্চল থাকিয়া নবাবের সাগ্রহ অনুরোধের উত্তরে বলিলেন, "আজ রাত্রি হইয়াছে, কাল সমস্ত ব্যবস্থা করা যাইবে।" উত্তরে নবাব বলিলেন, "আজ যুদ্ধ বন্ধ করিলে যে প্রমাদ হইবে—রাত্রে শত্রুরা শিবির আক্রমণ করিবে।" মীরজাফর বলিলেন, "সে ভার আমার উপর দিয়া আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।" মুতক্ষরীনের পাদটীকায় লিখিত আছে, "সিরাজ এই অবস্থায় মীরজাফরের সঙ্গে যে সকল কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন, তাহা বুদ্ধিহীন বা অত্যাচারী রাজার মত আদৌ নহে। সকৎজঙ্গের পরিজনবর্গ ও সন্তানগণের প্রতি তিনি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং গোলাম হুসেনের স্বগণদিগকে তিনি যেরূপ দয়া দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে বুদ্ধি বা বিচক্ষণতার অভাব কিছুমাত্র দৃষ্ট হয় না, তিনি অত্যাচারী ছিলেন—একথা তো একেবারেই বলা চলে না। ইনি বাল্যকালে অত্যধিক স্নেহে লালিতপালিত হইয়া সৎশিক্ষা পান নাই, এবং যখন তাঁহার কিছু কাল স্কুলে থাকা উচিত ছিল,—তখন হঠাৎ তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।"

মোহনলাল পুনর্ব্বার বেগে ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিলেন। গোলাম হুসেন এবং রাজীবলোচন উভয়েই লিখিয়াছেন—ইংরেজেরা বিপর্য্যস্ত হইলেন। জয়লক্ষ্মী নবাবের দিকে সবে মাত্র প্রসন্নবদন ফিরাইবেন, তখনই মীরজাফর আদেশ দিলেন, "আজ যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দাও।" মোহনলাল তীব্রস্বরে বলিয়া পাঠাইলেন, "এই কি যুদ্ধ থামাইবার সময়? আমি কিছুতেই এই অন্যায় আদেশ পালন করিব না, তাহা হইলে আমার সৈন্যেরা নিরুৎসাহ হইবে, এবং ইংরেজেরা সোৎসাহে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।" নবাবের এই কথাগুলি খুব মনে লাগিল, কিন্তু মীরজাফর বলিলেন, "তাহা হইলে হুজুরের যাহা মর্জ্জি, তাহাই করুন—আমি আর কি করিব?" যে ব্যক্তি তাঁহার কাঁধে চাপিয়া তাঁহাকে অতলে ডুবাইবে, অশুভ মুহূর্ত্তে শনির কোপে নবাব সেই মীরজাফরকেই আশ্রয় করিলেন। তাঁহাকে চটাইতে ভয় করিয়া মোহনলালকে যুদ্ধ করিতে বারংবার নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। নিতান্ত নিরাশ ও বিরক্ত হইয়া মোহনলাল কৃপাণ ত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে হটিয়া আসিলেন। তখন শত্রুরা সোৎসাহে তাঁহার সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল। মোহনলাল চলিয়া গিয়াছিলেন—তখন ইংরেজদের বিজয় সম্পূর্ণ হইল। গোলাম হুসেনের বিবরণানুসারে মোহনলাল বন্দী ও আহত হইয়া দুর্লভরামের হাতে সমর্পিত হন, তথায় অল্প পরেই তিনি নিহত হন। কিন্তু রাজীবলোচন লিখিয়াছেন—যুদ্ধক্ষেত্রে যখন মীরজাফরের আদেশ বারংবার লঙ্ঘন করিয়াও তিনি যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন মীরজাফরের এক চর পশ্চাৎ ভাগ হইতে গুলি করিয়া তাঁহাকে নিহত করে। যুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই মীরজাফর সৈন্যদল লইয়া ইংরেজদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন।

হতভাগ্য নবাব এখন আর রাজপ্রাসাদের লোকজন কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, কে তাঁহার গলায় ছুরি দিবে, ঠিকানা নাই। তিনি তাঁহার বেগম লুৎফুন্নেসা এবং বহুমূল্য কতকগুলি মণিমুক্তা লইয়া মুর্সিদাবাদ ছাড়িয়া চলিলেন। তিনি তাঁহার

সেনাপতিদিগকে আদেশ করিলেন, যে পর্য্যন্ত তিনি কোন নিরাপদ্ স্থানে না পৌঁছিবেন, সে পর্য্যন্ত যেন তাঁহারা তাঁহার অনুগমন করেন। তাঁহারা মীরজাফরের করতলগত, কেহ তাঁহার আদেশে কর্ণপাত করিলেন না। এমন কি তাঁহার শ্বশুর মির্জ্জা রেজাখাঁও তাঁহাকে কোন সহায়তা না করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। একটা দিন তিনি রাজপ্রাসাদে ছিলেন, তখন জনপ্রাণী তাঁহার খোঁজ নিতে আসে নাই। মহাবিপদ্ আশঙ্কা করিয়া তিনি রাজমহলের দিকে চলিলেন, পথে ফরাসী সেনাপতি মুঁসিয়ার লাসকে আসিতে চিঠি পাঠাইলেন। গোলাম হুসেন লিখিয়াছেন, "রাজমহলে যদি স্থলপথে যাইতেন তাঁহার অনেক সুবিধা হইত; কিন্তু পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিয়া তিনি জলপথে চলিলেন। কিছু খিচুড়ীর ব্যবস্থার জন্ত তিনি নৌকা ভিড়াইলেন। এমন সময়ে একটি ফকির আসিয়া আতিথ্য করিতে আগ্রহ দেখাইতে লাগিল। তিন দিন তিনি, বেগম সাহেবা, সন্ততিবর্গ ও অপরাপর স্ত্রীলোকেরা এক ফোটা জল পর্য্যন্ত খাইতে পান নাই; এই সম্পূর্ণ অভুক্ত রাজ-পরিবারকে দানা সা ফকির খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া ডাকিতে লাগিল। এদিকে সে মীরজাফরের চরদিগকে পূর্ব্বেই খবর দিয়া রাখিয়াছিল, তাহার নাকি সিরাজউদ্দৌলার প্রতি আগেকার কি এক আক্রোশ ছিল! যখন অভুক্ত ব্যক্তিগণ খাইতে বসিবেন, এমন সময়ে মীরজাফরের লোকজন আসিয়া নবাবকে ধরিয়া লইয়া গেল। নবাব অভুক্তই রহিয়া গেলেন, এ জীবনে তাঁহার আর খাওয়া হইল না।

মীরন যখন সিরাজউদ্দৌলাকে মুর্সিদাবাদে লইয়া আসে, তখন তাঁহার অভুক্ত ও বিড়ম্বিত অবস্থা দেখিয়া সৈন্যগণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। আটদিন পূর্ব্বে যিনি তরুণ সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতেন, আজ তাঁহার একি দুর্দ্দশা! সেই বিচলিত সৈন্যগণ কোন উৎসাহই পাইল না, কারণ সেনাপতিগণ সকলেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। মীরজাফরের পুত্র মীরন একটা হিংস্র পশু, মূর্খতা ও নিষ্ঠুরতার অবতার। সিরাজকে আবদ্ধ করিয়া সে বহু অর্থের লোভ দেখাইয়া একজন হত্যাকারীর খোঁজ করিল। কিন্তু এই দুষ্কর্ম্মে কেহই স্বীকার পাইল না। অবশেষে মহম্মদী বেগ নামক অপর এক পশু-প্রকৃতি লোক জুটিল। সে আলিবর্দ্দী ও সিরাজের অন্নে চির-প্রতিপালিত। এক আঘাতে সে হত্যা করিতে পারিত কিন্তু তাহা না করিয়া বারংবার আঘাত করিয়া হতভাগ্য নবাবকে নিহত করিল। মরিবার পূর্ব্বে সিরাজ বলিলেন, "আমি সত্যই আমার যোগ্য শাস্তি পাইলাম, হুসেন কুলি, তোমার আত্মার এখন তৃপ্তি হইবে।" * যখন সিরাজ এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন, তখন

* গোলাম হুসেন লিখিয়াছেন, "তিনি বেশী কিছু বলিতে পারিলেন না, কারণ কসাইটা তাঁহার উপর ক্রমাগত খড়্গাঘাত করিতেছিল। এই আঘাতগুলির কয়েকটি তাঁহার মুখের উপর পড়িল; যে মুখের লাবণ্য ও অনুপম সৌন্দর্য্য সমস্ত বঙ্গদেশে প্রবাদবাক্যের মত হইয়াছিল, সেই মুখশ্রী আঘাতে আঘাতে নষ্ট হইল। মুখখানি হেলিয়া পড়িল।" গোলাম হুসেন এই মীরনের নিষ্ঠুরতার অনেক কথা লিখিয়াছেন, এই নরপিশাচের একটা নীতি ছিল যাহাকে সন্দেহ করিবে, তাহাকেই শেষ করিতে হইবে। স্ত্রীলোকদিগকে এই দুষ্ট ব্যক্তি পশুর মত

মীরজাফর সেই নবাবের শয্যায় আরামে (প্রকৃতই হউক কিংবা ভান করিয়াই হউক) দিবা-নিদ্রা যাইতেছিলেন, চক্ষু মেলিয়া যোগ্য-পুত্র মীরনকে দেখিয়া বলিলেন, "দেখ যেন নবাব পলাইয়া না যায়।" একথা ঠিক সত্যকার কথা কি ছলনা তাহা বলা যায় না। মীরন উত্তর করিল, "তজ্জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না।"

সিরাজউদ্দৌলার ছিন্ন-ভিন্ন দেহ হস্তীর পৃষ্ঠে রক্ষা করিয়া সেই হস্তীকে মুর্সিদাবাদের সর্ব্বাপেক্ষা জনাকীর্ণ পথ দিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কারণ জনসাধারণকে বুঝিতে দেওয়ার দরকার যে পুরাতন নবাব আর নাই, নূতন নবাব হইয়াছেন। সেখানে হুসেন কুলি খাঁ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নিহত হইয়াছিলেন, কি এক প্রয়োজনে মাহুত সেইস্থানে হাতীকে থামাইল এবং ঠিক সেই জায়গায়ই সিরাজের দেহ হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়িতে লাগিল। হস্তী ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই স্থান দিয়া চলিল এবং যে গৃহে সিরাজের মাতা ছিলেন, সেইখানে আসিয়া থামিল। হতভাগিনী তাঁহার পুত্রের এই শোচনীয় পরিণামের কিছুই জানিতেন না। অকস্মাৎ এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি ভুলিয়া গেলেন যে তিনি মুসলমান অন্দরমহলের সম্ভ্রান্ত মহিলা, ভুলিয়া গেলেন যে তিনি আলিবর্দ্দীর দুলালী কন্যা আমনা বেগম। ভিখারিণীর মত চীৎকার করিয়া নগ্নপদে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার পুত্রের ছিন্ন-ভিন্ন দেহের উপর পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া চারিদিকের লোকেরা

হত্যা করিত। ইহার সর্ব্বশেষ দুষ্কার্য্য—ঘেসেটি বেগম ও সিরাজ-মাতা আমনা বেগমকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা। আলিবর্দ্দী খাঁর এই দুই কন্যাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে মীরন ঢাকার শাসনকর্ত্তাকে লিখিয়াছিল—"আপনার তত্ত্বাবধানে এই দুই রাজকুমারী আছেন, আপনি অবিলম্বে ইঁহাদিগকে হত্যা করিবেন।" কিন্তু ঢাকার রাজপ্রতিনিধি এই দুই নিরপরাধ রাজকুমারীকে হত্যা করিতে স্বীকৃত না হইয়া উত্তরে লিখিয়াছিলেন, "আপনি ঢাকার জন্য অন্য এক শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিয়া তাঁহার দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদন করুন। আমি ইহা পারিব না।" মীরন একজন লোককে ঢাকায় পাঠাইয়া দিল এবং ঢাকার শাসনকর্ত্তাকে লিখিল,—"ইনি বেগমদ্বয়কে মুর্সিদাবাদে আনিতে যাইতেছেন, ইঁহার সঙ্গে তাঁহাদিগকে পাঠাইবেন।" লোকটীর উপর এই আদেশ ছিল—ইঁহাদিগকে পথে জলে ডুবাইয়া মারিতে। আসন্নকাল বুঝিয়া বৃদ্ধা ঘেসেটি বেগম কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু কনিষ্ঠ বেগম (সিরাজ-মাতা—আমনা বেগম) বলিলেন—"দিদি, কাঁদিয়া কি হইবে? আমরা উভয়ে ভগবানের কাছে অশেষ অপরাধে অপরাধী। এইভাবে তিনি সে প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিলেন, তাহা তাঁহার দয়া। মীরনের উপর তাঁহার রোষাগ্নি বর্ষিত হউক।" এই অভিসম্পাতের পর দুই ভগিনী গলাগলি করিয়া অতলজলে প্রাণত্যাগ করিলেন। যেদিন এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড ঘটিল, ঠিক তাহার আটদিন পরে (১৭৬০ খৃঃ) ও সিরাজের মৃত্যুর দুইবৎসর পরে মীরন আজিমাবাদের জঙ্গলে ক্ষুদ্র একটি শিবিরে বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করে। আজিমাবাদের প্রধান সাধু—সা মহম্মদ আলি হাজিন—এই সংবাদ পাইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "বিধাতার রোষাগ্নি কেমন সুন্দরভাবে সন্ধান লইয়া জঙ্গলের এক ক্ষুদ্র শিবির হইতে তাহার লক্ষ্য খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে!" দুইবৎসর পূর্ব্বে সিরাজের শব যে পথ দিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, মুর্সিদাবাদের সেই পথেই মীরনের মৃতদেহ হস্তিপৃষ্ঠে আনীত হইয়াছিল। মৃত্যুর পর মীরনের পকেটে পুস্তিকায় ৩০০ শত সম্ভ্রান্ত স্ত্রী-পুরুষের নাম পাওয়া গিয়াছিল। ইঁহাদিগের সকলকেই সে হত্যা করিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিল। ঘেসেটি ও আমনা বেগমের অনুগ্রহেই সে প্রথমজীবনে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ইঁহাদের সর্ব্বনাশ-সাধন ভগবান সহিতে পারেন নাই (মুতাক্ষরিন, ২য় খণ্ড, ৩৬৩-৩৭২ পৃঃ)।

আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই সময়ে গোলাম হুসেন খাঁ বারান্দা হইতে তাঁহার আশ্রয়-দাতার পুত্রের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছিলেন। তিনি কতকগুলি গুণ্ডা লাগাইয়া লাঠির গুঁতা মারিয়া বেগম সাহেবাকে জোর করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

মীরজাফর ক্লাইভের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন, তাঁহার সংবর্দ্ধনার্থ সৈন্যদল অসি নিষ্কাসন করিল। মীরজাফর ইংরেজের কায়দা জানিতেন না, সুতরাং তাহারা বুঝি তাঁহাকে হত্যা করিবে, এই ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন; এই সময়ে স্বয়ং ক্লাইভ আসিয়া তাঁহাকে 'নবাব' সম্বোধন করিয়া প্রীতিভরে করমর্দ্দনপূর্ব্বক আশ্বস্ত করিলেন।

সিরাজের মৃত্যুসম্বন্ধে ষ্টুয়ার্ট সাহেব লিখিয়াছেন, "কর্ণেল ক্লাইভকে সমর্থনার্থ আমরা এই বলিতে পারি যে, ভারতীয় কোন ইতিহাস-লেখকই সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুতে তাঁহার কোন হাত ছিল, একথা বলেন নাই। অনেকে বিশ্বাস করেন, সিরাজ যে বন্দী হইয়াছেন, একথাই তাঁহাকে জানিতে দেওয়া হয় নাই। তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুর পর তাঁহাকে এসকল কথা জানান হইয়াছিল" (৫৬৯ পৃঃ)।

বাস্তবিক ক্লাইভের মত বীরপুরুষ এরূপ হেয় কার্য্য কখনই অনুমোদন করিতেন না, এমন কি মীরজাফরের এবিষয়ে কিছু ইঙ্গিত ছিল, কেহ কেহ এ সন্দেহ করিলেও তৎসম্বন্ধে স্থিরসিদ্ধান্ত করার যোগ্য কোন প্রমাণ নাই। তবে মীরজাফরকে কেহই দেখিতে পারিত না। নবাব হওয়ার পর তিনি নিজে মস্ত বড় জাঁকালো একটা নাম ধারণ করিয়াছিলেন, "সুজা এল মুল্‌ক হিসামএদ্‌ দৌলত মীরজাফর খাঁ বাহাদুর মেহাবৎজঙ্গ" ("But as he was very much smitten with the charms of the title of Mehabut djung, which had been borne by Alybardy Khan, he ordered a new seal to be engraven for himself, where he assumed the title of Sujah-el-Mulk Hysam-ed-doulat Mirdjafar Ally Khan Bahadur, Mehabut djung—that is, the high and valiant Lord Mirjafar khan, who is the valorous of the State, the sword of the Empire and the formidable in War and the Majestic in Battles." (Metaqherin, Vol. II, p. 208), কিন্তু তাঁহার এক রহস্যপ্রিয় সভাসদ্‌ তাঁহার মসনদে বসিবার অল্প কয়েক মাস পরে আর একটি সহজ নাম দিয়াছিল; "কর্ণেল ক্লাইভের গর্দ্দভ"—এই উপাধি দ্বারা তিনি আজীবন পরিচিত হইয়াছিলেন। (A very few months after Mirzafar's accession, he was nicknamed by some of the wits of the Court, "Colonel Clive's Ass" and retained the title till his death (Stewart, p. 569). মীরজাফর মৃত্যুকালে নন্দকুমারের উপদেশানুসারে কিরীটেশ্বরীদেবীর পাদোদক পান করিয়াছিলেন। গোলাম হুসেন লিখিয়াছেন, "ইহাই তাঁহার শেষ খাওয়া—খোদা আমাদিগকে এই ভাবের পীড়া ও মৃত্যু হইতে রক্ষা করুন"।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শিক্ষা-দীক্ষার কথা

পাঠানদের সময়ে বাঙ্গালী হিন্দুর যে তেজ ছিল, তাহা মোগলদের সময়ে অনেকটা নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। পাঠানেরা এদেশের হিন্দুদের সঙ্গে যতটা মিশিয়াছিলেন—মোগলেরা তাহা করেন নাই। হুসেন সাহ প্রভৃতি প্রধান রাজারা সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণদিগের পুত্রকন্যা খুঁজিয়া তাঁহাদিগের সহিত স্বীয় সন্ততিবর্গের বিবাহ দিতেন। আমরা একটাকিয়ার ব্রাহ্মণ জমিদারদিগের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবংশের অনেক সুন্দরী কন্যা এবং গুণশালী যুবকের সহিত মুসলমান বাদসাদের পুত্রকন্যার বিবাহ হইয়াছে। অবশ্য এই সকল কন্যা ও পুত্রদিগকে বিবাহের পূর্ব্বে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইত। এইভাবে অযোধ্যা প্রদেশের বাইশোয়ারা পরগনার অধিপতি ক্ষত্রিয় ধনপৎ সিংহের বংশীয় ভগীরথের পুত্র কালিদাস গজদানীর রূপে মুগ্ধ হইয়া নবাব বাহাদুর সাহের কন্যা তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই কাহিনীতে কবিত্বের রং ফলাইয়া মুসলমান কবি যে পল্লী-গীতিকা রচনা করিয়াছেন, তাহা "ইশা খাঁ" শীর্ষক কাব্যে আছে, বিশ্ববিদ্যালয় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। কালিদাস স্বর্ণহস্তী (অবশ্য ক্ষুদ্রাকৃতি মূর্ত্তি) ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া গজদানী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। নবাবকন্যার প্রেমে পড়িয়া তিনি ধর্ম্মবিসর্জ্জনপূর্ব্বক 'সোলেমান' নাম গ্রহণ করেন। এই দেওয়ান কালিদাস গজদানীর পুত্রই জঙ্গলবাড়ীর সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা ইশা খাঁ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বঙ্গদেশের ইতিহাসে যিনি একটা কলঙ্কের দাগের মত হইয়া রহিয়াছেন, সেই 'কালাপাহাড়'ও হিন্দু ছিলেন, তিনি মুসলমান বাদশাহের কন্যা বিবাহ করিয়া জাতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেন; তাঁহার কথা ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে। পাঠানেরা হিন্দুর রাজ্য জয় করিলেও তাঁহাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশীয়দিগকে স্বীয় সমকক্ষ মনে করিতেন। মোগলদের বিরুদ্ধে যেমন দাউদ খাঁ, কতলু খাঁ প্রভৃতি পাঠানেরা যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তেমনই চাঁদ রায়, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য, ভূষণার মুকুন্দরাম ও সত্রাজিৎ রায় প্রভৃতি হিন্দু জমিদারগণও যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কারণ পাঠানেরা শুধু মাথা হেঁট করাইতে চাহিতেন, কিছু রাজস্ব চাহিতেন, দক্ষিণা পাইলেই চলিয়া যাইতেন; হিন্দু রাজারা প্রায় স্বাধীনই ছিলেন, তাঁহারা ঐ রাজস্ব দেওয়ার পর নিজ রাজ্য সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই শাসন করিতেন, এমন কি পার্শ্ববর্ত্তী রাজারা অপর শত্রুদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ করিতেন—গৌড়দ্বারের রাজা চাঁদ রায় ও সন্তোস রায় এইভাবে কতলু খাঁকে রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে ইঁহারা এত প্রবল হইতেন যে, বঙ্গাধিপের রাজ্য আক্রমণ করিবার কথাও মনে মনে পোষণ করিতেন। এইভাবে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর একদা নবাবের রাজধানী আক্রমণের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ত্রিপুরেশ্বরের প্রধান পুরোহিত হুসেন সাহের সেনাপতি মমারক খাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে বলি

দিয়াছিলেন। পাঠানদের সময়ে হিন্দুর প্রকৃত দাসত্ব আরম্ভ হয় নাই। পূর্ব্বকালে জরাসন্ধ ও পৌণ্ড্র বাসুদেব যেরূপ মথুরা ও দ্বারকার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন, ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গের নগণ্য জমিদারেরাও সেইরূপ দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধোদ্যোগ করিয়াছিলেন। এমন কি প্রতাপাদিত্য মানসিংহকে পরাস্ত করিয়া আগ্রার রাজধানী পর্য্যন্ত যাইবেন, ভারতচন্দ্র কবি তাঁহার এই ইচ্ছা আভাসে জানাইয়াছেন ("যমুনার জলে ধোব এই তরবার"), দিল্লী, মথুরা প্রভৃতি অঞ্চলের প্রতি এই বিদ্বেষ বাঙ্গালীর চিরসংস্কারাগত। মহারথরা পূর্ব্বকাল হইতে পূর্ব্বভারতকে ভয় করিয়া চলিতেন। জগজ্জয়ী আলেকজাণ্ডার পূর্ব্বাঞ্চলের নাম শুনিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছিলেন। স্বয়ং মঃ ইবন বক্তিয়ার খাঁ এদেশের স্বাধীনতা মাত্র হরণ করিয়া আরো পূর্ব্বে অভিযান করিবার চেষ্টায় নানারূপে লাঞ্ছিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। এদেশ ইতিহাসের পূর্ব্বযুগ ইহতে ইন্দ্রপ্রস্থের আনুগত্যের বিরোধী। পুরাণের

বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্র্য ও দিল্লীর বিদ্রোহ।

যুগ ছাড়িয়া দিলেও ইদানীং কালে প্রতাপাদিত্য, তৎপুত্র উদয়াদিত্য, মুকুন্দরাম, তৎপুত্র সত্রাজিৎ এবং কেদার রায়, ইশা খাঁ, ফিরোজ খাঁ সেই ইন্দ্রপ্রস্থ-বিরোধী পতাকা বহন করিয়া প্রাণ দিয়াছেন, কিন্তু পণ ছাড়েন নাই।

পাঠান-রাজত্ব পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের এই স্বাধীনতার চেষ্টা সর্ব্বত্র চলিয়াছিল। পাঠানেরা ভূম্যধিকারী ছিলেন না, তাঁহারা ছিলেন রণক্ষেত্রের বীর—সংগ্রামবিজয়ী। কৃষি-ব্যবসায়, বাণিজ্য, দেশের উৎপাদিকা শক্তি এবং তজ্জাত অর্থাগম—এসকল বিষয় অসহিষ্ণু, সততকৃপাণপাণি, রণজয়ী বীরগণের কল্পনাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তাঁহারা ব্যবসায়-বাণিজ্য জানিতেন না; কি জমির কত আয় হইতে পারে, রাজস্ব কত হওয়া উচিত—এসকল লইয়া তাঁহারা মাথা ঘামাইতেন না। অর্থের প্রয়োজন হইলে নিকটবর্ত্তী কোন রাজভাণ্ডার বা দেবমন্দির লুণ্ঠন করিতেন, তাহাতে তাঁহাদের ঐহিক-পারত্রিক উভয় প্রকারের সুফল লাভ হইত। শুধু শের সাহ ও হুসেন সাহ জমিজমার আয়সম্বন্ধে খবর রাখিতেন, অপরাপর পাঠান নবাবেরা দিনরাত্র যুদ্ধের উদ্যোগ ও সেই চিন্তাই করিতেন। যাঁহারা অর্থের চিন্তা হইতে মুক্ত থাকেন, তাঁহাদের মন স্বভাবতঃই উদার হয়। পাঠান নবাবদের কতকটা সেরূপ উদারতা ছিল। এই সুযোগে এদেশে হিন্দুরা বাণিজ্যাদি দ্বারা বিপুল অর্থশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই ধনকুবেরদের শেষ দীপশিখা পরবর্ত্তী কালে জগৎশেঠের গৃহ হইতে জ্বলিয়াছিল। ঐতিহাসিকেরা লিখিয়াছেন, জগৎ শেঠের মত ধনী তখন পৃথিবীতে ছিল না।

পাঠানাধিকারে হিন্দু শিল্পিগণই হিন্দু-মুসলমান সকল নৃপতিবৃন্দ ও গণ্যমান্য লোকের

হিন্দুশিল্প।

উৎসাহ পাইত। বিদেশ হইতে পাঠান নবাবেরা শিল্পী বেশী আনাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যাহারা প্রস্তর ও স্বর্ণরৌপ্যের বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিত, পাঠানদের অত্যাচারে তাহারা একেবারে উন্মূলিত হইয়াছিল।

হাভেল সাহেব পরিষ্কাররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে মোগল ও পাঠান-শিল্প বলিয়া যাহা সচরাচর কথিত হইয়া থাকে, তাহা বৌদ্ধ ও হিন্দু শিল্পেরই মূলতঃ রূপান্তর।

তাহাতে ইরানী প্রভাব কতকটা আছে সত্য, কিন্তু ভারতীয় শিল্পই তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ফতেপুর সিক্রি এবং অন্যান্য স্থানের আকবর-কৃত মসজিদসমূহের সিংহদ্বারের কারুকার্য্যের মত উৎকৃষ্ট চারুকলা—কি গঠনে কি কারুকার্য্যে—পারস্যদেশীয় কোন মসজিদে দৃষ্ট হয় না। (A Handbook of Indian Art, E. B. Havell, p. 113.) তিনি বলেন হিন্দু কারিগরদিগকে আকবর ঐ সকল ইরানী মসজিদের আদর্শে মসজিদ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের অপূর্ব্ব শক্তিবলে তাহারা বিদেশী আদর্শ অনেকদূর ডিঙ্গাইয়া গিয়াছিল। হিন্দুদিগের মূর্ত্তি ও চিত্রনির্ম্মাণের কথা উল্লেখ করিয়া আবুল ফজল বলিয়াছেন, "ইহাদের চিত্রাঙ্কনশক্তি আমাদিগের ধারণার অতীত। সমস্ত জগতে ইহাদের সমকক্ষ শিল্পী অল্পই আছে।" (আইন-ই-আকবরী—ব্লকম্যানের অনুবাদ, প্রথম খণ্ড, ১০৭ পৃঃ) ("Their pictures surpass our conception of things. Few in the whole world we found equal to them.") হ্যাভেল বলেন, "হিন্দু শিল্পীদের দ্বারা গড়া এই সকল মুসলমানী মসজিদ এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, আরব, তুরস্ক, ইজিপ্ট এবং স্পেনের মুসলমানী শিল্পের নিদর্শনগুলি ইহাদের কাছে দাঁড়ায় না। হিন্দুর আধ্যাত্মিক ধারণা এবং তাঁহাদের সূক্ষ্ম-কারুকার্য্যে মণ্ডিত হইয়া বিজাপুর, দিল্লী, ফতেপুর সিক্রি, আহমদাবাদের মসজিদগুলি কেইরো এবং কনষ্টাণ্টিনোপলের মসজিদগুলি হইতে এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে শেষোক্তগুলি উহাদের তুলনায় একেবারেই আকিঞ্চিৎকর।" (The Ideals of Indian Art, Havell, p. 119) "Inlay workers who were all Hindus from Kanoj and a Hindu garden designer from Kashmere." (A Handbook of Indian Art, Havell, p. 137) হ্যাভেল সাহেব নানা প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বৌদ্ধশিল্প-প্রভাব সমস্ত এশিয়ার উপর অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। চীন ও জাপানে, সিংহল, জাভা, শ্যাম এবং সমস্ত ভারত সাগরের দ্বীপপুঞ্জে এই ভারতীয় শিল্পের আদর্শ সুপ্রোথিত হইয়াছিল,—পারস্য ও আরবও এই শিল্প (মূর্ত্তি বা বিগ্রহ-নির্ম্মাণপ্রথা অবশ্য বাদ দিয়া) হিন্দুস্থানের আদর্শই গ্রহণ করিয়াছিল। আহমদাবাদ ও বিজাপুরের আশ্চর্য্য মসজিদগুলি কিছু সামান্য পরিবর্ত্তনের পর বৌদ্ধ বিহারের আদর্শ অনুসরণ করিয়া এরূপ অপূর্ব্ব সুন্দর হইয়াছিল। আহমদাবাদের বিশাল ও সুন্দর হর্ম্ম্য ও মসজিদগুলি ষোড়শ শতাব্দীতে সেই প্রাচীন রীতি অনুসারে গঠিত হইয়া দর্শনীয় হইয়া আছে। ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যপ্রভু আহমদাবাদ গিয়াছিলেন, তাঁহার অনুচর গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন, "আশ্চর্য্য আহমদাবাদ জাঁকের সহর।"

মোগলদের সময়ে শাসনকর্ত্তারা বঙ্গের শিল্পীদিগকে কোন বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। কিন্তু পাঠানেরা যে হিন্দু শিল্পী দিয়া তাঁহাদের সমস্ত মসজিদ, প্রাসাদ ও সমাধিক্ষেত্র গড়িয়াছিলেন, তাহার প্রভূত উদাহরণ বাঙ্গলার সর্ব্বত্র এখনও আছে। গৌড়ের "বড় সোনা মসজিদ" বা "বারদুয়ারী" মসজিদে মাত্র বারটি গম্বুজ লাগাইয়া উহাতে মুসলমানী প্রভাবের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

বারদুয়ারী মসজিদ।

এই "বারদুয়ারী" গৃহ হিন্দু আমল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, প্রাচীন পল্লীগীতিকায় বঙ্গদেশের এই "বারদুয়ারী ঘরের" পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এখনও মৈমনসিংহ জেলার ঘরামীরা "বারদুয়ারী ঘর" নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ফার্গুসন সাহেব লিখিয়াছেন, "প্রাচীন গৌড়ের সৌধমালার মাল-মসলা দিয়া মুর্সিদাবাদ, মালদহ, রঙ্গপুর, রাজমহল প্রভৃতি নগরী সমগ্রভাবে গঠিত হইয়াছে, এমন কি কলিকাতা ও হুগলীর অনেক স্থানে সেই উপকরণ গৃহীত হইয়াছে।"

বাঙ্গলাদেশে ইট দিয়া বাড়ী-ঘর নির্ম্মিত হইত, পাথর এস্থানে কতকটা দুর্লভ; পোড়া মাটীতে (terracotta) নানারূপ কারুকার্য্য করা হইত। ইটের দ্বারা বঙ্গীয় কোঠাবাড়ীতে খিলান প্রস্তুত করা সহজ—পাথর দিয়া গোলাকৃতি কি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি (চামচিকা) খিলান তৈরী করা কঠিন। দিল্লী অঞ্চল অপেক্ষাও এদেশে মুসলমানদের মসজিদ প্রভৃতিতে পোড়া ইটের উপর হিন্দু কারিগরদের হস্ত-নৈপুণ্যের চিহ্ন বেশী। গৌড়ের মসজিদ ও সমাধিমন্দিরগুলিতে এইরূপ ইটের উপর যেসকল অপূর্ব্ব কারুকার্য্য দৃষ্ট হয় তাহা এদেশের হিন্দুকারিগরের হাতের কাজ। আমার মনে হয়, ইট কাঁচা থাকিতেই, এখন যেরূপ মালিকের নামের ছাঁচ তাহার উপর ছাপ দিয়া পোড়ানো হয়, সেইরূপ প্রাচীন কালে নানারূপ পৌরাণিক এবং সামাজিক ঘটনা, নানারূপ মূর্ত্তি ও শিল্প-সৌষ্ঠবের ছাঁচ তৈরী থাকিত, তাহারই ছাপ দিয়া ইট পোড়ানো হইত। পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদের খিলানের কাজ, ত্রিবেণীর জাফর খাঁর মসজিদের কারুকার্য্য, এগুলি সমস্তই হিন্দুমন্দিরের উপকরণে নির্ম্মিত, এমন কি শেষোক্ত মন্দিরের প্রাচীন নিদর্শনের একাংশ মসজিদের অঙ্গীয় হইয়া রহিয়া গিয়াছে। গৌড়ে হুসেন সাহর সমাধি এবং কয়েকটি মসজিদে যে নানা রঙ্গের এনেমেল করা টালির উপর কাজ দেখা যায়, তাহাও এই দেশের লোকের মৌলিক কাজ—বাঙ্গলার নিজস্ব শিল্প। ("The Pathan mosques and tombs of Gour, Pandua and Malda on this account are even closer imitation of Hindu and Buddhist buildings than they were in the neighbourhood of Delhi, where stones of large dimensions were procurable and consequently the arch was not used by Hindu masons to secure a structural purpose. The terracotta and fine moulded brick-decorations used both in mosques and temples in Bengal were certainly not imported by Muhammedans. The cognate art of enamelled tiles and bricks so much used in Muhammedan buildings in India was probably a local one in Gour"—(A Handbook of Indian Art, Havell, p. 123).)

হুসেন সাহের সময়ে অনেক মসজিদ ও সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, বঙ্গের নানাস্থানে তিনি মসজিদাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, শিলালিপিতে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ১৫০২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে পাটনা জেলায় বিহার মহকুমার বোনহারা গ্রামে, ঢাকা জেলার বল্লীপুর পরগনায় মাচাইন গ্রামে ১৫০১ খৃষ্টাব্দে, মালদহ জেলায় ১৫০২ খৃঃ অব্দের ১০ই মার্চ্চ, ১৫০৩ খৃঃ অব্দে গৌড়ে কদম রসুলের নিকট সারন জেলায় চোরান গ্রামে, ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুয়ায়—

এইরূপ বহুস্থানে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হুসেন সাহ মসজিদ, তোরণ ও কূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তাঁহার ওমরাহ ও অধীন লোক ও আত্মীয়বর্গও অনেক মসজিদ ও সমাধিমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বঙ্গের ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগে ২৫২ হইতে ২৬৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এই দেশব্যাপী স্থাপত্যের নিদর্শনগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কিন্তু যে কয়েকটির উল্লেখ আছে তাহাতেই প্রায় দশটি পৃষ্ঠা ভরিয়া গিয়াছে। গৌড়, পাণ্ডুয়া ও মালদহই এই স্থাপত্যের প্রধান ক্ষেত্র ছিল। সারন ও বিহার হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত হুসেন সাহের এই উত্তম সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। হুসেন সাহ ছাড়া পাঠানদের মধ্যে শের সাহের মসজিদ, সমাধি ও রাস্তা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শের সাহের সমাধি-মন্দিরে স্থাপত্যের সেরা সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয়। তিনি সুন্নি ছিলেন, এজন্য তদীয় স্মৃতি-চিহ্নে পার্শ্ববর্ত্তী মোগল বাদশাহ হুমায়ুনের সমাধির আড়ম্বরপূর্ণ জাঁকালো ভাবটি নাই। একটি কৃত্রিম হ্রদের মধ্যবর্ত্তী এই সমাধি স্বীয় মহিমান্বিত স্বাতন্ত্র্য প্রকটিত করিয়া দেখাইতেছে। উহা অনেকটা তাঁহার স্বীয় মহান্ চরিত্রের ন্যায়। চারিদিকের সমতলভূমি ও জলরাশির মধ্যে থাকিয়া উহা সেই উন্নত সুদৃঢ় চরিত্রের মহিমায় ঐন্দ্রজালিক প্রভাব প্রকটিত করিতেছে। ইহাতে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য বেশী নাই, কারণ সুন্নিরা সহজ নিরাভরণ, সতেজ সারল্য বেশী পছন্দ করিতেন। কিন্তু উহাতে ইরানী প্রভাব কিছুই নাই, উহা ভারতবর্ষের বৌদ্ধ স্তূপগুলির অমল-ধবল শারদ জ্যোৎস্নার মত প্রভা-দ্যোতক।

শের সাহের সমাধি।

হ্যাভেল সাহেব লিখিয়াছেন, "ইনি সুন্নিদের নিষেধাত্মক বিধি মানিয়া হিন্দু কারিগরদিগকে এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এজন্য সেই সকল শিল্পী ইহা কারুকার্য্যে অলঙ্কৃত করে নাই, এই সমাধিমন্দিরও সর্ব্বাংশে ভারতীয়। এই সমাধিতে প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের সমাধি-মন্দির ও বৌদ্ধস্তূপেরই পঞ্চদশ শতাব্দীর বিকাশ দৃষ্ট হয়" (He set Hindu craftsmen to work in carrying out his building projects in conformity with the Sunni prescriptions; just as the Indian mosque is always Indian so is the tomb of the great Pathan: it is the fifteenth century development of the Indo-Aryan heroes' tomb—the Buddhist *silpa*"—(A Handbook of Indian Art, Havell, p. 115). অজান্তার গুহা-মন্দিরাদি হইতে দৃষ্ট হয় বৌদ্ধস্তূপগুলি গোলাকৃতি সুদৃঢ় আকৃতিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া ধীরে ধীরে ভারতীয় শিল্প-কলার সুচিরাগত আদর্শে পদ্মাকৃতি হইয়া আসিতেছিল। মসজিদের গম্বুজগুলি এই পরিবর্ত্তিত ভাবের দ্যোতনা করিতেছে। কি ইরানে, কি আরবে, কি ভারতবর্ষে, মসজিদের গম্বুজগুলি ভারতীয় বৌদ্ধস্তূপের অনুকৃতি। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধশিল্প অর্দ্ধজগৎ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। সুন্নিরা মূর্ত্তি বাদ দিয়াও সেই প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। পাঠানের সময়ে এদেশের হিন্দু ও মুসলমান-কীর্ত্তি সমস্তই বাঙ্গালী হিন্দু কারিগরের হাতের। হিন্দুগণের জটিল নিষেধবিধি কতকপরিমাণে এড়াইয়া এবং ইসলামের সহজ ও সরল আদর্শের অনুবর্ত্তী

হইয়া কাজ করিতে আদিষ্ট হওয়াতে হিন্দু কারিগরদের হাত একটু বেশী স্বচ্ছন্দ ও গতিশীল হইয়াছিল।

সকলেই অবগত আছেন যে, হিন্দুপণ্ডিত ও ভিষক্‌গণ বোগদাদের রাজসভায় বিশেষরূপে আদৃত হইতেন। আমরা দেখিতে পাই ইসলামের বীরবরগণ ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ, শ্রমণ ও বৌদ্ধভিক্ষুদিগকে পাইলেই সংহার করিতেন, কিন্তু তাঁহারা ভারতীয় কারিগরদিগকে রক্ষা করিতেন। মহম্মদ গজনী ভারতীয় মন্দিরাদির অতুলনীয় সৌষ্ঠব এবং স্থাপত্যের পরা কাষ্ঠা দেখিয়া সহস্র সহস্র হিন্দুকারিগরকে গজনীতে রাজপ্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিতে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। গজনীতে তিনি হিন্দু রমণী ও হিন্দু কারিগরদিগের একটি হাট বসাইয়াছিলেন। সমস্ত মুস্লিম-এশিয়ায় এই হাট হইতে দাসী এবং নিপুণ কারিগর ক্রয় করা হইত।

এই কারিগরদের শ্রেষ্ঠ ছিল—মাগধ শিল্পীরা। 'মাগধ বন্দীর' ন্যায় মাগধ শিল্পীও জগতের সর্ব্বত্র জয়মাল্য পাইয়াছিল। পাঠান আমলে হিন্দু কারিগরদের এই খ্যাতি লুপ্ত হয় নাই। হাভেল সাহেব লিখিয়াছেন, হিন্দুস্থান হইতে কারিগরেরা যাইয়া ভিন্ন ধর্ম্ম ও ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা বিদেশে নূতন প্রভাবে পড়িয়া তদনুযায়ী জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। বাধ্য হইয়া তাহারা পারস্য, আরব, তুরস্ক, স্প্যানিয়ার্ড ও ইজিপ্সিয়ান নাম গ্রহণ করিল। এই ভারতীয় শিল্পাচার্য্যগণের বংশধরেরাই মুসলমান হইয়া সর্ব্বত্র প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্যের দীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। (A Handbook of Indian Art, p. 129) "Thousands of craftsmen, each expert in his own special branch, were forced into the service of Islam in different parts of Asia and Europe and set to work indiscriminately at the bidding of their masters" (p. 129). হিন্দু কারিগরেরা 'বিমান' নির্ম্মাণ করিতে অভ্যস্ত ছিল, তাহারা সহজেই গম্বুজ করিতে পারিল। তাহারা মূর্ত্তি তৈরী করিতে নিষিদ্ধ হইল, কিন্তু তাহাদের সূক্ষ্ম চারুশিল্প, যাহা নানারূপ সপুষ্পলতিকার ভঙ্গীতে মন্দিরদ্বারে প্রদর্শিত হইত, সেই শিল্পজ্ঞান ও হাতের অবলীলাক্রম ভঙ্গীদ্বারা তাহারা কোরানের 'শ্লোক'গুলিকে মসজিদের দ্বারদেশে অতি সুন্দর করিয়া চারুশিল্পকার্য্যে পরিণত করিল। তাহারা হয়ত মানুষের ছবি আঁকিতে নিষিদ্ধ হইল, কিন্তু মসৃণ টালির উপর এবং প্রাচীরের গায়ে নানারূপ বিচিত্র চিত্র আঁকিয়া তাহাদের শিল্পপ্রতিভা প্রদর্শন করিল।

পৃথিবীময় হিন্দুকারিগর উপনিবিষ্ট হইয়াছিল।

বৌদ্ধ যুগের স্তূপ, তোরণ এবং মন্দিরাদি পাশাপাশি রাখিয়া এশিয়ায় ইসলামের মসজিদ ও সৌধমালায় হিন্দু কারিগরের এই হস্তচিহ্ন বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা হাভেল সাহেব সপ্রমাণ করিয়াছেন; ইতিহাসের সাক্ষ্যও তাঁহার সহায় হইয়াছে। বস্তুতঃ বৌদ্ধযুগে স্থাপত্য ও চারুশিল্পের প্রভাব অতি আশ্চর্য্যভাবে সমস্ত এশিয়াতে এবং য়ুরোপের স্থানে স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল; তাহার আদি খুঁজিতে গেলে হয়ত আমরা অতল ঐতিহাসিক কূপের থৈ পাইব না। খৃঃ পূঃ ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বের মহেঞ্জো-দারোতে যে সকল

শিল্প-নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে—তাহা আর্য্যসভ্যতার পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহারই ক্রমবিকাশ আমরা হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলাম-যুগে দেখিতে পাই এবং তাহার কেন্দ্রভূমি ছিল ভারতবর্ষ।

মোগল-সম্রাট আকবর ইসলাম ও হিন্দুধর্ম্মের মিলন ঘটাইতে চেষ্টিত ছিলেন। তাঁহারই উদারতার ফলে মোগল-দরবারে স্থাপত্য ও সূক্ষ্মশিল্পের এরূপ আশ্চর্য্য বিকাশ হইয়াছিল। তাঁহারই উদারতার ফলে তাঁহার সময়ে ও তাঁহার পরবর্ত্তী দুই বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি বংশধরের রাজত্ব-কালে হিন্দু ও মুস্লিম এই উভয় জাতির আদর্শে তাজমহল, সাজাহানের মসজিদ, সম্মনবুরুজ (আগ্রা), ইতি মাদউল্লার সমাধিমন্দির (আগ্রা), দেওয়ানি খাস্ প্রভৃতি বিখ্যাত সৌধমালা গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু আরঙ্গজেব শিল্প ও স্থাপত্যের শেষশিখা নিবাইয়া ফেলিলেন। তিনি সাদা জামা ও সাদা কাপড় পরিতেন, সভাসদ্ সমস্ত নৃপতি প্রভৃতিকেও তাহাই পরিয়া দরবারে আসিতে হইত। তিনি চিত্রকর ও সূক্ষ্মশিল্পের কারিগরদিগকে নিরস্ত করিলেন। বেশভূষায় নিযুক্ত গল্প বলিবার লোক থাকিত, তাহারা নাচিয়া গাহিয়া এবং নানারূপ মুদ্রাসহযোগে অভিনয় করিয়া গল্পে প্রচুর রস সঞ্চার করিত, তাহাদিগকে তিনি কর্ম্মচ্যুত করিলেন না বটে, তবে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অঙ্গভঙ্গী একেবারে নিষেধ করিয়া দিলেন (মুতক্করিন)। এ যেন জটায়ুর পক্ষচ্ছেদ করা হইল। সঙ্গীত বিদ্যাটাকে তিনি অতি হেয় মনে করিয়া তাহা নিগৃহীত করিলেন। যমুনার পারে বীণা ও সেতার থামিয়া গেল, কোরানের আবৃত্তি চলিল। এই কার্য্যের দ্বারা দুইটি বিষয় প্রতিপন্ন হয়—প্রথমতঃ ইসলাম ধর্ম্মের সুন্নিমতের গোঁড়ামি, কিন্তু মূলতঃ বোধ হয় পিতৃদ্বেষী পুত্র তাঁহার বাপের কীর্ত্তিগুলি কিছুই নহে বলিয়া উহার অসারতা প্রমাণ করিতে চেষ্টিত ছিলেন, তাই নিজে একটা নূতন সহজ সরল জীবনের মৌলিক আদর্শ খাড়া করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার শিল্প ও কলা-চর্চ্চার বিদ্বেষ ধর্ম্মের গোঁড়ামি না পিতৃবিদ্বেষের ফল তাহা বলা কঠিন।

আরঙ্গজেব-কৃত শিল্প ও সঙ্গীতের নিরুৎসাহ।

সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে যে টাকা আসিত, তাহা আগ্রায় ব্যয় হইত। আরঙ্গজেব সে অর্থ ব্যয় করিতেন যুদ্ধবিগ্রহে, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাট্দ্বয় তাহা শিল্পচর্চ্চায় ব্যয় করিতেন। এই মোগল যুগের শিল্প বঙ্গদেশে প্রবেশ করিতে পারে নাই। শিল্পের কায়দা-কানুন ও পরিচ্ছন্নতার এই ইঙ্গিত যদিও অজান্তাযুগেও অনেক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, (সুতরাং তাহাকে ভারতীয় শিল্প নাম দিতে বাধে না)—তথাপি মোগল-শিল্প এদেশের জন-সাধারণের অনায়ত্ত। বাঙ্গলাদেশ সর্ব্বদা গণতান্ত্রিক, মোগলের সাম্রাজ্যবাদ ও কেন্দ্রীয় শাসন তাহাদের প্রকৃতির অনুকূল নহে, এইজন্য তাহারা মোগলাধিকারের পথে এত বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। যে প্রভূত অর্থে মোগল স্থাপত্য-শিল্পের আদর্শ রচিত হ[illegible], তাহা সার্ব্বভৌম শক্তি ভিন্ন অন্যের আয়ত্ত নহে। বিশেষ তটভঙ্গে নিত্য-লীলা-চঞ্চল [illegible] বাঙ্গলা দেশে স্থাপত্যের সেরূপ অবকাশ নাই। কিন্তু মোগলচিত্রও বাঙ্গা[illegible] আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। এদেশ আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের প্রতি বদ্ধলক্ষ্য [illegible] বলেন,

বাঙ্গালী মোগল কলমের পক্ষপাতী কেন হয় নাই।

তাহা তাজমহলেও নাই। শিল্প-পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—তাজমহলাদি উচ্চাঙ্গের স্থাপত্যের সঙ্গে অজান্তার শিল্পের এই স্থানে প্রভেদ। (বৌদ্ধ ও হিন্দুজগতের আধ্যাত্মিক মহিমা মোগলশিল্পে নাই। এইজন্ত সৌন্দর্য্যের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াও মোগল-শিল্প বাঙ্গালীদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ মোগল-শিল্পের আদব-কায়দা বাঙ্গালীর মোটেই ভাল লাগে নাই।) দিল্লীশ্বর জগদীশ্বরের আসন দখল করিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলে যতটা সম্ভ্রম ও সতর্ক দৃষ্টির দরকার, ভক্ত দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতেও ততটা দেখাইতে পারেন না। দৃষ্টান্তস্থলে সাজাহানের সভা, আকবরের জন্ম প্রভৃতি বিখ্যাত চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। প্রত্যেক সভাসদ্ ও দ্বারী চাকর পর্য্যন্ত আদব-কায়দার চূড়ান্ত দেখাইতেছে, তাহাদের বসিবার ভঙ্গীতে একটুও ত্রুটি নাই, পরিচ্ছদে সর্ব্বাঙ্গ ঘেরা। এমন কি ফকির ও সন্ন্যাসী আঁকিতে যাইয়াও তাঁহাদের ভঙ্গী বা বেশভূষায় মুহূর্ত্তের জন্যও মোগল-শিল্পী—তাঁহার অতি সূক্ষ্ম ও মার্জ্জিত আদব-কায়দার জ্ঞান ভুলিতে পারেন নাই। বাহিরের এই কায়দাকানুন, অবান্তর বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু প্রভৃতি সর্ব্ব চিত্রের মধ্যে উঁকি মারিতেছে। সর্ব্বত্রই যেন রাজদরবার—বসিবার বা চলিবার ভঙ্গী পাছে বেকায়দা হইয়া যায় মোগল শিল্পী সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন। বাল্মীকি রাবণসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, "নিষ্কম্পপত্রাস্তরবো নদ্যশ্চ স্তিমিতোদকাঃ।"——"আমি যেখানে থাকি বা চলাফেরা করি সেখানে তরুগুলি নিষ্কম্প ও নদীর জল স্তিমিতগতি হইয়া যায়" (রামায়ণ, আরণ্য, ৩৮ সর্গ, ৯ শ্লোক) তদ্রূপ দিল্লীশ্বরের প্রবল প্রতাপ যেন মোগল-শিল্পকে অতি মাত্রায় স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছে, সকল মূর্ত্তিই যেন রোমের সিনেটারগণের মত স্থিরগম্ভীর, এরাজ্যে যেন হাসা, কাঁদা ও অঙ্গসঞ্চালন নিষিদ্ধ। এই ভাব বাঙ্গলার লোক পছন্দ করিবে কি করিয়া? তাহাদের আদর্শ—চাঞ্চল্য, স্থৈর্য্য তাহারা মোটেই পছন্দ করে না। বৌদ্ধযুগের বুদ্ধবিগ্রহে অবিচলিত স্থৈর্য্য আছে বটে, কিন্তু তাহার আধ্যাত্মিকতা মোগল-শিল্পে নাই। মোগল-শিল্পে সমস্ত মূর্ত্তিই যেন বাহ্য-দৃষ্টিতে বুদ্ধাবতার। মোগল যুগে বাঙ্গলায় হরি-সংকীর্ত্তনের তুমুল ধুম পড়িয়া গিয়াছিল, সংকীর্ত্তন-ক্ষেত্রে নৃত্যকারীদের লম্ফঝম্প, খোলবাদক লাফাইয়া আড়াই হাত উঁচু উঠিয়াছে—এক পা ধরণীতলে আর এক পা বায়ুর উপর। তাহার দুই হাতের উদ্দণ্ড গতিতে খোলের আওয়াজের উচ্চতার কল্পনা করা যায়। যেখানে বাঙ্গালী ছবি আঁকিতে বসিয়াছে, সেইখানেই ক্ষিপ্রগতি ও প্রাণের দ্রুত স্পন্দন দেখাইয়াছে; হয়ত কোন সময়ে তাহারা মাত্রা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে—এই নর্ত্তন, কুর্দ্দন, টীকি নাড়া ও বাহ্বাস্ফালনের দেশে, সারি সারি বুদ্ধদেবের মত প্রশান্ত ছবি, তাহা যতই নিপুণ-হস্ত ও সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক হউক না কেন, তাহা ভাল লাগিবে কেন? বাঙ্গালী হয়ত এককালে বৌদ্ধমূর্ত্তির প্রশান্ত ভাব পছন্দ করিত, কারণ তাহাতে আধ্যাত্মিক ভাব ছিল, সে যুগ চলিয়া গিয়াছিল। মোগল-শিল্পের অন্য এক সম্পদ্ সূক্ষ্ম রেখাঙ্কন; মানুষের মুখ ও শরীর-অঙ্কনে তাহা এত সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দেখাইয়াছে যে, ছবি দেখিলে মনে হয়—ছবি মানুষ হইতে সুন্দর। ভোগবিলাসের রাজা সাহেন সা

বাদশাহাদের অন্দর মহলে ছবি যাইবে, বেগম, বাদসা, নবাব ও রাজপুরুষদের ছবি আঁকিতে হইবে, চিত্রকর তুলি ধরিয়া রং ঘষিতে ঘষিতে বর্ণের ভিতর এরূপ পরিমার্জ্জনা, এরূপ অলৌকিক লাবণ্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে যে, তাহার সমকক্ষতা করা সহজ নহে। চিত্রকর জানে, ছবিখানি ভাল হইলে তাহার আজীবনের ভরণপোষণের ব্যবস্থা হইয়া যাইবে, বিশ্রী হইলে হয়ত তাহার মুণ্ড যাইবে—এইজন্য নুরজাহান, মমতাজ, জাহাঙ্গীর, সাজাহান প্রভৃতির ছবি হাতীর দাঁতের উপর আঁকিতে যাইয়া তাহারা যত্নের কোন ত্রুটি করে নাই। এক কথায় বলিতে গেলে তাহারা প্রাণপণ করিয়াছে। কিন্তু এত যত্নের আঁকা ছবি কি সেই আধ্যাত্মিক সম্পদ দিতে পারিবে, যদ্দারা হিন্দু বা বৌদ্ধ শিল্পী কোন দেবতা বা দেবপ্রতিম ব্যক্তির মূর্ত্তিতে সেই দেবত্ব পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে? দৃষ্টান্ত স্থলে বুদ্ধের সেই অনির্ব্বচনীয় মূর্ত্তির কথা বলা যাইতে পারে, যাহাতে অজান্তাগুহা উজ্জ্বল হইয়া আছে—যেখানে কুলরমণী ভিক্ষা দিতে আসিয়া মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার শিশুপুত্রের হাতে ভিক্ষাভাণ্ড, সেই অলৌকিক প্রভাসম্পন্ন ব্যক্তিকে দেখিয়া শিশু ভুলিয়া গিয়াছে; ভিক্ষা দেওয়ার কথা যেন মনে নাই; কিংবা চৈতন্যদেবের গঙ্গার কূলে সেই অপূর্ব্ব নৃত্যের ছবিখানি, যাহাতে তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া মাঝি লগি হাতে দাঁড়াইয়া আছে—নৌকা বাহিতে ভুলিয়া গিয়াছে, নৌকার স্বামীর হাতের হুঁকা হইতে কল্কে পড়িয়া গিয়াছে, তাহার হুঁস নাই; অথবা কাঠের উপর সেই অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি—যাঁহার মাথার মুকুট মাতৃগরিমার দ্যোতনা করিতেছে, অঙ্কস্থিত শিশুর স্তন্যদানের সময়ে তাঁহার ভাবগম্ভীর মুখে স্নেহের মহিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মোগল আর্ট অত সুচিন্তিত, অত সুদক্ষ কারিগরী ও সাবধানতার পরিচায়ক হইয়াও কি ভক্তের বা সাধকের একটানে অবলীলাক্রমে আঁকা ছবির সমকক্ষতা করিতে পারিয়াছে? শুক্রনীতি মানুষের ছবি আঁকিতে নিষেধ করিয়া শুধু দেবতার ছবি আঁকিতে উপদেশ দিয়াছে; কেন এই নিষেধ-বিধি তাহা পূর্ব্বোক্ত বিষয়টি আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। সকলেই অবগত আছেন আরঙ্গজেবের অত্যাচারে আগ্রার শিল্পীরা রাজধানী ত্যাগ করিয়াছিল। হ্যাভেল সাহেব বলিয়াছেন—তাহারা রাজপুতনায় যাইয়া রাজাদের আশ্রয় লইল। এইখানে তাহারা যে সকল ছবি আঁকিয়াছে তাহা কতকটা মোগল-শিল্পের পরিচ্ছন্ন ভাব ও কতকটা হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা বজায় রাখিয়াছে। মানসিংহের পর হইতে রাজপুতনার সঙ্গে বাঙ্গালীদের একটু বেশী মেশামিশি হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে সংগ্রামসিংহ একেবারে বাঙ্গালীর সঙ্গে মিশিয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছিলেন। স্বয়ং মানসিংহ কুচবেহারের রাজকন্যা এবং কেদার রায়ের কন্যা বিবাহ করেন, ইহা ছাড়া তিনি বঙ্গদেশ হইতে আরও অনেক রমণী লইয়া গিয়া অন্দরমহলে পুরিয়াছিলেন। মোগল বাদশাগণ প্রায়ই বহু বিবাহিত পত্নী ও বহু উপরাজ্ঞী অন্দরমহলে রাখিতেন, মানসিংহ এ বিষয়ে তাঁহার প্রভুদের অনুকরণ করিয়াছিলেন। সনাতন ও জীবগোস্বামীর কৃপায় রাজপুতনার অনেক রাজা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গলাদেশ হইতে ব্রাহ্মণ লইয়া গিয়া পুরোহিত নিযুক্ত করিতেন, এইভাবে

রাজপুত-শিল্প।

রাজপুত-শিল্প বাঙ্গলাদেশে প্রবেশ করিয়াছিল। এই শিল্পের নমুনা বাঙ্গলায় যাহা পাই, তাহা একের উপর অন্যের প্রভাব বিস্তার করার প্রমাণ ছাড়া সৌন্দর্য্যের আদর্শ হিসাবে খুব উচ্চ মূল্যের যোগ্য বলিয়া মনে হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জয়পুরের শিল্প বাঙ্গলা চিত্রশালার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। জয়পুরী কৃষ্ণ অত্যন্ত মহিমা-সহকারে ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া বাঁশীহাতে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন—তাঁহার সহিত বঙ্গের সুচিরসম্পদ্—মাধুর্য্যের সম্পর্ক অল্প। রংএর খেলায় জয়পুরী চিত্রকর সিদ্ধহস্ত—তাহাদের ছবিগুলি কমনীয়তা মাখানো, লাবণ্যপূর্ণ বর্ণসংযোগে বেশ চিত্তাকর্ষক। কিন্তু খাঁটী বাঙ্গলা চিত্রের লীলাচঞ্চল প্রাণের খেলা তাহাতে অল্প।

কাঙ্গড়া কলম।

কাঙ্গড়া কলমের চিত্র এখানে উল্লেখযোগ্য। আমরা উল্লেখ করিয়াছি পাঞ্জাবের উত্তর-পূর্ব্বসীমায় হিমালয়ের উপত্যকাপ্রদেশস্থ কতকগুলি রাজ্যের অধীশ্বর আপনাদিগকে সেন-রাজবংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কাশ্মীর, পুঞ্চ, সুকেত, মণ্ডী এবং কুল্লার রাজবংশের প্রাচীন তালিকায় দৃষ্ট হয় যে গৌড়ের লক্ষ্মণসেনের বংশধর সুরসেন ১২৫৯ বিক্রম সংবৎসরে মুসলমানকর্ত্তৃক গৌড়দেশ হইতে তাড়িত হইয়া প্রয়াগে গিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত দেশগুলির অধীশ্বরেরা সুরসেনের পুত্র রূপসেনের বংশধর। * যখন রাজন্যবর্গের বংশতালিকায় একথা উল্লিখিত আছে, তখন আমাদের তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। পাঞ্জাব গেজেটিয়ার উক্ত রাজগণের যে বংশতালিকা দিয়াছেন, তাহাতেও এই কথা পাওয়া যায় এবং পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ কর্ম্মবীর স্বর্গীয় রামভুজ দত্ত চৌধুরী মহাশয়ের স্ত্রী বঙ্গের বিদুষী কন্যা সরলা দেবী তথা হইতে এই বংশাবলী সঠিক জানিয়া আসিয়াছেন। ১২৫৯ বিঃ অব্দ, ইংরেজী ১২০২ খৃঃ অব্দ, এই সময়েই লক্ষ্মণসেন মুসলমানের আক্রমণে বিব্রত হইয়া পড়েন, তিনি তখন অতি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং গৌড়ের শাসনভার তৎপুত্র কেশবসেনের উপর ন্যস্ত ছিল। কেশবসেনের সঙ্গে মুসলমানদের যে যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ কোনস্থলে পাওয়া যায় না। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে পিতা নবদ্বীপ হইতে চলিয়া গেলে কেশব শত্রুদিগকে সহজে গৌড়ে প্রবেশ করিতে দেন নাই। সেই হৃতরাজ্য রাজগণের ইতিহাস কোন দেশীয় লোক লিখিয়া যান নাই। ১২০২ খৃঃ অব্দে সুরসেন মুসলমানকর্ত্তৃক গৌড় হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন, ইনি কেশবসেনের পুত্র হওয়াই সম্ভব। যদি তাহাও না হয়, তবে তিনি যে লক্ষ্মণসেনের পৌত্র ছিলেন—তাহা সহজেই অনুমিত হয়। লক্ষ্মণসেন উত্তর-ভারতে "হিন্দুধর্ম্মের খলিফা" বলিয়া স্বীকৃত ছিলেন। মুসলমানকর্ত্তৃক উত্তর-ভারত-বিজয়কালে যে বঙ্গদেশের রাজা একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন এমন মনে হয় না। তাহা হইলে এতগুলি পার্ব্বত্য প্রদেশে লক্ষ্মণসেনের বংশধরেরা কখনই রাজ্যপদ পাইতেন না। খুব সম্ভব সুরসেন হিন্দু-মুসলিম সমরে উত্তর-ভারতে কোন না কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কিংবা নিপীড়িত হিন্দুদের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন—নতুবা

* রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড (২০-২১ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

কোনরূপ কৃতজ্ঞতা বা কৃতিত্বের পরিচয়-প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত না পাইলে সহজে স্বরাজ্য-তাড়িত রাজকুমারকে পার্ব্বত্যদেশের হিন্দুরা রাজপদে বরণ করিয়া লইবে কেন? মঃ ইব্‌ন বক্তিয়ার খিলজী শুনিয়া আসিয়াছিলেন আর্য্যাবর্ত্তে লক্ষ্মণসেন অপর সকল রাজার ধর্ম্মগুরু ছিলেন। সম্ভবতঃ এই আভিজাত্যের ফলে এবং সুরসেনের রণনৈপুণ্য কিংবা অপর কোন মহৎ গুণের পরিচয় পাইয়া ভূস্বর্গ কাশ্মীর ও অপরাপর দেশের লোকেরা মুসলমানকর্ত্তৃক নিহত পূর্ব্বরাজগণের বংশধরের অভাবে, ইহার পুত্রগণকে স্বীয় স্বীয় রাজ্যের অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। রাজা হইয়া ইহারা অবশ্যই ঐসব দেশে বাঙ্গালী ভাস্কর ও বাঙ্গালী চিত্রকর লইয়া গিয়াছিলেন। শিল্পবিদ্‌গণ যাহাকে "কাঙ্গড়া কলম" নাম দিয়াছেন, তাহা খুব সম্ভব "বাঙ্গলা কলম।" বাঙ্গালী চিত্রকরেরাই এই চিত্রশালার প্রতিষ্ঠাতা। তাহা না হইলে কালীঘাটের প্রাচীন চিত্রপটগুলির সঙ্গে কাঙ্গড়া চিত্রপটের এরূপ আশ্চর্য্য সাদৃশ্য কেন হইবে? আমরা একখানি মহাদেবের চিত্রে ও পরীর চিত্রে এবং অপরাপর কালীঘাটের চিত্রে যে অদ্ভুত লীলায়িত কালীর রেখাঙ্কন দেখিয়াছি, কাঙ্গড়ার অনেক চিত্রে ঠিক তাহাই আছে। বাঙ্গালী চিত্রকরের কালীর রেখাগুলি সুস্পষ্ট ও তাহাদের বঙ্কিমত্ব কাঙ্গড়ার ঐরূপ রেখাঙ্কন হইতে স্পষ্টতর। কাঙ্গড়ার সমীপবর্ত্তী দেশগুলির রাজপুত কি মোগল-শিল্পে কৃষ্ণ-রেখার এই লীলায়িত ভাব আদৌ নাই।

কাঙ্গড়ার চিত্রগুলির গণতন্ত্রতাও বাঙ্গালী চিত্রের অনুকূল। মোগলচিত্রের বাদসাহী ভাব এবং রাজপুত চিত্রের দেবভাবের প্রাধান্য কাঙ্গড়ার চিত্রে নাই। রাজপুত চিত্রের দেবতারা আসন জুড়িয়া বসিয়া থাকেন, তাঁহারা খুব সুন্দর হইলেও নড়াচড়াটা তাঁহাদের স্বভাববিরুদ্ধ। কাঙ্গড়া ও বাঙ্গলার চিত্রে যে গতিশীলতা আছে—তাহা অনেকটা একরূপ। মোগলদের কতকগুলি চিত্রে বিশেষ একটা শিকার-চিত্রে গতি সূচিত হইয়াছে—কিন্তু সে গতিও যেন একটু সম্ভ্রমাত্মক। হরিণেরা ছুটিয়াছে—ক্ষিপ্রগতিতে, কিন্তু যে চাহনী তাহারা পশ্চাতে নিক্ষেপ করিতেছে তাহাতেও যেন শিকারী রাজকুমারের প্রতি একটা বিস্ময়বিমুগ্ধ আবেশ আছে। কাঙ্গড়ার বৈষ্ণব চিত্রগুলি বাঙ্গালীর হাতের ছবির ন্যায়। এই চিত্রকরদের পূর্ব্বপুরুষেরা বাঙ্গলার লোক—এই ধারণার অনেক কারণ আছে। ১৯২১ সনের 'রূপম্' পত্রিকায় প্রকাশিত কাঙ্গড়ার একখানি স্বাধীনভর্ত্তৃকার ছবি লাহোর মিউজিয়ামে আছে। ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইনস্পেক্টর এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল, এম. এ. মহাশয় তাঁহার "ভক্তপ্রবর মহাকবি সুরদাস" নামক পুস্তকের ভূমিকায় (।৴ পৃষ্ঠায়) সেই ছবিখানি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"এই ছবিতে বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিগণের গীতের ভাব এত সুস্পষ্ট যে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না।" বাঙ্গালীর সঙ্গে আর্য্যাবর্ত্তের অপরাপর দেশের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বা মেশামেশি ছিল ইতিহাসে তাহা উল্লিখিত হয় নাই। বৃন্দাবনে রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামীরা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নানা ভাবে [illegible] করিয়াছিলেন। গোবিন্দদাস তাঁহার পদ রচনা করিয়া জীব গোস্বামীর নিকট বৃন্দাবনে পাঠাইতেন। ঐ পদগুলি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট বড়ই উপাদেয় মনে হইত। ব্রজবুলিতে লিখিত হওয়াতে

তাহা বৃন্দাবনে গাওয়া হইত। বঙ্গীয় কবি ও চিত্রকরেরা বাঙ্গালীকর্ত্তৃক নবভাবে সৃষ্ট বৃন্দাবন তীর্থে নিশ্চয়ই যাতায়াত করিতেন। কাঙ্গড়ার চিত্রগুলির উপর বাঙ্গালীর এরূপ বেশী প্রভাবের কারণ সহজেই অনুমান করা যায়।

বৌদ্ধযুগে শিক্ষা সার্ব্বজনীন ছিল। যে কোন জাতির লোক শ্রমণ হইতে পারিতেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু সর্ব্ববর্ণের মধ্যে দৃষ্ট হইত। বৌদ্ধ-সংস্কারগুলি কতক পরিমাণে এখনও বৈষ্ণব-দিগের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। যে কোন জাতি এখনও বৈষ্ণব হইতে পারেন। মুসলমানদের জন্যও তাঁহারা অর্গল বন্ধ করিয়া রাখেন নাই। চৈতন্য-যুগের কথা ছাড়িয়া দিলে পরবর্ত্তী যুগেও এই উদারতা অনেক পরিমাণে বজায় ছিল এবং এখনও আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে গঙ্গারাম মৈত্র নামক কুলীন ব্রাহ্মণ এক মুসলমানী ও তাহার ভ্রাতা আবদুলকে বৈষ্ণব করিয়া ভূষণা ও রূপদয়াল নাম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা লইয়া বৈষ্ণব সমাজে কোন বিশেষ গোলমাল হয় নাই। (সামাজিক ইতিহাস, ১৫৪ পৃঃ) মুসলমান হরিদাস, মুসলমান-ভাবাপন্ন এবং সম্পূর্ণরূপে জাতিচ্যুত রূপ-সনাতন বৈষ্ণব-সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন। মুসলমান সেনাপতি এবং আরবী পারসী প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিজলী খাঁ, শ্রীবাসের বাড়ীর মুসলমান দরজী প্রভৃতির বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ চৈতন্য প্রভুর সময়েই তাঁহার প্রভাবে ঘটিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শ্যামানন্দ ধারেন্দা-বাহাদুরপুর নামক স্থানে শের খাঁ নামক শক্তিশালী মুসলমান দস্যুকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। নিম্নজাতি বৈষ্ণবদলে এত ঢুকিয়াছিল যে, তাহারাই এখন 'জাত-বৈষ্ণব' দলের প্রধান শক্তি। সহজিয়া বৈষ্ণবদলে হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান সর্ব্বজাতির একটা উৎকট সমন্বয় হইয়াছিল। সমাজের নিম্নস্তরে সহজিয়ারা বৌদ্ধ-সংস্কার এখনও বজায় রাখিয়াছে। সহজিয়াদের গুরু অনেকেই মুসলমান ছিলেন। ঢাকা জেলায় রোয়াইল গ্রামের নিকট খারার বাসী পঞ্চুফকির মুসলমান—শত শত হিন্দু তাঁহার শিষ্য। সহজিয়াদের সাহেব-ধনী সম্প্রদায়ের গুরু ছিলেন মুসলমান। তাঁহারই নামে সম্প্রদায়টির নাম হইয়াছে। কৃষ্ণনগরের নিকট সালিগ্রাম, দোগাছিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ইহাদের প্রধান আড্ডা। ইহারা জাতিভেদ একেবারেই মানেন না। হিন্দু ও মুসলমান এক থালায় বসিয়া খান। ইহারা বিগ্রহ পূজা করেন না এবং নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি এরূপ গাঢ়রূপে অনুরক্ত যে পরস্পরের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হইতে পারেন। দরবেশী সম্প্রদায় সনাতনকর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল এরূপ প্রবাদ আছে। রামকেলীর নিকট চৈতন্যের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর হুসেন সাহের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া পলায়ন-পর সনাতন কিয়ৎকালের জন্য দরবেশের ছদ্মবেশ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এই হেতুতে প্রবাদটির উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। দরবেশী সম্প্রদায়ের মূল শিক্ষা—"কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান। মিল-জুলকে কর সাঁইজীকো নাম।" (হিন্দুই কি মুসলমানই বা কি, একত্র মিলিত হইয়া সাঁইজীর নাম কর) এখানে সাঁইজী শব্দ দ্বারা সনাতন গোস্বামীকে বুঝাইতেছে। (সাঁইজি গোঁসাইজি শব্দের অপভ্রংশ)। হজরতি সম্প্রদায়ের নেতা হজরতের বাড়ী ছিল

সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়-চেষ্টা ও সহজিয়া।

বাঁশবেড়িয়া। পাগল নাথী ও গোবরা সম্প্রদায়ের উক্ত নামধেয় নেতৃদ্বয়ও মুসলমান ছিলেন। প্রথমোক্তের বাড়ী মুরাদপুর এবং দ্বিতীয়টীর নিবাস ছিল নাগদা গ্রামে। রামবল্লভী-সম্প্রদায় জাতিভেদ অগ্রাহ্য করিয়াছেন ; তা ছাড়া প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে তাঁহারা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের কতকটা চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের একটি গান এইরূপ "কালী-কৃষ্ণ-গড-খোদা, কোন নামে নাহি বাধা, বাদীর বিবাদ দ্বিধা, তাতে নাহি টল। মন কালী-কৃষ্ণ-গড-খোদা বল রে।" ইহারও পূর্ব্বে বঙ্গের ভক্ত কবি গাহিয়াছিলেন, "মগে বলে ফারা, তারা, 'গড' বলে ফিরিঙ্গী যারা খোদা বলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজি।" নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ঔদার্য্য এবং সম্পূর্ণরূপে সংস্কারশূন্যতা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

একদিকে সমাজের স্কন্ধারূঢ় হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যেরূপ সামাজিক শাসন অতি উৎকট ভাবে কড়া করিয়া গড়িতেছিলেন, অপরদিকে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা শাস্ত্র না জানিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া দলের পর দল গঠন করিয়াছেন। ইঁহারাই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধনীতির সারোদ্ধার করিয়া বাঙ্গলার সমস্ত দ্বারগুলি সুখকর - স্বাস্থ্যদায়ী অনাবিল ভাবপ্রবেশের জন্ত মুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে মালাপাড়া গ্রামে বলরাম হাড়ী-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম জীবনে চৌকিদারী করিতেন। কিন্তু একসময়ে তিনি চৌর্য্য অপরাধে অভিযুক্ত হন, মেহেরপুরের (নদীয়া জেলায়) মল্লিক বাবুদের সরকারে ইনি কাজ করিতেন। অভিযোগ টিঁকিল না,—কারণ বলরাম নির্দ্দোষ ছিলেন। কিন্তু এই অভিযোগের পর তিনি ঘৃণায় চাকুরী ছাড়িয়া দিলেন। বহুবৎসর তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থানে ঘুরিয়া যখন দেশে আসিলেন, তখন লোকে তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া মানিতে লাগিল। তিনি পাগলের মত থাকিতেন, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন সকল কথা বলিতেন—যাহা লোকের মর্ম্মে তীরের মতন যাইয়া প্রবেশ করিত ; ব্রাহ্মণেরা পর্য্যন্ত তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধে গভীর তত্ত্বকথা শুনিতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। একদা কয়েকজন ব্রাহ্মণ নদীতীরে দাঁড়াইয়া তর্পণ করিতেছিলেন, তাঁহারা জল নদীতে নিক্ষেপ করিতেছিলেন।

বলরাম হাড়ী।

ঐ সময়ে বলরাম গঙ্গার জল লইয়া নদীর পাড়ের দিকে ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন। এরূপ করার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "তোমাদের তর্পণের জল যদি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পাইতে পারেন, তবে আমার নিক্ষিপ্ত জলই বা আমার শাকসব্জীর বাগানে যাইবে না কেন, উহাতো মাত্র কয়েক ক্রোশ দূর বই নয়।" খুসী বিশ্বাসী দলের নেতা মুসলমান ছিলেন, তিনি বলিতেন "তোমরা কষ্টে পড়িলে আমাকে প্রার্থনা জানাইও, আমার যদি কেহ থাকে তবে আমি তাঁহাকে জানাইব।" এই সহজিয়া সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান দলের স্থাপয়িতা বাবা আউল

বাবা আউল।

১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে নীচকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার ২২ জন শিষ্য ছিল। তাহাদের মধ্যে রামশরণ পাল, নিতাই ঘোষ প্রভৃতি প্রধান। ইহার সম্বন্ধে এই সম্প্রদায়ে একটি চলিত গান আছে, তাহা এই "এভাবের মানুষ কোথা হইতে এলো। এর নাহিক রোষ, সদাই তোষ, মুখে বলে সত্য বল॥ এর সঙ্গে বাইশজন, সবার একমন, জয়কর্ত্তা বলি,

বাহু তুলি, করে প্রেমে ঢল ঢল। এযে হারা দেওয়ায়, মরা বাঁচায়, এর হুকুমে গাঙ্ শুকালো॥" বস্তুতঃ সহজিয়া দলের প্রায় সমস্ত ব্যক্তিই তাহাদের গুরুদের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন। আমরা তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্মপ্রসঙ্গে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সময়কার নানা শ্রেণীর মত সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা করিয়াছি, তদ্দ্বারা স্পষ্টই দৃষ্ট হইবে—বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভাঙ্গা দল বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়িয়া এই সহজিয়াদের নানাদলের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহারা সামাজিক বা ধর্ম্মের চিরাগত সংস্কারের কোনটিই মানে নাই, ইহাদের চিন্তাশীলতার গতি অবাধ। ইহারা সামাজিক অনুশাসনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে নাই এবং সময়ে সময়ে এরূপ উচ্চাঙ্গের তত্ত্বকথা এত সংক্ষেপে কহিয়াছে যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ও সেই সকল কথা শুনিলে ভড়্কাইয়া যাইতে পারেন। স্ত্রীলোকের সতীত্বসম্বন্ধে ইহারা সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ মানে নাই। আমাদের সমাজে পতিব্রতার জন্য যে স্বর্গলোক পরিকল্পিত হইয়াছে এবং জনসাধারণ পাতিব্রত্যের যে উচ্চ মূল্য দিয়া থাকে, সহজিয়ারা তাহা দিতে সম্মত নহে। তাহাদের মতে সাধ্বীর তথাকথিত একনিষ্ঠ প্রেমের মধ্যে কতটা পরকালের সুখ-কামনা ও ইহকালের লোক-খ্যাতির আশা হইতে সঞ্জাত, তাহা জানিবার উপায় নাই; হিন্দুর সংস্কার-জাত সতীত্ব এতটা মিশ্র ভাবের মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছে, এজন্য তথাকথিত সতীত্ব বা দাম্পত্য ভাব—প্রেমের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ যাচাই করিবার জন্য বিচার-সহ কষ্টিপাথর নহে। "বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে"র প্রথম ভাগের ভূমিকায় 'জ্ঞানাদি সাধন' হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় ইহাদের ভগবান্ সম্বন্ধে ধারণাও একেবারেই কোন সংস্কারাধীন নহে—উহাতে চিন্তার যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-শক্তি দেখা যায় তাহা নৈয়ায়িক পণ্ডিতের মত। সমাজে জাতিভেদ প্রভৃতির সংস্কারের ইহারা কোন ধার ধারে না। ইহারা প্রকাশ্যভাবে কোন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে নিজের দলে টানিয়া আনিয়া তাহার কপালে স্বীয় সম্প্রদায়ের ছাপ মারিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে না। অথচ ইহাদের দলের লোক, খৃষ্টান হউক, মুসলমান হউক, ব্রাহ্মণ হউক, দলের নেতার প্রতি এতটা অনুরক্ত যে জগতে তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও মানে না, তাঁহার এক কথায় অবলীলাক্রমে প্রাণ দিতে পারে। কর্ত্তাভজাদের নেতা বাবা আউল বা আউল চাঁদ পরবী নামক গ্রামে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে স্বর্গগত হন। রামশরণ এবং বাবার আর সাত শিষ্য তাঁহার দেহ পরবী গ্রামে (চক্রদহ হইতে ছয় মাইল পশ্চিমে) শ্মশানে ভস্মীভূত করেন। বাবা আউলের পরলোক-গমনের পরে, রামশরণ পাল গদীর অধিকারী হইয়া নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই দলে খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দু আছে এবং যদিও নরনারীর অবাধ মিলনে কোন বাধা নাই তথাপি ইহাদের নীতি অতি উচ্চ। ইহাদের একটি অনুশাসন এইরূপ "স্ত্রী হিজড়ে, পুরুষ খোজা, তবে হবে কর্ত্তা ভজা।" কর্ত্তাভজা লাল শশীর গানগুলি 'সন্ধ্যাভাষায়' লিখিত, তাহা দুর্ব্বোধ, কিন্তু কতকগুলি বোঝা যায়। সহজিয়াদের একটি গান—"তুফান আসছে কষে, জলে জল যাবে মিশে, মাঝি হাল ধর কষে। আবার যাঁহা নৌকা, তাঁহা তুফান, নৌকা রাখ কি কারণ! ওরে মাঝি দাঁড়িয়ে শোন। মাজি সত্য বাদাম দও, ধীরে ধীরে বাও, তুফান পানে কেন চাও, হাল ধরেছে নিরঞ্জন।" মানুষ এখানে মাঝি,—দাঁড় বাহিবার তাহাকে ক্ষমতা দিয়াছেন

ভগবান্, কিন্তু কোন্‌দিকে নৌকা চলিবে, তাহার নিয়ন্তা ভগবান্ স্বয়ং হাল ধরিয়া আছেন। অর্থাৎ পুরুষকারের কিছু ক্ষমতা আছে—তাহা দাঁড় বাহা পর্য্যন্ত, কিন্তু দৈবই নিয়ন্তা; যে ক্ষমতাটুকু আছে, তাহা ব্যবহার না করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা উচিত নহে। আর মানব-জীবনরূপ তরণী, তাহা তো তুফানের মধ্যে চলিবেই, কোন নৌকা এমন নাই, যাহা তুফানের হাতে পড়ে নাই। তুফানের দিকে লক্ষ্য করিতে নাই, তাহা হইলে ভয় পাইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িবে। তুফানে নৌকা চালাইবেন যিনি তিনি তো কর্ণধার—হাল ধরিয়া আছেন, উঁহাকে বিশ্বাস করিয়া তুমি দাঁড় বাহিয়া যাও। উপনিষদের "স ন বন্ধুর্জনয়িতা স এব বিধাতা" পদের ভাব গানের শেষ ছত্রটিতে স্পষ্ট।

সন্ধ্যাভাষা।

সহজিয়াদের অনেক কথাই 'সন্ধ্যাভাষায়' লিখিত, এই ভাষাভিজ্ঞ ভিন্ন কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। শব্দের সাধারণ যে অর্থ, অনেক সময়ে সন্ধ্যাভাষায় তাহা ভিন্নার্থ-বোধক। সহজিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলে তাহারা সে সকল কূট অর্থ কাহাকেও বলিবে না। সমস্ত ধর্ম্ম ও সমাজের সংস্কারগুলি পদদলিত করিয়া যে সকল মত অসামান্য মৌলিকতা দেখাইয়া অতিরিক্ত সাহসিকতার সহিত কথিত হইয়াছে তাহা সাধারণ লোক শুনিলে বিদ্রোহী হইবে—এজন্য সহজিয়ারা সন্ধ্যাভাষার সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছিল। "সে দেশের কথা, এ দেশে কহিলে, লাগিবে মরমে ব্যথা"—চণ্ডীদাস।

বাঙ্গলার তথাকথিত নিম্নশ্রেণী।

বাঙ্গলাদেশের সহিত পরিচয় যতই ঘনিষ্ঠ হইবে, ততই নিম্নশ্রেণীর প্রতি শ্রদ্ধা বেশী হইবে। আমরা বারংবার বলিয়াছি—ইহারা আমাদের জাতির নিজস্ব ভাব বজায় রাখিয়াছে। উর্দ্ধতন পর্য্যায়ে বিদেশীর প্রভাবের ঝড়,—পাণ্ডিত্যের দর্প, সংস্কারের বোঝা, এবং নানারূপ আবর্জ্জনা জুটিয়া সমস্ত প্রশ্ন জটিল ও দুরূহ করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু নিম্নে শ্যামলশস্যপূর্ণ—নিত্য সজীব তরু-গুল্মময় সবুজ পল্লী—এখানেই বঙ্গলক্ষ্মী তাঁহার ধন-ভাণ্ডার রাখিয়াছেন। এখানেই বঙ্গের চারুশিল্প—অজান্তার শেষ চিহ্ন, এখানেই নিরক্ষর কবির অপূর্ব্ব পল্লী-গীতি, রায়বেঁশে, বাউল ও বৈষ্ণব নৃত্য, এখানেই সহজিয়ার সুনির্ম্মল অদ্বিতীয় প্রেমের আদর্শ—কিছুদিন পূর্ব্বেও ছিল। পাশ্চাত্য বন্যায় আজ সেই রত্নভাণ্ডার চলিয়া যাইবার পথে। যদি বাঙ্গলার পল্লী-গীতিকা, মনোহর সাই কীর্ত্তন, সহজিয়ার আদর্শ প্রেম, রায়বেঁশে নাচ, পল্লীর শিল্পকলা চলিয়া যায়, তবে বাঙ্গলার ভৌগোলিক তত্ত্ব জানিয়া আমরা কি করিব? বাঙ্গলাদেশ তো তাহা হইলে লুপ্ত হইল! কতকগুলি গিল্টী করা বিদেশী শিক্ষার ফলে এদেশের কি গৌরব থাকিবে? যাহা বিদেশের নকল, তাহা তো নকল ছাড়া কিছুই নয়। জগতের শিক্ষা-দীক্ষায় বাঙ্গালীর যে সকল অসাধারণ দান ছিল—তাহা লুপ্ত হইলে বাঙ্গলাদেশকে অন্য যে নাম দাও, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু "বাঙ্গলা [illegible]নার বাঙ্গলা" নাম দিয়া সেই পবিত্র নামের অবমাননা করিও না।

বিদেশী শিক্ষা-সঞ্জাত উপেক্ষা ও ঘৃণায় এই কিঞ্চিৎ অধিক [illegible]র মধ্যে বাঙ্গলার

শৌর্য্য-বীর্য্য, শিল্প, চিন্তাশীলতা প্রভৃতি সমস্ত লুপ্ত হওয়ার মধ্যে আসিয়াছে। সহজিয়াদের বিপুল সাহিত্য—যাহা এখনও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট কিছু কিছু পাওয়া যায়,—তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায়, রামমোহন ও কেশব ধর্ম্মসম্বন্ধে নূতন কথা কিছুই বলেন নাই।

বাঙ্গলার পল্লীবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ নিরক্ষর থাকিলেও তাহাদের শিক্ষার অভাব কোন কালেই হয় নাই। আকবর লিখিতে পড়িতে জানিতেন না। আমাদের দেশে আর্য্যগণ পূর্ব্বকালে মুখে মুখেই বেদ-বেদান্ত আবৃত্তি করিতেন। পুস্তক লেখা ও পড়ার পাঠ বৈদিক যুগে কমই ছিল। মনে ও স্মৃতিতে তাঁহারা জগতের সকল তত্ত্ব গাঁথিয়া রাখিতেন। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা অর্থ—সমস্ত জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া চরিত্রের অঙ্গীভূত করা, জ্ঞান শুধু লিপি-পরিচয়-প্রচারের অপরিহার্য্য অঙ্গীয় বলিয়া অনেক সময়ে বিবেচিত হইত না। আমাদের দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা মুখে মুখে এখনও বড় বড় গণিতের সমস্যা পূরণ করিতে পারে—তাহাদের কতকগুলি এমনতর বাঁধা নিয়ম ছিল যাহাতে অতি সহজে তাহারা গণিতে এরূপ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারিত, যাহা অঙ্কশাস্ত্রে এম. এ. উপাধিধারীর পক্ষেও কষ্টসাধ্য। ১২৬৩ বাঃ সনের (১৮৫৫ খৃঃ অব্দের) হাতের লেখা একখানি শুভঙ্করী আমার নিকট আছে, তাহাতে গণিতের কতকগুলি সূত্র ও দৃষ্টান্ত আছে। আমি সকল স্থানে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, সুতরাং বুঝাইতে চেষ্টা করিব না, যেমন পাইয়াছি, নিম্নে তাহা তেমন ভাবেই উদ্ধৃত করিতেছি :—

সাগ্নাকশী (সাগ্নাকস্থ)—

(১) বিঘা প্রতি দর খণ্ডা, আড়ায় ধর সোলগণ্ডা
কুড়িয়া গণ্ডা লেখা জান মানে কড়া সমাধান
সেরে কাক বুঝ শিশু কহেন শুভঙ্কর সাগ্নাকস্থ।

(২) শুনহ কাএস্থ ভাই করি নিবেদন। শত গজ কিন্যা দেহ লেহ কিছু ধন। কার কার গণ্ডা কার ডেড় বুড়ি। সত গজ কিনে দেহ চার কো(ড়ি ?)।

আসামী	গজ	দর	নেট
বড় গজ	৫	৲৭৷৹	/১৭॥
মাজারি	২৫	৲১	/৫
ছোট গজ	৭০	।৹	৲১৭৷৹
	১০০	...	।৹

(৩) এক এক এগার মাথে। একশত শাক্রিতিশ দিআ তাথে॥ কি কড়ি পাতএ নাথ। পনের বাইসার সুন্নি শাত।

পাতন	১	১	১	১		
ভাগ	১৩৭					
	১	৫	২	২	০	৭

(৪) দুই দুই বাইস মাথে। কিবা ভাগ দিব তাতে॥
শুভ কহে ওহে তাত। পনের বাইশার সুন্নি সাত॥

পাতন	২	২	২	২		
ভাগ	৬৮॥০					
	১	৫	২	২	০	৭

(৫)

রাজা বলে অবধানে শুনরে কোটাল
শত তঙ্কাঅ শত পক্ষ আনহ ততকাল॥
কিনিবে সারস পক্ষ দুই টাকা দরে
অৰ্দ্ধতঙ্কা দিআ শুক কিনহ সত্তরে॥
শিকা শিকা পাঅরা, মঅনা তিন শিকা
কিনে আন শত পক্ষ দিয়া শত টঙ্কা॥

আসামী	...	জি	...	দর	...	নেট
সারস	...	৪২	...	২৲	...	৮৪৲
শুক	...	৪	...	॥০	...	২৲
পাঅরা	...	৫৩	...	।০	...	১৩।০
মঅনা	...	১	...	৵০	...	৵০
		১০০				১০০৲

(৬) টাকাঅ ছাগ শিকাঅ গাই। পাচ টাকাতে মোহিশ পাই। শঅ টাকাঅ শঅ জিব। বলে গেল সদাশিব॥

আসামী	...	জি	...	দর	...	নেট
ছাগ	...	২৪	...	১৲	...	২৪৲
মোহিশ	...	১২	...	৫৲	...	৬০৲
গাই	...	৬৪	...	।০	...	১৬৲
		১০০				১০০৲

(৭) তিন টাকায় ছাগ শিকায় গাই। আট আনাতে মোহিশ পাই॥ কুড়ি টাকায় কুড়ি জিব। বলে গেল সদাশিব॥

আসামী	...	জি	...	দর	...	নেট
ছাগ	...	৫	...	৩৲	...	১৫৲
গাই	...	১০	...	।০	...	২॥০
মোহিশ	...	৫	...	॥০	...	২॥০
		২০				২০৲

বোটকে আউটি

(৮) বটেক দুবট বটেক সাত। ছয় পাঁচ ছয় দিআ তাত॥ এগার হাজার ছশ আশী। ভাগ জাননে মুতে বশী।

পাতন	।০	॥০	১৸০	১॥০	১।০	১॥০
ভাগ	১১৬৮০					
	১১	১১	১১	০	০	

(৯) শুনি অশ্ব পাখা পাখা পাখা। রামচন্দ্র দিআ সখা॥ ঘোড়ার পৃষ্ঠে দিআ বাম। অষ্ট কোটার এই নাম।

পাতন	১	৫	২	২	০	৭
ভাগ	৫৮৪					
	১১	১১	১১	১১		

(১০) পন শশী পঞ্চম—শরগজ বাণ। নবছ নবছ রস বোম্ম পণ॥ অষ্টাদশ পণ বুড়ী দিজ্যে। আদি বিসম খোড়ি শিবরাম কিজ্যে॥

পাতন	৴০	৷৴০	৷৴০	॥০	৴০	॥৴০	॥৴০	।৶০	॥০
ভাগ	১৶৫								

(১১) নব কোঠার আরম্ভ্যা

এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়। সাত আট ছাড়া নয়॥ গিহ ভাগ দিআ জান। নবকোঠার জন্মস্থান॥

পাতন	১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৯			
ভাগ	৯			
	১১	১১	১১	১১

(১২) অষ্ট কোঠার আরজ্যা

চার চার চোআলিস যাথে। সওা চোত্তস দিআ তাথে
কি কড়ি পাত্তএ নাথ। পনের বাইশার ভুগ্নি সাত।

পাতন	৪	৪	৪	৪
ভাগ	৩৪।০			
১ ৫	২	২	০	৭

(১৩) বান বান বোঝ পণ। শোল গণ্ডা দিআ আন॥ বাণের ভাগে পুরি আন। মনি মুনি জন্মস্থান॥

পাতন	৫	৫	॥১৬
ভাগ	২		
২	১	৭	৫০

(১৪) মনি মুনি বাষে পাখা। তাহিনা বাব পণ দিআ। সথা শোল দিআ পুরি আন। চার চার জন্মস্থান।

পাতন	২	২	১	৫০
ভাগ	১৬			
	৪৪		৪৪	

(১৫) মাস মাহিনা

মাস মাহিনা জার জত। দিন তার পড়ে কত।
টাকা প্রতি ১০৷৷ = দশ গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি হঅ।
আনা প্রতি ॥ = দুই কড়া দুই ক্রান্তি শিবরাম কয়॥

(১৬) বৎসর মাহিনা

বৎসর মাহিনা জার জত। দিন তার পড়ে কত।
টাকা প্রতি ৫৫ তিন কড়া পাঁচ দন্তি হঅ।
আনা প্রতি দুই দন্তি শিবরাম কঅ॥

(১৭) বৎসর মাহিনা জার জত। মাস তার পড়ে কত। টাকা প্রতি ৴৬॥ = ছাব্বিশ গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি হঅ। আনা প্রতি ৷॥ = অষ্ট ক্রান্তি শিবরাম কঅ।

(১৮) সনা (সোনা) কেনা

সনা (সোনা) কিনিতে যখন যাবে। ছিআনই (ছিয়া[illegible]) রতিতে মোহর লবে। টাকা প্রতি ৩৴ তের কড়া এক ক্রান্তি হঅ। আনা [illegible] আড়াই ক্রান্তি শিবরাম কঅ।

(১৯) সনা (সোনা) কিনিতে জখন জাবে। সঙ্গ রত্তিতে মোহর লবে। টাকা প্রতি ৩৶৪ তিন গণ্ডা তিন কাক চার তিল হঅ। আনা প্রতি ৶৪ তিন কাক চার তিল শিবরাম কঅ।

(২০) চারি ধানে রত্তি হঅ, দশ রত্তিতে মাসা, দশ মাসায় তলা (তোলা) হঅ, সুন সত্যভাষা। চৌষট্টী তোলায় সের বত্তিস প্রমাণি। চোল্লিশ সেরে মন হঅ সর্ব্বলোকে জানি। পাঁচ সেরে পোশরি হঅ চারি সেরে বিশা। ইহাতে জানিলে খুচে অবোধের দিশা।

মাথতের আরজ্যা

(২১) জতেক তঙ্কার গ্রামে মাথত করিবে। তত গণ্ডা মাথতের তলে ভাগ দিবে। আসলে হরিলে অঙ্ক যত টাকা হঅ। টাকা প্রতি তত গণ্ডা শিবরাম কঅ।

আসল নফার আরজ্যা

(২২) লাভে মূলে যত পাই। বিকি-দরে কিন ভাই। কিনন-দরে হরে লবে। আসলের ঠিকানা পাবে।

বগড্য ধান কেনা

(২৩) ধান্য কিনিতে জাবে নিবে দর করে। আনা প্রিতি কুড়িতে দেড়পাই লবে ধরে। মনে লবে দেড় কনা পেঅ্যাচো ঠিকনা। আমঠি এক। শিবরাম দাশ কহে হিসাব করে দেখ।

(২৪) মনের করার জার সের পড়ে কত। টাকা প্রিতি অষ্টগণ্ডা হঅ লেখার মত। আনা প্রিতি ছুই কড়া শুন শিশুগণ। এই মত মনকরা শিবরাম কন।

(২৫) সেরের করার জার ছটাক পড়ে কত। টাকা প্রিতি এক আনা হয় লেখার মত। আনা প্রিতি পাঁচ কড়া গণ্ডাঅ কাক হয়। এই মত সেরকরা শিবরাম কঅ।

(২৬) সেরের করার জার তলা (তোলা) পড়ে কত। টাকা প্রিতি এক পাই হঅ লেখার মত। আনা প্রতি পাঁচ কাক শুন শিশুগণ। এই মত সেরকরা শিবরাম কন॥

ধান কেনার আরজ্যা

(২৭) তঙ্কা দিআ জত আড়া কিনিবে সে ধান। আড়া প্রিতি কুড়ি হঅ আনার প্রমাণ। কুড়ির প্রিতি সের হঅ পুশু ধর মানে। সেহেতে ছটাক ধান্য শিবরাম ভনে॥

মন করার আরজ্যা

(২৮) তঙ্কাঅ লইবে জত মন আশবাব। মনেতে আড়াই সের আনার হিসাব। জত সের থাকঅ ছটাক তত হঅ। ছটাকেতে আড়াই সের শিবরাম কঅ॥

(২৯) মনের করার জার পুঞ্জ পড়ে কত। তঙ্কা প্রিতি দুই গণ্ডা হঅ লেখার মত। আনা প্রিতি দুই কড়া শুন শিশুগণ। এই মত মনকরা ভিগু (ভৃগু) রাম কন॥

আনা মসার (মাসার ?) আরজ্যা

(৩০) কাহনে লইবে পন চোকে লবে বুড়ি। গণ্ডায় লইবে কাক পোনে পাচ কোড়ি॥ কড়াঅ লইবে পঞ্চ তিলের লিখন। আনা মসা কর শিশু আনন্দিত মন॥

গণ্ডা কোড়ির আরজ্যা

(৩১) কাহনে লইবে গণ্ডা করিয়া জতন। পনেতে লইবে কাক শুন শিশুগণ। গণ্ডায় লইবে তিল কড়াঅ ধুল হঅ। এই মত গণ্ডার কোড়ি শিবরাম কঅ।

জমাবন্দির আরজ্যা

(৩২) জমি বিঘা যত তঙ্কা করিবে বর্নন। তঙ্কা প্রিতি যোল গণ্ডা কাঠাঅ ধরন। জত আনা তত গণ্ডা পাই প্রিতি বট। গণ্ডা প্রিতি যোল তিল জানি অকপট। কড়া প্রিতি চারি তিল শুভঙ্কর ভনে। জমাবন্দি কর শিশু আনন্দিত মনে। *

(৩৩) তেরিজের আরজ্যা—"তেরিজ ধারণ কথা শুন শিশুগণ। দক্ষিণে কড়ার স্থান করিবে গণন। কড়া থুয়ে চাড়িকড়ায় গণ্ডা লবে হাতে। শতশুদ্ধ গণ্ডা থোবে দশক পশ্চাতে। দশকে দশকে পণ কমি হৈলে থোবে। পণে পণে এক কড়ি চৌথ ধরে লবে। চারি চৌকে টাকা হর তেরিজ লেখা কর। নরসিংহ রচয়ে ক্রমে এই অংশ ধর।

(৩৪) জমা-ওয়াশিলের আরজ্যা—"জমা ওয়াশিল বাকী শুন শিশু ভাই। জমা ছোট, খরচ বড় ফাজিল বলি তাই। জমা বড়, খরচ ছোট, বাকীদার হয়, জমা ওয়াশিল সমান হৈলে সাধু খালাস হয়।

(৩৫) দেউলের মাপ—আছিল দেউল এক পর্ব্বত প্রমাণ। ক্রোধ করি ফেলে দিল বীর হনুমান। অর্দ্ধেক পঙ্কেতে তার তিন ভাগ জলে। দশম ভাগের ভাগ সেহালার তলে। উপরে ৫২ গজ দেখি বিদ্যমান। সকলে কতেক শিশু কর পরমাণ।

(৩৬) আরজ্যা—বাণবট ঘৃতসের, আটা এক বটে। কড়ায় তিন সের চালু আইলের হাটে॥ দশ কড়া কড়ি দিয়া গেল সদাগর। পাঁচ সের দধি কেন ইহার ভিতর॥

(৩৭) রামচন্দ্র দ্বাপরেতে কৃষ্ণরূপ ধরি। চন্দ্রবদনে নিলেন মোহন মুরলী। ভুজে ধরি অষ্ট সখী বিহারয়ে বনে। বাণে বিদ্ধি হয়াসুর স্থিতি বৃন্দাবনে। ভুবন মোহিত হৈল যাঁর বাঁশী রবে। আছয়ে প্রকাশ চক্ষু দেখিবারে পাবে। গাঁথিয়া মুক্তার হার যদি দিবা

* ফিরিস্তি কাগজ বোই পঠনার্থে শ্রীকোকি(র) দাস সিমেস্তদার পরগনে খালাবাদ সাকিম বলরামপুর। সন ১২৬৩ সাল তারিখ ২৩ চৈত্র। [(১) হইতে (৩২) পর্য্যন্ত একখানি পুঁথি হইতে উদ্ধৃত।]

গণে। করহ ইহার সূত্র আপন বুদ্ধি বলে। দুইপাশে চন্দ্র হবে মধ্যে তারাগণ। তবে সে হইবে হার শুন সর্ব্বজন।

পাতন ১৪২৮৫৭১৪৩
৭৮৪৬৫২৭৮১
২১৫৩৪৭২২
১০০০০০০০০১

সাত দিয়া পুরিবে ৭

(৩৮) তঙ্কা প্রতি মোন যার হইবেক দর। তঙ্কা প্রতি অষ্টগণ্ডা সের প্রতি ধর। আনা প্রতি দুই কড়া গণ্ডায় অষ্ট তিল। শুভঙ্কর দাস কহে এই মত মিল।

(৩৯) তঙ্কা প্রতি মোন যার হইবেক দর। তঙ্কা প্রতি দুই কড়া ছটাক প্রতি ধর। আনা প্রতি দশ তিল গণ্ডায় অর্দ্ধেক কয়। শুভঙ্কর দাস কহে এই মত হয়।

(৪০) তৈল লবণ ঘৃত চিনি যাহা কিনিতে যাই। মোন দরে সেরে টাকায় অষ্ট গণ্ডা পাই। পোয়া প্রতি দুই গণ্ডা সেরে ছটাক জান। কহেন শুভঙ্কর শুন বালক বুঝান।

(৪১) ইন্দ্রের অমরাপুরে পারিজাত আছে। দিনে শত লক্ষ ফুল ফোটে সেই গাছে। এক এক ফুলের মূল্য সোয়া মন সোনা। চারি যুগে কত পুষ্প কত মোন সোনা। [ইহা একটা খুব দীর্ঘ পূরণের ব্যাপার—কিন্তু শিশুরা ইহা মনে মনে কষিতে পারিত। (১২ বৎসর = ১ যুগ)]

(৪২) মুনি গেলা তপস্যায় শূন্য ঘর করে। দুই পাখা গরুড় নিল বাণ কন্দর্পের ঘরে। পৃথিবীতে চন্দ্র নাই উদয় আকাশে। কোথা গেল পোনর বাইশ অঙ্ক হবে কিসে। গুরু অগ্নি বসু রাম রত্নাকর তায়। একাদশে পূরে নিল অষ্ট কোঠা হয়।”

পাতন ১৩৮৩৭
ভাগ পূরণ ১১
১৫২২০৭

এইরূপ আর্য্যা ও প্রশ্ন শত শত এখনও পাড়াগাঁয়ের অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের জানা আছে—কিন্তু কিছুকাল পরে এই বিদ্যা যাহা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার পক্ষে এখনও অপরিহার্য্য, তাহা একবারে নষ্ট হইবে। আর একটা কথা, অঙ্কের অসংখ্য পারিভাষিক শব্দ ছিল, তাহা বহুযুগ ধরিয়া দেশময় প্রচলিত ছিল, সেগুলি উপেক্ষা করিয়া আমরা মনগড়া শব্দ নির্ম্মাণ করিতেছি,—পদ্মার তীরে বসিয়া কূপ খনন করার বৃথা শ্রম করিয়া মরিতেছি। আমরা যাহাকে “পাটীগণিত” বলি, হিন্দুস্থানীরা তাহা তাঁহাদের পারিভাষিক ঠিক রাখিয়া “অঙ্কগণিত” বলেন। আমাদের মনগড়া “ক্ষেত্রতত্ত্ব”-শব্দ তাঁহাদের পারিভাষিকে “রেখাগণিত।”

শুভঙ্করী আর্য্যায় অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে, তাহা কৃপা করিয়া গণিতের অধ্যাপকগণ চক্ষু খুলিয়া একবার দেখিলে ভাল হয়; যথা—'হার্য্য', 'হারক', 'লব্ধ', 'হীন', 'হ্রস্বহরণ', 'দীর্ঘহরণ', 'পাতন ন্যাস', 'পর্য্যান্তাঙ্ক'। শুভঙ্করের আর্য্যার প্রাচীন পাতড়া হইতে এই গদ্যাংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—"তাহার বিবরণ এই, যে অঙ্ককে অঙ্কান্তর দ্বারা বিভাগ করা যায় তাহার নাম হার্য্য, এবং যে অঙ্ক দ্বারা তাহা হরণ করি তাহার নাম হারক, আর হরণ করিলে যে অঙ্ক পাওয়া যায় তাহার নাম লব্ধ। এবং হরণ করিলে অবশিষ্ট যে থাকে তাহার নাম হৃতাবশেষ।" এই পাতড়া-সাঙ্কেতিক অঙ্কসম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা আছে, তাহা আগে শিশু মাত্রই জানিত। এখন তাহার কতক কতক জানা থাকিলেও অনেক শব্দ দুর্বোধ হইয়া উঠিয়াছে। পাতড়া হইতে আর একটা অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

১=চন্দ্র, মহী, শশী, গুরু। ২=পক্ষ, কর, পাখা, ভুজ। ৩=নেত্র, রাম, লোচন, অগ্নি। ৪=বেদ, যুগ। ৫=বাণ, শর। ৬=মদ, ঋতু। ৭=সমুদ্র, অশ্ব, মুনি। ৮=বসু, গজ। ৯=গ্রহ, রন্ধ্র। ১০=দিক্। ১১=রুদ্র।

জমির মাপ—৮ যবে এক অঙ্গুলী; ৪ অঙ্গুলীতে এক মুট; ৩ মুটে এক বিগৎ; ২ বিগতে এক হাত; ৫ হাত দীর্ঘ ৪ হাত প্রস্থে এক ছটাক; ১৬ ছটাকে এক কাঠা; ২০ কাঠায় বিঘা; ১৬ বিঘায় এক খাদা। সময় নিরূপণ—১৮ নিমিষে ১ কাষ্ঠা, ৩০ কাষ্ঠায় এক কলা, ৩০ কলায় এক অনুপল (ক্ষণ), ৬০ অনুপলে এক পল, ৬০ পলে এক দণ্ড, ৭॥ দণ্ডে এক প্রহর, ৮ প্রহরে এক দিবারাত্র, ৭ দিবসে এক সপ্তাহ, ১৫ দিবসে এক পক্ষ, দুই পক্ষে এক মাস, দুই মাসে এক ঋতু, ছয় ঋতুতে এক বৎসর, ১২ বৎসরে এক যুগ, ৭১ যুগে এক মন্বন্তর।

গণিতের অনেক সূত্র নিম্নশ্রেণীর লোকের মুখে মুখে জানা ছিল। এজন্য তাহাদের কাগজ কলম লইয়া ধস্তাধস্তি করিয়া অঙ্ক কষিতে হইত না। তাহারা অতি জটিল হরণ-পূরণ, ও বাজার দরের সূক্ষ্মতম হিসাব মুখে মুখে করিতে পারিত। শ্রীমান্ সোমেশ বসু আমেরিকা, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে যাইয়া বড় বড় জটিল হরণ-পূরণ অতি অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যে বিশুদ্ধরূপে মুখে মুখে বলিয়া তথাকার মনীষী অধ্যাপকবৃন্দকে চমৎকৃত করিয়া দিয়া আসিয়াছেন। এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা কি যোগবলসম্ভূত? ভারতবর্ষে যোগবল অবিশ্বাস করা উচিত নহে। সেই বিশ্বাস আমাদের অস্থি-মজ্জাগত, কিন্তু তাহাতে এত ভেল চলিয়াছে যে, তাহা অনেক সময়ে বৈজ্ঞানিক বিচারসহ হয় না। হয়ত সে বিদ্যা জনসমাজে অনেক পরিমাণে লুপ্ত হইয়াছে এবং ভণ্ডদের প্রতারণা এই বিদ্যার উপর একটা অশ্রদ্ধার ভাব আনিয়াছে। কিন্তু বসুমহাশয়ের এই গণিতের অপূর্ব্ব সফলতা হয়ত বা প্রাচীনকালের অধুনাবিলুপ্ত সূত্রের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকিবে। মুখে মুখে সাধারণ লোকেরা এদেশে এরূপ আশ্চর্য্যভাবে গণিতের জটিল অঙ্ক কষিতে শিখিয়াছি[illegible] এখন লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। আমরা বার্নার্ড স্মিথ মুখস্থ করিয়াছি, কিন্তু [illegible] ও শুভঙ্করাদিকে বিচারের সুবিধা না দিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছি। নিত্যকার প্র[illegible] গণিতের

অনেকখানি প্রয়োজন আছে; জমিজমার হিসাব, বাজার দর, কাঁসা, তামা, পিত্তল প্রভৃতির দর ও ওজন, শস্যাদির দরের হিসাব প্রভৃতি বিষয়ে চাষারা মুখে মুখে যাহা এখনও করিতে পারে, আমাদের এম. এ. উপাধিধারী গণিতের অধ্যাপকগণ অনেক সময়ে তাহা অনেক বেশী সময়ে কষ্টেসৃষ্টে করিতে পারেন। চাষারা কাগজে-কলমে অভ্যস্ত নহে, নিতান্ত জটিল অঙ্ক হইলে তাহাদেরই মধ্যে অক্ষরজ্ঞানবিশিষ্ট মাতব্বর দুই একজন লোক তাহা 'কালী' করিতে বসে। নিতান্ত জটিল অঙ্ক না হইলে তাহারা মসি, মস্যাধার বা কাগজের সহায়তা লয় না। এই জন্য যাহারা "কালী" করিতে জানে, চাষাসমাজে তাহাদের প্রভূত মান। এই নিম্নশ্রেণীর লোকদের অতি সূক্ষ্ম হিসাব, যাহা তাহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা করে, তাহা ভুল হয় না। কিন্তু এখনকার শিক্ষিত লোক সেইরূপ করিতে গেলে দ্বিগুণ চৌগুণ সময় তো লইবেনই —তাহাতে অনেক সময়ই ভুল হইয়া থাকে। এখন বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গলার সাহায্যে সমস্ত অধিতব্য বিষয়ের জ্ঞান বিস্তার করিবেন। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে যে বিষয়টা স্বতঃসিদ্ধ ছিল, —জগতের সমস্ত জাতি যে সকল কথা নিজের ভাষায় শিখে, ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে জাপান যেভাবে সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞান তাহাদের নিজের ভাষায় শিখাইয়া উন্নতির তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন,—এখনও হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর যাহা নিজরাজ্যে প্রচলন করিয়াছেন, তাহা এদেশে অগ্রাহ্য হইয়া আছে। স্বদেশের ভাষায় জ্ঞান প্রচার করার বিরুদ্ধে কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়াছেন, ইঁহাদের মাথা অনেকটা ইংরেজী শিক্ষায় বিগড়াইয়া গিয়াছে। যিনি এখন অঙ্ক শিখেন, তিনি বিদেশী ভাষায় তাহা শিখিতে অর্দ্ধেকের বেশী সময় সেই বিষয়ের উপযোগী ভাষা শিখিতে ব্যয় করেন। আসল বিষয় শিখিতে আর কতটুকু সময় থাকে?

যাহা হউক এখন যখন বাঙ্গলা ভাষায় গণিতাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে, তখন আমাদের গণিতের যে সকল সূত্র বিলাতী পুস্তকে পাওয়া যায় না, অথচ নিত্যকার জীবনযাত্রার পক্ষে যাহা অপরিহার্য্য, সেইগুলি কি শুভঙ্করের আর্য্যা হইতে শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত নহে? এই আর্য্যাগুলিতে কড়া, কাঠা, ক্রান্তি প্রভৃতি যে সকল শব্দ আছে—তাহা প্রয়োজন হইলে, পাউণ্ড, টাকা, পয়সা, পেন্স প্রভৃতি এখনকার প্রচলিত গণিতাঙ্কে পরিণত করিয়া প্রাচীন আর্য্যাগুলির অনুসরণপূর্ব্বক সূত্র রচনা করিতে বোধ হয় এখনকার অধ্যাপকেরা অসমর্থ হইবেন না। অনেক সময়ে দেশীয় মাপ, দর এবং মূল্যাদি বাঙ্গলাদেশের চিরাগত সংস্কারাধীন করাতে বিশেষ দোষ নাই, তবে যখন বিলাতের সঙ্গে কারবারের প্রয়োজন হইবেই, তখন দুইরূপ গণিতাঙ্কে মূল্য ও ওজনের সম্বন্ধে পারিভাষিক শব্দজ্ঞানের ব্যবস্থা রাখা উচিত। বড়ই দুঃখের বিষয়, যে সকল সূত্র শিখিয়া এতদ্দেশের লোকেরা এত সহজে গণনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিত, সেই অসামান্য বিদ্যা—অশিক্ষিতপটুতা—আমরা বিবেচনাহীন হইয়া হারাইতে বসিয়াছি। রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের সংখ্যায় হিন্দুদিগের গণিতশিক্ষা-সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পাদ্রী লঙ সাহেব শুভঙ্করকে "The Cocker of Bengal" (বাঙ্গালাদেশের 'ককার') উপাধি দিয়াছেন। এই নামে শুভঙ্করের কোন গৌরব বৃদ্ধি হয়

নাই। গণিতের যে সকল অতি সূক্ষ্ম বিষয়ের সূত্র আবিষ্কার করিয়া শুভঙ্কর সমস্ত কূট প্রশ্নের সহজ সমাধান করিয়াছেন, অন্যত্র তাহার দৃষ্টান্ত সুলভ নহে। লর্ড সাহেব উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিয়াছিলেন, "১৪০ বৎসর যাবৎ শুভঙ্করের আর্য্যার আবৃত্তিতে অনুমান ৪০,০০০ বঙ্গবিদ্যালয় মুখরিত হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং আমাদের ইংরেজী শিশু-বিদ্যালয়সমূহে যে ভাবের শিক্ষা পরবর্ত্তী সময়ে প্রচলিত হইয়াছে তাহার পূর্ব্বগৌরব হিন্দুদেরই প্রাপ্য।" হিন্দুরা মানসাঙ্ক বিদ্যায় ওস্তাদ ছিলেন। হিন্দুর এই সুচিরাবলম্বিত পন্থা এখন mental arithmetic আখ্যা পাইয়া শিক্ষিতদের মধ্যে গৌরবান্বিত হইয়াছে। শুধু গণিতের নহে, জ্যোতির্ব্বিদ্যার গুরুতর প্রশ্নগুলি ডাক ও খনার প্রসাদে বাঙ্গালী নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এরূপ আশ্চর্য্যভাবে সমাধান করিতে পারিত, যাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কোন্ দিন চন্দ্রগ্রহণ হইবে, তাহা অতি সহজে নিম্নশ্রেণীর লোক গণিয়া কহিতে পারে। "যে যে গৃহের যে রাশি, তার সপ্তমে থাকে শশী, সেদিন যদি হয় পৌর্ণমাসী, অবশ্য রাহু গ্রাসে শশী। দুই তিন পাচ ছয় একাদশে দেখ্‌তে হয়।" সহজে প্রশ্নটার উত্তর হইয়া গেল। আর কোন্ দেশের ইতর জনসাধারণ এভাবে প্রশ্নটির সমাধান করিতে পারে তাহা আমি জানি না। আশ্চর্য্যের বিষয় যোগ ও তন্ত্র সাধারণ লোকের মধ্যে এরূপ বহুলপ্রচার লাভ করিয়াছিল যে, আমরা মনেই করিতে পারি না, অশিক্ষিত অথবা অর্দ্ধশিক্ষিত লোকেরা কিরূপে এই দুরূহ সাধনার পথে অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছিল। সহজিয়াদের বিস্তৃত সাহিত্যের অনেকাংশ সন্ধ্যা-ভাষায় লিখিত, তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। এই সাহিত্যের পাঠক, শ্রোতা ও লেখকগণের অধিকাংশই মূর্খ পাড়াগেঁয়ে লোক—কিন্তু তাহাদের সাহিত্যে যেরূপ ভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত করিয়া ষট্‌পদ্মভেদের ও সহস্রারের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিবরণ আছে, তাহা অতীব বিস্ময়কর। "গোরক্ষবিজয়" নামক বাঙ্গলা পুস্তকখানি এতদিন অবজ্ঞাত হইয়া নিম্নশ্রেণীর কুটিরে পড়িয়াছিল। ইহার লেখক নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান, এবং পাঠকও সেই শ্রেণীর। অথচ এই কাব্যের শেষাংশে গোরক্ষনাথ যে ৩১টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গুরু মীননাথের মায়া-মোহ ভঙ্গ করিলেন, তাহা যোগপথের পন্থী—কৃতী সাধক ভিন্ন কেহই উত্তর দিতে পারিবেন না। আমরা সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহি; তথাপি বিশ্ব-পণ্ডিতেরা যখন এম. এ. পরীক্ষার্থীদের পাঠ্যতালিকা হইতে গোরক্ষ-বিজয়ের সেই অংশ বাদ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, আমি বলিয়া কহিয়া এ বৎসরের জন্য তাহার কতকাংশ রাখিয়া দিয়াছি। এই ৩১টি প্রশ্নের মধ্যে একটি "অজপা কাহাকে বলে, জপে কোন জন?" এখন জানিতে পারিয়াছি, "অজপা" কথাটি তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ও যোগের অতি প্রাথমিক কথা, তাহা পূর্ব্বকালে এদেশের আপামর সাধারণ সকলেই বুঝিত। প্রশ্নগুলির আর দুইটি—প্রদীপ "নির্ব্বাণ হইলে জ্যোতিঃ কোথায় যায়? এবং ধ্বনি ফুরাইয়া গেলে সুর কোথায় বিলীন হয়?" ইত্যাদি। এদেশে মহোৎসবে যেমন ছোট বড় সকলে নির্ব্বিচারে একত্র বসিয়া যায়, জ্ঞানবিস্তারের পরিবেষণেও এদেশের লোকেরা অপর সকলকে বঞ্চিত করিয়া নিজেরা শুধু তাহা ভোগ করিতেন না। অন্ততঃ বৌদ্ধাধিকারের সময়ে এইরূপই নিয়ম ছিল। মাঝে কয়েক শতাব্দীর জন্য গোঁড়া ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানের দ্বার

আগ্‌লাইয়া পাহারা দিয়া উহার ভাণ্ডার একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন ; কিন্তু এই গণ-তান্ত্রিক দেশে সেরূপ প্রভুত্ব টিঁকিল না—বৈষ্ণবেরা আসিয়া ঠেলা দিয়া সেই প্রাচীন দরজা ভাঙ্গিয়া দিলেন ; সমস্ত শাস্ত্রের আদেশ ও ব্রাহ্মণের নিষেধ-বিধি উলট-পালট করিয়া দিয়া সহজিয়ারা সতীত্বের আদর্শ ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়াছিল ; বৈষ্ণব গোস্বামী নিম্নতম শ্রেণীর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে শিষ্য করিতে লাগিলেন ; অশেষ গালাগালির ভাজন হইয়াও অনুবাদকগণ সংস্কৃত পুরাণ, কাব্য প্রভৃতি বাঙ্গলায় লিখিতে বসিয়া গেলেন। নরোত্তম কায়স্থ ও শ্যামানন্দ সদ্গোপ হইয়াও ব্রাহ্মণদিগকে শিষ্য করিতে লাগিলেন—গোঁড়ার দল রোষ-কষায়িত চোখে তাহাদিগকে বার বার ভয় দেখাইতে লাগিলেন।

উচ্চশিক্ষা।

প্রাচীনকালে বিদ্যার কিরূপ সম্মান ছিল তাহা পূর্ব্ব এক অধ্যায়ে (২৯১-৩০০ পৃঃ) আমরা দেখাইয়াছি। "অজাতমৃতমূর্খেভ্যো মৃতাজাতৌ সুতৌ বরম্। যতস্তৌ স্বল্পদুঃখায় যাবজ্জীবং জড়ো দহেৎ" (পঞ্চতন্ত্র)। বাঙ্গলা প্রাচীন সরস্বতীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্যে আমরা দেখিতে পাই, রাজা সুরেশ্বর তাঁহার মূর্খ পুত্রকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিতেছেন। অবশ্য এতটা বাড়াবাড়ি কবিকল্পনার অবাধগতিশীলতা প্রমাণ করে ; কিন্তু দয়ারাম কৃত 'সারদামঙ্গলে'র সমস্ত অতিরঞ্জনের মধ্যে এইটুকু সত্য যে, বঙ্গীয় সমাজে এক সময়ে মূর্খ পুত্র অতিশয় ঘৃণার পাত্র ছিল। ব্রাহ্মণ্য-যুগে শিক্ষার ক্ষেত্র অনেকটা সঙ্কুচিত করিয়া ফেলা হইয়াছিল।

আমাদের দেশের ইতিহাস জানিতে চাহিলে ইতরসাধারণের মধ্যে তাহার যতটা উপকরণ এখনও পাওয়া যাইবে—লিখিত পুস্তকে কি অনুশাসনাদিতে তাহা ততটা পাওয়া যাইবে না। অধুনা আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায় এদেশের কোন ঐতিহাসিক পুস্তক বা সন্দর্ভ (thesis) লিখিতে যাইয়া কেবলই লাইব্রেরীর সাহায্য গ্রহণ করেন। যে সকল উপকরণ তাঁহাদের চারিদিকে পড়িয়া রহিয়াছে—তাহা দেখিবার শক্তি তাঁহারা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। যাহা কোন সাহেব দেখেন নাই বা বলেন নাই, এমন কোন সত্য একান্ত স্পষ্টভাবে দেখিলেও তাহা বলিবার মত তাঁহাদের সাহস নাই। টলেমি যে ভৌগোলিক বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, (খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী) তাহা ভাল করিয়া পড়িয়া আমি বুঝিয়াছি, তদুক্ত "সলসোনু," "সাবার," "দাসরা," এবং "বেনিয়াজুড়ম" এই কয়টি নগর খাস বাঙ্গলার। যে সকল সাহেব সেই ভৌগোলিক বৃত্তান্তের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা খুব সম্ভব বাঙ্গলাদেশের অধুনা নগণ্যত্বপ্রাপ্ত ঐ কয়টি পল্লীর অস্তিত্ব জানিতেন না, সুতরাং উহাদের স্থাননির্ণয় করিতে যাইয়া নানারূপ উৎকট কল্পনার সাহায্য লইয়াছেন। সোলসুনো টলেমির বিবরণে খুব বড় অক্ষরে অনেকটা জায়গা জুড়িয়া লেখা হইয়াছে, যে জায়গায় উহার সংস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আমার মনে হয় তাহা কালীঘাটের নিকট। "সরসুনো" গ্রাম এখনও বেহালার দক্ষিণে বিদ্যমান। উহা যে অতি প্রাচীন তাহাতে সংশয় নাই। প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায়ের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ এখনও তথায় দৃষ্ট হয়—তাঁহার দুই কন্যার নামে যে পাশাপাশি দুইটি বৃহৎ দীঘি আছে—তাহাও ঐ গ্রামের প্রাচীনত্বের প্রমাণ ; কারণ সম্ভবতঃ এই দুই দীঘি বহু পূর্ব্ব হইতেই ছিল—উহাদের

পুনঃসংস্কার করিয়া শেষে বসন্তরায়ের কন্যাদের নামে উহাদের পরিচয় হইয়াছে। পদ্মাতীরে সুপ্রসিদ্ধ রাজবাড়ীর মঠ, যাহা সেদিনমাত্র উক্ত নদীর কবলিত হইয়াছে—তাহার ভিত হইতে সমস্তই বৌদ্ধস্থাপত্যের নিদর্শন, অথচ উহা কেদার রায়ের নামের সঙ্গে জড়িত হইয়াছে। সম্ভবতঃ কেদার রায় উহা সংস্কার করিয়া উহাতে কোন দেবতা স্থাপনা করিয়া থাকিবেন। সরস্বতীর দীঘিও এইভাবে নাম পরিগ্রহ করিয়া থাকিবে। প্রাচীনেরা বলিয়া থাকেন ভগ্ন রাজবাড়ীর সঙ্গে গঙ্গার যোগ করিয়া তথায় একটা বৃহৎ সুড়ঙ্গ-পথ ছিল। কিন্তু দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের ভগ্নাবশেষ অনেকস্থলেই মৃত্তিকার উপরে থাকে না। তাহা খুঁড়িয়া বাহির করিতে হয়। বসন্তরায় যে গ্রামে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সে গ্রাম পূর্ব্ব হইতেই সমৃদ্ধ ও ভদ্রনিবাস ছিল, নতুবা তিনি সেখানে বাড়ী করিতে যাইবেন কেন? তিনি ঐ গ্রাম স্থাপন করেন নাই। গ্রামটী দেখিলেই খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। বোধ হয় এক কালে বাসুদেবপুর, বেহালা, বড়িষা প্রভৃতি অনেক গ্রাম লইয়া 'সরস্বনা' একটা পরগনার মত ছিল, এজন্য টলেমি উহার আয়তন এত বড় করিয়া দেখাইয়াছেন। "সাবার" যে ঢাকা জেলার প্রসিদ্ধ "সাভার"—তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ দেখিতে পাই নাই, ঐ অঞ্চলটা ভীমসেনের পুত্র শ্রীমন্ত সেন কিরাতদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন (সপ্তম শতাব্দীতে)। হরিশ্চন্দ্র এবং তাঁহার পুত্রপৌত্রাদি তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। আমরা ১৭৭-৭৮ পৃষ্ঠায় এই বৌদ্ধ নৃপতিবর্গের উল্লেখ করিয়াছি। "দাসরা" সাভার হইতে অনতিদূরে। টলেমির সংস্থাপনানুসারেও তাহাই দৃষ্ট হয়। দাসরা গ্রাম এক কালে কুলীন বৈদ্যগণের ২৭টি সমাজের মধ্যে অন্যতম ছিল। ছয় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে এই সকল সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল। তিন-চারি শত বৎসর পূর্ব্বের কুলজি গ্রন্থসমূহে এই গ্রামের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই গ্রামের সন্নিহিত 'শিববাড়ী' বহু প্রাচীন, তথায় শিব একটি বৃহৎ অসম পাথররূপে গভীর কূপের মধ্যে বিরাজিত। শিববাড়ীতে যে সকল প্রাচীন প্রস্তর-মূর্ত্তি রক্ষিত আছে, তাহাদের মধ্যে বাশুলী অতি প্রাচীন, নবম-দশম শতাব্দীর বাসুদেব মূর্ত্তিও তথায় দৃষ্ট হয়। দাসরার খালের ধারে একটি প্রাচীন কালীবাড়ী ছিল। ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে সেই স্থানটির একাংশে পুষ্করিণী করিতে ইচ্ছুক হইয়া মালিক খুঁড়িয়াছিলেন। প্রায় একুশ হাত নিয়ে একটি প্রস্তরস্তম্ভ তন্মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। উহাতে হস্তীর উপরে সিংহমূর্ত্তি ও অপরাপর কারুসৌষ্ঠবের চিহ্ন আছে। উহা গুপ্তযুগের শেষের দিকের বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ ঐ স্তম্ভটি কোন দেবমন্দিরের ছিল। আমাদের দেশে যেখানে কোন মন্দির থাকে, যুগ যুগ ধরিয়া সেই থানটায় নব নব মন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকে। সেই যে নবম শতাব্দীতে তথায় মন্দির ছিল, সেদিনকার কালীবাড়ী এতকাল পরেও সেই স্থানটির সূচনা করিতেছে। স্তম্ভটি দাসরার প্রসিদ্ধ উকীল স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়ীতে ছিল; উহা শিবলিঙ্গ বলিয়া পুরোহিত পূজা করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। পূর্ণবাবু আমার শিক্ষক ও আত্মীয়; তিনি উহা আমাকে দিয়াছেন। অধুনা উহা আমাদের বাড়ীর

'রূপেশ্বর' মন্দিরে আছে। টলেমির নির্দ্দেশ অনুসারে "বেনিয়াজুড়ম" দাসরার নিকটবর্ত্তী। এই "বেনিয়াজুড়ম" এখনও বিদ্যমান—ইহার বর্ত্তমান নাম "বানিয়াজুরী"। গ্রামটীতে কিছু কিছু প্রাচীন চিহ্ন আছে। সাহেবেরা অজ্ঞতাবশতঃ এই তিন গ্রামের ঠিকানা না জানিয়া যেখানে সেখানে উহাদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমার মতই যে সত্য—একথা আমি বলিতেছি না, অন্ততঃ এ বিষয়টা বাঙ্গালীর পক্ষে এত গুরুতর, যে এসম্বন্ধে কতকটা আলোচনা চলে। বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের ইতিহাস, এমন কি ভাষা ও সাহিত্যের উচ্চ পরীক্ষা দিতে হইলে আমাদিগকে বিলাতে যাইয়া পড়িতে হয়। সাহেবদের লিখিত পুস্তকগুলি তো আমরা বাড়ীতে বসিয়াই পড়িতে পারি, কিন্তু একবার অজন্তা, অমরাবতী, সাঁচি, গয়া, ভুবনেশ্বর, হস্তিগুম্ফা, খেজুরাহ প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া দেখিবার ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় করেন না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। তাহাতে অল্পসময়ে অনেক কাজ হয়, এবং ভারতীয় ইতিহাস-লক্ষ্মীর সঙ্গে আমাদের মুখোমুখী পরিচয় হইতে পারে। খরচও কম পড়ে। জাবা, প্রম্বনম, শ্যাম ও কাম্বোজ প্রভৃতি স্থানও প্যারি বা লণ্ডন হইতে অনেক কাছে।

সঙ্গীতে যখন সাক্ষাৎ জগদীশ্বর দিল্লীশ্বর আকবর তানসেনপ্রমুখ সঙ্গীতাচার্য্যগণের দ্বারা রাগ-রাগিণীর বৈজ্ঞানিকভাবে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করাইতেছিলেন, তখন বাঙ্গলা-পল্লীতে সেই সুর পৌছায় নাই। কিন্তু হিন্দুযুগে এদেশে বৈজ্ঞানিক ভাবে সঙ্গীতের চর্চ্চা বিশেষ-রূপেই হইয়াছিল। লক্ষ্মণ সেনের সময়ে রাগ-রাগিণী রাজসভায় মূর্ত্ত হইত বলিয়া কথিত আছে। যে সময়ে সমুদ্রগুপ্ত বীণা বাজাইতেন, তাঁহার সেই সুরলহরী, নারদ ও তুম্বুরু প্রভৃতি সঙ্গীত সম্রাট্‌দিগকেও লজ্জা দিত বলিয়া তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে এই বীণাতে তিনি এরূপ সুদক্ষ ছিলেন যে, তাঁহার মুদ্রায়ও তাঁহার মূর্ত্তি বীণাবাদকরূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। লক্ষ্মণ সেনের সভায় জয়দেবের হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী পদ্মাবতী 'গান্ধার' রাগে গান গাহিয়া কপিলেশ্বরের সভা-জয়ী সঙ্গীতাচার্য্যকে জয় করিয়াছিলেন, স্বয়ং জয়দেব তাঁহার চরণের গতির ক্রম লক্ষ্য করিয়া তান রাখিতেন এবং নিজকে "পদ্মাবতীচরণচারণ-চক্রবর্ত্তী" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার নর্ত্তকী শশিকলা এবং বিদ্যুৎ-প্রভার গানে রাগ-রাগিণী এরূপ মূর্ত্ত হইয়া উঠিত যে, লোকে তাহা শুনিয়া বেহুঁস হইয়া যাইত। এক রমণী সেইরূপ অবস্থায় বিদ্যুৎ-প্রভার মুখে 'সুহৈ' রাগের গান শুনিয়া নিজের শিশুকে কলসী মনে করিয়া রজ্জু বাঁধিয়া কূপোদকে নামাইয়া দিয়াছিল। সেক শুভোদয়াতে এই ঘটনাটির উল্লেখ দৃষ্ট হয় (সেক শুভোদয়া, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, ৬৮-৬৯ পৃঃ)। জয়দেবের গীতগোবিন্দ সমস্ত ভারতবর্ষে গীত হইত, কিন্তু এই সকল গান সর্ব্বদাই গুর্জ্জর, খাম্বাজ, গান্ধার প্রভৃতি রাগে গীত হওয়ার নির্দ্দেশ আছে। সম্ভবতঃ গুজরাট, কাম্বোজ, কান্দাহার প্রভৃতি স্থানের নাম হইতে ঐসকল রাগের নাম গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু বঙ্গদেশ চিরকালই গণতান্ত্রিক, এখানকার জনসাধারণ কোন কালেই একটা নির্দ্দিষ্ট কায়দা বা বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে রাজী নহে। জনসাধারণ সঙ্গীত-বিজ্ঞানের প্রচলিত ধারা শিরোধার্য্য করিয়া

লয় নাই, তাহাদের নিজস্ব একটা সুর ছিল—এই সুর হিন্দী মনসামঙ্গলে (বেহুলাকাব্যে) 'বাঙ্গাল রাগ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা আমাদের চিরপরিচিত ভাটিয়াল রাগ। এই সুর কোন প্রচলিত রাগরাগিণীর ধার ধারে না, উহা খাঁটি পল্লীহৃদয়ের সমস্ত করুণ রস নিংড়াইয়া লইয়া আত্মপ্রকাশ করিত। এই সুর পদ্মা, ধলেশ্বরী, ভৈরব, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদনদীর গর্ভে মাঝিদের মুখে যিনি শুনিয়াছেন, তিনি বুঝিবেন এই নদীমাতৃক দেশের উহা নিজস্ব সুর।

ভাটিয়াল ও মনোহর সাই।

আকাশ ও নদী যেখানে তুল্য রূপই বিশাল, বাতাসের গতি যেখানে অবাধ, সেই অসীম রাজ্যের অসীম বেদনা বা ভক্তির সমস্ত বাধা-নির্মুক্ত এই সুর যেন নৈসর্গিক দৃশ্যপটের নিজস্ব। মাঝি যখন উহা গায়, তখন তাহার সেই সুরতরঙ্গ পদ্মার তরঙ্গের মতই আকাশ-বাতাসকে উন্মাদনা দিয়া চলিয়া যায়। যে সুরে মনসাদেবীর কীর্ত্তন গাহিয়া দ্বিজ-বংশীদাস কেনারামের মত হিংস্র পশুকে বিমুগ্ধ করিয়া তাহার পঙ্কিল জীবনস্রোত মন্দাকিনীতে পরিণত করিয়াছিলেন এবং ভেলুয়া কাব্যের নায়ক সারেঙ্গ বাজাইয়া পশুপক্ষী বশীভূত করিতেন বলিয়া বাঙ্গলা পল্লীগীতিকায় বর্ণিত আছে,—ইহা হৃদয়ের সেই তন্ত্রী স্পর্শ করিয়া অধীর বেদনার সৃষ্টি করে। "আমার গুরু বড় দয়াল সত্য আমি হলাম অপদার্থ, আমি যে ভক্তিহীন—ভক্তিহীন" কথাগুলি অতি সরল সহজ—কিন্তু ভাটিয়াল রাগে যখন নদীর উপর এই গানের সুর বহিয়া যায়—তখন ভগবানের অসীম দয়ায় মানুষের নিজ অস্তিত্ব ডুবিয়া যায়।

এতকাল ভাটিয়াল রাগ—করুণ রসের প্রস্রবণস্বরূপ পল্লীর হৃদয় ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছিল—হঠাৎ এক সোনার মানুষ তাঁহার যাদুকাঠি দিয়া এই রাগটি স্পর্শ করিলেন—অমনই তাহা সোনা হইয়া গেল; যেন গুড়কে চিনি কিংবা চিনিকে মিছরিতে পরিণত করা হইল। বোধহয় এটি দেখান যাইতে পারে যে রেনেটি, গড়নহাটী এবং মনোহর সাই প্রভৃতি কীর্ত্তনের সুর—এই ভাটিয়ালের উপাদানেই সৃষ্ট। আমি জানি না—মনোহর সাই কীর্ত্তনের মত এরূপ প্রেমের উন্মাদনা জগতের আর কোন সুরে আছে কিনা—কারণ উহা প্রেমের উন্মাদেরই সুর—সে সুর বিজ্ঞানসঙ্গত কিনা জানি না; যদি না হয়, তবে এই সুরকে বুঝিবার জন্য নববিজ্ঞান সৃষ্ট করা উচিত। আজ প্রায় পঞ্চশত বৎসর যাবৎ বাঙ্গালী এই সুরের মোহে পাগল হইয়া আছে। যেদিন চৈতন্যচন্দ্রের উদয় হইল, সেইদিন হইতে গীতগোবিন্দের প্রাচীন সুর এদেশ হইতে উঠিয়া গেল এবং বাঙ্গলা কীর্ত্তনের সুরে তাহা গাওয়া হইতে লাগিল।

স্ত্রীশিক্ষা।

বহু রূপকথা ও গীতিকথায় দৃষ্ট হয় স্ত্রীলোক ও পুরুষ এক গুরুর নিকট এক পাঠশালায় বসিয়া পড়িতেন। সখীসোনার গল্পে রাজকন্যা ও কোটালের পুত্র একত্র এক পাঠশালায় পড়িতেন—সেই সূত্রে একটা প্রতিশ্রুতির ফলে উভয়ে পলায়ন করিয়া স্বামি-স্ত্রীর মত জীবন যাপন করিয়াছিলেন। পল্লীগীতিকায়ও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবে এই প্রথা রহিত হইয়া গেল। ষোড়শ শতাব্দীতে ফকির-রাম কবিভূষণ বর্দ্ধমান জেলায় বাস করিয়া সখীসোনার গল্পের একটা নূতন কবিত্বপূর্ণ সংস্করণ সঙ্কলন করেন। গল্পটি কিন্তু বহু প্রাচীন, ফকির-রামের সময়ে নিশ্চয়ই একটা সংস্কারে

দাঁড়াইয়াছিল, তখন হয়ত এ প্রথা প্রচলিত ছিল না। এতগুলি রূপকথায় আমরা রমণী ও পুরুষের একত্র পড়াশোনার কথা পাইতেছি, যাহাতে মনে হয় ইহা দেশব্যাপী একটা প্রাচীন রীতির প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেত করিতেছে। কিন্তু পাঠশালায় একত্র না পড়িলেও স্ত্রীলোকের পড়াশুনা যে এ দেশে মুসলমানদের সময়েও প্রচলিত ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আমরা গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, অরুন্ধতী প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুতা ইতিহাস-পূর্ব্ব যুগের পণ্ডিতাদিগকে লইয়া টানাটানি করিব না। কালিদাস তাঁহার স্ত্রী ভোজরাজের কন্যার নিকট স্বীয় মূর্খতার জন্য বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন, কিংবা বিদ্যার ন্যায় রাজকুমারীরা পণ করিয়া বসিতেন যে, যে তাঁহাদিগকে বিচারে পরাস্ত করিতে পারিবে, তাঁহাকেই বিবাহ করিবেন—এই সকল গল্পকেও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান দিব না। কিন্তু মধ্যযুগে আমরা চণ্ডীদাসের প্রণয়িনী রামী, শিখী মাইতীর ভগিনী মাধবী এবং চন্দ্রাবতী প্রভৃতি কবিদিগের লেখার সহিত পরিচিত হইয়াছি। চণ্ডীকাব্যে দেখা যাইতেছে যে বণিকের বধূরাও লিখিতে পড়িতে জানিতেন, পল্লীগীতিকায় জেলে-কৈবর্ত্তের কন্যা মলুয়া ও খুল্লনা পত্রাদি লিখিতে পারিতেন—এরূপ উল্লিখিত আছে। ইহার সকলগুলিই গল্প কিনা, কিংবা ইহাদের কোন কোন কাহিনী সত্যমূলক, তাহা নির্ণয় করিবার অবসর আমাদের নাই। যাহারা শিল্পবিদ্যায়—সঙ্গীতে এবং অপরাপর কলাবিদ্যায় এতটা পারদর্শী ছিলেন, তাঁহারা যে লেখাপড়া জানিতেন না, এমন মনে হয় না। আমরা গত একশত-দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের অনেক শিক্ষিতা মহিলার কথা জানি—তাঁহারা শুধু লেখাপড়া জানিতেন না—কিন্তু অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

চন্দ্রাবতী, আনন্দময়ী, দ্রবময়ী।

ফরিদপুর যপ্সা-গ্রামনিবাসী লালা রামগতি সেনের কন্যা বিদুষী আনন্দময়ী দেবীর নাম সুপরিচিত। ইনি পলাশী যুদ্ধের সময়ে জীবিত ছিলেন। ইনি অথর্ব্ববেদ হইতে যজ্ঞকুণ্ডের আকৃতি আঁকিয়া রাজা রাজবল্লভকে তাঁহার যজ্ঞের জন্য দিয়াছিলেন। বেদনির্দ্দিষ্ট সেই যজ্ঞকুণ্ডের খসড়া পণ্ডিতমণ্ডলীকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। তাঁহার খুল্লতাত জয়নারায়ণ সেন যে 'হরিলীলা' নামক কাব্য রচনা করেন, তাহাতে ইহার অনেক পদ আছে, তাহাতে সংস্কৃতে তাঁহার অসামান্য অধিকার প্রমাণ করে। ষোড়শ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি চন্দ্রাবতীর নাম এখন সুপরিচিত। ইনি সংস্কৃতে ব্যুৎপন্না ছিলেন, এবং মলুয়া, কেনারাম প্রভৃতি অপূর্ব্ব গীতিকা রচনা করিয়াছিলেন এবং পিতার আদেশে রামায়ণের পদ্যানুবাদও করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকার ১ম ও ৪র্থ খণ্ডে এই কবির সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে এবং তাঁহার রচিত কাব্যগুলিও সঙ্কলিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের পল্লীসাহিত্য খুঁজিলে আমরা বহু রমণী-কবির রচনা পাইতে পারি। কিন্তু সংস্কৃতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ১০০ বৎসর পূর্ব্বেও কোন কোন বঙ্গীয় মহিলার আয়ত্ত ছিল, তাহার পরিচয়ও কিছু কিছু পাওয়া যাইতেছে। শুধু চন্দ্রাবতী এবং আনন্দময়ী নহেন, বঙ্গদেশে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও এমন সকল পণ্ডিতা রমণী ছিলেন, যাঁহারা বিদ্বৎসমাজে বিশিষ্ট স্থান পাইবার যোগ্য। ১৮৫১ খৃঃ অব্দের ১৯শে এপ্রিল তারিখের "সম্বাদ-ভাস্কর" নামক পত্রিকার দ্রবময়ী দেবীর সবিস্তার উল্লেখ আছে। ইহার কাহিনী আমার ছাত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-

মোহন ভট্টাচার্য্য, এম. এ. সম্বাদ-ভাস্করের প্রাচীন স্তূপ হইতে আবিষ্কার করেন এবং তাহার সহায়তায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রবাসীতে (১৩৩৮ সন, ফাল্গুন) প্রকাশিত করিয়াছেন। দ্রবময়ী দেবী ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মাত্র চতুর্দ্দশ বৎসর-বয়স্কা ছিলেন। সম্বাদ-ভাস্করে তাঁহার সেই সময়ের কথাই লিখিত হইয়াছিল। এই অদ্ভুত প্রতিভাশালিনী বালিকা কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের কন্যা। ইনি ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত বেড়াবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর আমরা সম্বাদ-ভাস্কর হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—"দ্রবময়ী বালিকাকালে বিধবা হইয়া পিতা চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের টোলে পড়িতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ ও মূল সাতখানি টীকা এবং অভিধান-পাঠ সমাপ্ত হইলে চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার স্বকন্যার ব্যুৎপত্তি দেখিয়া কাব্যালঙ্কার পড়াইলেন এবং ন্যায়শাস্ত্রেরও কিয়দংশ শিক্ষা দিলেন; পরে দ্রবময়ী গৃহে আসিয়া পুরাণ মহাভারতাদি দেখিয়া হিন্দুজাতির প্রায় সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা হইলেন, এইক্ষণ দ্রবময়ীর বয়ঃক্রম চৌদ্দবৎসর। পুরুষেরা বিংশতি বৎসর শিক্ষা করিয়াও যাহা শিক্ষা করিতে পারেন না, দ্রবময়ী চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে ততোধিক শিক্ষা করিয়াছেন। এইক্ষণে তাঁহার পিতা চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার বৃদ্ধ হইয়াছেন, সকল দিন ছাত্রগণকে পড়াইতে পারেন না, তাঁহার টোলে ১৫।১৬ জন ছাত্র আছেন, দ্রবময়ী কিঞ্চিৎ ব্যবধানে এক আসনে বসিয়া পিতার ছাত্রগণকে ব্যাকরণ, কাব্যালঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্র পড়াইতেছেন, তাঁহার বিদ্যার বিবরণ শ্রবণ করিয়া নিকটস্থ অধ্যাপকেরা অনেকে বিচার করিতে আসিয়াছিলেন, সকলে পরাজয় মানিয়া গিয়াছেন; দ্রবময়ী কর্ণাটরাজের মহিষীর ন্যায় যবনিকান্তরিতা হইয়া বিচার করেন না। আপনি এক আসনে বৈসেন, সম্মুখে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে বসিতে আসন দেন, তাঁহার মস্তক ও মুখ নিরাবরণ থাকে; তিনি চার্ব্বঙ্গী, যুবতী, ইহাতেও পরুষদিগের সাক্ষাতে বসিয়া বিচার করিতে শঙ্কা করেন না, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের সহিত বিচার কালে অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় কথা কহেন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা তাঁহার তুল্য সংস্কৃত ভাষা বলিতে পারেন না, গৌড়ীয় ভাষায় বিচারেও পরাস্ত হন। দ্রবময়ীর ভাব দেখিতে বোধ হয় লক্ষ্মী কিংবা সরস্বতী হইবেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে ভক্তি প্রকাশ পায়, এ স্ত্রীলোককে দেখিবার জন্য কাহার উৎসাহ না হয়। বেড়াবাড়ী গ্রামে যাইয়া দ্রবময়ীকে দেখুন, তাঁহার সহিত বিচার করুন, আমরা দ্রবময়ীর বিদ্যা-শিক্ষার বিষয়ে যাহা লিখিলাম যদি ইহার এক বর্ণ মিথ্যা হয়, তবে আমাদিগকে মিথ্যাজল্পক বলিবেন, এরূপ সতী বিদ্যাবতী স্ত্রীলোক কেহ লীলাবতীর পরে এদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই।"

১২৩১ বাং সনে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত "স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক" নামক পুস্তক হইতে হটী বিদ্যালঙ্কার নাম্নী অপর এক মহিলার বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিতেছি।—

হটী বিদ্যালঙ্কার।

"রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কন্যা হটী বিদ্যালঙ্কার নামে একজন ছিলেন, তিনি বাল্যকালে আপন আপন গৃহকার্য্যের অবকাশে পড়াশুনা করিয়া ক্রমে ক্রমে এমন পণ্ডিতা হইলেন, যে সকল শাস্ত্রের পাঠ দিতেন; পরে তিনি কাশীতে

বাস করিয়া গৌড় দেশের ও সে দেশের অনেক লোককে পড়াইতে পড়াইতে তাঁহার সুখ্যাতি অতিশয় বাড়িলে সেখানকার সকল লোকে তাঁহাকে অধ্যাপকের ন্যায় নিমন্ত্রণ করিতেন। এবং তিনি সভায় আসিয়া সকল লোকের সহিত বিচার করিতেন" (৩৭৮ পৃষ্ঠা)।

এই পুস্তকে আরও লিখিত আছে:—"ফরিদপুর কোটালী পাড়া গ্রামের শ্যামাসুন্দরী নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণের স্ত্রী ব্যাকরণাদি পাঠ সমাপ্ত করিয়া ন্যায়-দর্শনের শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন, ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। আর উলা গ্রামের শরণ সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্যের দুই কন্যা বার্তা-বিদ্যা ও ক্ষেত্র-বিদ্যা শিখিয়া পরে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ করিয়া পণ্ডিতা হইয়াছিলেন, ইহা সকলেই জানেন।" (৩৭ পৃঃ)

আমরা আনন্দময়ী দেবীর কথা উল্লেখ করিয়াছি, ইহার আত্মীয়া গঙ্গামণি দেবীর রচিত অনেক গান বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচলিত আছে। ইনি হরিলীলা কাব্য নকল করিয়াছিলেন, ইহার হস্তাক্ষর বড় সুন্দর ছিল। পার্ব্বতী দাসী নাম্নী আর এক জন মহিলার হস্তাক্ষরের নমুনাও আমরা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। ইনি একখানি বৈষ্ণব পুঁথি নকল করিয়াছিলেন, হস্তাক্ষর মুক্তার ন্যায় সুন্দর।

ফরিদপুর জেলায় সুন্দরী দেবী নাম্নী এক ব্রাহ্মণ-রমণী এক শতাব্দী পূর্ব্বে ন্যায়শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। লঙ সাহেবের ক্যাটালগে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বৈদ্যবংশীয়া অনেক রমণী গৃহে বসিয়া চিকিৎসা করিতেন, আমরা জানিতে পারিয়াছি। তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করিয়া কৃতী হইতেন, কিন্তু গাছগাছড়া ও অমোঘ মুষ্টিযোগ সাহায্যে দুঃসাধ্য ব্যাধি আরাম করিতে বেশী পটু ছিলেন। তাঁহাদের খ্যাতি বহুদূর ব্যাপী হইত এবং তাঁহাদের গৃহদ্বারে প্রত্যহ বহু রোগীর—বিশেষ মহিলা-রোগীর ভিড় হইত।

আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি এক চাকার রথ চলে না। সংসারে রমণী ও পুরুষদের তুল্যরূপই কাজ ছিল। গৃহলক্ষ্মী না হইলে একদিনের জন্য গৃহ চলিত না। গৃহখানি তাঁহারা অতি যত্নে প্রদর্শনীর মত সাজাইতেন। তাঁহাদের হাতের মৃৎ-ভাণ্ডের উপর নানা রূপ রং-বিরঙ্গের কাজ, শিকায় বিচিত্র কারুকার্য্য, শয্যা বাঁধিয়া রাখিবার জন্য নানারূপ নিপুণ কারুখচিত দড়ি-দড়া, কারুকার্য্য ও চিত্রমণ্ডিত সাজি ও কুলা, পান ও পানের বাটা রাখিবার সূক্ষ্ম সূচীকার্য্যে সম্পাদিত বটুয়া ও বস্ত্রাবরণ, বালিসের খোল, বসিবার আসন, লাঠি, বরণ-ডালা, ও পাখার বিচিত্র পুঁতির কার্য্যের শিল্পকলা, চিত্রিত পীড়ি, দেয়ালের চিত্র, ছেলেদের খেলিবার সোলা ও মাটীর পুতুল—এমন কি কাঠের উপর বিচিত্র মূর্ত্তি, পাশা ও দাবা খেলিবার ছক্ ইত্যাদি কত জিনিষ যে আমরা দেখিয়াছি, তাহার অবধি নাই। শ্রীহট্টের মেয়েরা কাঠের ঘোড়া ও কাঠের হাতী এখনও নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকেরা এদেশে দেবী ছিলেন, তাঁহাদের যুদ্ধবিদ্যায় কৃতিত্বের নমুনা আমরা দিয়াছি; চৌধুরীর লড়াই নামক গীতি-কথায় যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা সত্য ঘটনা-মূলক। আমাদের দেশে যে কালী, ছিন্নমস্তা, ভৈরবী, দশভুজা প্রভৃতি শক্তিমূর্ত্তির পূজা হয়, তাহার মূল উপকরণ এইদেশের অন্তঃপুরে বিদ্যমান! এই মহিলারা প্রেমের জন্য না করিতে

পারেন, এমন কিছুই নাই, গীতি কবিতাগুলির পত্রে পত্রে দেখিতে পাইবেন; বীরত্ব, ত্যাগ, আত্মসমর্পণ, কষ্ট-সহিষ্ণুতা, স্বার্থের বলিদান এবং তপস্যা—এ সমস্ত বিষয়েই তাঁহারা পুরুষকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। আমরা মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কাজল-রেখা, সখিনা প্রভৃতি নারী-চরিত্রের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই চিত্রগুলি আমি যখন প্রথম দেখিয়াছিলাম, তখন আমার মনে হইয়াছিল যে দশমহাবিদ্যার রূপ আমার চাক্ষুষ হইল। এক একটি দেবী-চরিত্র পড়িয়া আমি ২।৩ দিন আবিষ্টের মত থাকিতাম। হিন্দু মেয়েরা যে কিরূপ নির্ভীকভাবে সহমরণে যাইতেন, তাহা বিদেশী লোকেরা বিস্ময়ের সহিত লিখিয়াছেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে কিছু দৃষ্টান্ত দিয়াছি, কিন্তু গ্রীক ঐতিহাসিক হইতে সেদিনকার হ্যালিডে সাহেব পর্য্যন্ত যে সকল চাক্ষুষ দৃশ্য বর্ণনা করিয়াছেন, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড প্রভৃতি সাহেবেরা তাহা চাপা দিয়া এই ব্যাপারের একটা বীভৎস দিক্ দেখাইয়াছেন। খুব উচ্চ পরিবারে ও খুব নিম্নস্তরে মাঝে মাঝে যে অত্যাচার না হইত তাহা নহে। কিন্তু বঙ্গের মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে, এই সহমরণ যে কত পবিত্র ও উজ্জ্বল ছিল, তাহার স্মৃতি বঙ্গের বহু পরিবারে প্রবাদবাক্যের মত হইয়া আছে। আমরা শৈশবে বহু পরিবারে সংঘটিত সহমরণের ইতিহাস শুনিয়াছি, সর্ব্বত্রই তাহা প্রেমের উচ্চবার্ত্তা বহন করে—সহমৃতাদের স্মৃতি বঙ্গের ইতিহাসের অতি পবিত্র ও গৌরবজনক। সে কাল গিয়াছে, সে আদর্শ ভাঙ্গিয়াছে, আমরা তাহা আর ফিরিয়া চাহি না—তাহা আর হইবার নহে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় পাদ্রীদের সঙ্গে সুর মিলাইয়া রাজা রামমোহন সেই জগদ্-বন্দিতাদের স্মৃতির পূজা দিতে ভুলিয়াছেন, কেবলই অত্যাচারের পৈশাচিক লীলা দেখিয়াছেন। সহমরণের বিরুদ্ধে চেষ্টা করিয়া তিনি ভালই করিয়াছিলেন, এই চেষ্টা যুগোপযোগী। কিন্তু তিনি দেশের ছেলে হইয়া সেই দেবীদিগের অলৌকিক গুণের জন্য একটি মাত্র প্রশংসার কথা বলেন নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী উদার চিত্ত সেই স্বর্গীয়া রমণীদের পায়ে পূজার অর্ঘ্য দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। তিনি লিখিয়াছেন: "বাংলার প্রাণ-বিসর্জ্জন-পরায়ণা পিতামহীকে আজ আমরা প্রণাম করি। তিনি যে জাতিকে স্তন্য দিয়াছেন, স্বর্গে গিয়া তাহাকে বিস্মৃত হইবেন না। হে আর্য্যে! তুমি তোমার সন্তানদিগকে সংসারের চরম ভয় হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দাও। তুমি কখনও স্বপ্নেও জান নাই যে তোমার আত্ম-বিস্মৃত বীরত্বদ্বারা তুমি পৃথিবীর বীরপুরুষদিগকেও লজ্জিত করিতেছ। তুমি যেমন দিবাবসানে সংসারের কাজ শেষ করিয়া নিঃশব্দে পতির পালঙ্কে আরোহণ করিতে, দাম্পত্য লীলার অবসান-দিনে সংসারের কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া তুমি তেমনি সহজে বধূ-বেশে সীমন্তে সিন্দূর পরিয়া পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছ। মৃত্যুকে তুমি সুন্দর করিয়াছ, পবিত্র করিয়াছ,—চিতাকে তুমি বিবাহশয্যার ন্যায় আনন্দ-ময় করিয়াছ। বাংলা দেশের পাবক তোমারই পবিত্র জীবনাহুতি দ্বারা পূত হইয়াছে, আজ হইতে এই কথা আমরা স্মরণ করিব। আমাদের ইতিহাস নীরব, কিন্তু অগ্নি আমাদের ঘরে ঘরে তোমার বাণী বহন করিতেছে। তোমার অক্ষয়—অমর স্মরণ-নিলয় বলিয়া সেই অগ্নিকে

—তোমার সেই অন্তিম বিবাহের জ্যোতিঃ-সূত্রময় অনন্ত পট্ট-বসনখানিকে আমরা প্রত্যহ প্রণাম করিব। সেই অগ্নিশিখা তোমার উন্নত বাহুরূপে আমাদের প্রত্যেককে আশীর্ব্বাদ করুক। মৃত্যু যে কত সহজ, কত উজ্জ্বল, কত উন্নত, হে চিরনীরব স্বর্গবাসিনি! অগ্নি আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণে তোমার নিকট হইতে সেই বার্ত্তা বহন করিয়া অভয় ঘোষণা করুক।" অবশ্য অল্পসংখ্যক স্থানে যে জোর-জবরদস্তি না চলিত তাহা নহে, কিন্তু এই ব্যাপক পদ্ধতির মূলকথা ছিল প্রেমার্থে আত্মবিসর্জ্জন। যাঁহারা বাঙ্গলার পল্লীগীতিগুলি পড়িবেন, তাঁহারা ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন। বঙ্গের মহিলাদের সর্ব্বস্ব দেওয়া প্রেমের প্রকৃত দৃশ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন—বঙ্গের মর্ম্মকথা বলিতে সুদক্ষ পল্লী-কবিরা। একদিকে স্বামীর চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন, অপরদিকে জীবনে প্রেমের জন্য সমস্ত দুঃখ ও মৃত্যু বরণ করিয়া লইয়া এই নায়িকারা যে ভাবে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন—তাহাতে এই উভয় ব্যাপারেরই মর্ম্মকথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। এ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ আভিধানিক জি. সি. হটন তাঁহার বাঙ্গলা ও ইংরাজী শব্দের নির্ঘণ্টে (A Glossary of Bengali and English—1825 A.D.) লিখিয়াছিলেন, "To crown all, the matchless constancy and fearless indifference of death in the Indian widow, who voluntarily mounts the funeral pile in the expectation of accompanying her husband to a region of bliss." [সকলের সেরা দৃষ্টান্ত, হিন্দু বিধবার অতুলনীয় নিষ্ঠা এবং মৃত্যুর প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন উপেক্ষার ভাব, যাহাতে তাঁহারা স্বামীর চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।]

এক সময়ে বঙ্গের মহিলাদিগের চিকিৎসার ভার পল্লীর মেয়েদের হাতেই ছিল বলিয়া মনে হয়। চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন, কৃষ্ণলীলার অভিনয় দেখিতে দেখিতে যখন রাধিকা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, তখন রাজধানীর এক প্রাচীনা আহিরিনীকেই চিকিৎসার জন্য আনা হইল, তিনি মন্ত্র-তন্ত্র, তুকতাক এবং গাছগাছড়া প্রভৃতি ঔষধের উপাদান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন। যখন রাজকন্যার চিকিৎসার জন্য এইরূপ মহিলা-চিকিৎসকের আহ্বান হইল, তখন মনে করিতে পারা যায়, মেয়েদের চিকিৎসার জন্য মেয়ে-চিকিৎসকই ডাকা হইত। অবশ্য চণ্ডীদাসের রচনা কাব্য-কথা, কিন্তু তথাপি রূপ-কথা ও কবি-কল্পনার ফাঁক দিয়া আমরা সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার আভাস পাইতে পারি—এই হিসাবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়ও তাহাদের স্থান আছে।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি বহু প্রাচীন কাব্যে বাঙ্গলাদেশের তাৎকালীন প্রসিদ্ধ দেবমন্দির-গুলির উল্লেখ আছে। অজ্ঞ পুঁথিলেখকগণের দোষে সেই স্থানগুলির নাম অনেক পরিবর্ত্তিত ও বিকৃত হইয়াছে, দেববিগ্রহগুলির নাম ও তাহাদের ভৌগোলিক সংস্থান লইয়া আলোচনা চলিতে পারে। হয়ত পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার যে সকল তীর্থস্থান ছিল, তাহার কতকগুলি এখনও বিদ্যমান আছে। সেই দেবতাগুলির কোন কোনটির পূজা হয়ত বৌদ্ধযুগ কিংবা তৎপূর্ব্ব হইতেও চলিয়া আসিয়াছে। দেবতত্ত্ব জানিতে হইলে স্বয়ং

যাইয়া তত্তৎস্থল পরিদর্শন করা দরকার—এই দেবাবিগ্রহের সহিত অনেক সময় প্রাচীন ইতিহাসের কথা জড়িত আছে। যাঁহারা বাঙ্গলার ইতিহাসের গবেষণা করেন, আমি তাঁহাদিগের দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

বাঙ্গলার চাষাদিগের শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাদের সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা দরকার। ইহাদের একখানি নিজস্ব শাস্ত্র আছে,—তাহা ইহাদের কাছে বেদের ন্যায়; নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে এই শাস্ত্রের অনুশাসন তাহারা সর্ব্ববিষয়ে মানিয়া চলে। এই শাস্ত্র তাহারা লিখিত আকারে শিখে না—ইহা তাহাদের মুখে মুখে কত যুগ হইতে চলিয়া আসিয়াছে। ভাষা অবশ্যই রূপান্তরিত হইয়াছে এবং যুগে যুগে নূতন কথার সংযোজনা হইয়াছে—তথাপি ইহা খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী হইতে চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যখন বাঙ্গলার সমস্ত লোকই কৃষি-কার্য্য করিত ও বীজবপন, বাণিজ্যের আরম্ভ অথবা শুভকার্য্য অনুষ্ঠানের জন্য গ্রহ-উপগ্রহের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত—এই শাস্ত্র তখন হইতে বিরচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা অনেক সময়েই একান্ত নির্ভুল এবং চাষাদের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও বাঙ্গলার ঋতুভেদে উৎপাদিকা শক্তির বৈষম্য এবং আবহাওয়া প্রভৃতির গভীর অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। এই প্রবচনগুলি ডাক ও খনার বচন বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বাঙ্গলার দুর্ভাগ্য যে বিলাত হইতে যে সকল বাঙ্গালী কৃষিতত্ত্বের উপাধি লইয়া এদেশে আসেন, কিংবা যাঁহারা বোম্বাই সহরে যাইয়া কৃষিবিজ্ঞানে পারদর্শী হন—তাঁহারা এতদ্দেশের সম্পূর্ণ উপযোগী এবং বাঙ্গলার অবস্থার সহিত সম্যক্ পরিচিত "ডাক ও খনার" এই অভ্রান্ত শাস্ত্রকে নিতান্ত উপেক্ষা করেন। গণিতের পণ্ডিতেরা যেরূপ শুভঙ্করী আর্য্যার কোন খবরই রাখেন না, কৃষি-বিষয়ক বিজ্ঞানবিদ্ এদেশের পণ্ডিতেরাও ডাক-খনার কোন তত্ত্বই অবগত নহেন। যাহা লইয়া উক্ত বিষয়গুলির হাতেখড়ি হওয়া উচিত, সেই উপকরণ অগ্রাহ্য করাতে এই পণ্ডিতগণের শিক্ষার ভিত্তি চিরকালই কাঁচা থাকিয়া যায়। ডাক ও খনার সহস্র সহস্র প্রবচন এখনও পল্লীগ্রাম খুঁজিলে উদ্ধার করা যাইতে পারে। কয়েকটি প্রবচন নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। (১) চৈত্রে কুয়া (-সা) ভাদ্রে বান। নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান। (চৈত্রে কোয়াসা ও ভাদ্রে বান হইলে মড়ক লাগে।) (২) পূর্ণ আষাঢ়ে দখিনা বয়। সেই বচ্ছর বন্যা হয়। (দখিনা=দক্ষিণা হাওয়া।) (৩) পৌষে গরমি বৈশাখে জাড়া। প্রথম আষাঢ়ে ভরবে গাড়া। (পৌষ মাসে যদি গরম হয় এবং বৈশাখ মাসেও যদি শীত থাকে, তবে সে বৎসর আষাঢ়ের প্রথম দিকেই ভয়ানক বর্ষা হইবে।) (৪) কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা। মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা। বল্‌গে চাষারে বাঁধতে আল। আজ না হয় হবে কাল। (কোদাল ও কুড়ুল দিয়া কোপাইলে যেরূপ হয়, যখন মেঘগুলি সেইরূপ ছিন্ন হয় এবং তখন যদি মাঝে মাঝে হাওয়া দেয়, তবে বৃষ্টি আসন্ন বুঝিতে হইবে, সুতরাং তখনই চাষাদের বৃষ্টি ধরিবার জন্য ক্ষেতে আইল বাঁধিয়া রাখা উচিত।) (৫) যদি বর্ষে আগনে, রাজা নামেন মাগনে। যদি বর্ষে পৌষে, কড়ি হয় তুষে। যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।

যদি বরে ফাগুনে, চিনা কাওন হয় দিগুণে। জ্যৈষ্ঠ শুকে আষাঢ়ে ধারা, শস্তের ভার না সহে ধরা। মাঘ মাসে বর্ষে দেবা, রাজা ছেড়ে প্রজার সেবা। (যদি অগ্রহায়ণে বৃষ্টি হয়, তবে এরূপ দুর্ভিক্ষ হইবে যে, রাজাকেও ভিক্ষাভাণ্ড লইয়া বাহির হইতে হইবে। পৌষে বৃষ্টি হইলে দুর্ভিক্ষ আরও ভয়ানক হয়, তখন তুষ বিক্রয় করিয়াও অর্থলাভ হয়। যদি জ্যৈষ্ঠমাসে বৃষ্টি না হইয়া আষাঢ়ে খুব বৃষ্টি হয় তবে অপর্য্যাপ্ত শস্য হয়। মাঘ মাসে বৃষ্টি হইলে প্রজারা এত ধনী হইবে যে, রাজা ছাড়িয়া প্রজার কাছে গেলেও অর্থলাভ হইবে।) (৬) মেঘ করে রাত্রে আর দিনে হয় জল। তবে জেনো মাঠে যাওয়াই বিফল। (৭) আষাঢ়ে নবমী শুকুল পখা, কি কর শ্বশুর লেখা জোখা। যদি বর্ষে রিমিঝিমি। শস্যের ভার না সহে মেদিনী। যদি বর্ষে মুষলধারে, মধ্যসমুদ্রে বগা চরে। যদি বর্ষে ছিটে ফোঁটা, পর্ব্বতে হয় মীনের ঘটা। (শুক্লপক্ষীয় আষাঢ়ের নবমীতে যদি মুষলধারে বৃষ্টি হয়, তবে খনা তাহার শ্বশুরকে বলিতেছেন, কেন আর হিসাবটিসাব করিতেছেন—আমার কথা মানিয়া লউন, ঐ তিথিতে ঐরূপ বৃষ্টি হইলে সেবার এরূপ অনাবৃষ্টি হইবে যে, মধ্যসমুদ্রও শুকাইয়া যাইবে—সেখানে চড়া পড়িবে ও তথায় বক চরিয়া বেড়াইবে। যদি খুব প্রবল বৃষ্টি না হইয়া ঐ তারিখে ছিটেফোঁটা অর্থাৎ অল্প বৃষ্টি হয়, তবে সেবার বর্ষা এরূপ বেশী হইবে যে, পর্ব্বতের উপরও মৎস্য দেখা দিবে। যদি রিমিঝিমি বৃষ্টি হয় অর্থাৎ অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া ছোট ছোট বিন্দুতে অবিশ্রান্ত বর্ষা হয়, তবে সেবার অপর্য্যাপ্ত শস্য হইবে।) (৮) খনা ডেকে ব'লে যান। রোদে ধান ছায়ায় পান। (যত রৌদ্র বেশী পাইবে, ততই ধান্য ভাল হইবে এবং যত বেশী ছায়া পাইবে, ততই পান বেশী হইবে।) (৯) আশ্বিনে ঊনিশ কার্ত্তিকের ঊনিশ, বাদ দিয়া যত পারিস মটর কলাই বুনিস। (১০) খনা বলে চাষার পো। শরতের শেষে সরিষা রো। (১১) সাত হাত তিন বিঘতে। কলা লাগাবি মায়ে পুতে। কলা লাগিয়ে না কাট পাত। তাতেই কাপড় তাতেই ভাত। (১২) যদি থাকে টাকা করবার গোঁ, তবে চৈত্র মাসে ভুট্টা রো। (১৩) দিনে রোদ রাতে জল, তাতে বাড়ে ধানের বল। (১৪) শুনরে বাপু চাষার বেটা। মাটীর মধ্যে বেলে যেটা। তাতে যদি বুনিস পটোল। তাতেই তোর আশা সফল। (১৫) বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে হলুদ রোও। দাবা পাশা খেলা ফেলিয়া থোও। (১৬) ফাল্গুনে আগুন চৈতে মাটী। বাঁশ বলে শীঘ্র উঠি। শুন বাপু চাষার বেটা। বাঁশের ঝাড়ে দিও ধানের চিটা। দিলে চিটা বাঁশের গোড়ে। দুই কুড়া ভুঁই বেড়বে ঝাড়ে। (১৭) খনা বলে শুন শুন। শরতের শেষে মূলো বুন। (১৮) তামাক বুনে গুড়িয়া মাটী। বীজ পুত গুটি গুটি। ঘন ঘন পুত না। পৌষের অধিক রেখো না। (১৯) ব'লে গেছে বরাহের পো। দশটি মাস বেগুন রো। চৈত্র বৈশাখ দিবে বাদ। ইথে নাই কোন বিবাদ। (২০) অগ্রহায়ণে যদি না হয় বৃষ্টি। তবে না হয় কাঁটালের সৃষ্টি। (২১) ডাকছেড়ে বলে রাবণ। কলা রোবে আষাঢ় শ্রাবণ। তিন শত ঝাড় কলা রয়ে। থাক গৃহী ঘরে শুয়ে।

এইরূপ অসংখ্য প্রবচন আছে। কতকগুলি রন্ধন সম্বন্ধে—যথা, যত জ্বালে ব্যঞ্জন মিষ্ট। তত জ্বালে ভাত নষ্ট। (ব্যঞ্জন রাঁধিতে যত বেশী জ্বাল দিবে ততই স্বাদ, কিন্তু ভাত রাঁধিতে

বৃহ আল ভাল।) আঁতুড় ঘর সম্বন্ধে, আকাশের অবস্থা সম্বন্ধে, সর্ব্বপ্রকার কৃষি সম্বন্ধে—এই সকল প্রবচন বাঙ্গলার পক্ষে খাঁটি সত্য। যখন বাঙ্গালীর চাকুরী মিলিতেছে না, তখন আমাদের কৃষির জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে; কিন্তু এই প্রবচনগুলি কি এখন আমাদের উদ্ধার করা উচিত নহে?

আমার নিকট খনার বচনের একটা সংগ্রহ আছে। বাঙ্গলা পঞ্জিকাগুলিতে কিছু কিছু সংগ্রহ আছে, কিন্তু চাষার পল্লীতে না গেলে এ সংগ্রহ সম্পূর্ণ হইবে না। শিক্ষিত বাঙ্গালী বাবুর যে সেইটিই মহাভয়ের কথা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মৈথিলি ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবুয়া মিশ্র জ্যোতিষাচার্য্য মহাশয় বলেন যে তাঁহাদের দেশের জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় অনেক মৈথিলী পুঁথিতে (কোন কোনটি ৩০০।৪০০ বৎসরের পূর্ব্বের) অথ "খনাবচনং" বলিয়া বাঙ্গলা ভাষায় রচিত খনার বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই সকল প্রবচনের বটতলার কতকগুলি সংস্করণ আছে। তাহাতে বেশী বচন সংগৃহীত হয় নাই। ইহাদের কাল নির্ণয় করা সহজ নহে, বৃহৎসংহিতা (৫ম শতাব্দী), এমন কি পতঞ্জলির মহাভাষ্য (খৃঃ পূ ৩০০ শতাব্দী) প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকে এই সকল প্রবচনের মত কতকগুলি বচন সূত্রাকারে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু এতদ্দেশ-প্রচলিত খনার বচন নামধেয় প্রবচনগুলিতে ঠিক বাঙ্গলা দেশের কথাই বেশী করিয়া পাওয়া যায়। নারী-চরিত্র, জ্যোতিষিক প্রসঙ্গ এবং সামাজিক বিষয়ের প্রবচনই ডাকের কথায় বেশী।

এই সকল প্রবচনে মাঝে মাঝে প্রাচীন ইতিহাসের ইঙ্গিত আছে। ভগীরথ যে গঙ্গার গতি ফিরাইয়া দিয়া একটা বিরাট্ পূর্ত্তকর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন, পৌরাণিক উপাখ্যানের আড়ালে তাহা চাপা পড়িয়াছে—কিন্তু খনার বচনে "মরবি যদি মরগে ভগার খাদে"—ছত্রটি পাওয়া যায়। "খাদ" অর্থ "খাল"—সুতরাং ভগীরথ যে খাল কাটিয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যাইতেছে। আর একটি প্রবচন এইরূপ:—"উঠ়ে শুতে পাশমোড়া, তার অর্দ্ধেক ভীমে ছোঁড়া, ভবার চৌদ্দ ভবীর আট, এই সব ক'রে জন্ম কাট। এ যদি না করতে পারিস, ভগার খালে গিয়ে ডুবে মরিস।" এখনও গোঁড়া ব্রাহ্মণদের রীতি আছে যে গঙ্গায় স্নান করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা এক মুঠ মাটী নদী হইতে তুলিয়া তীরে ক্ষেপণ করিয়া শেষে স্নান করেন। এই বিরাট্ পূর্ত্তকার্য্যে যে হিন্দুমাত্রই সহযোগিতা করিয়াছিল এবং কোন কালে এই ধারা রুদ্ধ না হয়, এজন্য প্রত্যেক নাগরিকেরই নিত্য-সাহায্য বাধ্যতামূলক ছিল, এই রীতিদ্বারা যেন সেই কথার আভাস পাওয়া যায়।

আবার শুভদিন ও অশুভদিন সম্বন্ধে অনেক লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী জনসাধারণ প্রতি মুহূর্ত্তে সমস্ত শাস্ত্রীয় শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া সিংহবিক্রমে বন্ধন মুক্ত হইতে পারে। খনার এই বচনটির প্রতি লক্ষ্য করুন—

"রজক দেখবে যখন, কাপড় ছাড়বে তখন॥ নাপিত দেখবে যখন, খেউরি হবে তখন॥ কিসের তিথি কিসের বার। লাফ দিয়া হও গহিন পার॥ জল ভাঙ্গ গঙ্গার জল, বল বল বাহু বল॥ আর যত সব ভাসা দিসা। খনার বিচারে বুদ্ধিনাশা॥"

ইহার পূর্ব্বেই একটি বচনে পাই সোম ও শুক্র বার বাদ দিয়া নূতন কাপড় পরিবে, রবিবারে ও মঙ্গলবারে খেউরি হইবে না, জলপথে বিদেশে যাইতে হইলে অনেক অশুভ দিন বর্জ্জন করিতে হইবে। কতকগুলি নিষিদ্ধ দিনে রজকালয়ে কাপড় দিতে নাই; কিন্তু এইবার শৃঙ্খলিত পুরুষ বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইয়া বলিতেছেন—যখন রজক আসিবে, তখনই কাপড় দিবে—তাহাতে দিন-ক্ষণ নাই। নাপিত পাইলেই খেউরি হইবে এবং লাকাইরা সমুদ্র পার হইও, তাহাতে দিন-ক্ষণ দেখিতে হইবে না। জলের মধ্যে গঙ্গা-জল শ্রেষ্ঠ, এবং বলের মধ্যে বাহু বলই শ্রেষ্ঠ, গ্রহাদির বল কিছুই নহে। খনা বলিতেছেন ওসকল শাস্ত্রের বচনে কেবল বুদ্ধি নাশ করে এবং উহারা নিরর্থ।

আশ্চর্য্যের বিষয় অন্যান্য প্রাকৃতিক উপদ্রবের মত, ভূমিকম্প সম্বন্ধেও কতকগুলি পূর্ব্ব লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—"ভন্ ভন্ ক'রে উড়ে মশা। এক চাপড়ে শতেক মরে সে দিন মেদিনী নড়ে॥" (মশার যদি এরূপ বাহুল্য হয় যে, এক চাপড়ে একশটি বিনষ্ট হয়—সেই দিন ভূমিকম্প হইবে, জানিবে।) এইভাবে বন্যা ও ঝড়ের সূচনা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারির সূচনা প্রভৃতি ব্যঞ্জক অনেক প্রবচন আছে। ধান, চাল হইতে সুরু করিয়া মাষ কলাই প্রভৃতি বিবিধ ডাল, কচু, পান, বেগুন, কলা, আম, কাঁটাল প্রভৃতি বিবিধ ফল উৎপাদন করিবার উপযোগ্য আবহাওয়া এবং শস্য ও ফলের ব্যাধি নষ্ট করিবার উপায়—বাঙ্গলার কৃষিতত্ত্বের সমস্ত কথাই অতি সংক্ষেপে খনা দিয়াছেন। ডাকের বচনেও এ সকল কথা আছে, কিন্তু তাহাতে নরনারীর চরিত্রের অন্তর্দৃষ্টি সম্বন্ধে প্রবচনই বেশী। মৎসঙ্কলিত বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের প্রথম খণ্ডে উহা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে বিদেশী লোকেরা অনেকেই মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংরেজদের মন আমাদের উপর অনেকটা সদয় ছিল; তখন তাঁহারা আমাদের দোষগুণ উভয়ই সরলভাবে ব্যক্ত করিতেন। কেরি, ওয়ার্ড ও মার্সম্যান এদেশের রীতিনীতি অনেক সময়ে অতিরিক্ত ভাবে নিন্দা করিয়াছেন—তাঁহাদের খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের সুবিধার জন্য। কিন্তু এদেশের ভাল দিক্‌টাও তাঁহারা দেখিয়াছিলেন; তখনও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও কূটরাষ্ট্রনীতি ইংরেজ কি দেশীয় সমাজে প্রবেশ করে নাই। মিস মেওর মত লোক তখন একটিও ছিল না, বরঞ্চ এদেশের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে কত এলফিনষ্টন, ফার্গুসন, উইলসন, কোলব্রুক লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এখনও মহামনা গ্রীয়ারসন জীবিত আছেন—তুলসীদাসের প্রতি শ্রদ্ধায় যাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ কাউএল সাহেব মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডী পড়িয়া বিমুগ্ধ। তিনি এই কবিকে কখনও চসার এবং কখনও ক্রেবের সঙ্গে তুলনা করিয়া উচ্চাসন দিয়াছেন এবং স্বয়ং চণ্ডীকাব্যের অনেকাংশ ইংরেজী পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। হটন তাঁহার বাঙ্গলার অভিধানের (বাঙ্গলা হইতে ইংরেজী; ইহা একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ)

বিদেশীর অভিমত।

নির্বন্টের ভূমিকায় উচ্ছ্বসিত ভাষায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কতকটা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"তাপ ভূ-নিম্নে প্রবেশ করিতে যেরূপ দেরী হয়, সমাজের নিম্নস্তরে জ্ঞানের প্রসারও তেমনই সময়- ও কষ্ট-সাপেক্ষ। এই জ্ঞানের পরিধি যুগযুগান্তরের চেষ্টায় ভারতীয় কুটীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। যিনি এই তথ্য সহজ ও সরল স্বাভাবিক জীবনে আবিষ্কার করিতে সমর্থ, তিনি এই দেশের পাণ্ডিত্য ও পারিভাষিক মুন্সিয়ানার জটিলতা ব্যতীতও সেই জ্ঞান যে কতটা বিশ্বজনীন প্রসারতা এবং গভীরতা লাভ করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইবেন। সেই জ্ঞান যে সকল লোকের আছে, তাহারা যে উহা কত দুর্লভ ও মূল্যবান্ তাহা আদৌ অবগত নহে। সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি প্রায়-নগ্নদেহ কোন কুটীরবাসীর মুখে নর-চরিত্র এবং মানুষের কর্ত্তব্যাদি সম্বন্ধে এরূপ আশ্চর্য্য জ্ঞানের কথা শুনিবেন, যাহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া যাইবেন। তিনি তাঁহার এতদ্দেশীয় নিম্নতম চাকর-বাকরের মুখে চারিদিকের লোকের স্বভাব সম্বন্ধে এরূপ অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তির পরিচায়ক আলোচনা শুনিবেন, যাহা অন্য দেশের মাত্র মহাজ্ঞানীদের মধ্যে আশা করা যায়। তিনি পল্লীগুলির মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে খোলা হাওয়ার মধ্যে এরূপ সূক্ষ্ম শিল্প ও কারুকার্য্যের নমুনা দেখিবেন, যাহা যুগযুগান্তরের চেষ্টালব্ধ।

এই প্রদেশগুলির পর্য্যটক তাঁহার ভ্রমণকালে বর্ত্তমান শিল্পের অনেক নিদর্শন দেখিতে পাইবেন। তিনি অনেক মন্দির, মসজিদ এবং obelisk দেখিবেন, যাহা সদ্যঃফোটা ফুলের ন্যায় শিল্পীর কোমল হস্তের গন্ধ এখনও হারায় নাই। এইসকল মন্দিরের যে কোনটি য়ুরোপে কোন স্থানে থাকিলে তাহা সেই দেশের, সেই শিল্পীর ও সেই যুগের গৌরব বলিয়া স্বীকৃত হইত। সেইরূপ মন্দিরের খ্যাতিতে সমস্ত খৃষ্টীয় দেশগুলির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মুখরিত হইয়া উঠিত। এই শিল্পের অসাধারণ শ্রম, গঠন-নৈপুণ্য, নির্ম্মাণের কষ্ট ও অর্থব্যয় সম্বন্ধে কতই-না সুবৃহৎ পুস্তক লিখিয়া ইহাদিগকে সম্মানিত করা হইত। প্রাদেশিক এই সমস্ত শিল্পকার্য্যের নিদর্শন আমাদের গভীর বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কিন্তু যিনি একবার ইলোরার গুহা-মন্দিরগুলি দেখিবেন, শিল্পসাধনা—সুরুচি ও আয়তন সম্বন্ধে এই অত্যাশ্চর্য্য মন্দিরগুলির সমকক্ষতা করিতে পারে, তিনি জগৎ খুঁজিয়া এরূপ স্থাপত্য-শিল্পের নমুনা কোথায়ও পাইবেন না। যখন পর্য্যটক এই মন্দিরের নগরটি দেখিবেন, তখন যে অসামান্য প্রতিভাশালী ইহাদের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন এবং যেসকল কর্ম্মনিপুণ অধ্যবসায়শীল হস্ত ইহাদের আকার দিয়া গ্রানাইট্ পাথরে তাঁহাদের অমরকীর্ত্তি চিরকালের জন্য ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের পরিচয় পাইয়া তিনি সহজেই বুঝিবেন যে তিনি জগতের এমন এক অত্যাশ্চর্য্য জাতির মধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন, যাহাদের তুলনা নাই। তিনি তাঁহাদেরই বংশধরগণের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, যাঁহাদের অসাধারণ কল্পনাশক্তি ধ্বংসশীল ও অস্থায়ী উপকরণগুলি উপেক্ষা করিয়া তিনি

যে সকল অদ্ভুত কর্ম্ম করিতে পারিত, তাহা অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী পর্ব্বতের শিলা কাটিয়া তাঁহারা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন।

এমন সকল লোকও আছেন যাঁহারা এতদ্দেশীয় লোকের নীতিজ্ঞান আছে বলিয়া স্বীকার করেন না। যাঁহারা এরূপ অসার মত পোষণ করেন, তাঁহারা একবার এদেশের সৈনিকদের অসাধারণ বিশ্বস্ততা, আত্মসম্মানজ্ঞান এবং অপূর্ব্ব বীরত্বের কথা ভাবিয়া দেখুন। এদেশের লোকের সখ্যের আদর্শ কত বড়, তাহা একবার ভাবুন, বন্ধুর জন্ত বন্ধু—সুখে দুঃখের চূড়ান্ত পরীক্ষাস্থলে কিরূপভাবে আত্মনিবেদন করিয়াছেন—এদেশের ভৃত্যেরা সামান্ত কিছু উপকার পাইলে প্রভুভক্তির কি আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রদর্শন করে—এই সকল তাঁহারা একবার চিন্তা করুন। এই দেশের তপস্বীরা ভগবানের প্রীতিলাভের অন্ধবিশ্বাসে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কি উৎকট ভাবে নিপীড়ন করেন—তাহা ভাবুন। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে আমি সতীদের কথা কহিব। অতুলনীয় নিষ্ঠা এবং মৃত্যুর প্রতি একান্ত উপেক্ষার প্রতীক হিন্দু বিধবা স্বামীর সঙ্গলাভ করিবার আশায় স্বেচ্ছায় চিতানলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া থাকেন, সেই দৃশ্যের কথা আপনারা একবার স্মরণ করুন। যে জাতির মধ্যে এই সকল মহাগুণের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহারা সাধারণ মনুষ্যের পর্য্যায়ভুক্ত নহেন। যদি বিধি-প্রবর্ত্তক শাসনকর্ত্তারা এই সকল একনিষ্ঠ নৈতিক গুণ লক্ষ্য করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন, তবে এই জাতিকে উন্নতির শেখরদেশে আরূঢ় করাইয়া অনায়াসে ইহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।"

["Knowledge, which like heat, pervades with difficulty the mass beneath, has in the progress of ages penetrated into the cottage; and the man who knows how to discover it in the simple language of nature, even though it be unaccompanied by pedantic commonplace or technical obscurity, will be astonished at its universality and profundity without its possessor being conscious either of its rarity or its value. He will hear the most profound desertations on human life and actions from the mouth of the almost naked peasant. He will discover a knowledge of character in the lowest of his menial servants, that would not dishonour the most acute penetration and accurate observation. He will behold in his progress through the country, the most delicate arts pursued in the open air and each affected by a simplicity of process that could only result from the felicitous contrivances of centuries upon centuries.

In his travels through the provinces it may be his fortune to see many splendid specimens of modern art. He may observe temples, mosques and obelisks that have scarcely lost the bloom of the artificer's hand: Works that in Europe would each have been the glory of its age, its country and its projector; the fame of which would have resounded

from one end of christendom to the other, and be consecrated in elaborate descriptions, commemorative of its proportions and its extension, its difficulties and its expense. These he may veiw with amazement ... he will be convinced that he is amongst the most surprising race of men that ever existed ; among the descendants of those who wishing to proclaim to posterity the mighty things of which they were capable, and feeling the frail and perishable nature of the common records, conceived the bold design of cutting a memento of their skill and power in the living rock for ever.

There are those who would deny the possession of moral principles to the natives. Let such prejudiced and superficial observers bear in mind the moral dignity, the jealous sense of honour and the heroic fortitude of the native soldier ; the singular fidelity and affection of the people in their plighted friendship for each other, through every extreme of good or evil ; the devoted attachment of servants who are treated with any degree of kindness and consideration by their masters ; the self-inflicted torments of the ascetic in the blind hope of making himself acceptable to his God ; and to crown all, the matchless constancy and fearless indifference of death in the Indian widows, who voluntarily mount the funeral pyre in the expectation of accompanying her husband to a region of bliss. A people capable of these things are of no common character and nothing but the skill of the legislator is required to direct such steadfastness of principle to whatever can advance and perpetuate their happiness." (Pages viii, ix.)]

এদেশের চাষাদের হয়ত বর্ণজ্ঞান অনেকেরই ছিল না বা নাই, কিন্তু পূর্ব্বকালে গ্রামে গ্রামে এত পাঠশালা ছিল যে, লঙ্ সাহেব তাঁহার ক্যাটালগে বিস্ময়ের সহিত প্রাচীন বঙ্গে লেখাপড়ার বিস্তারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অনেক সময় বর্ণজ্ঞান না থাকিলেও বিষয়জ্ঞান তাহাদের এতটা ছিল এবং হয়ত এখনও আছে যাহাতে তাহারা শিক্ষিত রূপে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। এ সম্বন্ধে হটন সাহেব ও তৎসময়ের অপরাপর অনেক ইংরেজও ইঙ্গিত করিয়াছেন। পাঠক বর্ণজ্ঞানশূন্য বাঙ্গলার চাষাকে ভিল, সাঁওতাল বা কুকী মনে করিবেন না। বাঙ্গলার চাষা সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ পৃথিবীর অতি শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মতগুলির সম্মুখীন হইয়াছে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ঋষির আশ্রম হইতে উপনিষদের উপদেশ শুনিয়াছে; পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইন্দ্রিয়সংযম, নীতিসূত্র ও ত্যাগসম্বন্ধে অবহিত হইয়াছে। নব ব্রাহ্মণ্য তাহাদিগকে ভক্তির বন্যায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব মহাজনগণ, কথক ও বাউল-দরবেশের প্রসাদে, তাহারা ভক্তি, ধর্ম্ম ও জ্ঞানের নানা সারগর্ভ উপদেশ শুনিয়াছে। অন্য দেশে জনসাধারণ ভাগবত জ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ—শ্রেষ্ঠ মনীষীরা যে চিন্তা করেন, জনসাধারণকে তাহা তাঁহারা বিলাইতে জানেন

না। ইলিয়াড কাব্য হইতে টেনিসনের গীতি পর্য্যন্ত উচ্চশিক্ষিতের পাঠাগারের সমস্ত দ্রব্যই জনসাধারণের পক্ষে নিষিদ্ধ। বিলাতের কয়জন চাষা সেক্সপীয়রের নাটক বা চসারের কাব্যের কথা জানে? কিন্তু এদেশের কোন্ চাষা—মুসলমান চাষাকে বাদ দিয়া বলিতেছি না,—রামায়ণ, মহাভারতের কথা জানে না? ৫০০ বৎসরের কৃত্তিবাস, বহু প্রাচীন ধর্ম্মমঙ্গল, এমন কি শূন্যপুরাণ, গোরক্ষবিজয়, মহীপালের গান, চণ্ডীমঙ্গল, মনসাদেবীর গান—এই চাষারাই জিয়াইয়া রাখিয়াছে। বর্ণজ্ঞান না থাকিলেও পদাবলীর অপূর্ব্ব সম্পদ্ ও পালা-গানের আশ্চর্য্য কবিত্বের ভাণ্ডারের চাবি ইহাদেরই কাছে। ডাক ও খনার বচন ইহাদেরই কণ্ঠে, কবিকঙ্কণের চরিত্র-বিশ্লেষণের এবং মহাজনের পদ-কীর্ত্তনের আসর ইহারাই জমাইয়া রাখিয়াছে। বঙ্গের যাহা কিছু প্রেম ও জ্ঞানের গরিমা—নিরক্ষর চাষীরাই তাহার মালিক। ইংরেজী বিদ্যার প্রচলন অবধি যে জ্ঞানের ধারাবাহিকত্ব এতকাল আপামর সাধারণের মধ্যে (বর্ণজ্ঞান থাকুক বা না থাকুক) চলিয়া আসিয়াছিল, তাহার গতি থামিয়া গিয়াছে।

এই জন্যই বাঙ্গলার চাষা যাহা জানে বা বলে তাহা শুনিয়া বিদেশীরা স্তব্ধ হইয়া যায়, হটন সাহেবের উক্তি কিছুমাত্র অতিবাদ নহে। বাঙ্গলার চাষা কত বিপ্লবের মধ্যে বাস করিয়াছে,—দুর্ভিক্ষ, অজন্মা, মহাজন ও জমিদারের অত্যাচার, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মহামারী এ সকল তো তাহাদের নিত্যকার সঙ্গী, তবু ক্ষেতে দাঁড়াইয়া সে যাহা দেখে, তাহাতে বাস্তব অপেক্ষা অবাস্তবের কথাই তাহার বেশী মনে পড়ে। ইংরেজ কবির আর্ত্তনাদ—

I am acquainted with sad misery as the galley-slave is with his oar. [শৃঙ্খলিত জাহাজের ক্রীতদাস যেরূপ জাহাজের দাঁড়কে চিনে, (তাহা হইতে তাহার মুক্তি নাই, সারাদিন সেই দাঁড় টানিতেই হইবে) দুঃখের সহিত আমি তেমনই পরিচিত' (John Webester)] কিন্তু আমাদের চাষা দুঃখকে সর্ব্বাঙ্গে বহন করিয়া অবাস্তবের স্বপ্ন দেখে। বৌদ্ধদর্শন ও হিন্দুর প্রেমশাস্ত্রের তত্ত্ব তাহাকে যে উর্দ্ধলোকে স্থাপিত করিয়াছে সে আসন টলায় কে? তাহাদের জন্য রামপ্রসাদাদি কবি তাহাদের মনের কথাগুলি ছন্দে বাঁধিয়া দিয়াছেন। ঘাস নিড়াইতে নিড়াইতে, লাঙ্গল চালাইতে চালাইতে সে তাহাই গাহিয়া শান্তি লাভ করে—"মনরে কৃষিকাজ জান না—এমন মানব জীবন রইল পড়ে, আবাদ কর্লে ফলতো সোনা।" কলু ঘানি চালাইতে চালাইতে গাহে—"মা আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোখঢাকা বলদের মত, ভবের গাছে বেঁধে দিয়া মা, পাক দিতেছে অবিরত—কি দোষ করিলে আমার ছটা রিপুর অনুগত।" দুর্য্যোগ, ঝড় তুফানে পড়িয়া যখন তাহার তরীখানি ডুবু ডুবু—তখনও সে বাহিরের বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তাহার জীবনতরণীর কথা স্মরণ করে—"কাল সমুদ্র দেখে আমার একা যেতে ভয় করে—গুরু আমায় ফেলে যেও নারে!" কিংবা তাহার জীবনতরীর একমাত্র কর্ণধারের কাছে কাঁদিয়া বলে, "মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে—আমি আর বাইতে পারি না। জীবন ভরে বাইলাম বৈঠারে, তরী—ভাটার সময় আর উজায় না।" দিন-মজুর কুয়ো খুঁড়িতে খুঁড়িতে গায়—"দোষ কারু নয়গো মা—আমি স্বখাত সলিলে

ডুবে মরি শ্যামা। ষড়্‌রিপু হল কুন্দওস্বরূপ, পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ।" ঘরে বসিয়া পাশা খেলিতে খেলিতে চাষা গায়—"ভবের আশা খেলব পাশা বড় আশা মনে ছিল।")

এরূপ শত শত উদাহরণ দিয়া দেখান যাইতে পারে বাঙ্গলার চাষা মাটিতে বাস করিয়াও প্রকৃত পক্ষে অবাস্তব রাজ্যের অধিবাসী। সে জমিদার কি মহাজন—বা অদৃষ্টের ভৃত্য নহে, সে বুদ্ধ ও জৈন গুরুদের শিষ্য। একটুখানি বর্ণজ্ঞান দিয়া ইহাকে উন্নত করা এবং আকবরকে নাম সই করিতে শিখাইয়া শ্রেষ্ঠতর করিবার বাহাদুরী লওয়া—উভয়ই তুল্যরূপ। (বাঙ্গালী চাষা প্রশ্ন করে—"দীপ নিবিলে, আলো কোথা যায়? সুর থামিলে শব্দ কোথায় যায়?" (গোরক্ষবিজয়।) এইরূপ দার্শনিক প্রশ্ন কোন্ দেশের চাষা করিতে পারে? অন্য দেশের গ্রাম্য কবিতায়—বেদনার গম্ভীরতা, জীবনের উপভোগ, স্বাভাবিক কবিত্ব আছে, কিন্তু বাঙ্গলা পল্লীগাথায় প্রেমের যে তপস্যা আছে—জগতের আর কোথায়ও সেরূপ সাধনা আছে কিনা তাহা জানি না। পল্লীগাথাগুলিতে সেই আশ্চর্য্য তপস্যার কথা পড়িয়া নিতান্ত বিদেশী ভাবাপন্ন পাঠকও বাঙ্গলার চাষার প্রতি সশ্রদ্ধ হইবেন। এদেশের কবি অধ্যাত্ম-রাজ্যের নিজ জন। বাঙ্গলার গ্রাম্য কবির গাথা পড়িয়া এজন্য তাহাদের সৃষ্ট নায়িকাদিগকে চিত্রবিদ্যাবিশারদ মিসেস হেগ, সেক্সপীয়র ও রেইনীর নায়িকাদের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন; রোমা রোঁলা পল্লীগাথায় অপূর্ব্ব কাব্যশিল্পের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছেন এবং উইলিয়াম রথনষ্টাইন তাহাদের মধ্যে অজন্তার বিশ্ববিশ্রুত রমণীমূর্ত্তিদিগকে জীবন্ত পাইয়াছেন। জীবতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব যদি চাষারা বৌদ্ধ শ্রমণের নিকট পাইয়া থাকে,—হিন্দু ব্রাহ্মণের নিকট তাহারা ভক্তি ও প্রেম পাইয়াছে। সংসারের দুঃখ সে মায়ের হাতের 'মার ধ'র' মনে করিয়া সেই মাতাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে—'বারে বারে যত দুখ দিয়াছ, দিতেছ তারা, সে কেবল দয়া, তব জেনেছি মা দুখহরা।' ক্ষেতের কাজ করিতে করিতে সে যে গান গায়, তাহার মর্ম্ম ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোন্ দেশের চাষা বুঝিবে?) বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে সন্ধ্যাভাষায় বিরচিত লাল শশীর যে গানগুলি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের সকলগুলির মর্ম্মার্থ আমরা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকটি যে খুব উচ্চ অঙ্গের ভাবরাজ্যের কথা ও অবাস্তব তত্ত্বের সম্পদ্ তাহা সেগুলি পড়িলে পাঠকমাত্রেই ইঙ্গিতে বুঝিবেন।

বণিকদের কথা।

বাঙ্গলার বণিকেরা যে ক্রমশঃ অর্থগৃধ্নু ও দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছিল তাহা আমরা ষোড়শ শতাব্দীর কাব্যগুলিতেই দেখিতে পাই। পল্লী-গীতিকায় দেখিতে পাওয়া যায়—মগ ও মুসলমানদিগের মত হিন্দু ললনাদিগকে নদীর ঘাট হইতে বণিকেরাও হঠাৎ তুলিয়া লইয়া চম্পট দিতেছে। রূপকথায় শৈশবে আমরা শুনিয়াছি—সদাগরেরা স্নানার্থিনী সুন্দরী রমণী পাইলে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক তুলিয়া লইত। চট্টগ্রামের মঘাই বণিকের চিত্র 'মহিষাল-বন্ধু' নামক গীতিকায়, ভেলুয়া গীতির ভোলা বণিকের চিত্রে, এবং মহুয়া-গীতির বিলাসী বণিকের চরিত্র ইতিহাসের একটা পৃষ্ঠা কাব্য-কথায় লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই বণিকেরা নরমাংসাশী এবং অর্থলুব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। পল্লী-গীতিকায় দৃষ্ট হয় সাধারণ কাচ কি প্রস্তরখণ্ড ইহারা সময়ে সময়ে

মহামাণিক্য বলিয়া সরলপ্রকৃতি গ্রাম্য লোকদিগের নিকট বিক্রয় করিতেছে (Folk Literature of Bengal দ্রষ্টব্য)। কবিকঙ্কণ মুরারি শীলের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা একান্ত ধূর্ত্ত, সদসদ্‌জ্ঞানবর্জ্জিত ঠক বণিকের। সমাজে বহু মুরারি শীল না থাকিলে হয়ত কবি কাল্পনিক মুরারি শীলের এরূপ জীবন্ত চিত্র আঁকিতে পারিতেন না। বঙ্গ দেশের বিপুল বাণিজ্য যে নষ্ট হইয়া গেল তাহা দুর্নীতির ফল বলিয়াই মনে হয়। যে পর্য্যন্ত কোন শ্রেণীর লোক সুনীতিপরায়ণ ও ধার্ম্মিক থাকে, ততদিন তাহাদের পতন হয় না। এক সময়ে বাঙ্গালী বণিকের নাম ছিল "সাধু"। এই 'সাধু'শব্দের অপভ্রংশ 'সাউ' (শাহা, সাহু)। নৈতিক জগতেও এই সাধুদের চরিত্র-ভ্রংশ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

জাহাজ-নির্ম্মাণ।

বঙ্গদেশের বিস্তৃত বাণিজ্য-সম্বন্ধে উল্লেখ অনেক প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথি ও গীতিকায় পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে জাহাজগুলির আকার ও আয়তনাদিসম্বন্ধে অনেক পুস্তকে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বংশীদাসের (১৫৭৫ খৃঃ) মনসামঙ্গলে জাহাজ-নির্ম্মাণের একটা উৎসাহিত বিবরণ আছে। কবিকঙ্কণের তদ্রূপ বর্ণনায় অত্যধিক অতিরঞ্জন প্রবেশ করিয়াছে। জাহাজগুলি এক যুগে খুব বৃহৎ হইত, সেই সংস্কার অতিরঞ্জিত করিয়া কবিরা যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা অশ্রদ্ধেয়। "কোষা" নামক ডিঙ্গির উল্লেখ পল্লী-গাথার অনেক স্থলে পাওয়া যায়। ইশা খাঁর গীতিতে এই কোষার এক অতিরঞ্জিত বর্ণনা আছে। এখনও ঢাকা অঞ্চলে "কোষ" নৌকার ব্যবহার প্রচলিত আছে। জাহাজগুলির মধ্যে যেটিতে স্বয়ং সদাগর থাকিতেন এবং যাহা বিশেষ সুসজ্জিত হইত, তাহা 'মধুকর' নামে অভিহিত হইত। আমরা কাব্যগুলিতে জাহাজের বহু নাম পাইয়াছি, তাহার কোন কোনটি বেশ কবিত্বময়, যথা—"রাজবল্লভ," "রাজহংস," "সমুদ্রফেনা," "শঙ্খচূড়," "উদয়তারা," "গঙ্গাপ্রসাদ," "দুর্গাবর"। কোন কোন নাম প্রাকৃত-যুগের, যথা—"গুয়ারেখী," "টিয়াঠুটি," "ভাড়ার-পটুয়া," "বিজু সুজু" (বিজয় গুপ্ত)। ইহারা পুরাকালে যে খুব বৃহদাকৃতি হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাব্যের অতিরঞ্জনের মূলে কিছু না কিছু সত্য আছে। সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হওয়ায় যুগযুগান্ত পরে যে সকল সংস্কার ছিল, তাহা ক্রমশঃ পাড়াগেঁয়ে কবিরা বাড়াইয়া অশ্রদ্ধেয় করিয়া ফেলিয়াছেন। চাঁদ সদাগরের একটি জাহাজের মাস্তুল এত উঁচু ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে যে তাহার উপর উঠিলে বাঙ্গলা দেশ হইতে রাবণের লঙ্কা দেখা যাইত। কোন কোন বৃহৎ জাহাজে চাঁদ সদাগর হাট বসাইতেন; তামিলদেশীয়া নর্ত্তকীরা কোন কোনটিতে নৃত্য করিত। এই জাহাজের বহর এত বড়—দীর্ঘ ছিল যে, একদিকের নৌকায় যখন রৌদ্র খেলিত, সেই সময়েই অপরদিকের নৌকার উপর বৃষ্টি হইত ("তার পিছু বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে উদয়-তারা। অনেক নায় ঝড় বৃষ্টি অনেক নায় খরা।"—বিজয় গুপ্ত। কোন কোন জাহাজে কলিঙ্গদেশীয় সৈন্যগণ থাকিত। চাঁদ সদাগরের কোন ডিঙ্গা এত বড় ছিল যে তাহা ৮০ গজ জল ভাঙ্গিয়া যাইত। কোন জাহাজ এত বড় ছিল যে তাহা একদিকে ঠেকিলে নদীর পাড় ধসিয়া পড়িত ও নিম্ন ভূমিতে আটকাইয়া যাইত, তখন তাহাকে চালাইবার

জন্ত ছাগ-মহিষ বলি দিয়া কালী মায়ের তুষ্টি সাধন করিতে হইত। এই সকল আজগুবী বর্ণনার কতকগুলি অতিরঞ্জিত সংস্কার হইতে উৎপন্ন হইলেও ইহা চাঁদ সদাগরের অতুলনীয় বাণিজ্য, তরণী, নৌবল এবং বিপুল বৈভবের প্রতি ইঙ্গিত করে। তখন রাজপুত্র ও সদাগরের পুত্রের মর্য্যাদা প্রায় তুল্য ছিল। চাঁদ সদাগর রাজদণ্ড কেন ব্যবহার করেন, লঙ্কার রাজা এই প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, বাঙ্গলা দেশে বণিকেরা রাজার মতনই সম্মানিত। রূপকথা গুলিতে দৃষ্ট হয়, রাজপুত্র ও সওদাগরের পুত্রের মর্য্যাদা প্রায় তুল্য। সেই সকল বণিক-রাজের দেশে আজকাল জেলেরাও চারটি ভাত পায় না। সপ্তগ্রাম বাঙ্গলার প্রধান বন্দর ছিল। এখানে জাহাজ নির্ম্মিত হইত। সমুদ্রযাত্রার প্রাকালে সরস্বতী নদী হইতে বণিকেরা "মিঠা পানি"-তুলিয়া লইত। ঐ নদী শুকাইয়া যাওয়ার পর সপ্তগ্রামের ঐশ্বর্য্য লুপ্ত হয় এবং চট্টগ্রাম বঙ্গদেশের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। পল্লীগাথায় যে সকল বাণিজ্য-তরণীর বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে অতিরঞ্জন অতি অল্প। চট্টগ্রামে নির্ম্মিত জাহাজে চড়িয়া বাঙ্গালীরা এককালে লঙ্কা, লঙ্কাদ্বীপ, মাটাবান প্রভৃতি দেশে যাইতেন। "নিলঙ্কা" শব্দ বোধ হয় লঙ্কাদ্বীপকে, "প্রলম্ব" প্রম্বনমকে ও "আবর্ত্তনা" মাটাবানকে বুঝাইতেছে। "নাকুট," "অষ্টীলঙ্কা," "চন্দ্রসাল্য" প্রভৃতি যে সকল দেশের নাম পাওয়া যাইতেছে, তাহারা খুব সম্ভব ভারত-সাগরের কোন কোন দ্বীপ। চট্টগ্রাম ও তাম্রলিপ্ত বঙ্গদেশের এই দুই বন্দর বিশ্ববিশ্রুত। চট্টগ্রামের কর্ণফুলীর তীরবাসী "বালামী" নামক এক শ্রেণীর লোক জাহাজ নির্ম্মাণ করিত। এখনও বালামীদের বংশধরেরা ছোট ছোট জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। "বালামী নৌকা" ইহাদের নামানুসারে পরিচিত। চীন পরিব্রাজক মাহুন্দের লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়—একদা তুরস্কের সুলতান আলেকজাণ্ড্রিয়ার জাহাজ-নির্ম্মাণপদ্ধতিতে অসন্তুষ্ট হইয়া চট্টগ্রাম হইতে অনেকগুলি জাহাজ নির্ম্মাণ করাইয়া লইয়াছিলেন। আরবী লেখক ইদ্রিস দ্বাদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রামের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন—তিনি সে দেশের নাম করিয়াছেন "কর্ণবুল"—এই শব্দ 'কর্ণফুল' শব্দের অপভ্রংশ। ১৪০৫ খৃঃ অব্দে চীন দেশের মন্ত্রী চেং হো বাণিজ্য-সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্নের সমাধানার্থ স্বয়ং চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন, এবং ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ আরবীয় পর্য্যটক ইবনবতাতু চট্টগ্রামের জাহাজে চড়িয়া জাবা এবং চীনে গমন করিয়াছিলেন। ১৫৫৩ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগিজ নামু ডি চোনা (গোয়ার শাসনকর্ত্তা) তাঁহার সেনাপতি দি মাল্লাকে চট্টগ্রামে তাঁহাদের একটা বাণিজ্য-কেন্দ্রস্থাপনার্থ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। য়ুরোপীয় নব-উদ্ভাবিত যন্ত্র-চালিত জাহাজের প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রামের এই বিপুল জাহাজ-নির্ম্মাণ কারবারটি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে হতশ্রী হইয়া পড়িল। চট্টগ্রামে অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক জাহাজের মালিকদের নাম লোকে বলিয়া থাকে—তাঁহারা জগতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাইতেন। মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে তাঁহারা জীবিত ছিলেন—রজ, বসির, গুমানি মালম, মদন কেরানি, দাতারাম চৌধুরী প্রভৃতি জাহাজাধ্যক্ষদের কোন কোন জনের শতাধিক জাহাজ ছিল। ইহারা হার্ম্মাদদিগের অত্যাচারের সময়ে বৃহৎ নৌসজ্জ লইয়া অগ্রসর হইতেন। এই শ্রেণীবদ্ধ জাহাজ-

গুলিকে 'শ্লুপবহর' বলা হইত। যিনি হার্ম্মাদদিগকে দমন করিয়া খ্যাতি লাভ করিতেন, তাঁহাকে "বহরদার" বলা হইত। উনবিংশ শতাব্দীর আদিকালেও নাবিকগণের কেহ কেহ জীবিত ছিলেন; পিরু সদাগর, নসুমালুম, রামমোহন দারোগা প্রভৃতির নাম এখনও শোনা যায়। রামমোহন দারোগার জাহাজ বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া স্কটলণ্ডের টুইড বন্দরে গিয়াছিল। চট্টগ্রাম-নির্ম্মিত কতকগুলি জাহাজের বিবরণ সংক্ষেপে আমরা এখানে দিব :—

১। বালাম নৌকা—ইহা পূর্ব্বে যত বড় হইত, এখন আর তত বড় হয় না। সাধারণতঃ ইহারা ১৬ দাঁড়ে, পাল উড়াইয়া চলে। ইহাদের মধ্যে বড় গুলি ২০০ এমন কি ২৫০ টন ধান্য বোঝাই লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু ৫০ টনের অধিক মাল লইয়া ইহাদিগকে সমুদ্র-পথে যাইতে দেওয়া হয় না। এই ক্ষিপ্রগামী বালাম নৌকা যন্ত্রাদির সাহায্য বিনাও অনায়াসে ভারত-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ কাটিয়া চলিয়া যায়। এক সময়ে ইহারা অতি প্রকাণ্ড হইত।

২। গোধা নৌকা—ইহাও অতি প্রাচীন। এই নৌকাগুলি সচরাচর অতি দীর্ঘ হয়। ইহারা সাধারণতঃ শুঁটকি মাছের কারবারের জন্য ব্যবহৃত হয়। বর্ত্তমান কালে ইহারা সমুদ্র-পথে সোনাদিয়া, লালদিয়া, রাঙ্গাবালী প্রভৃতি বঙ্গোপসাগরের দ্বীপপুঞ্জে মৎস্যের কারবার উপলক্ষে যাতায়াত করে। এই নৌকাগুলি লৌহের পেরেক দিয়া আটকান হয় না। "গল্লক" নামক বেত দিয়া নৌকার বিভিন্ন অংশ জোড়া দেওয়া হয়, এবং সেই বেতের অবকাশে "খ্যামা" গুলি (ছিদ্র) দড়ি, তুলা, ধুনা প্রভৃতির দ্বারা এমন শক্ত করিয়া আটকান হয় যে, তাহাতে জলপ্রবেশের কোন সম্ভাবনা থাকে না। গোধা নৌকার ভিন্ন ভিন্ন অংশ খুলিয়া রাখা হয়। বর্ষাকালে সেগুলি জোড়া দিয়া নৌকা সমুদ্রযাত্রার জন্য প্রস্তুত করা হয়; ইহাদের গলুই হাঙ্গরমুখো করা হয়। যখন বর্ষাকালে সমুদ্রপথ পর্য্যটন করিয়া বিপুল মৎস্যের পশার লইয়া শত শত গোধা নৌকা কর্ণফুলী নদীতে আসিয়া নঙ্গর করে, তখন সেই মৎস্যব্যবসায়ীদের আত্মীয়স্বজন দামামা, দগড় ও ঢোল পিটিয়া ও বাঁশী বাজাইয়া তাহাদিগকে যেরূপ অভিনন্দন করে, তাহা একটা দর্শনীয় ব্যাপার।

৩। শ্লুপ নৌকাগুলি অনেকটা বালামের মতই, পর্ত্তুগীজ প্রভাবে কতকটা রূপান্তরিত হইয়া ঐ নাম পরিগ্রহ করিয়াছে।

৪। সারেঙ্গা নৌকা—কতকটা ডোঙ্গা বা সাল্‌তির মত। এগুলি সমুদ্রে যাইতে সাহসী হয় না; একটি বড় গাছ কুঁদিয়া নির্ম্মিত হয়।

৫। সাম্পান—অনেকটা হাঁসের মত আকৃতি, ইহা চীনা নৌকার ধরণে প্রস্তুত।

৬। কোন্দা—চট্টগ্রামের অরণ্যসমূহের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বৃক্ষ কুঁদিয়া এই শ্রেণীর নৌকা তৈরী হয়। ইহা বহু মাল লইয়া যাতায়াত করে, মাঝিরা ইহা লগি দিয়া ঠেলিয়া চালাইয়া থাকে।

এখন চট্টগ্রামের বাঙ্গালীরা যন্ত্রচালিত জাহাজনির্ম্মাণ শিক্ষা করিতেছে। মিঃ উইলিয়ামস্ এবং লেফটেন্যাণ্ট উইলসনের উৎসাহে ইহারা এই বিষয় শিখিয়াছে। উইলসন বাঙ্গালীদের হাতের কাজ দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহারা জাহাজ-নির্ম্মাণে সুদুর্লভ কৃতিত্ব দেখাইতেছে।

অধুনা মাধব, কালীকুমার ও দ্বারকানাথ জাহাজ-নির্ম্মাণে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। আমাদের স্বদেশী নেতাদের ইহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া উচিত, দুঃখের বিষয় ইহাদের নাম পর্য্যন্ত অনেকেই জানেন না।

পল্লী-গীতিকা-সাহিত্যে "নসর মালুম" নামক গাথায় (পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড, ১-৪৪ পৃঃ) জাহাজ ও সমুদ্রযাত্রাসম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মালুমেরা সমুদ্রপথের সমস্ত বিষয় অবগত হইতেন, তাঁহারা দীর্ঘ পর্য্যটনের প্রাক্কালে মানচিত্র আঁকিয়া লইতেন এবং নক্ষত্র দেখিয়া দিক্ নির্ণয় করিতে পারিতেন। সায়েস্তা খাঁর চট্টগ্রামে অভিযান-প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের ডিঙ্গিগুলির যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা কৌতুকাবহ (পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা দ্রষ্টব্য)।

জাহাজের অংশগুলির যে নাম চট্টগ্রামে প্রচলিত আছে তাহার কয়েকটি এখানে দিতেছি:—বাক (Rib), কাহন (floor), ইরাক (keel), সুকানকিলা (keelson), গুদস্তা (stern post), রাদ (stem), মাস্তল (mast), মাস্তলের চালুতা (rake of the mast), ইস্কো (batten)। "নুরন্নেহা ও কবর" নামক গাথায় (পূঃ গীঃ, ৪র্থ খণ্ড, ৯৩-১৩০ পৃঃ) নৌ-সৈন্য লইয়া জাহাজের বহর কি ভাবে যুদ্ধ করিতে যাইত, তাহার একটা উল্লেখযোগ্য বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মুসলমানেরা কোরানবাহী জাহাজকে অগ্রগামী করিয়া যুদ্ধের অভিযান করিতেন। কোরানের পশ্চাতে ধর্ম্মপ্রচারের অন্যবিধ উপকরণ, যথা—গোলা, গুলি, কামান প্রভৃতি জাহাজে বোঝাই থাকিত। প্রাচীন হিন্দু বানিজ্য সম্বন্ধে অনেক কথা ৪৭০-৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

গৃহ-নির্ম্মাণাদিসম্বন্ধে অনেক কথা প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে পাওয়া যায়। কোন কোন পুরাণে এ সম্বন্ধে কতকগুলি সূত্র প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের ডাক ও খনা এ বিষয়ে নীরব নহেন, তাঁহাদের সূত্র বাঙ্গলার কৃষকগণের মুখে মুখে—"পূবে হাঁস (পূর্ব্বদিকে জলাশয়—তথায় হংস বিচরণ করিবে), উত্তরে বাঁশ, পশ্চিম ঘিরে, দক্ষিণ ছেড়ে, বাড়ী করগে ভেড়ের ভেড়ে।"

গৃহ-নির্ম্মাণ।

বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে তারাপতি নামক কর্ম্মকাররাজের যে লৌহ-গৃহ-নির্ম্মাণের বর্ণনা আছে, তাহা পড়িলে কিরূপ সমারোহের সহিত পুরাকালে আমাদের হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মিত হইত তাহার একটা আভাস চোখের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এই স্থপতিরা হয়ত ভিন্ন দেশাগত ছিল, নতুবা সূত্রধর ও লৌহকর্ম্মকারদের জল অনাচরণীয় রহিয়া গেল কেন? ইহারা কোনরূপ নোংরা কাজ করে না, তথাপি ইহাদের জন্য পতিতের ব্যবস্থা কেন? বংশীদাসের বর্ণনায় স্থপতিশ্রেষ্ঠ তারাপতির রূপবর্ণনা পড়িলে মনে হয় যে এইজাতীয় লোক যে ভিন্ন দেশবাসী, তাহার একটা সংস্কার কবির মনে ছিল। তারাপতি অবশ্য কল্পিত চরিত্র, কিন্তু এই চরিত্র যে শ্রেণী-নির্দ্দেশ করিতেছে তাহা ঐতিহাসিক।

"তারাপতি কর্ম্মকার সকলের প্রধান।
অধিক গুণ তার জানে সর্ব্বকাম॥
দীর্ঘ দীর্ঘ হাত পা, মাথায় ঝাটা চুল।
ডান হাতে হাতুর বাম হাতেতে তুল॥

পিঙ্গল মাথার চুল বেকা কাকলী।
নাকে মুখে চক্ষুতে লাগিয়াছে কালী॥"

ইহার পর হাজার হাজার কামার একত্র হইয়া "আড়ে সাত গজ," "নয় গজ দীর্ঘে" এবং "উভে নয় গজ" লৌহের ঘরখানি কি ভাবে গড়িয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

বঙ্গে যে সকল কুটিরশিল্পের চর্চা হইত, তাহার কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। বাণিজ্যের জন্য বঙ্গের বস্ত্রশিল্প জগতের সর্ব্বত্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। ঢাকার মসলিনের কথা পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। (বঙ্গদেশের বাণিজ্যশিল্পের মধ্যে "শঙ্খশিল্প" একটি প্রধান, ঢাকা নগরী তাহারও শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র।)

শঙ্খের কারবারটা প্রথমতঃ দাক্ষিণাত্যেই ছিল। শঙ্খ-শিল্পিগণ তথায় 'পারওয়া' নামে অভিহিত হইত। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের অনেক শাঁখার কাজ তামিল দেশের প্রাচীন রাজধানী কোরকাই এবং কায়েলের ভগ্নস্তূপে আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে ভাবে তথায় শঙ্খ কাটা এবং কারুকার্য্যমণ্ডিত হইত, তাহাতে বুঝা যায় এই শিল্পীদের অস্ত্রশস্ত্র ঠিক ঢাকার শাঁখারীদের ব্যবহৃত হাতিয়ারের মতই ছিল। মালিক কাফুর কর্ত্তৃক চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে টিনিভেলি জেলায় হিন্দু-রাজধানীধ্বংসের পর এই শিল্পিগণ বঙ্গদেশে ঢাকায় আগমন করেন বলিয়া শ্রীযুক্ত জে. হোরনেল বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির জারন্যালের মেময়রের (memoir) ৪১১ পৃষ্ঠায় যে মত অত্যন্ত দ্বিধার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। এ সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। কিন্তু ঢাকার এই শিল্প যে এত আধুনিক তাহা মনে হয় না। হাতের শাঁখা বাঙ্গলা গৃহস্থ রমণী বহু পূর্ব্ব হইতেই ব্যবহার করিতেন এবং সেই শাঁখা যে দূরদেশবাসী শিল্পিরা প্রস্তুত করিয়া দিত, এমন মনে হয় না। শিবের প্রাচীন ছড়ায় বাঙ্গালী কবিরা দেবাদিদেবকে শাঁখারী সাজাইয়া গৌরীর সঙ্গে তাঁহার দাম্পত্য-কলহের পরিকল্পনা করিয়াছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় শ্রেণীর লোকেরাই শঙ্খকে অতি পবিত্র সামগ্রী বলিয়া মনে করিতেন; বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সময়ে এতদ্দেশীয় মেয়েরা যে শাঁখা পরিতেন, তাহা দাক্ষিণাত্য হইতে আমদানী হইত বলিয়া মনে হয় না; "শঙ্খ কর চুর, বসন করহ দূর—তোড়হ গজমতি হাররে"—বিদ্যাপতির এই কবিতা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর। পুরাকালে অবশ্য মহীশূর, বেলেরি, হায়দ্রাবাদ, অনন্তপুর, কর্ণাল, কাথিওয়ার, কৃষ্ণা, গুজরাট প্রভৃতি নানা কেন্দ্রে শাঁখার কাজ হইত। কিন্তু (স্মরণাতীত কাল হইতে ঢাকাও এই শিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ট্যাভারনিয়ার সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিয়াছেন ঢাকা ও পাবনা (অনুবাদক ভুল করিয়া পাবনাকে পাটনা করিয়াছেন,—এ. সো. মেময়ার, ৪২৫ পৃঃ) এই দুই নগরীতে অন্যূন ২০০০ শাঁখারী ছিল। বাঙ্গলায় ঢাকা, নবদ্বীপ, রঙ্গপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি নানাস্থানে শাঁখার কারবার চলিতেছে। এই ব্যবসায়ীরা পূর্ব্বে সকলেই হিন্দু ছিল, কিন্তু এখন দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমানেরা এই ব্যবসায়টা প্রায় একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন। তথাপি মোটামুটি ধরিলে হিন্দু শিল্পীর সংখ্যাই সমধিক।) ঢাকার শাঁখারীবাজারে যে সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পী বাস করেন, তাঁহাদের

পূর্ব্বপুরুষেরা কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছিলেন বলা যায় না। তাঁহাদের মেয়েদের বর্ণ এত করসা ও মুখের গড়ন এরূপ যে, তাঁহারা খাঁটি বাঙ্গলাদেশের লোক বলিয়া মনে হইত না। তাঁহারা যে বাঙ্গলা ভাষায় কথা কহিতেন, তাহাও কতকটা বিদেশী ভাষার মত, কলহের সময়ে তাঁহারা যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাহা কিছুতেই বাঙ্গলা বলিয়া মনে হইত না। আমি অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাই বলিতেছি। বর্ত্তমান সময়ে ইঁহারা শিক্ষাদীক্ষায় অনেক পরিমাণে উন্নত হইয়াছেন, কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বেও স্বীয় শিল্পকার্য্যে সুদক্ষ হইয়া বহির্জ্জগতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিতেন না। ইঁহারা তখন অতি ক্ষুদ্র গুহার ন্যায় ছোট ছোট বাড়ীতে থাকিতেন এবং সেই সকল বাড়ী ত্রিতল-চৌতল হইত,—এক একখানি রথের মত দেখাইত। ঢাকার শাঁখারীবাজার সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের নিজস্ব ছিল—অতি সঙ্কীর্ণ ৩০০ গজ পরিমিত রাস্তার দুই ধারে দ্বিতল, ত্রিতল ও চৌতল ছোট ছোট ঘরগুলি; শাঁখারীদের, বিশেষ তাঁহাদের মেয়েদের অতিশয় ধবধবে শ্বেতবর্ণ; শাঁখ কাটিবার একরূপ অদ্ভুত লৌহের করাত এবং অপরাপর যন্ত্র, শাঁখ কাটার সেই একঘেয়ে শব্দ, যাহা লইয়া তামিল কবি তাঁহার সমালোচককে খৃঃ পূঃ কোন এক শতাব্দীতে ঠাট্টা করিয়াছিলেন, এই সকল বৈশিষ্ট্য লইয়া ঢাকার শাঁখারী সম্প্রদায়—বহুযুগ যাবৎ ঢাকা কোতয়ালীর নিকটে বাস করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে তখন একটি করিয়া কূপ ছিল; সেই কূপে স্নান এবং সেই গৃহে আহারাদি সমাপনপূর্ব্বক দিনরাত তাঁহারা শাঁখা তৈরী করিতেন—তাঁহারা কদাচিৎ বাহিরে যাইতেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে যদিও বুড়ীগঙ্গার ঘাট তাঁহাদের গৃহ হইতে অর্দ্ধ মাইল মাত্র দূরে, তথাপি অনেক অশীতিপর বৃদ্ধ বুড়ীগঙ্গার ঘাট কোথায় তাহা জানিতেন না। এ সকল প্রবাদ অবশ্যই অতিরঞ্জিত, কিন্তু ইহার মূলে এই সত্যটুকু নিহিত যে এই স্বীয়-কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্টচিত্ত-সম্প্রদায় বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। ঢাকা জেলার দাসরা গ্রামে ইঁহাদের এক কেন্দ্র ছিল। ইঁহারা পূর্ব্বে অতিসূক্ষ্ম কারুকার্য্য করিতে পারিতেন; রেখাগুলি এরূপ সূক্ষ্মভাবে টানিয়া যাইতেন ও তাহা গালা দিয়া এরূপ সুন্দরভাবে রঞ্জিত করিতেন যে, তখন শাখাগুলি অনাড়ম্বর হইয়াও একান্ত সুরুচি ও সংযত কলার নিদর্শন হইত। এখন নানারূপ কারুকার্য্য তাহাতে ঢুকিয়াছে সত্য, কিন্তু কাজগুলি আর সেরূপ যত্নের সহিত হয় বলিয়া মনে হয় না। এখনকার শাঁখা বা; চুড়ি পূর্ব্বের মত সুচারুরূপে কর্ত্তিত হয় না, এখন বাহিরে নানারূপ চিত্তাকর্ষক চিত্র অঙ্কিত থাকে, কিন্তু ভিতরটা উঁচুনীচু ও খুব ভাল ভাবে কাটা হয় না। কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের ভাল শাঁখার পশ্চাদ্‌ভাগ নিখুঁতভাবে সমতল হইত।

হরনেল সাহেব লিখিয়াছেন, এক সময় ঢাকার শাঁখার ব্যবসায়টার অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল। বিলাতী বেলোয়ারী চুড়ি ও বিদেশী প্যাটারনের গহনার প্রতি অনুরাগের জন্য বাঙ্গালী ভদ্রঘরের মেয়েরা আর শাঁখার প্রতি বেশী আকৃষ্ট হইতেন না; কিন্তু স্বদেশী আরম্ভ হওয়ার পর হইতে মেয়েরা আর বিলাতী চুড়ি পরেন না, আবার শাঁখার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়াছে; এজন্য আবার এই শিল্প জাগিয়া উঠিয়াছে।

১৯০৫ হইতে ১৯১০ পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে কলিকাতায় শঙ্খের আমদানীর নিম্নলিখিত ফর্দ্দ হরনেল সাহেবের প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে :—

	১৯০৫-৬	১৯০৬-৭	১৯০৭-৮	১৯০৮-৯	১৯০৯-১০
সিংহল হইতে					
	১৪৪৭৭২৲	১৮৯২৮০৲	৮৬৫১৫৲	১৮১২২৩৲	১৬৬০৬০৲
মাদ্রাজ হইতে					
	৩৩৭৫৫৲	৩৬০৫৭৲	৫৫৮৯৲	৫৫২৪১৲	৬৮০১৯৲
ত্রিবাঙ্কুর হইতে					
	১১৪৲	শূন্য	৫৯২৲	শূন্য	৫০০৲
বোম্বাই হইতে					
	৬৭৪৪৲	১৩৭৩০৲	৩৮২৩৲	২৩০৫৲	৪২৯৮৲
মোট	১৮৫৩৮৫৲	২৩৯০১৬৭৲	৯৬৫১৯৲	২৩৮৭৬৯৲	২৩৮৮৭৭৲

এই তালিকায় দৃষ্ট হয় শাঁখার চাহিদা এদেশে বাড়িতেছে। ইহা একটু শুভ লক্ষণ। দুঃখের বিষয় পরবর্ত্তী এই বিশ বৎসরে ব্যবসায়টি কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহার হিসাব আমাদের কাছে নাই।

বর্ত্তমানকালে শাঁখার যে সকল কারুকার্য্য চলিতেছে তাহার নমুনা নিম্নে দিতেছি।

শ্রীহট্টে দেবালয়ে ব্যবহৃত শাঁখের উপর অতি সূক্ষ্ম হস্তে অনেক চিত্রাদি ক্ষোদিত হইত। তাহাতে কোন পৌরাণিক দেবলীলার চিত্র আঁকা হইত,—এখনও সেই দেবতাদের লীলার ক্ষোদিত সূক্ষ্মরেখায় সুন্দরভাবে অঙ্কিত চিত্রযুক্ত শাঁখ কোন কোন দেবালয়ে পাওয়া যায়। একটি চিত্র দেওয়া হইল। এখনকার দেবতারা নৈবেদ্য হইতেই বঞ্চিত হইতেছেন, কে আর তাঁহাদের জন্য মন্দির ও পূজার উপকরণ সাজাইবে?

কবি জসীম উদ্দীনের মারফৎ ঢাকা ৬৩নং শাঁখারীটোলাবাসী শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ধর শাঁখারী এবং তাঁহার পুত্র এবং আত্মীয়গণের নিকট হইতে অতীত ও বর্ত্তমানকালের ঢাকার শাঁখার কারবারের নিম্নলিখিত বিবরণ পাইয়াছি।

(১) যে যে স্থান হইতে শঙ্খ আমদানী হয় :—তিত্‌পুর (মাদ্রাজ), যাপ্‌না (কলম্বো) ইত্যাদি।

(২) শঙ্খের জাত :—তিতপুটী, রামেশ্বরী, ঝাঁজী, দোয়ানী, মতি-ছালামত, পাটী, গারবেশী, কাচ্চাম্বর, ধলা, ভেজাল, কেলাকর, জামাই পাটী, এলপাকার পাটী, নায়াখাদ্‌, খগা, সুর্কীচোনা।

(৩) শঙ্খের দ্বারা কি কি তৈরী হয় :—শাঁখা, আতরদানী, মালা, এস্‌ট্রে, সেফ্‌টীপিন্‌, ঘড়ির চেন, আংটি, বোতাম, ক্রুশ, ব্যাংগেল, ব্রেসলেট, পো, রুমালদানী, জলশঙ্খ, বাজশঙ্খ।

(৪) শাঁখার নাম :—

প্রথম যুগ—গাড়া (২ গাছা হইতে ৪০ গাছা পর্য্যন্ত)।

মধ্য যুগ—সাতকাণা, পাঁচদানা, তিনদানা, বাচ্চাদার, সাদাবালা, আউলাকেশী।

বর্ত্তমান যুগ—সোণা বাঁধানো, টালী, লাইনমোড, চিত্তরঞ্জন, পানবোট, মোড়ানো, সতীলক্ষ্মী, জালফাঁস, হাঁইসাদার, দানাদার, সাদাশাঁখা, শঙ্খবালা, আইপেটেরন, ইংলিশপ্যাচ, তেড়াশঙ্খ, শিকলি বালা, নেকলেস বালা।

লতাবালা, ধানছড়ি, চৌমুক্কি, হাসিখুসী, দার্জিলিং, তারপেঁচ, জয়শঙ্খ, পাথুরহাটা, গোলাপ ফুল, মোটালতা, মাজ, মুড়িদার, আঙ্গুরপাতা, বেণী, উপবেণী, বাঁশগীর, গোলাপবালা, নাগরী বয়লা।

বস্ত্রবয়ন-শিল্প।

বঙ্গদেশ বস্ত্রবয়ন-শিল্পের জন্মভূমি। বসোরার যেমন গোলাপ, হিমালয়ের যেমন দেবদারু, বস্ত্রবয়নশিল্প তেমনই বঙ্গের নিজস্ব। এক্ষেত্রে বাঙ্গালীর প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।

এদেশে এককালে চরকা মেয়েদের হাতের অপরিহার্য্য অস্ত্র ছিল, যেমন বিষ্ণুর হাতের সুদর্শন চক্র। এখন উহা মহাত্মা গান্ধীর হাতে উঠিয়াছে। চরকা কথাটা 'চক্র' কথারই অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। উহার আকারটা কতকটা সুদর্শন চক্রেরই মত।

চরকাকাটা।

পূর্ব্বকালে রাজার রাণী হইতে দীনতম কুটিরস্বামিনী সকলেই চরকায় সূতা কাটিতেন। বাঙ্গলার ব্রত-কথার অনেকগুলিতেই চরকা দিয়া সূতা কাটার কথা আছে। ষোড়শ শতাব্দীতে সুসঙ্গদুর্গাপুরের রাণী একদারাজাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি আমাকে কেমন ভালবাস ?" রাজা জানকীনাথ তাঁহার ভালবাসা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। রাণী কমলা মাথা হেলাইয়া বলিলেন, "আমার মৃত্যুর পরে তুমি দানসাগর শ্রাদ্ধ করিলে, চিতায় মঠ দিলে, আমি তো আর তাহা দেখিতে আসিব না। আমি জীবিত থাকিতে থাকিতে তুমি কি করিতে পার, আমি দেখিতে চাই।" রাজা বলিলেন, "তুমি যা বলিবে তাই করিব।" রাণী বলিলেন, "বেশ, আমি সাত দিন সাত রাত ধরিয়া চরকায় একটানা সূতা কাটিব, সেই সূতা যতটা দীর্ঘ হইবে, সেই মাপে তুমি আমার জন্য একটি দীঘি কাটাইয়া দিবে— তাহার নাম রাখিবে 'কমলা-সায়র'।" কমলা সায়রের কতকাংশ [illegible] নদের গর্ভে বাকী অংশ এখনও বিদ্যমান। সেই দীঘিসংক্রান্ত ছড়া [illegible] কমলা দেবীর

শোচনীয় মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক পল্লীগীতি এখনও সে অঞ্চলে প্রচলিত, তাহাদের দুইটি আমি প্রকাশ করিয়াছি (পূঃ গীঃ, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)।

"চরকা আমার ভাতার পুত, চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে হাতী বাঁধা," প্রভৃতি অর্থ-বাচক প্রবচন এখনও পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের মুখে মুখে শোনা যায়। মেয়েরা চরকার ভাবে এতটা অভিভূত ছিলেন যে, চাঁদের কলঙ্কটাকে "চাঁদের মা বুড়ী চরকা কাটিতেছে" এই ব্যাখ্যা করিয়া ছেলেদের বুঝাইতেন। চরকার সূতা এত সরু হইত যে এখনও তাহার যে নমুনা পাওয়া যায়, তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হয়; অথচ চরকার ব্যবহার তো এযুগে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। এখনও বিক্রমপুরের বামুণের মেয়েরা চরকার সূতায় এরূপ সূক্ষ্ম পৈতা তৈরী করেন যে, চার দণ্ডী পৈতার চার পাঁচটা একটা বড়-এলাচের খোসার মধ্যে অনায়াসে পূরিয়া রাখা যায়। আমি যখন ঢাকা কলেজে পড়িতাম, তখন আমার এক বিক্রমপুর-নিবাসী সহপাঠী বড়-এলাচের খোসার মধ্যে পূরিয়া তাঁহার মাতার হাতের কাটা চারিটি পৈতা আমাকে উপহার দিয়াছিলেন; সেই চারিটি পৈতায় ২৪০ হাত সূতা ছিল। সেই সূতা মাকড়সার জালের মত সূক্ষ্ম হইলেও বেশ শক্ত ছিল, আমি তাহা বহুদিন ব্যবহার করিয়াছিলাম।

একটি বড়-এলাচের খোলে ৪।৫টি পৈতা।

বাঙ্গলার চরকা ও বাঙ্গলার সূতা বাঙ্গলার গৃহগুলির এরূপ অপরিহার্য্য অঙ্গীয় উপকর হইয়া পড়িয়াছিল যে, লোকে কথাবার্ত্তা, উপমা দেওয়া প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই এই চরকা ও সূতার উত্থাপন করিত। এমন সকল ব্যাপারে সূতার উল্লেখ ও উপমা দেওয়া হইত, যাহা এখন অদ্ভুত ঠেকে; কিন্তু সেইভাবের প্রয়োগ দ্বারা বুঝা যায়, বাঙ্গলার সূতার কারবারটা কত প্রিয় ও বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। একটি প্রাচীন বৈষ্ণবগান এইরূপ :—

বাঙ্গালার সূতার ব্যবসায়।

"(সে হাটে) বিকায় নাকো অন্য সূতো।
বিনা তাঁতি নন্দের সুত॥
সে হাটের প্রধান তাঁতি, প্রজাপতি পশুপতি,
আর যত আছে তাঁতি—তাদের শুধু যাতায়াত॥"

কিন্তু পুরুষেরা চরকা কাটিতেন না—তাহা তাঁহাদের অপমানের বিষয় ছিল। গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে দেখাইয়াছি, যদি কোন সেনাপতি যুদ্ধে অক্ষমতা দেখাইতেন, তবে রাজা প্রায়ই তাঁহাকে অপমান করিয়া বলিতেন, "তোমার আর যুদ্ধে যাইয়া কাজ নাই, তোমাকে একখানি চরকা পাঠাইয়া দিব।" বঙ্গদেশে চরকার পাট উঠিয়া গেলেও আসামের মেয়েরা এখনও চরকা ছাড়েন নাই। তাঁহারা রেশমের উপর এখনও যেরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করেন, তাহা অতি সুন্দর। চাদরের উপর কল্কা বড়ই শোভন হয়। বড় ঘরের মেয়েদের হাতের কাজ দেখাইয়া বরপক্ষকে সন্তুষ্ট করিতে হয়, তবেই ভাল বিবাহ হয়। বাঙ্গলার মেয়েরা এখন বিলাতীর নকল করিয়া 'লেস' তৈরী করেন এবং যাহা কচিৎ ব্যবহারে লাগে তাহাই

রচনা করিয়া বাহাদুরী লইতে চেষ্টিত হন। কিন্তু আসামের মেয়েরা ভাল রেশমে নিত্য প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি বয়ন করিয়া থাকেন।

কার্পাস দ্বারা বস্ত্রবয়ন ভারতবর্ষে যে কত প্রাচীন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশে তাঁতিদের সূতার উল্লেখ আছে ("হে শতক্রতু, ছুঁচোগুলি যেরূপ তাঁতিদের সূতা খাইয়া ফেলে, চিন্তাসমূহ আমাকে তেমনই খাইয়া ফেলিতেছে—১০৩৩।৯)। এই শ্লোকের ইঙ্গিতার্থ—তাঁতিরা সেই প্রাচীন কালেও সূতায় মাড় দিত। খৃঃ পূঃ ২০০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীকেরা ভারতীয় কার্পাসের কথা জানিতেন। ষ্টাটিটিয়াস (Statitius) কার্পাসকে "কার্বাসম" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। জে. ফর্বেস রয়েল (J. Forbes Royle, M. D., F. R. S.) তাঁহার "Early History of Cotton" পুস্তকে লিখিয়াছেন, "গ্রীকেরা ঢাকার মসলিনের কথা বিলক্ষণ জানিতেন, তাঁহারা বস্ত্রশিল্পের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ইহাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং 'গ্যাঞ্জেটিকা' নাম দিয়াছেন, যেহেতু ইহা গঙ্গার উপকূলে প্রস্তুত হইত (১২০ পৃঃ)।" বাঙ্গালী শিল্পী যে এ বিষয়ে জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী—তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। প্লিনি হইতে আরম্ভ করিয়া ডাক্তার উরে (Dr. Ure) এবং টেইলর পর্য্যন্ত বহু লেখক ঢাকার মসলিনের অশেষ সুখ্যাতি করিয়াছেন।

প্লিনির সময় বাঙ্গলার মসলিনের নাম ছিল "কার্পাসিয়াম"। এই শব্দটি সংস্কৃত 'কার্পাস' শব্দের অপভ্রংশ। অতীতকালের মসলিনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র, ঢাকার অদূরবর্ত্তী ভাওয়াল পরগনার অন্তর্গত "কাপাসিয়া" এখনও ঐ নামে পরিচিত।

বাইবেলে এই মসলিনের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (ইজেকিল, ১৪শ অধ্যায়, ১০, ১৩ এবং ইসিয়া, ৩য় অধ্যায়, ২৩)।

প্লিনি লিখিয়াছেন, "রোমের মেয়েরা মসলিনের ভান করিয়া স্বীয় নগ্ন অবয়ব সাধারণের চক্ষের নিকট উপস্থিত করেন।"—"A dress under whose slight veil our women continue to show their shapes to the public."

বিদেশী মত।

ডাক্তার উরে বলিয়াছেন, "রোমের পূর্ণতম ঐশ্বর্য্যের যুগে ঢাকার মসলিন তথাকার মহিলাদের সর্ব্বপ্রধান ও প্রিয় বিলাসের সামগ্রী ছিল (Cotton Manufacture of Great Britain by Dr. Ure)। ইয়েটস্ লিখিয়াছেন, ভারতীয় কার্পাস খৃষ্ট জন্মিবার চারিশত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসদেশের বাজারে প্রচলিত ছিল। (Tesitrium Antiquorum.)

জুভিনেলের পুস্তকেও মসলিনের প্রশংসাসূচক উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্লিনির লেখা হইতে জানা যায় যে বঙ্গদেশের ঢাকানগরীই এই বস্ত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। সমস্ত জগতে সুপ্রাচীন কাল হইতে ইহার বিশেষ আদর হইত। "একদিকে চীন, অপর দিকে তুরস্ক, মিশর, আরব, ইথিওপিয়া এবং পারস্যদেশের সহিত এই বাণিজ্য চলিত; ইহার কিছুদিন পরে প্রভেন্স, ইটালী, ল্যাংগুইডক এবং স্পেন দেশেও ঢাকার মসলিন প্রেরিত হইত।

৬০ হাত কাপড় হাতে রাখিলে টের পাওয়া যায় না।

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ঢাকার মস্‌লিন শীর্ষক প্রবন্ধ—আবদুল আলি)। ইজিপ্টের সুবিখ্যাত রাজা এ্যাণ্টোনিও তাঁহার সৈন্যদিগকে "কার্বাসাষ" বস্ত্র উপহার দিতেন। ট্রেভারনিয়ার লিখিয়াছেন, মহম্মদ আলিবেগ ভারতবর্ষ হইতে পারস্যদেশে ফিরিয়া রাজা চাসেফিকে একটি মূল্যবান্ প্রস্তর-খচিত বৃহৎ ডিম্বের মত ক্ষুদ্র নারিকেল উপহার দেন, ইহার মধ্যে ৬০ হাত দীর্ঘ একখানি মস্‌লিন কাপড় ছিল; উহা এত পাৎলা যে হাতে রাখিলে আদৌ কোন জিনিষ হাতে আছে বলিয়াই মনে হইত না।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে এরিয়ান ঢাকার মস্‌লিনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, (Periplus of the Erythrean Sea)। নবম শতাব্দীতে দুইজন চীন পর্য্যটক ভারতবর্ষের বিবরণ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন (Account of India and China by Two Mahammedan Travellers)। এই পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছেন আবিব তিও ইছারাৎ। টেলার সাহেব তাঁহার 'টপোগ্রাফি অব ঢাকা' গ্রন্থে (১৬৩ পৃঃ) লিখিয়াছেন—"উক্ত দুই মুসলমান লেখকের মতে ঢাকার লোকেরা এমন চমৎকার কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত করে যে জগতের অন্যত্র তাহার তুলনা হইতে পারে না। গোল আধারে এই বস্ত্রগুলি রক্ষিত হয় এবং ইহার একখানি এত সূক্ষ্ম যে একটি অঙ্গুরীয়কের রন্ধ্রপথে সমস্ত কাপড়খানি টানিয়া আনা যায়।" প্রফেসর উইলসন লিখিয়াছেন "৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুগণ বস্ত্রশিল্পে জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন" (Introduction to Rigvada Samhita)। কুলভা নামক একখানি তির্ব্বতীয় পুস্তকে লিখিত আছে Gtsing Dgahmo নাম্নী একজন ধর্ম্ম-যাজিকা মস্‌লিন পরিয়া বাহির হইছিলেন বলিয়া তিনি উলঙ্গ হওয়ার অপরাধে অভিযুক্তা হইয়া অপমানিতা হইয়াছিলেন। গ্রীসের লেখকগণ প্রাচীনকালে তথাকার তরুণ ও তরুণীদের এইরূপ বস্ত্র ব্যবহারের নিলর্জ্জতার জন্য তীব্রভাবে নিন্দা করিয়াছেন। টেলর য়ুরোপীয় প্রাচীন লেখকদের মত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহাদের মতে "ঢাকার মস্‌লিন মানুষের হাতের তৈরী নহে—উহা পরীদের হাতের কাজ" (১৬৩ পৃঃ)। একদা মস্‌লিন-পরিহিতা রাজকুমারী জেবউন্নিসাকে দেখিয়া তাঁহার পিতা আরঙ্গেব উলঙ্গ মনে করিয়া ভৎর্সনা করাতে কুমারী বলিয়াছিলেন, "আমি কাপড়খানি সাতবার ঘুরাইয়া পরিয়াছি।"—এই সাড়ীখানি ২০ গজ লম্বা ছিল, ইহার ওজন প্রায় ১০ আউন্স (Bolt's Consideration on the Affairs of India, p. 206)। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান এইরূপ বস্ত্রের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহার সহচরীরা মস্‌লিন পরিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। মোগল সম্রাট্‌গণ এই মস্‌লিন বস্ত্রের প্রচার সম্বন্ধে এতটা ঈর্ষ্যান্বিত ছিলেন যে কোন কোন সম্রাট্ এই বস্ত্র বিদেশে পাঠাইতে নিষেধ করিয়া আইন প্রচার করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে নূরজাহানের সুরুচি ও ফ্যাসানের প্রতি অত্যধিক অনুরাগের ফলে ভারতবর্ষীয় সমস্ত প্রধান নগরে সম্ভ্রান্তঘরে মস্‌লিন বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছিল।

৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

নূরজাহানের উৎসাহ।

যখন মস্‌লিনের সৌভাগ্য প্রায় অস্তমিত, তখনও বাঙ্গলার কয়েকজন রাজা বিশেষ

ত্রিপুরেশ্বরগণ এই বস্ত্রের উৎসাহ দিয়া ইহাকে কথঞ্চিত বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। "India of Ancient and Middle Ages" নামক পুস্তকে মিসেস ম্যানিং লিখিয়াছেন—ঘাসের উপর বিছানো একখানি সুদীর্ঘ মসলিন এক গাভী ঘাসের সঙ্গে খাইয়া ফেলিয়াছিল; এই জন্ত সেই গাভীর মালিক নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। ইতিহাস লেখক কাফি খাঁ মোগল রাজ-অন্তঃপুরে মস্‌লিনের আদর সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন; তাহাতে দেখা যায়, এই বস্ত্রশিল্প রাজাবাদসাহের কতটা মনোযোগ এবং অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিল। ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার হইতে (১৯০৫ খৃঃ) নিম্নলিখিত বিবরণ শ্রীযুক্ত আব্দুল আলি সাহেব সংগ্রহ করিয়াছেন (রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২০, ১ম সংখ্যা, ৩১ পৃঃ):—১৮৫১ খৃঃ অব্দের প্রদর্শনীতে ঢাকার মস্‌লিন জগতের যত বস্ত্রশিল্পের নমুনা পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবধারিত হইয়াছিল; অধ্যাপক কুপার এই প্রদর্শনীর বিবরণে এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৫১ খৃঃ অব্দের প্রদর্শনীতে ভাল মস্‌লিন একটু দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছিল, অনেক আয়াসে কিছু সংগৃহীত হইয়াছিল। ১৮৬১ খৃঃ অব্দের প্রদর্শনীতে উৎকৃষ্ট মস্‌লিন "শিল্পের জয়চিহ্ন" নাম অর্জ্জন করিয়াছিল, তখন উহা এতটা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল যে ঢাকায় মাত্র একঘর তাঁতি উহা বয়ন করিতে পারিত। লণ্ডনের শিল্পশালায় একখানি মস্‌লিন রক্ষিত ছিল, তাহা দৈর্ঘ্যে বিশ গজ ও প্রস্থে এক গজ এবং তাহার ওজন ৭½ আউন্স ছিল। Textile Manufactures নামক গ্রন্থে ডাঃ এফ্. ওয়াটসন জগতের সমস্ত বস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া ইহার অপ্রতিদ্বন্দ্বিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, শুধু গুণে নয়—এরূপ সূক্ষ্ম কাপড় যে এতটা টেঁকসই হইতে পারে তাহা ধারণার অতীত। ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে একখানি মস্‌লিনের ৬০ পাউণ্ড মূল্য ছিল, জাহাঙ্গীরের সময়ে একখানি উৎকৃষ্ট মস্‌লিন (আবরোয়ান) ৪০০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রীত হইত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই মস্‌লিন য়ুরোপে বিশেষতঃ ফ্রান্সদেশে প্রভূত পরিমাণে রপ্তানি হইত। ১৮১৭ অব্দে কেবল ঢাকা হইতেই এককোটি বাহান্নলক্ষ টাকার মস্‌লিন রপ্তানি হইয়াছিল। ভারত-নির্ম্মিত সাধারণ বস্ত্রেরও য়ুরোপে যথেষ্ট কাটতি হইত।

১৭৫ হাত মসলিনের ওজন ৪ তোলা।

"টপোগ্রাফি অব ঢাকা" পুস্তকে লিখিত আছে, ১৬০ হাত লম্বা একখানি মস্‌লিনের ওজন ছিল মাত্র ৪ তোলা। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে অবনতির সময়ও সোনারগাঁয়ে নির্ম্মিত একখানি ১৭৫ হাত দীর্ঘ মস্‌লিনের ৪ তোলা মাত্র ওজন ছিল। পূর্ব্বে ঢাকায় ইহা হইতেও অনেক সূক্ষ্ম মস্‌লিন নির্ম্মিত হইত।

ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা ও মেঘনা এই নদনদীর সঙ্গমস্থলে ১৯৬০ বর্গমাইল পরিমিত ভূখণ্ডে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মস্‌লিন প্রস্তুত হইত, ইহাদের কেন্দ্রস্থান কাপাশিয়া এখন ভাওয়ালের জঙ্গলে পরিব্যাপ্ত। ঢাকা, মুড়াপাড়া, সোনারগাঁ, ডেমরা, তিতবর্দ্দী, বালিয়াপাড়া, নপাড়া, নৈকুলী, বহারক, চরপাড়া, বাশটেকি, নবিগঞ্জ, সাহাপুর, ধামরাই প্রভৃতি স্থানে মস্‌লিনের স্মৃতি এখনও তাঁতিরা বহন করেন। তাহারা [illegible] ভুলিয়া গিয়াছেন যে এককালে তাঁহাদের

পূর্ব্বপুরুষেরা জগৎ জয় করিয়াছিলেন এবং শিল্পজগতে তাঁহারা রাজচক্রবর্ত্তীর আসনে সমাসীন ছিলেন।

যেখানে পদ্মা, মেঘনা ও ধলেশ্বরী বিরাট্ জলরাশি লইয়া বহিয়া যাইতেছে,—যেখানে নির্ম্মল সৌরকরোজ্জ্বল আকাশ ঐ নদনদীর মতই দিগন্ত প্রসারিত,—যেখানে ডিঙ্গা বাহিয়া জেলেরা তাহাদের অবাধ স্ফূর্ত্তির দ্যোতক ভাটিয়াল গান গাইয়া আকাশ বাতাস ও জলরাশির সুরে সুর মিশাইয়া থাকে—সেই রাজ্যের তন্তুবায়গণ আকাশ, রৌদ্র ও জ্যোৎস্নার বর্ণ ধরিয়া রাখিয়া, জলরাশি ও অভ্রের স্বচ্ছতা লইয়া—স্রোতের প্রবহমাণ গতি আয়ত্ত করিয়া বস্ত্রশিল্পের যে বর্ণ, স্বচ্ছতা ও সৌন্দর্য্য পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা যে "বঙ্গের স্বপ্ন", "বিজয়চিহ্ন",, "পরীগণের লীলা", "সান্ধ্যশিশির", "প্রবহমাণ নীর", "গঙ্গাজলী", "মেঘডুম্বুর", "বাতাসের জাল" প্রভৃতি নামে পরিচিত হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি ?

মাদ্রাজের অন্তঃপাতী মছলিপত্তন বন্দর হইতে বিদেশীয় বণিকেরা এই বস্ত্র য়ুরোপে চালান দিতেন। এই মছলিপত্তন হইতে 'মস্‌লিন' নাম বাঙ্গলার কার্পাস বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন তুরস্কের সম্রাটেরা বাঙ্গলার এই কার্পাস বস্ত্রের পাগড়ী পরিতেন, এজন্য তথায় ইহার চাহিদা খুব বাড়িয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদের ভয়ে বঙ্গোপসাগরে যাতায়াত কঠিন ও অসুবিধা-জনক হইয়া উঠে, তখন তুরস্কের রাজধানী মোসল নগরের বস্ত্র-নির্ম্মাতারা বঙ্গের বস্ত্র-শিল্পের অনুকরণে একরূপ সূক্ষ্মবস্ত্র তৈরী করিতে আরম্ভ করেন। সেই নাম হইতে 'মস্‌লিন' শব্দের উদ্ভব হয়। আমাদের মনে হয় মছলিপত্তন নাম হইতেই মস্‌লিন নামের উদ্ভব বেশী সম্ভবপর।

মস্‌লিন নামের উৎপত্তি ও প্রকারভেদ।

মস্‌লিনের নিম্নলিখিত প্রকার ভেদ পরিদৃষ্ট হয় :—(১) ঝুনো—ইহা ঠিক মাকড়সার জালের মত সূক্ষ্ম—ইহা পরিলে কোন কাপড় শরীরে আছে বলিয়াই মনে হইত না। (২) রং—ইহাও খুব সূক্ষ্ম। (৩) সরকার আলি—নবাব বাদসাহেরা এই বস্ত্র পরিধান করিতেন, ইহা যেমনই সূক্ষ্ম তেমনই শক্ত হইত,—তাঁতিদের উৎসাহের জন্য এই বস্ত্রের বয়নকারীদিগকে সরকার হইতে জায়গীর দেওয়া হইত। (৪) খাসা—ইহাও সূক্ষ্ম ঘন-সন্নিবিষ্ট সূত্রে প্রস্তুত হইত। আইন আকবরিতে ইহা 'কসাক' নামে অভিহিত হইয়াছে। সোনারগাঁয়ে উৎকৃষ্ট খাসা নির্ম্মিত হইত। (৫) সবনম্ (সান্ধ্য শিশির) নামেই ইহার পরিচয়—শিশিরের মতই ইহা স্বচ্ছ এবং সন্ধ্যার মতই ইহার বর্ণ। (৬) আবরোয়ান (প্রবাহিত জল-স্রোত), ইহা পরিধান করিয়া জেবউন্নিসা পিতার নিকট উপস্থিত হইলে আরঞ্জেব তাঁহার কন্যাকে উলঙ্গ ভ্রমে করিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজ কুমারী সাত বেড় দিয়া কাপড় পরিয়াছিলেন। আবদুল আলি ৭০ বেড় লিখিয়াছেন—ইহা স্পষ্টই অতিরঞ্জন।

ইহা ছাড়া তাঞ্জেব, সরবন্দ, বদনখাস, আলাবাল্লে, সরবতী, তরন্দাম, কুমীস, ডুরিয়া, নয়নসুক, চারখানা, মলমল-খাস ও জামদানি প্রভৃতি বহু প্রকারের মস্‌লিন প্রস্তুত হইত। টেলরের টপোগ্রাফী পুস্তকে এই সকল বস্ত্রের সূতা-সংখ্যা, ব্যবহার, ওজন, মূল্য প্রভৃতি বিষয়ে

অনেক কথাই লিখিত হইয়াছে। ঢাকার ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় তাঁহার উৎকৃষ্ট গ্রন্থে এই সকল বিবরণ বিস্তারিত ভাবে সঙ্কলন করিয়া আলোচনা করিয়াছেন (১৫৪—২২৪ পৃঃ)। ঢাকাই মস্‌লিনের যে সকল শ্রেণীর বিষয় উল্লিখিত হইল, তাহার অনেকগুলির আবার সূক্ষ্মভেদ আছে, যথা—জামদানী বস্ত্রের মধ্যে, তোড়াদার, কারেলা, বুটিদার, তেরছা, জলবার, পান্নাহাজার, মেল, দুবলিজাল, ছাওয়াল, বাল আর, ডুরিয়া, গেদা, সাবুরগা প্রভৃতি নানা প্রকার ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঢাকার মোটা কাপড়ের এক সময়ে খুব আদর ছিল, যথা—বাফ্‌তা, বুন্নি, এক পাট্টা ও জোর, হাম্মাম, লুঙ্গি, কসিদা। মস্‌লিনের ছিটও পূর্ব্বে নানারকমের ছিল। যথা—নন্দন-সাহী, আনার-দানা, কবতুর খোপী, সাকুতা, পাছাদার, কুস্তিদার প্রভৃতি। এই যুগে সেই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এ দেশের কৌস্তভ, পারিজাত, চিন্তামণির মতই সেগুলি নামে মাত্র পরিণত হইয়াছে। অবনতির দিনেও ১৮০০ খৃঃ অব্দে ঢাকায় ৪৫০০০০৲, সোনার গাঁয়ে ৩৫০০০০৲, ডেমরাতে ২৫০০০০৲, তিতবর্দ্দিতে ১৫০০০০৲ টাকার মস্‌লিন প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দেও ঢাকায় ১৫০০, সোনার গাঁ ও ডেমরাতে ৯০০, তিতবর্দ্দিতে ১০৬০ এবং মুড়াপাড়া, আবদুল্লা পুর প্রভৃতি স্থানে ৭০০—সকল সমেত ৪১৬০ খানি তাঁত ঢাকা জেলায় চলিত। যতীন্দ্রবাবু নবাবী আমলের বস্ত্রের চাহিদা ও বিক্রয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত হিসাব দিয়াছেন, ইহার অনেক কথাই টেলরের পুস্তকে পাওয়া যাইবে। ১৮০০ খৃঃ অব্দের তালিকা এইরূপ :—

"দিল্লীর বাদশাহের জন্য সাদা ও বুটাদার মসলিন ও রৌপ্য-খচিত বস্ত্র ১০০০০০৲ (আর্কট মুক্তা), মুর্সিদাবাদ নবাবের জন্য ৩০০০০০৲, জগৎশেঠের জন্য ১৫০০০০৲, তুরানীদের জন্য ১০০০০০৲, পাঠান ব্যবসায়ীদের জন্য ১৫০০০০০৲, মোগল ব্যবসায়ীদের জন্য ১৫০০০০০৲, ইংরেজ কোম্পানী ৩৫০০০০৲, হিন্দু ব্যবসায়ী ২০০০০০৲, ফরাসী ব্যবসায়ী ৫০০০০৲, ওলন্দাজ কোম্পানী ১০০০০০৲ টাকা (১৮৯ পৃঃ)।"

ঢাকা মসলিনের চাহিদা।

১৭৫৩ খৃঃ অব্দে ২৮৫০০০০ টাকার বস্ত্র বিক্রয় হইয়াছিল। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে ঢাকা হইতে ৫০০০০০০৲ টাকার বস্ত্র বিদেশে প্রেরিত হয়। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে ১৩৬২১৫৪৲ মূল্যের বস্ত্র ঢাকা হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে ১৩৬২৬০১৮ ॥৶৫ মূল্যের বস্ত্র ঢাকা হইতে নানাস্থানে প্রেরিত হইয়াছিল।

ইংরেজরা অনেক কল-কব্জা করিয়াও ঢাকার এই অপূর্ব্ব বস্ত্র-শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারেন নাই। ওয়াট্‌সন লিখিয়াছেন, "With all our machines and wonderful inventions we have hitherto been unable to produce a fabric which for fineness or utility can equal the 'woven air' of Dacca."—আমাদের সমস্ত যন্ত্র এবং নানাবিধ অত্যাশ্চর্য্য উপায়গুলি দ্বারাও আমরা এপর্য্যন্ত কি ব্যবহারের পক্ষে উপযোগিতায় কি চারুশিল্প হিসাবে ঢাকার এই "হাওয়ার ইন্দ্রজালে"র সমকক্ষতা করিতে পারি নাই।

যাঁহারা অসাধারণ সিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহাদের অসাধারণ কঠোর পরীক্ষা দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, এই বুঝি বিধাতার নিয়ম। ঢাকার এই বিরাট ও শ্রেষ্ঠ শিল্পটি কিভাবে বিলোপ প্রাপ্ত হইল সেই করুণ ইতিহাস না বলাই ভাল। মুসলমান রাজত্বের শেষদিক্ হইতে এই তন্তুবায়গণ যত বিড়ম্বনা সহিয়াছে, তাহা সাধনার শাস্তি, প্রতিভার প্রায়শ্চিত্ত। দালালদিগের হাতে তন্তুবায়গণ লাঞ্ছনার একশেষ সহ্য করিয়াছে, হতভাগ্যগণ বন্দীশালায় আবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের উপর যে সকল জুলুম হইয়াছে, তাহাতে তাহারা প্রাণপণ করিয়াও পারিশ্রমিকের ভাগ নানাজনকে দিয়া তাহাদের হাতে একরূপ কিছুই রাখিতে পারিত না। বড় দুঃখে এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যবসায়টি তাঁতিরা ছাড়িয়া দিয়াছিল—সে সকল দুঃখের কথা William Bolts (১৭৭২) তাঁহার Considerations of Indian Affairs নামক গ্রন্থে, Mill তাঁহার History of British India, Sir George Birdwood তদীয় Report on the Old Records of the India Officeএ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইংলণ্ডের সহিত প্রতিযোগিতায় এই কারবার ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ১৮০০ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ড তদ্দেশজাত বস্ত্রশিল্পের উন্নতিকল্পে ঢাকার মস্‌লিন ইংলণ্ডে বিক্রয় নিষেধ করিয়া আইন পাস করেন। মলমল, আবরোয়া, খুনা, তারেন্দাম, তাঞ্জেব, জামদানি, ডুরিয়া ও খাসা এই আট প্রকার মসলিনের উপর নিষেধবিধি জারি হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বেই (১৭৮৭ খৃঃ) ম্যাঞ্চেষ্টারের সদ্যো-জাত শিল্পের রক্ষার জন্ম মস্‌লিনের উপর শতকরা ৭৫৲ টাকা কর ধার্য্য হয়; বেড়াজালে পড়িয়া এই শিল্প নষ্ট হইয়াছে।

কারবারীদের কষ্ট ও কারবার ধ্বংস।

কিরূপে মস্‌লিন তৈরী হইত, টেলর সাহের তাহার সবিস্তার বর্ণনা দিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় (১৩৩৭, শ্রাবণ) প্রবাসী পত্রিকায় কোন সুদক্ষ ব্যক্তির সাহায্য লইয়া মস্‌লিন বয়ন সম্বন্ধে খুঁটিনাটী অনেক কথা লিখিয়াছেন এবং চিত্র দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

তিনি দেখাইয়াছেন য়ুরোপের প্রস্তুত নকল মস্‌লিনের সূতায় প্রত্যেক ইঞ্চিতে গড়ে ৬৮০৮ এবং ৫৬০৬ পাক দেওয়া হয়, তৎস্থলে ঐ পরিমিত ঢাকা মস্‌লিনের সূতায় গড়ে ১১০০১ এবং ৮০০৭টি পাক দেওয়া হইত। হাতে কাটা সূতা ও কলের সূতায় পার্থক্য অনেক। কলে কাটা সূতা তাদৃশ মজবুত হয় না, কাপড় পরিবার অযোগ্য হয়, অত সূক্ষ্ম কাপড় ধোপে নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু হাতে কাটা সূতার মস্‌লিন ধোয়াইলে তাহার চাকচক্য বাড়ে, আরও বেশী টেঁকসই হয় এবং ব্যবহারের পক্ষে অত্যন্ত আরামপ্রদ।

মস্‌লিনের উৎকর্ষ ও স্থায়িত্ব।

সাধারণতঃ যে সকল উৎকৃষ্ট মস্‌লিন তৈরী হইত, তাহার সূতা ৩০ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক মেয়েরা প্রস্তুত করিত। বস্ত্রবয়নকারীরা যে যন্ত্রের সাহায্যে মস্‌লিন তৈরী করে তাহাতে জটিলতা কিছুই নাই। তাহা অতি আদিম প্রণালীতে কয়েকখানি কাঠ, দড়ি ও কয়েকটি আংটি দ্বারা প্রস্তুত। এই উপায়ে মস্‌লিনের মত উৎকৃষ্ট বস্ত্র তাহারা কিরূপে নির্ম্মাণ করিত,

তাহা য়ুরোপীয় শিল্প-সমালোচকগণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। কেদারবাবু লিখিয়াছেন, "ঢাকার তাঁতিদের দেহের গড়ন ছিপ ছিপে ও কোমল। তাহাদের দৈহিক শক্তি ও উদ্যমের কিঞ্চিৎ অভাব পরিলক্ষিত হইলেও অপর পক্ষে তাহারা সূক্ষ্মস্পর্শজ্ঞান ও ওজন সম্পর্কে সূক্ষ্ম অনুভূতি-সম্পন্ন; শুধু তাহাই নহে,—দেহপেশীর পরিচালনে তাহাদের যে অসামান্য ক্ষমতা আছে, তাহার ফলে হাতের আঙ্গুলের সঙ্গে পায়ের আঙুল ঠিক সমান তালে পরিচালিত হইয়া থাকে। ঐতিহাসিক অর্মে ইহাদের সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় বলিয়াছেন যে ইহারা যে সকল যন্ত্রপাতির সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়ন করিতে পারে, ঐ সকল যন্ত্রপাতি দ্বারা ইয়ুরোপীয় তাঁতিরা তাহাদের শক্ত ও স্থূল অঙ্গুলির সাহায্যে মোটা চট্‌ও তৈরী করিতে কদাচিৎ সমর্থ হয়............ঢাকার তাঁতিরা সূতা দেখিবামাত্র তাহার সূক্ষ্মতা ঠিক করিতে পারে, নলের মধ্যে কতটা সূতা পাকানো আছে তাহা ঠিক করিবার তাহাদের কোন তৌলদণ্ড নাই। সূতার শ্রেষ্ঠত্ব চোখ চাহিয়াই ঠিক করে এবং দৈর্ঘ্য ঠিক করিতে হইলে খানিকটা খোলাজমিতে কিছু দূরে দূরে কাঠি পুঁতিয়া তাহাতে সূতা মেলিয়া দিয়া স্থির করে।.........সূতা মাপিতে এক হাত দুই হাত করিয়া গণনা করে এবং রতি দিয়া ওজন করে। এক রতির ওজন প্রায় দুই গ্রেন। পূর্ব্বকালে যখন দিল্লীর বাদশাহের দরবারে মসলিন পাঠান হইত, তখন সেই মসলিনের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ছিল ১৫০ হাত, ওজন এক রতি; কিন্তু সময় সময় কম বেশী হইয়া ১৪০ হাত হইতে ১৬০ হাত পর্য্যন্ত হইত। টানায় ১৪০ হাত এবং প'ড়েনে ১৬০ হাত সূতা আবশ্যক হইত" (প্রবাসী, ১৩৩৭ শ্রাবণ)।

বিলাতের শিল্পীদের অনধিগম্য।

সূতা প্রস্তুত করিবার প্রণালীও অতি সূক্ষ্ম শিল্পকলার পরিচায়ক। বেশী গরমে সূক্ষ্ম সূতা হইতে পারিত না। কাটুনীরা প্রত্যূষ হইতে বেলা এক প্রহরের মধ্যে সূতা কাটিত। কিন্তু অত্যুৎকৃষ্ট সূতা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ভাল হয়। যদি গরম বেশী হয়, তবে একটা আধারে জল রাখিয়া তাহার উপর সূতা কাটা হইত। জলের স্বাভাবিক বাষ্প গরমের সময় সূতা কাটার অনুকূল।

সূক্ষ্ম মসলিন ধোওয়াও নানারূপ উপায়ে সম্পাদিত হয়—পাটে আছড়াইলে ইহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। প্রথমে কাপড়খানি ঈষৎ উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া পরে সাজিমাটি ও সাবানের জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। তারপর এক নবদূর্ব্বাদল যুক্ত খোলা-স্থানে উজ্জ্বল রৌদ্র-করে শুকাইতে হয়। আধা শুকনো হইলে মসলিন পুনরায় জলে সিদ্ধ করিয়া সর্ব্বশেষ নেবুর রসযুক্ত খুব পরিষ্কার জলে সিদ্ধ করিয়া কিছুকাল রাখিয়া দিতে হয়। যে সকল কাপড়ের সূতা ব্যবহারের দরুন এদিক সেদিক সরিয়া গিয়াছে তাহা সোজা করিবার প্রথাকে ঢাকার লোক 'কাঁটা করা' বলে। উহা ঢাকার নদ্দিয়া নামক এক শ্রেণীর লোকেরাই জানে; ঢাকা ছাড়া অন্যত্র ঢাকার মসলিন তেমন সুন্দর করিয়া কেহ ধৌত করিতে পারে না, কারণ অন্য কোন স্থানে এই 'কাঁটা করা'র রীতি পরিচিত নহে।

ঢাকার রিপুকরেরা মস্‌লিনের ছেঁড়া জায়গাগুলি এমন সুন্দরভাবে মেরামত করিতে পারে যে তাহাতে রিপুর চিহ্নমাত্র থাকে না। টেলর সাহেব লিখিয়াছেন ঢাকার রিপুকর্ম্মীরা অহিফেন খাইয়া রিপু করিতে বসে, তাহাতে নাকি তাহাদের কাজের নেশা বাড়িয়া যায় এবং রিপু উৎকৃষ্ট হয় (Topography of Dacca, p. 176)।

অহিফেন খাইয়া রিপুকর্ম্ম করে।

সূতা কাটার দুই প্রধান যন্ত্র চরকা ও ডলন কাঠি। খুব ভাল মস্‌লিনের সূতা ডলন কাঠি দিয়া তৈরী করিতে হয়। দশইঞ্চি দৈর্ঘ্য একটি সূঁচের নিম্নভাগে ক্ষুদ্র গোলাকৃতি মৃত্তিকা রাখিয়া দেওয়া হয়, উহাকে "ডলন কাঠি" বলে। টেকো চালাইবার সময় হাত ঘামে ভিজিলে খড়ির গুঁড়া দিয়া ঘাম শুকাইয়া লইতে হয়। ডলন কাঠির সাহায্যে দুই আঙ্গুলে টেকো ঘুরাইতে বেশ ভার বোধ হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন, যেহেতু সূতা ও কাপড়ের প্রস্তুত-প্রণালী স্বচক্ষে না দেখিলে ইহার একটা পরিষ্কার ধারণা করা অসম্ভব।

চরকা ও ডলন কাঠি।

ঢাকার মস্‌লিন বহু প্রাচীন এবং ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভেই ইহার খ্যাতি জগন্ময় প্রচারিত হইয়াছিল। সুদীর্ঘ যুগের পরেও জগতের ঈশ্বর সমকক্ষ দিল্লীর ঈশ্বরেরা উত্তর-কালে এই কারবারটা বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বরগণ ময়ূরসিংহাসনে বসিতেন, তাজমহলের সৃষ্টি করিতেন, মস্‌লিন পরিতেন এবং যমুনার নীলসলিলে দেওয়ানী খাসের প্রতিবিম্ব দর্শন করিতেন ; এই যুগে ইহাদের কোনটির মতই কিছু হয় নাই।

ঢাকার মস্‌লিন সম্বন্ধে ১৮৬০ খৃঃ অব্দে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'শিল্পিক দর্শন' নামক পুস্তকে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহার অনেকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"ঢাকাই বস্ত্র সকলেরই প্রিয় ; অপিচ হিন্দুদিগের শিল্পকর্ম্মনৈপুণ্য বিষয়ে এই অনুপম বস্ত্র এক মহতী ধ্বজা। পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল পারদর্শী তন্তুবায়েরা ইহার তুল্য বস্ত্রবয়নে বহুকালাবধি যত্নশীল আছে ; কিন্তু অস্মদ্দেশীয় এই জয়পতাকার গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে অত্যাপি কেহই সক্ষম হয় নাই। ঢাকাই বস্ত্র যৎপরোনাস্তি সামান্ত যন্ত্রে প্রস্তুত হয়, কিন্তু এই সামান্ত যন্ত্র ও তদ্ব্যবহারকর্ত্তৃদের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা, যে বিলাতের অদ্বিতীয় শিল্পকুশল ব্যক্তিরা বহুমূল্য বাষ্পীয় যন্ত্রসহকারেও তাদৃশ সূক্ষ্মবস্ত্র প্রস্তুত করণে পরাস্ত হইয়াছে। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই অনুপম বস্ত্র প্রাচীন রোম রাজ্যে প্রসিদ্ধ হইয়া হিন্দুদিগের শিল্প-সাফল্যের অনির্ব্বচনীয় প্রমাণ স্বরূপ গণ্য ছিল ; এবং অধুনা ইংলণ্ডদেশের তন্তুবায়দিগের তিরস্কার স্বরূপ জনসমাজে বিখ্যাত আছে। জনৈক য়ুরোপীয় শিল্পকর ইহার প্রশংসায় কহিয়াছিলেন যে 'বোধহয় ইহা বিদ্যাধরী ও অপ্সরারা বপন করিয়াছে ; এতাদৃশ সূক্ষ্মবস্ত্র মনুষ্যের স্থূল হস্তে সম্ভবে না।' ফলতঃ এই প্রশংসা অপ্রযোজ্য নহে।

"ঢাকা প্রদেশের সর্ব্বত্র এই উত্তম বস্ত্র প্রস্তুত হয় ; পরন্তু পশ্চাৎ লিখিত নগর সকল ইহার প্রধান বাণিজ্য স্থল ; তদ্যথা : ঢাকা, সুবর্ণগ্রাম, ডুমরা, তিতবাদী, জঙ্গলবাড়ী ও বজেৎপুর। এই সকল নগরী মধ্যে ঢাকা সর্ব্বোতোভাবে সুপ্রসিদ্ধ। এতন্নগরীর বস্ত্রার্থে

পূর্ব্বকালে পৃথিবীর সকল সুসভ্যদেশ হইতে বনিগ্‌বর্গ ঐ স্থানে আগমন করিত। অধুনা অল্পমূল্যের বিলাতি বস্ত্র ব্যবহারের রীতি প্রচলিত হওয়াতে বহুমূল্য ঢাকাই বস্ত্রের প্রতি জনগণের তাদৃশ অনুরাগ ও স্পৃহা নাই ; তথাপি ঐ নগর নিতান্ত শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই। অত্তাপি তথায় নানাবিধ ব্যবসায়ীদিগের সমাগম হইয়া থাকে।

"বস্ত্রবয়নের প্রথম ক্রিয়া সূত্র প্রস্তুত করণ। এই কর্ম্ম এদেশীয় পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোক দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই স্ত্রীলোকদিগকে সামান্য লোক কাটনী বা 'সূতা কাটনী' বলিয়া থাকে। এই কাটনীদিগের ত্বগিন্দ্রিয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তদ্দ্বারা ইহারা সূত্রের সূক্ষ্মত্ব—তারতম্য যে প্রকার উত্তমরূপে করিতে পারে পৃথিবী মধ্যে এরূপ আর কুত্রাপি কোন জাতীয়েরা পারে না। অল্পবয়স্কা স্ত্রীরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট সূত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। বয়ঃক্রম ত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইলে তাহাদিগের নয়ন ও ত্বগিন্দ্রিয় তৎকর্ম্মে অপটু হয়, সুতরাং তাহারা আর তত উত্তম সূত্র প্রস্তুত করণে সক্ষম থাকে না। পূর্ব্বাহ্নে বেলা ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ও অপরাহ্নে ৪ ঘটিকার পর সূত্র কাটিবার সময়, এতদ্ব্যতীত অন্য সময়ে বিশেষতঃ রৌদ্র প্রখর থাকিলে, উত্তম সূত্র প্রস্তুত হয় না। 'মলমলখাস' নামক সুপ্রসিদ্ধ বস্ত্র বুনিবার সূত্র অতি প্রত্যূষে কাটিতে হয় ; এবং যদ্যপি সেই সময় কাটনীর চতুর্ব্বর্ত্তিত স্থানে শিশির না থাকে, তবে এক পাত্রে কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া তদুপরি সূত্র কাটিবার প্রয়োজন হয় ; নচেৎ সূত্র ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। এই প্রকারে যে সূত্র প্রস্তুত হয় তাহা উর্ণনাভের সূত্র হইতেও সূক্ষ্ম। ইহার ১৭৫ হস্ত সূত্রের পরিমাণ এক রতি মাত্র। ফলতঃ ইহার একসের পরিমাণ সূত্র বিস্তার করিলে প্রায় ৪০০ জ্যোতিষীয় ক্রোশ স্থান ব্যাপ্ত হয়!!! অপিতু এই অদ্ভুত সূত্র যাদৃশ সূক্ষ্ম ইহা প্রস্তুত করণের শ্রমও তৎপরিমাণে বহুল। দুইমাস কাল নিয়ত পরিশ্রম করিলে এক তোলক পরিমাণ সূত্র প্রস্তুত হয় ; সুতরাং ইহার মূল্যও অত্যন্ত অধিক। একসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সূত্র ৬৪০ টাকার ন্যূনে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সূত্র প্রস্তুত হইলে 'ফেটা' বা 'লুটীর' আকারে রাখিতে হয়। পরে তন্তুবায়েরা ঐ ফেটা বা লুটী জলে ভিজাইয়া উহা বংশনির্ম্মিত এক চরকিতে বেষ্টন করিয়া ঐ সূত্রকে দুই অংশে পৃথক্ করে, যাহা উত্তম তাহা 'টানার' (বস্ত্রের দৈর্ঘ্যসূত্র) নিমিত্তে ব্যবহার হয়, এবং অবশিষ্ট 'পড়েনের' (বস্ত্রের প্রস্থসূত্র) উপযোগ্য। সূত্র ঐ প্রকার পৃথক্ পৃথক্ হইলে টানার সূত্র তিন দিবস নির্ম্মল জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। চতুর্থ দিবসে উহা হইতে নিষ্পীড়ণ করত ঐসূত্র এক চরকিতে বেষ্টন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। অনন্তর তাহা অঙ্গারচূর্ণ মিশ্রিত জলে পুনরায় ভিজাইতে হয়। অঙ্গারচূর্ণের পরিবর্ত্তে ভূষা অর্থাৎ পাক-পাত্রের তলজাত অঙ্গারবৎ পদার্থও ব্যবহৃত হয়। দুই দিবস এই জলে রাখিয়া ঐ সূত্রকে পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করা হয়। অতঃপর ঐ সূত্র পুনরায় এক রাত্রিকাল পরিষ্কার জলে ভিজান থাকিলে মাড় দিবার উপযুক্ত হয়। ঢাকা অঞ্চলে খৈয়ের মণ্ডের ব্যবহার আছে এবং উহা সূত্রোপরি লিপ্ত করিবার পূর্ব্বে তাহার সহিত কিঞ্চিৎ ধুনা মিশ্রিত করিয়া থাকে। এই প্রকারে টানার সূত্র প্রস্তুত হইলে তাহাকে

'উত্তম' 'মধ্যম' ও 'অধম' সূত্র মধ্যভাগে ব্যবহার করিয়া থাকে; সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্ত্রবয়ন কালেও এই নিয়মের অন্যথা করে না। 'পড়েন' প্রস্তুত করণে পূর্ব্ববৎ পরিশ্রম নাই। তাহাকে একরাত্রি কাল জলে ভিজাইয়া তৎপর দিবস প্রাতে মণ্ডে লিপ্ত করিতে হয়; পরন্তু টানার সূত্র এককালে প্রস্তুত করিতে হয়। পড়েনের সূত্র প্রত্যহ প্রস্তুত করিতে হয়। এককালে এক থানের ব্যবহারোপযোগী সূত্র প্রস্তুত করিলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়।

"পূর্ব্ব প্রকারে সূত্র প্রস্তুত হইলে যথানিয়মে বপনকর্ম্ম আরম্ভ হয়; কিন্তু স্থান সঙ্কীর্ণতা প্রযুক্ত তাহার বিস্তারিত বিবরণে অধুনা নিরস্ত থাকিতে হইল। 'মলমলখাস' বস্ত্রবপনের উত্তম সময় আষাঢ়, শ্রাবণ এবং ভাদ্র মাস। এতদ্ভিন্ন অন্য সময়ে তৎকর্ম্ম করিতে হইলে তাঁইতের নীচে কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া কেবল প্রাতঃকালে পরিশ্রম করত তাহা সুসম্পন্ন করিতে হয়। ঢাকা প্রদেশে যে সকল বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে মলমলখাস, সরকার আলি, ঝুনা, রঙ্গ, আবরওয়া, খাসা, শবণম, আলাবালী, তঞ্জেব, তরন্দম, সরবন্দ, সরবতী, কোমিস, ডোরিয়া, চারখানা এবং জামদানী—এই কয়েক প্রকার বস্ত্র সর্ব্বপ্রসিদ্ধ।

"মলমলখাস মুসলমান রাজাদিগের আধিপত্য সময় রাজপরিবারেরা ব্যবহার করিত। তৎপ্রযুক্ত ইহা 'খাস' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার টানায় ১৮০০ সূত্র থাকে এবং এক অর্দ্ধ (আধি) থানের পরিমাণ ৮ তোলা ৵০ আনা মাত্র !!! ঐ থান অনায়াসে এক অঙ্গুরীর মধ্য দিয়া চালিত হইতে পারে। ইহা বপনে ছয়মাস কাল ব্যয় হয় এবং ইহার মূল্য ১০০।১৫০৲ টাকা।

"সরকার আলি পূর্ব্বাপেক্ষায় মধ্যম। রাজপ্রতিনিধিরা ইহা ব্যবহার করিত এবং ইহার টানায় ১৯০০ সূত্র থাকে। 'ঝুনা' বস্ত্র এমত অত্যন্ত সূক্ষ্ম যে ইহা পরিধান করিলে শরীরোপরি বস্ত্র আছে এমন বোধ হয় না। ইহার তুলনায় 'গাজ' নামে প্রসিদ্ধ বস্ত্রও অতি স্থূল জ্ঞান হয়। ইহার দুই হস্ত প্রশস্ত বস্ত্রে ২০০০ টানার সূত্র থাকে। মুসলমান রাজমহিষীরা ও নর্ত্তকীরা এই বস্ত্র ব্যবহার করে। অন্যত্র ইহার ব্যবহার নাই। প্রাচীন বৌদ্ধ-গ্রন্থে এই বস্ত্রের ব্যবহার স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষেধ আছে। তাবর্ণিয়ার সাহেব লেখেন যে মুসলমান রাজাদিগের আজ্ঞাক্রমে কোন বণিক্ এই বস্ত্র ক্রয় করিয়া স্থানান্তর করিতে পারিত না। 'রঙ্গ' বস্ত্র পূর্ব্ববৎ, কেবল বপনের প্রথা স্বতন্ত্র। ইহার টানায় ১২০০ সূত্র মাত্র থাকে। 'আবরওয়া' অতি প্রসিদ্ধ বস্ত্র। ইহার তুল্য স্বচ্ছ বস্ত্র আর কুত্রাপি হয় নাই। ইহার টানায় ৭০০ সূত্র মাত্র থাকে। যবনেরা ইহার স্বচ্ছতা স্রোতোজলের তুল্য জ্ঞান করিয়া ইহাকে 'আব' (বারি), 'রওয়া' (গতিবিশিষ্ট) উপাধি দিয়াছেন। এই বস্ত্রোদ্দেশে কথিত আছে যে কোন সময় আরঙ্গজেব বাদশাহ স্বতনয়ার বর্ণ তাহার বস্ত্র ভেদ করিয়া প্রকাশ হইয়াছে দেখিয়া তাহাকে তিরস্কার করাতে সে কহিয়াছিল, "পিতঃ, সপ্তস্তর বস্ত্র পরিধান করিয়াছি, তথাপি কেন তিরস্কার করেন?" 'খাসা' বা 'জঙ্গল খাসা' পূর্ব্বে সোনারগাঁয়ে প্রস্তুত হইত। ইহা অন্যান্য মলমল অপেক্ষা ঘন এবং অধিক প্রশস্ত। ৩ হস্ত প্রশস্ত খাসা অপ্রাপ্য নহে। 'শাবণম,' এই মলমল অতি মনোহর। ইহা রজনীযোগে

তৃণময় ক্ষেত্রে বিস্তৃত করিয়া রাখিলে শিশির দ্বারা সিক্ত হইয়া পর প্রাতে অদৃশ্য হয়; ক্রমাগত যত দিবা বৃদ্ধি হইতে থাকে তত শিশির শুষ্ক হইলে তাহা পুনরায় দৃষ্টিগোচর হয়। সর্ব্বোত্তম শবণমের টানায় ৭০০ সূত্র থাকে।"

রেশম

বঙ্গদেশে রেশমের কীট-উৎপাদকদিগের নাম তুতচাষী। তুতপত্রের জন্য সাধারণতঃ ১০ বিঘা জমির প্রয়োজন। তুত চারি প্রকার, ১ম সার,—পত্রবৃহৎ ও ফল কালো বর্ণ হয়; ২য় ভোর—পত্র অপেক্ষাকৃত ছোট—হুগলী ও মেদনীপুর অঞ্চলে ইহা বেশী জন্মে; ৩য় দেশী; ৪র্থ চীনি।

পূর্ব্বে বঙ্গদেশে চারি প্রকারের কীট দ্বারা রেশম প্রস্তুত হইত। ১ম বড়—ইহাতে বৎসরে একবার মাত্র রেশম জন্মে। ২য় দেশী—বৎসরে ইহা হইতে পাঁচবার রেশম হয়। ৩য় চীনি (অপর নাম মান্দ্রাজী)—বৎসরে ছয় সাতবার রেশম হয়; ৪র্থ বর্ণশঙ্কর—দেশী ও চীনি কীটের মিশ্রণে জন্ম—ইহাতে উত্তম রেশম হয় না।

রেশমের কীটকে তুতচাষীরা সাধারণতঃ "পুলো," "পোকা" বা "পোক" বলে। দেশী কীটের ডিম বসন্তকালে ১০ দিনে, বৈশাখে ৮ দিনে, আষাঢ় মাসে ৭ দিনে ও শরৎকালে প্রায় দুই মাস পরে ফুটিয়া থাকে। বড় কীটের ডিম ফাল্গুনের শেষে জন্মে এবং দশমাস পরে অর্থাৎ মাঘ মাসের প্রথমে কীটাবস্থায় পরিণত হয়। ফাল্গুনের শেষে ৪০টি পুংকীট ও ৪০টি স্ত্রীকীট ভাল হইলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২৮০০ (১০ কাহন) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম প্রসব করে। ডিমগুলি প্রথম পীতাভ তারপর মেটে পাথরের বর্ণ হয়। নব জাত কীটদিগকে চাষীরা প্রত্যহ চারবার নূতন তুতের পাতা খাইতে দেয়। চারিদিন তুতের পাতা খাইয়া কীটগুলি ঘুমাইয়া পড়ে। এই ঘুমকে চাষারা "আঙ্গারে ঘুম" বলে। এই ঘুম দুইদিন পর্য্যন্ত থাকে; ঘুম ভাঙ্গিলে কীটের চর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্যরূপ চর্ম্ম হয় এবং এই অবস্থায় তাহারা পুনরায় তুত খাইতে থাকে। এই খাওয়া ও তৎপরবর্ত্তী অপরিহার্য্য ঘুম—এই প্রক্রিয়া ৪ বার হইয়া থাকে, ইহার মধ্যে ত্বক্ পরিবর্ত্তন করিয়া কীট ৩½ অঙ্গুলী প্রমাণ দীর্ঘ হয়। এইবার পুনরায় ইহাদিগকে ১০ দিন তুত খাইতে দেওয়া হয়—তারপর তাহারা আর কিছু খাইতে চাহে না। এই সময় একটা ডালা হইতে তাহাদিগকে দরমা দিয়া প্রস্তুত ২৸০ হাত প্রস্থ এবং ৩৸০ হাত দীর্ঘ অপর একটা আধারে রাখা হয়। এই আধারের নাম "ফিং"। ফিংএর উর্দ্ধে দুই অঙ্গুলী গভীর তিন অঙ্গুলী প্রস্থ সরু বাঁশের খোপ সকল নির্ম্মিত থাকে। চাষীরা ঐ খোপে এক একটি কীট রাখিয়া দেয়। তখন কীটগুলি তাহাদের মুখ হইতে এক প্রকার সূত্র বাহির করিয়া স্বীয় দেহ আবৃত করে। ক্রমাগত ৫৬ ঘণ্টা সূত্র প্রস্তুত করার পর কীটেরা নিস্তব্ধ হইয়া পড়ে। এই গুটি প্রস্তুত হওয়ার [illegible] দিন পরে চাষীরা

গুটি মধ্যস্থ কীট রৌদ্রের উত্তাপে অথবা "তুন্দুর" নামে গৃহে রাখিয়া নিহত করে, তৎপরে গুটিগুলি তপ্ত জলে সিদ্ধ করিলেই অনায়াসে সূত্র প্রস্তুত হয়।

এখনও বহরমপুর বাঙ্গলার রেশমী বস্ত্রের গৌরব কতক পরিমাণে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। "রেশম" ফার্সি শব্দ। আমাদের দেশে এইরূপ বস্ত্রের নাম ছিল 'কৌষেয়' 'ক্ষৌম,' 'পট্ট'। রামায়ণে সীতার পীত কৌষেয় বাসের উল্লেখ আছে। মহাভারতে সভা পর্ব্বে দৃষ্ট হয়, হিমালয়ের উত্তর প্রদেশস্থ শক জাতীয় রাজারা যুধিষ্ঠিরকে "কীটজ বস্ত্র" উপঢৌকন দিয়াছিলেন। ভারতীয় সাহিত্যে চীন দেশীয় রেশমী বস্ত্রের অনেক স্থলে উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রথের পতাকা পর্য্যন্ত চীনা বস্ত্রে প্রস্তুত হইত। এ সম্বন্ধে কালিদাসের সুপরিচিত "চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য" সহজেই মনে পড়িবে।

চীন সম্রাট্ ফোহির (Fo-hi) বংশোদ্ভব রাজা চীননং (Chin Nong) ২৮০০ খৃঃ পূর্ব্বে রেশমী বস্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। ২৬০২ খৃঃ পূর্ব্বে চীন সম্রাট্ হোয়েনটি (Hoan Ti) তাঁহার পাটরাণী সিলিং চিকে (Si-Ling-Chi) রেশমী সূতার উৎকর্ষ সাধনের ভার প্রদান করেন। এ বিষয়ে রাজ্ঞীর কৃতিত্ব এত বেশী হইয়াছিল যে, লোকে তাঁহাকে রেশমের দেবতা বলিয়া জানিত।

Economics of Silk Industry নামক পুস্তকের লেখক আর. সি. রওয়াল্লি (R. C. Rawalley) প্রভৃতি রেশমতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ভারতবর্ষের রেশম—এই দেশজ, উহাকে অন্য কোন স্থান হইতে আনিতে হয় নাই। শুধু রামায়ণ মহাভারতে নহে, পৃথিবীর আদি গ্রন্থ ঋগ্বেদেও ইহার উল্লেখ আছে। মনু বহু স্থানে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, (পঞ্চম অধ্যায়, ১২০ শ্লোক; নবম অধ্যায়, ১৬৮ শ্লোক; দ্বাদশ আধ্যায়, ৬৪ শ্লোক)। বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃতে এই বস্ত্রের যে যে নাম পাওয়া যায় (ঊর্ণ, কৌষেয়, কীটজ, ক্ষৌম) তাহাদের কোনটিরই চীন দেশীয় রেশমী বস্ত্রের নামের সঙ্গে সাদৃশ্য নাই। সে সকল নাম ভারতবর্ষের নিজস্ব, এবং এই বস্ত্রের উল্লেখ যখন খৃষ্ট জন্মিবার বহু পূর্ব্ব হইতে (চীনদেশীয় বস্ত্রের আদিকাল হইতে প্রাচীনতর সময়ের) ভারতীয় সাহিত্যে পাওয়া যাইতেছে—তখন এই শ্রেণীর বস্ত্র এদেশেই উৎপন্ন হইয়াছিল, পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, (R. C. Rawalley's Economics of Silk Industry, p. 15)।

ইয়ুরোপে এই বস্ত্র দুর্লভ ছিল। রোমের রাজারা এই বস্ত্রের অত্যন্ত সমাদর করিতেন। কিন্তু ইহা এত দুর্ম্মূল্য ছিল যে রাজরাণীরাও ইহা পরিতে পাইতেন না। সম্রাট্ আরিলিয়ানের পত্নী একটা অঙ্গরক্ষা এই বস্ত্রে বানাইতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু সম্রাট্ বহুব্যয়-সাধ্য বলিয়া তাহা রাজ্ঞীকে দিতে সম্মত হন নাই। ১৬০০ বৎসর পূর্ব্বে রোম সম্রাট্ হেলিওগেবলস রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করিতেন বলিয়া তদ্দেশীয় রাষ্ট্রসভা তাঁহাকে অপরিমিত ব্যয়শীলতার জন্য তিরস্কার করিয়াছিলেন। খৃষ্ট জন্মিবার অল্প সময় পরেই য়ুরোপে ভারতীয় রেশমেরই পরিচয় হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের প্রাচীন লেখকদিগকে কল্পনাপ্রিয় ও ইতিহাস-জ্ঞান-শূন্য বলিয়া নিন্দা করিতে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের কেহ কেহ উৎসাহ বোধ করেন। কিন্তু তাঁহারা যে বাস্তবজ্ঞানেও কোন জাতি হইতে ন্যূন নহেন, য়ুরোপীয় প্রাচীন লেখকগণই তাঁহাদের গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তাহার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ইসনাড লিখিয়াছেন, শুধু তুত খাওয়াইয়া একটা গাভীকে বহুদিন রাখিয়া দেওয়া হয়, তারপর তাহার বাছুর হইলেও তাহাকেও তুত খাওয়াইয়া শেষে মারিয়া ফেলা হয়। ঐ বাছুরের মাংস একটা পাত্রে রাখিয়া দিলে তাহা পচিয়া যায় এবং তন্মধ্যে রেশমী কীট দেখা দেয়,—সেই কীটজ সূত্রে ভারতীয় কৌষেয় বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

যে গৃহে এইভাবে কীটের ক্রমবিকাশ হয়—তাহার নাম "বানক"; ইহার পরিমাণ ১০ হাত দীর্ঘ, ১০ হাত প্রস্থ, ৬ হাত উচ্চ। এই গৃহে পর পর পাঁচটি মাচান থাকে, প্রত্যেক মাচানে ১৬টি ডালা—উহার পরিমাণ ৩॥০ হাত দীর্ঘ, ও ২॥০ হাত প্রস্থ; এক একটি ডালায় ৩২০০ কীট রক্ষিত হয়। সুতরাং সকলগুলি ডালাতে ২,৫৬,০০০ কীট পালিত হইতে পারে। এই গৃহে এককালে তিন মণ, তিন সের রেশম প্রস্তুত হয়—তাহা ছাড়া আরও কিছু অল্পদরের রেশম পাওয়া যায়—তাহাকে "ওছা রেশম" বলে।

রেশম ধৌত করিয়া মাজা ঘষা করিতে হয়। তাহাতে প্রতি সেরে এক পাদ পরিমাণে রেশম নষ্ট হয়। চীনি গুটীতে এক রতি পরিমাণ রেশম জন্মে এবং ঐ রেশম প্রায় ৮০০ হাত দীর্ঘ হয়। ঐ রেশমের ষাট তোলায় এক জোড়া উত্তম গরদ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই পরিমাণ বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পাঁচ হাজার সাতশো ষাট (৫৭৬০) গুটীর সূত্র দরকার।

এ সম্বন্ধে ৯২ বৎসর পূর্ব্বে এক বিশ্ববিশ্রুত বাঙ্গালী পণ্ডিত লিখিয়াছিলেন, "৫৭৬০ জীবের প্রাণ নষ্ট না করিলে এক জোড়া গরদের বস্ত্র পরিধান করা অসাধ্য। অধুনা যাঁহারা অবিরত বৈধ হিংসার নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাস্য যে তসর, গরদ, চেলি, সাটিন ও মকমল ইত্যাদি কীটজ বস্ত্র তাঁহারা কি বিবেচনায় ধারণ করেন? তাঁহারা অবশ্যই জ্ঞাত আছেন যে বিংশতি বৎসর প্রত্যহ ছাগমাংস ভক্ষণে যত সংখ্যক জীবহত্যা ঘটে, এক জোড়া গরদের বস্ত্রার্থ ততোধিক পাপের (?) সম্ভাবনা; কারণ উক্ত বস্ত্রের প্রত্যেক গজ-পরিমিত পদার্থ প্রস্তুতকরণে সহস্রাধিক জীবের প্রাণহানি হয়। ১২৪৯ বঙ্গাব্দে (১৮৪১ খৃঃ) ১৬,১১৮।০ মণ রেশম ও ৭৬, ৮৪৬ থান কোড়া আর ৭,৫৮,৭৮৩ থান রেশম মিশ্রিত কার্পাস বস্ত্র বঙ্গদেশ হইতে বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন এতদ্দেশে যে রেশমের বস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল তৎসমুদয় প্রস্তুতকরণার্থে ১,২০,০০০ মণ রেশমের আবশ্যক; এবং এই রেশম উৎপন্ন করণার্থ প্রতিবর্ষে অভাবতঃ ৮,৩২,৫২,০৩,২৫২ জীব-হত্যা হইয়া থাকে। বৈধহিংসাদ্বেষী মহাশয়েরা কৌষেয় বস্ত্র ব্যবহারে বিরত হইলে উক্ত সংখ্যক জীবের অনেকে রক্ষা পাইতে পারে!!!" (বিবিধার্থ সংগ্রহ, ২য় পর্ব্ব, ২৫ পৃঃ।)

নৈতিক ও অধ্যাত্ম জগতের এই গূঢ় প্রশ্ন সমাধানের আমাদের অবকাশ নাই কিন্তু উপরে যে সংখ্যার অঙ্ক দেওয়া হইল তাহা দ্বারা ৯২ বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজ রাজত্বের প্রাক্কালে

আমাদের রেশম, ব্যবসায়ীদের যে সমৃদ্ধি ছিল তাহার কথা স্বতঃই মনে হইবে। আমরা মোগল রাজত্ব পর্য্যন্ত এই ইতিহাসের দাঁড়ি টানিয়াছি। সুতরাং পরবর্ত্তী সময়ের বঙ্গের বাণিজ্য-ধ্বংসের বিষাদময় তুলনা-মূলক চিত্র উদঘাটন করা আমাদের বিষয়-বহির্ভূত। এখন সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে যে রেশম বিদেশে রপ্তানি হইতেছে, তাহার একটা তালিকা আমার টেবিলের উপর আছে। এই তালিকা হইতে শুধু বঙ্গদেশের অংশটা কতক পরিমাণে অনুমান করা যাইতে পারে। ১৮৬৭—৬৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার রেশম বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৮৮৭—৮৮ অব্দে যে চালান যায় তাহার মূল্য শুধু ৪০ লক্ষ টাকা। ১৮৯২—৯৩ অব্দে রপ্তানি বাড়িয়া গিয়াছিল, উহার মূল্য ৬৭,১৫,০০০৲ টাকা—ইহা সমস্ত ভারতবর্ষের হিসাব।

বাঙ্গালীর পাণ্ডিত্য

আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, বঙ্গদেশে বহু পূর্ব্বে আর্য্য-নিবাস হইয়াছিল এবং অধিবাসীরা বেদোক্ত ধর্ম্ম পালন করিতেন। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন, আসামের পাহাড়ে এখনও বৈদিকধর্ম্ম-পালনকারী এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা ঠিক বৈদিক ঋষিদের মন্ত্রের অনুরূপ মন্ত্র জপ করিয়া বৈদিক অনুষ্ঠান করেন।

পরবর্ত্তী জৈন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব এদেশে বৃদ্ধি পাওয়ার পরে এবং এদেশের জনসাধারণ স্বভাবতঃই পশু-বধ-বিরোধী হওয়াতে বৈদিকধর্ম্ম এদেশে ততটা প্রচলিত হইতে পারে নাই। মহাভাষ্যের উদাহরণ-প্রসঙ্গে পতঞ্জলি লিখিয়াছেন, "লোকেশ্বর আজ্ঞাপয়তি.........প্রাগঙ্গং গ্রামেভ্যো ব্রাহ্মণা আনীয়ন্তামিতি।" এই লোকেশ্বর শুঙ্গবংশীয় ব্রাহ্মণ রাজা পুষ্যমিত্র। তিনি বৌদ্ধ প্রভাবে পূর্ব্বদেশ বৈদিকাচার-বিরহিত দেখিয়া তথায় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, উহা খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর কথা।

বেদ-বিদ্যা।

কিন্তু নিরন্তরে যদিও জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ করিয়া প্রচলিত হইয়াছিল, তথাপি খৃষ্টীয় প্রথম দিক্‌কার কয়েক শতাব্দীতে এদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কোন কালেই অভাব হয় নাই। তাম্রলিপিতে ইহার বহুল প্রমাণ দৃষ্ট হয়। দামোদরপুরের (দিনাজপুর) পাঁচখানি তাম্রশাসনে দৃষ্ট হয়, খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে এদেশে ব্রাহ্মণগণ "অগ্নিহোত্র" ও "পঞ্চ মহাযজ্ঞ" সম্পাদন করিতেন, পুণ্ড্রভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষে এই সকল বৈদিক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত। ফরিদপুর জেলার তিনখানি তাম্রশাসনে জানা যায় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বঙ্গদেশের "বারক মণ্ডলে" যজুর্ব্বেদের বাজাসন শাখাবলম্বী ব্রাহ্মণেরা বাস করিতেন। ত্রিপুরার তাম্রশাসনে দৃষ্ট হয় প্রদোষ শর্ম্মা নামক জনৈক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ চারিবেদে অভিজ্ঞ শতাধিক ব্রাহ্মণকে তদ্দেশে উপনিবিষ্ট করাইয়াছিলেন। নেপালের রাজকীয় পুঁথিশালায় চতুর্ভুজ-বিরচিত হরিচরিত কাব্যের পুষ্পিকায় দৃষ্ট হয়, পালবংশীয় ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে

বরেন্দ্রভূমিতে শ্রুতিবিদ্ ব্রাহ্মণগণের বসতি ছিল। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে নির্মিত দিনাজপুরের গুরবমিশ্রের গরুড়স্তম্ভে দৃষ্ট হয় উক্ত মিশ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ বংশানুক্রমে বেদবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। কেদার মিশ্র বাল্যকালেই "চতুর্ব্বিদ্যাপয়োনিধি" পান করিয়া বেদ এবং বৈদিক সাহিত্যে প্রথিতযশা হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ দেবপালের মন্ত্রী দর্ভপাণি "বেদচতুষ্টয়রূপ মুখপদ্মলক্ষণাক্রান্ত" ছিলেন। দেবপাল দেবের সমসাময়িক "ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ" গ্রন্থকর্ত্তা নারায়ণেরও অশেষ বেদজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় দশম শতকে মহীপাল দেবের বাণগড় লিপিতেও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রাজা ভূতি বর্ম্মার সময়ে তদানীন্তন কামরূপে বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কামরূপের ভাস্কর বর্ম্মার তাম্রশাসনে বেদের বিভিন্ন শাখাবলম্বী ২০৫ জন ব্রাহ্মণের নাম আছে। ইহা ছাড়া এদেশবাসী ভিন্ন ভিন্ন যুগের বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বিষয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার লিখিত হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধনা-লেখমালার অন্তর্গত প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, এই বিষয়ে আমি সেই প্রবন্ধটি হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। বৈদিক গ্রন্থ বৌদ্ধযুগে এদেশে তাদৃশ আদৃত হয় নাই, এই জন্ম যাহা কিছু ছিল, তাহা লুপ্ত হইয়াছে। তথাপি গুণবিষ্ণু, হলায়ুধ, রামনাথ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি কয়েক জন বৈদিক গ্রন্থকর্ত্তার নাম ও তাঁহাদের গ্রন্থের বিষয় পণ্ডিত দুর্গানাথ উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্গলার জনসাধারণ সেন রাজাদের পূর্ব্বে পশুবলি ও বৈদিক যজ্ঞাদির বিরোধী ছিল। এই জন্য বঙ্গের বাহিরের লোকেরা এই দেশ বেদ-বহির্ভূত, ব্রাহ্মণহীন বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন। বস্তুতঃ বঙ্গদেশে কোন কালেই পণ্ডিতের অভাব হয় নাই। আমরা ২৯১-৯৮ এবং ৩৫৩-৭৬ পৃষ্ঠায় বঙ্গীয় পণ্ডিতদের কথা আলোচনা করিয়াছি।

ইংরেজদের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেও বাঙ্গলায় এইরূপ ভুবনজয়ী পণ্ডিত অনেক ছিলেন, যাঁহাদের পদতলে বসিয়া উইলসন, কোলব্রুক, কেরি, ওয়ার্ড, টমাস ও মার্সম্যান প্রভৃতি সুপণ্ডিত সাহেবগণ এদেশের ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করিতেন। এই ব্রাহ্মণদের মধ্যে আমরা মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করিতে পারি। মার্সম্যান সাহেব তাঁহার শ্রীরামপুরের ইতিহাসে মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদিগের পুরোভাগে ছিলেন মৃত্যুঞ্জয়; ইনি উড়িষ্যাবাসী, এবং বিদ্যার জাহাজ বলিয়া পরিচিত ছিলেন" (আমি Colossus of literatureএর ভাবার্থ "বিদ্যার জাহাজ" শব্দে বুঝাইলাম)। কিন্তু তিনি উড়িষ্যাবাসী ছিলেন না; বঙ্গদেশবাসীই ছিলেন; যে হিসাবে মার্সম্যান তাঁহাকে 'উড়িষ্যাবাসী' বলিয়াছেন—সে হিসাবে আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও উড়িষ্যাবাসী বলা চলে। মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার ১৭৬২ খৃঃ অব্দে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। মার্সম্যান ইহার সম্বন্ধে আরো লিখিয়াছেন :—"ইহার সঙ্গে আমাদের সুবিখ্যাত অভিধান-রচয়িতার (জনসনের) খুব সাদৃশ্য ছিল। জনসনের মতই মৃত্যুঞ্জয়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল এবং তাঁহারই মত হিন্দু পণ্ডিতের বিরাট্ ও অশোভন বপু ছিল। সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার মত পাণ্ডিত্য আর কাহারও ছিল না; মিঃ কেরি প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টা

ইহারই কাছে ভাষা শিক্ষা করিতেন।" মৃত্যুঞ্জয় প্রণীত প্রবোধচন্দ্রিকার ইংরেজী ভূমিকায় মার্সম্যান লিখিয়াছেন, "মৃত্যুঞ্জয় বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের অন্যতম" ("One of the most profound scholars of the age")। এই প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের শুধু পাণ্ডিত্য নহে, ইহাদের নৈতিক দৃঢ়তা ও ধর্ম্মবিশ্বাস দেখিয়া সেই সকল সুপণ্ডিত পাদ্রী সাহেবেরাও বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন। কেরি সাহেবের জীবনচরিতে লিখিত হইয়াছে যে এক সদাশয় ব্রাহ্মণ একদা একটি লোককে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করেন; এই ব্যাপার আদালতের বিচারাধীন হয়, এবং ব্রাহ্মণকে সাক্ষী মানা হইয়াছিল। কিন্তু সাক্ষীকে আদালতে যাইয়া শপথ লইতে হয়। ব্রাহ্মণ শপথ লইতে অস্বীকার করেন, এই অপরাধে মহাত্মা ব্রাহ্মণকে হাজত ভোগ করিতে হয়। তিনি একটি লোককে জীবন দান করিয়াছিলেন, প্রতিদান স্বরূপ আদালত তাঁহার উপর এই উৎকট ব্যবস্থা করিলেন। ক্ষোভে ব্রাহ্মণ হাজতে তিন দিন তিন রাত্রি উপবাস করিয়া রহিলেন, প্রাণত্যাগ করিবেন তবুও আদালতে শপথ গ্রহণ করিবেন না, এই তাঁহার পণ। এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সাধুচরিত্র ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান দেখাইয়া কেরি সাহেব বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাৎপূর্ব্বক তাঁহাকে মুক্তিদান করেন। বঙ্গদেশে তখনও যেরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস ও সাধুতা বিরাজ করিতেছিল, তাহা দেখিয়া পাদ্রীরা অনেক সময় বিলাপ করিয়া বলিতেন, "কুসংস্কার সত্ত্বেও হিন্দুরা তাঁহাদের ধর্ম্মের প্রতি যেরূপ অচলা ভক্তি ও ঐকান্তিকী নিষ্ঠা দেখাইয়া থাকেন, আমাদের খৃষ্টানদিগের মধ্যে তাহার সিকি পরিমাণ অনুরাগও তো দেখিতে পাই না।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সংস্করণ, ৫৬১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) টমাস সাহেব নবদ্বীপে যাইয়া তথাকার পণ্ডিতদের আশ্চর্য্য চরিত্রবল, নির্ভীকতা ও প্রগাঢ় বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সেই যুগের বাঙ্গালীদের উদারতা, বন্ধুর জন্য, প্রতিশ্রুতির জন্য অকাতরে স্বীয় প্রাণদান প্রভৃতি মহাগুণের অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। এই পুস্তকে সে সকল লিপিবদ্ধ করিবার অবকাশ নাই। বাঙ্গালীদের অসামান্য বিদ্যানুরাগে সাহেবেরাও বিস্মিত হইয়াছেন। প্রতাপাদিত্য-চরিত-লেখক **রামরাম বসু** সম্বন্ধে ডাঃ কেরি লিখিয়াছেন, "ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিদ্যানুরাগী পণ্ডিত আমি দেখি নাই। ১৬ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই ইনি আরবী ও পারসী ভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সংস্কৃত ভাষায়ও ইহার তুল্যরূপ অধিকার ছিল।" "A more devout scholar than him I never saw ....Before his 16th year he became a perfect master of Arabic and Persian. His knowledge of Sanskrit was not less worthy of note." কেরির মত বহুভাষাবিৎ পণ্ডিতের এই প্রশংসা উপেক্ষা করিবার কথা নহে। রামরাম বসু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে চুঁচুড়ার জন্মগ্রহণ করেন এবং নিমতা গ্রামের এক পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে আরও অনেক দেশবিশ্রুত পণ্ডিত বঙ্গদেশে জন্মিয়াছিলেন, ইহাদের মধ্যে **গঙ্গাধর কবিরাজের** নাম স্মরণীয়। ইহার সম্বন্ধে ১৩৩৯ সনের ১৯শে জ্যৈষ্ঠের "নায়ক" পত্রিকায় কৃতবিদ্য কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন লিখিয়াছেন,

"বহু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকে বলিতে শুনিয়াছি—'আর্য্য-চিকিৎসার শেষ ঋষি গঙ্গাধর। শ্রীচৈতন্যদেবের যুগের পর এত বড় পণ্ডিত ভারতে জন্মগ্রহণ করেন নাই'।"

ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন এবং ৭৭ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে আয়ুর্বেদ-সংক্রান্ত ৩০খানি, তন্ত্রগ্রন্থ ২খানি, জ্যোতিষ ১খানি, ব্যাকরণ ৮খানি, স্মৃতি ৭খানি, নাটক, আখ্যায়িকা, মহাকাব্য ও ছন্দগ্রন্থ ১৩খানি এবং ১৪খানি বিবিধ বিষয়ক। তাঁহার রচিত আয়ুর্বেদ-সংক্রান্ত টীকা "জল্পকল্পতরু" এখন বঙ্গদেশীয় শ্রেষ্ঠ ভিষক্‌গণের প্রধান অবলম্বন। গঙ্গাধর যশোহর জেলার মাগুরা গ্রামে ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে (২৪শে আষাঢ়, শুক্রবার) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮৪ সনের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে প্রাণত্যাগ করেন। ইঁহার পিতার নাম ছিল ভবানী রায় ও মাতার নাম অভয়া দেবী—এবং ইনি তাঁহাদের একমাত্র সন্তান ছিলেন।

এই পণ্ডিতদিগের শিরোমণি-স্বরূপ আমরা রাজা রামমোহন রায়ের নাম উল্লেখ করিতে পারি; ইনি প্রাচীন ও আধুনিক কালের সন্ধিস্থলে বিরাজমান। ইনি হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর বৃষ্টল নগরীতে প্রাণত্যাগ করেন। পরাধীন জাতির একটি লোক, ধন-মান-ঐশ্বর্য্য-বিদ্যাগর্ব্বিত ইংরেজদিগের মধ্যে তখনকার দিনে যে উচ্চ প্রশংসা ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পাইয়াছিলেন, তাহাতে বুঝা যাইবে, আর্য্যসভ্যতার প্রধান লীলাকেন্দ্রসমূহে তখনও জ্ঞান-ধর্ম্মের পুণ্য-প্রদীপ জ্বলিতেছিল; জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ বাঙ্গলার ব্রাহ্মণকে যে জগদ্‌-গুরু বলিয়া মান্য করিয়াছিলেন—তাহা তাঁহাদের অজস্র অকপট হৃদয়ের অভিনন্দন দ্বারা প্রতীতি হয়। আমরা এখানে কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির অভিমত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব—বঙ্গীয় মন্দিরের হোমানল বিদেশী শ্রদ্ধাভক্তি কতটা আকর্ষণ করিয়াছিল। লণ্ডনের ইউনিটারিয়ান সমিতি হইতে রামমোহন রায়কে যে অভিনন্দন দেওয়া হয়, সেই সমিতির মুখপাত্র হইয়া রাজাকে মানপত্র দেওয়ার সময় স্যার জন বাউরিং (Sir John Bowring) যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই:—"কেহ কেহ কল্পনা করিয়াছেন, যদি এখন আমাদের মধ্যে বিশ্ব-বিশ্রুত অমর-কীর্ত্তি ব্যক্তিগণ, যাঁহাদের যশ যুগযুগান্ত যাবৎ চলিয়া আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ যদি হঠাৎ সশরীরে উপস্থিত হন, তবে আমাদের মনে কি ভাব হইবে? যদি হঠাৎ প্লুটো, সক্রেটিস্, মিলটন কি নিউটন অকস্মাৎ আসিয়া দেখা দেন, তবে আমরা কি ভাবিব? আমাদের একজন কবি, যিনি স্বর্গীয় প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস, তিনি দক্ষিণ মেরুর সেই সুন্দর জ্যোতিষ্মান্ আলোকপুঞ্জ যাহা 'স্বর্ণ ক্রুশদণ্ড' (Golden Cross) বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা যাঁহারা সর্ব্বপ্রথম দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিস্ময়াবিষ্ট মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল তাহা অঙ্কন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমি এই সমিতির পক্ষ হইতে রাজা রামমোহন রায়কে আপ্যায়ন করিতে যাইয়া সেইরূপ ভাব-বিহ্বলতার সহিত হস্ত প্রসারিত করিতেছি।" আমেরিকার ডাঃ বুথ মিঃ ইটলিনের নিকট ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৭শে নভেম্বর যে চিঠি লিখিয়াছিলেন,

তাহাতে রামমোহন সম্বন্ধে এই কথাগুলি ছিল :—"ইহার মৃত্যুর পরে আমি ইহার সমস্ত গ্রন্থাবলী ভাল করিয়া পাঠ করিলাম। তাহার ফলে আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, রামমোহন রায়ের সমকক্ষ ব্যক্তি জগতে বর্ত্তমান কালে বা অতীতে কখনও জন্মেন নাই।" রেভারেণ্ড জে. স্কট্ পোর্টার প্রিসবিটেরিয়ান সভায় বলেন, "যে কোন বিষয় আলোচনায় তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যাইত, সেরূপ পাণ্ডিত্য আমি আর কাহারও মধ্যে দেখি নাই। তাঁহার যুক্তির সারবত্তা এবং মৌলিকত্ব এরূপ ছিল, যাহার অধিক আর কাহারও হইতে পারে না। জগতে যত লোক যে কোন যুগে জন্মিয়াছেন, রামমোহন রায় তাঁহাদের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠগণের অন্যতম।" ১৮৩৩ খৃঃ অব্দের ১৪ই অক্টোবর তারিখে ফিনস্ বাড়ী গির্জ্জায় (লণ্ডন) বক্তৃতা কালে রেভারেণ্ড জে. ফক্স বলিয়াছিলেন, "একটা কবিত্বপূর্ণ স্বপ্নের ন্যায় তাঁহার অস্তিত্ব বিলীন হইয়া গিয়াছে! কিন্তু তিনি মৃত হইয়াও এখনও যে স্বরে কথা কহিতেছেন তাহা যুগ যুগান্তর ভরিয়া শুধু ভারতবাসী নহে, য়ুরোপের ও আমেরিকার অধিবাসীদের কাণে বাজিবে।" নিউ গ্রাভেল পিটে রেভারেণ্ড এ্যাসপ্ল্যাণ্ড রামমোহন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "যে পর্য্যন্ত জগতে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারিত হইবে, ততকাল রামমোহনের নাম কেহ ভুলিতে পারিবেন না।" কর্নেল ফিটজ্ লরেন্স (মানচেষ্টারের আরল) তাঁহার ইংলণ্ড, ইজিপ্ট ও ভারতবর্ষের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে (১৮১৭-১৮ খৃঃ) লিখিয়াছেন, "অত্যাশ্চর্য্য শক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, তাঁহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ; আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, ইংরেজী, বাঙ্গলা ও হিন্দুস্থানী ইঁহার নখাগ্রে এবং ইনি কথায় কথায় লক (Locke) এবং বেকনের (Bacon) গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করেন।" সামাজিক সাম্যবাদের তৎকালের প্রধান নেতা সুবিখ্যাত রবার্ট ওয়েন ইঁহার সঙ্গে তর্কে হারিয়া গিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে মিঃ রেকর্ডার হিল (Recorder Hill) লিখিয়াছেন, "রাজা আমাদের ভাষায় তর্ক করিলেন, ইংরেজী ভাষায় তাঁহার বিস্ময়কর অধিকার আমাদিগকে অভিভূত করিল। রবার্ট হারিয়া গিয়া একটু চটিয়া গেলেন। তাঁহার এরূপ বিচলিত ভাব ও অসহিষ্ণুতা আমি আর কখনই দেখি নাই। রাজার ভাব স্থির, সংযত ও প্রশান্ত।" ডাঃ বুট ইষ্টলিন সাহেবকে ১৮৩৩ খৃঃ অব্দের নভেম্বর মাসে লিখিয়াছিলেন, "আমার চক্ষে রাজা রামমোহন রায় মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ, জগতের অতীত ইতিহাসে ও বর্ত্তমানে জ্ঞান ও বিনয়ের এরূপ পূর্ণ প্রতিমা আর একটিও আমি কল্পনা করিতে পারি নাই।" আর একজন ইংরেজ লিখিয়াছিলেন, "তর্কযুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে এক্ষেত্রে রাজা ইংলণ্ডে তাঁহার সমকক্ষ একজনও পান নাই।" মেরি কার্পেণ্টার লিখিয়াছেন, "শ্রীরামপুরের মিঃ এডামস্ রাজাকে ব্যাপটিষ্ট্ মতে দীক্ষিত করিতে আসিয়া নিজে রাজার সঙ্গে তর্কে পরাভূত হইয়া তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, একথা সকলেই জানেন।" সেই সময়ের সর্ব্ব প্রধান হেতুবাদী দার্শনিক জেরেমী বেন্থাম রামমোহনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি রাজাকে একবার চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "আপনার পুস্তকে নাম না থাকিলে আমি কিছুতে ধরিতে পারিতাম না যে উহা হিন্দুর লেখা,—বরঞ্চ উহা কোন শ্রেষ্ঠ এবং উচ্চশিক্ষিত

ইংরেজের দ্বারা লিখিত বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল।" জন ষ্টুয়ার্ট মিলের ভারতবর্ষের ইতিহাসের সুখ্যাতি করিয়া বেন্থাম রাজাকে লিখিয়াছিলেন,—"মিলের ইংরেজী লেখাটা যদি আপনার মত সুন্দর ও নিখুঁত হইত, তবে আর কিছু বলিবার থাকিত না।" বিলাতের তৎকালের প্রসিদ্ধ কবি ক্যাম্বেল রামমোহনকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। তিনি যতদিন ইংলণ্ডে ছিলেন, ততদিন সেই দেশের আভিজাত্য এবং বিদ্যাদর্পিত ইংরেজ সমাজ তাঁহাকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিয়া আতিথ্য দেখাইতে ব্যস্ত হইয়াছিল। তিনি ইংলণ্ডেশ্বরের সভায় এবং ফরাসী রাজ লুই ফিলিপের প্রাসাদে সর্ব্বোচ্চ সম্মান পাইয়াছিলেন।

এই বাঙ্গলার এক নগণ্য প্রদেশ রঙ্গপুর—তথাকার কালেক্টারের সেরেস্তাদার, যিনি তৎকালের বিধি অনুসারে কেরানিগিরি হইতে উচ্চতর কোন পদের দাবী করিতে পারিতেন না, তিনি এত বড় হইয়াছিলেন যে সমস্ত সভ্য জগৎ সসম্ভ্রমে তাঁহার নিকট মাথা নোয়াইয়াছিল। এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ 'মুকুটহীন রাজশ্রীর' প্রভাবে চিরকাল সমস্ত জগতের উপর রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন। কুটিরবাসী এক নগণ্য পল্লীর পণ্ডিতকে দেখিয়া পণ্ডিতশিরোমণি কেরি প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রথিতযশা ব্যক্তি তাঁহাদের বেতনভুক্ সেই দরিদ্র ব্যক্তিকে তৎকালীন জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের একজন বলিয়া সংবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী পণ্ডিতের মস্তিষ্কের অপূর্ব্ব সৃষ্টি—নব্যন্যায়ের কূটতর্কের মধ্যে এখনও য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ মাথা প্রবেশ করাইতে পারিতেছেন না। হে ভারতবাসী! চারিদিকে বিপদজাল ঘিরিয়া ধরিয়াছে, ঊর্দ্ধে মহামেঘের উদ্দামলীলা। এই দুর্য্যোগের গভীর নিশার গাঢ় অন্ধকারে পথ দেখা যাইতেছে না; কিন্তু যুগে যুগে নব নব প্রতিভার স্ফুরণে, নানক, কবির, তুকারাম, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, রামমোহন, গান্ধী, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত পুরুষবরদিগের অভ্যুদয়ে কি মনে হয় না যে, এই তপস্যার ক্ষেত্রে—এই যজ্ঞস্থলে এখনও হোমাগ্নি জ্বলিতেছে, এখনও আহিতাগ্নিকের চির জ্যোতিষ্মান্ বহ্নিদীপ্তি হেথায় নির্ব্বাপিত হয় নাই? এই যুগের মুক্তিমন্ত্র শিখাইবার যোগ্য কোন পুরোহিত আসিবেন, কি আসিয়াছেন; তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত বাণীর প্রত্যাশায় সমস্ত দেশ স্তম্ভিত ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে।

এই শিক্ষাপ্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্ব্বে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় স্থাপিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি কথা বলিব।

ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষাশিক্ষার উপর এই বিদ্যালয় জোর দিয়াছিল, বস্তুতঃ ইহা খুবই স্বাভাবিক ছিল। এ কথাটা ভাবিতে পারা যায় না যে, যাঁহারা কোটী কোটী লোকের ভাগ্যনিয়ন্তা শাসনকর্ত্তা, তাঁহারা সেই দেশের ভাষা না জানিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে কাজ কি করিয়া সুসম্পন্ন করিতে পারেন। এই প্রাদেশিক ভাষা অগ্রাহ্য করাতে শিক্ষালয়গুলিতে নানারূপ বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। এদেশের লোকেরা মৌলিক চিন্তাশীলতার প্রতিষ্ঠা একরূপ হারাইতে বসিয়াছে। গণিত পড়িবে গণিতের ভাষা ইংরেজী; ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, ন্যায়, ভিষক্‌শাস্ত্র প্রভৃতি সমস্তই ইংরেজীতে শিখিতে হয়। ফলে প্রত্যেক বিষয় শিখিতে সময়ের অর্দ্ধেকটা যায় তৎসম্বন্ধীয় ভাষাটা দখল করিতে। এমন কি

সংস্কৃত ও বাঙ্গলায় এমন প্রশ্নপত্র আছে যাহাতে ঐ দুই ভাষায় জ্ঞান না থাকিলেও শুধু ইংরেজী জানিলেই পরীক্ষার্থী কৃতকার্য্য হইতে পারে। ভাষা লইয়া কসরৎ করাতে বিষয়জ্ঞান অতি অল্পই হয় এবং যেটুকু হয় তাহা গতানুগতিক হয়—স্বাধীন চিন্তাশীলতার কোন উৎসাহ দেওয়া হয় না। বিদেশী ভাষার নানারূপ কসরৎ দখল করিতে করিতেই জীবনের অর্দ্ধেক চলিয়া যায়। এজন্ত মেডিক্যাল কলেজে এত ভাল ভাল ছাত্র গত অর্দ্ধশতাব্দীকালে এদেশে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু গুডিব চক্রবর্ত্তী হইতে ডাঃ সরকার পর্য্যন্ত একজনও এমন দাঁড়ান নাই, যিনি মৌলিক গবেষণা দ্বারা চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কোন নূতন তত্ত্ব দান করিতে পারিয়াছেন। ইংরেজী সাহিত্যে আমরা এত কৃতী যে আমরা একরূপ ইংরেজীতে হাসি, ইংরেজীতে কাসি এবং ইংরেজীতে স্বপ্ন দেখি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, অথচ আমরা সেক্সপীয়র সম্বন্ধে লিখিতে গেলে কেবলই টেইন, ডাউডন, ভিকটর হিউগো কি বলিয়াছেন, তাহারই অনুবৃত্তি করিয়া থাকি ; আমাদের যে কোন স্বাধীন মত বা স্বকীয় আদর্শ আছে তাহা জানিও না, ভাবিতেও পারি না। এদিকে ২৪ বৎসরের ইংরেজ যুবক বেদ, পুরাণ, বেদান্ত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি যাহা কিছু পড়িবেন, বুড় বাল্মীকি, দ্বৈপায়ন কিংবা ঋগ্বেদের ঋষি কেহই ইহাদের অত্যদ্ভুত সমালোচনা হইতে রেহাই পান না। ইহারাই বা চিন্তাজগতে এমন স্বাধীন ও আমরাই বা এরূপ পরাম্মুখ ও শেকলে-বাঁধা গোলাম হইলাম কেন? ইতিহাস এবং দর্শনেও আমরা কেবলই পরের মত রোমন্থন করিতেছি। ইহার একমাত্র কারণ আমরা নিজেদের কথাও নিজের ভাষায় পড়িতে পাই না। এ সম্বন্ধে এফ. এচ. স্ক্রাইন, আই. সি. এস. বলেন, "কুক্ষণে মেকলে সাহেব বাঙ্গলার শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, নতুবা বাঙ্গালীরা যে মৌলিকতাহীন বলিয়া অভিযুক্ত হইয়া থাকেন সেই নিন্দার দশমাংশের একাংশেরও তাঁহারা ভাজন হইতেন না।"

প্রাদেশিক ভাষা অগ্রাহ্য করার ফল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই অধিকতর দৃষ্ট হয়। এই যে কোটী কোটী লোকের ভাষা না জানিয়া রাজপুরুষেরা এদেশ শাসন করিতেছেন, তাহার ফলে শত শত মতরজ্জম (অনুবাদক) অফিসে অফিসে বসিয়া গিয়াছে। একজন ইংরেজ যদি আমাদের ভাষা শিক্ষা করেন, তবে শত শত উকীল মোক্তারের ভাঙ্গা, অশুদ্ধ ও অপরিস্ফুট ইংরেজী দিয়া বিচারককে সকল কথা বুঝাইতে হয় না। ইহাদের এই পণ্ডশ্রমে ব্যয়িত সময়ের কি কোন মূল্যই নাই? সাক্ষীর জবানবন্দীর ইংরেজী অনুবাদে যে কত বৃথা সময় ও শক্তির অপচয় হয় তাহা সকলেই জানেন। মাত্র জনকয়েক হাইকোর্টের জজ, ছোট আদালতের জজ ও জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও জেলা জজ এদেশীয় ভাষা শিখিবেন না আর তজ্জন্ত সমস্ত জাতি এই ভাবে ঘোর প্রায়শ্চিত্ত করিবে, ইহা যুক্তিসহ নহে। বিচারককে ইংরেজীতে কি সকল কথাই এই সকল উকীল ভাল বুঝাইতে পারেন, না, নাম-মাত্র দেশী ভাষার জ্ঞান লইয়া বিচারক সাক্ষীর জবানবন্দী বুঝিতে পারেন? শাসনকর্ত্তাকে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দেশের অবস্থা বুঝিয়া লইতে হয়, দেশীয় ভাষা না জানিয়া তিনি এই কার্য্য কি ভাবে সুসম্পন্ন করিতে পারেন? প্রাদেশিক ভাষায় তিনি যে পরীক্ষা দিয়া পাস করেন, তাহা খেলা মাত্র ; ম্যাট্রিকুলেসনের বাঙ্গলা পরীক্ষার

উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্য জ্ঞান তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই নাই। কি আশ্চর্য্য যে বাঙ্গালী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বাঙ্গালী উকীল ইংরেজীতে বক্তৃতা করিয়া থাকেন। ইংরেজী শিক্ষা এখন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু তাই বলিয়া যে ইংরেজীর বর্ণজ্ঞান-শূন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে ব্যবহারকালেও সেই ভাষার শরণ লইতে হইবে তাহার কথা নাই। সংস্কৃত দায়ভাগ, মুসলমানী আইন কানুন ও ইংরেজী ব্যবহার-শাস্ত্র শিক্ষা করা অপরিহার্য্য, কিন্তু তাই বলিয়া সংস্কৃত, ফারসী কি ইংরেজীতে বক্তৃতা দিতে হইবে এবং সাক্ষীর জবানবন্দী তর্জ্জমা করিতে হইবে এ কথাতো সমর্থন করা যায় না। শাসক ও শাসিতের সঙ্গে পরস্পরের সহানুভূতি ও প্রীতির অন্যতম মূল-বন্ধন পরস্পরের ভাষাজ্ঞান। আমাদের ভাষা জানিলে— সাহিত্যপাঠে ও কথোপকথনে বিদেশী শাসন-কর্ত্তা আমাদের মনোভাব বুঝিয়া যতটা শ্রদ্ধা ও প্রীতিপরায়ণ হইবেন—আমরা যদি চিরকালই কৃত্রিম বুলি বলিয়া তাঁহাদের কাছে পশুপক্ষীর ন্যায় দুর্ব্বোধ হইয়া থাকি, তবে সে সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা আমরা তাঁহাদের কাছে কখনই পাইব না।

মহাত্মা লর্ড ওয়েলেসলী কর্ত্তৃক ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ অতি বড় সদুদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছিল।

এই দেশস্থ সিভিলিয়ানগণকে তাঁহাদের পদ পাইবার পূর্ব্বেই সেই পদে উন্নতি লাভ করিবার জন্য দেশী ভাষায় খুব শক্ত পরীক্ষাস্থলে স্বীয় স্বীয় গুণপনার পরিচয় দিতে হইত। তাঁহাদিগকে চারটিবার বিচারস্থলে উপস্থিত হইয়া দেশী ভাষায় তর্কবিতর্ক দ্বারা তাঁহাদের শাসিত প্রদেশের ভাষাজ্ঞানের প্রমাণ দিতে হইত। এই তর্কসভায় দেশীয় প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ, রাজগণ, বিদেশী রাজদূতেরা, মন্ত্রিগণ এবং বিশিষ্ট মুন্সী ও মৌলভিরা উপস্থিত থাকিতেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সিভিলিয়ানদের বাঙ্গলা ও ফারসীতে এই বিচার কলিকাতার বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর সমক্ষে হইত। এদেশের উচ্চকর্ম্মচারীদের কর্ম্মোন্নতি এই কলেজের অভিমতের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিত। এখানে বিদ্যার পরিচয় না দিয়া সমস্ত ভারতে কোন সিভিলিয়ানের পদ বা বেতনের উন্নতির সম্ভাবনা ছিল না। (No promotion was to be given in the public service throughout India in any branch of the service held by civilians except through the channel of this College."—Memoirs of Dr. Buchanan, Vol. I, p. 208.) এই কলেজে বড় বড় ইংরেজ অধ্যাপক ও দেশের পণ্ডিতগণের ভাব-বিনিময়, চিরস্থায়ী অন্তরঙ্গতা ও পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্দ্যের একটা বিশিষ্ট স্থান সৃষ্টি করা হইয়াছিল। সিভিলিয়ানদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পড়িতে হইত—(১) য়ুরোপের বর্ত্তমান কালের প্রধান প্রধান ভাষা, (২) ল্যাটিন, গ্রীক ও ইংরেজী প্রাচীন সাহিত্য, (৩) গণিত, (৪) ভূগোল, (৫) সাধারণ ইতিহাস, (৬) উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, (৭) রসায়নশাস্ত্র, (৮) জ্যোতির্ব্বিদ্যা, (৯) নীতিবিজ্ঞান, (১০) স্মৃতি, (১১) সমস্ত জগতের সংক্ষিপ্ত ব্যবহারশাস্ত্র, (১২) ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জন্য আরবী, পারসী, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গলা, তেলেগু, মহারাষ্ট্রী, তামিল এবং কেনারিজ প্রভৃতি

সাহিত্য, ভারতবর্ষের ও দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস। এই কলেজ রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম-ক্ষেত্রের একটা বড় বিভাগ ছিল এবং প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীরা অধ্যাপকদিগের সহিত সহযোগ করিয়া ইহা পরিচালনা করিতেন। ওয়েলেসলীর ইচ্ছা ছিল যে গার্ডেন রিচে একটা বড় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া কলেজকে সুপ্রোথিত করা—তাহাতে সমস্ত অধ্যাপকগণ থাকিবেন, ৫০০ ছাত্র থাকিবার ব্যবস্থা থাকিবে, তাহা ছাড়া একটি বৃহৎ পাঠাগার, বক্তৃতাশালা, ভোজনাগার এবং আনুষঙ্গিক গৃহাদি থাকিবে।

বহু উদারচেতা ইংরাজ এই মহৎ উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন। একটা কোম্পানী কর্ত্তৃক এত বড় সাম্রাজ্যের পত্তন হওয়ার ব্যপদেশে এমন মহৎ প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা আর কোথায়ও হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। ভারত সরকারের সঙ্গে এদেশের প্রধান প্রধান লোকের একটা মিলন-স্থল স্বাভাবিক ক্রমে এই ভাবে গড়িয়া উঠিলে বোধ হয় পরবর্ত্তী নানা রাষ্ট্রনৈতিক বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত না; প্রাক্কালেই মিলনের পথ সুগম হইলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে মতদ্বৈধ এরূপ উৎকট হইয়া দাঁড়াইত না।

এই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পরিপন্থী হইলেন মেকলে ও রাজা রামমোহন রায়। ১৮০০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৩৫ সন পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষায় প্রধানতঃ ইংরেজদের সহায়তায় যে অভূতপূর্ব্ব সাহিত্যিক প্রচেষ্টা হইয়াছিল—যাহাতে বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্য একরূপ গড়িয়া উঠিয়াছিল—তাহা মূলতঃ এই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উদ্যোগে।

মোগলাধিকারে বাঙ্গালী

মোগল রাজত্বেও দেখা যায় বাঙ্গলাদেশে প্রধান প্রধান যোদ্ধার অভাব হয় নাই। কিন্তু পাঠান আমলে হিন্দু রাজা ও অপরাপর ভূঞারাজগণ যেরূপ দিল্লীশ্বরের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছেন, মোগল-যুগে আকবর-প্রতিষ্ঠিত বিপুল সাম্রাজ্যের আওতায় পড়িয়া বাঙ্গলার সে সাহস ও বীর্য্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সাম্রাজ্যতন্ত্রী মোগলের তীব্র লক্ষ্য মুসলমান বাদসাহগণের উপর যেরূপ ছিল, ক্ষুদ্র নগণ্য পল্লীবীরের উপরও সেইরূপ ছিল,—সেই শ্যেন-দৃষ্টি এড়াইয়া কেহ কিছু ষড়যন্ত্র বা বিদ্রোহের উদ্যোগ করিতে সাহস পাইত না। আরঙ্গজেব অত্যন্ত সন্দিগ্ধমনা ছিলেন, পাছে কেহ দীর্ঘকাল একস্থানে থাকিয়া শক্তি সঞ্চয় করে, এজন্য তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগকে একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে দিতেন না। আরঙ্গজেব বলিয়া নয়, মোগল রাজত্বে এই সাম্রাজ্যতন্ত্র অল্প-বেশী সকল সম্রাটের রাজত্ব-কালেই দেখা যাইত। আরঙ্গজেবের সময়ে হিন্দুদিগের উপর অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচার চলিয়াছিল—সুতরাং সেই যুগে বাঙ্গালীরা কতকটা অসাড় ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। তথাপি মুসলমান নবাবদিগের অধীনে থাকিয়া ইহারা যুদ্ধবিগ্রহ করিতেন এবং অনেক সময়েই বিশ্বস্ততা-নিবন্ধন

বাদশাহগণের প্রিয়পাত্র হইতেন। গোলাম হুসেন দেখাইয়াছেন যে, আরঙ্গেব তাঁহার নানা প্রকার অত্যাচারের অনুমোদনে গোঁড়া মৌলভীদিগের নিকট উৎসাহ পাইতেন। তাঁহার কাফের-দলনের সদিচ্ছার জন্য ইহারা তাঁহাকে নিরন্তর "বিশ্বাসী সম্রাট্" (Faithful Emperor) "সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয়" (The cherisher of religion) ইত্যাদি উপাধি দিয়া স্তোক-বাক্য বলিতেন, ফলতঃ ইঁহাদের দ্বারা দেশের ঘোর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল। আরঙ্গেবের শত্রুরাও বলিতে বাধ্য যে, তিনি অতি দৃঢ়হস্তে শাসন করিতেন, সুতরাং তৎকৃত অন্যায়গুলিদ্বারাও দেশের শাসনযন্ত্র শিথিল হইতে পারে নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী সম্রাট্গণের অর্থগৃধ্নুতা এবং শক্তিসামর্থ্যের অভাবে দেশ উত্তরোত্তর ধ্বংসের মুখে চলিতে লাগিল; যাঁহারা আইনজ্ঞ ও সুবিচারক তাঁহারা ক্রমশঃ হটিয়া গেলেন এবং নিতান্ত দুষ্টচরিত্র লোকেরা সিংহবিক্রমে প্রজাপীড়ন আরম্ভ করিয়া দিল। ("At last the office of the Cazy or Judge and that of Sadar or great Almoner, with many other Magistratures came to be publicly put up to sale, so that the people skilled in law and in distributive justice, entirely disappeared from the land; nor was anything else thought of, but how to bring money to hand by any means whatever." (Mutakharin, Vol. III, p. 160.) বাঙ্গলাদেশে এই অর্থগৃধ্নুতার ফলে হিন্দু জমিদারদিগের জন্য 'বৈকুণ্ঠের' ব্যবস্থা হইতে সেই অত্যাচার কতক পরিমাণে বুঝা যাইবে—সামান্য হিন্দু প্রজারা যে কত সহিয়াছিল, তাহা না বলাই ভাল। মোগলের সাম্রাজ্যতন্ত্র অর্থকেই মূলমন্ত্র করিয়া সমস্ত প্রদেশে এই বিষের আওতা প্রসারিত করিয়াছিল।

সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বের অব্যবহিত পূর্ব্বেও হিন্দুরা সাংসারিক ব্যাপারে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বাধীন হইবার প্রচেষ্টা অবশ্যই নিরস্ত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা শৌর্য্যেবীর্য্যে তখনও বঙ্গেশ্বরগণের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন; দেওয়ানী বিভাগে —বিশেষতঃ রাজস্বসম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যে—তাঁহারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। গুণপনা দেখিয়া নবাবেরা জাতি বা ধর্ম্ম গ্রাহ্য না করিয়া ইঁহাদিগকে উচ্চতম পদ দিয়াছিলেন। মোগল ও পাঠান উভয় জাতির মধ্যে যেরূপ অবিশ্বাস ও কৃতঘ্নতার দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিতে দেখা যায়, হিন্দুদিগের মধ্যে সেইরূপ বিশ্বাসের অভাব কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শুধু সিরাজের সর্ব্বনাশসাধনে কয়েকজন হিন্দু বড়লোক মুসলমান-চক্রীদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। মুসলমানের অধিকার-বিলোপের পর সেই সকল বিক্রান্ত ওমরাহ ও নবাব কোথায় গেলেন? বঙ্গদেশের জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের তালিকায় তাঁহারা মুষ্টিমেয় হইয়া পড়িলেন। শত অত্যাচারেও হিন্দু স্বীয় চরিত্রবল বজায় রাখিয়াছেন, এজন্যই তাঁহারা এপর্য্যন্ত টিকিয়া আছেন, অন্য কোন জাতি হইলে ভীষণ অত্যাচারের ফলে হয় তাঁহারা বিজেতাদের সঙ্গে মিশিয়া তাঁহাদের নিয়স্তরে কোনরূপে বাঁচিয়া থাকিবার একটা অবকাশ করিয়া লইতেন, নতুবা নির্ম্মূল হইয়া যাইতেন। কতক পরিমাণে [illegible] [illegible] হইয়াও আজও বঙ্গে হিন্দুরাই প্রবল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও আমরা বহু হিন্দুকে শাসন-বিভাগের শেখরদেশে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। ঢাকার দেওয়ান যশোবন্ত রাও নবাব সরফরাজ খাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন। তিনি এই সময়ের ইতিহাসে এক প্রসিদ্ধ চরিত্র। সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভের ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তি পূর্ব্ববঙ্গে প্রবাদবাক্য হইয়া আছে। তাঁহার রাজধানী রাজনগরের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিরাশি—দোলমঞ্চ, নবরত্ন, একুশরত্ন প্রভৃতি বহু হর্ম্ম্য কীর্ত্তিনাশার অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে—এই সময়ে প্রধান মন্ত্রী দুর্লভরামের ভ্রাতা রাসবিহারী পূর্ণিয়ার ফৌজদার নিযুক্ত হইয়া কর্ম্মকুশলতা দ্বারা নবাবের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং ঐ নবাবের (সকৎজঙ্গ) অন্যতম প্রিয়পাত্র কায়স্থ শ্যামসুন্দর তাঁহার কামান ও অস্ত্রশস্ত্র-বিভাগের কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সময়ে সকৎজঙ্গ তাঁহার মুসলমান সেনাপতিদিগকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা থামের মত দাঁড়াইয়া কি করিতেছ? দেখ্‌ছ না হিন্দু শ্যামসুন্দর অগ্রগামী হইয়া কেমন যুদ্ধ করিতেছে।" একথা পূর্ব্বে একবার লেখা হইয়াছে। রাজা রামনারায়ণ ও সুন্দরসিংহ পূর্ণিয়া ও মুরসিদাবাদের যুদ্ধবিগ্রহে প্রধান কর্ম্মিরূপে নবাবদের অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। মুতক্ষরিনে ইঁহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা উল্লিখিত আছে। আলমচাঁদ রায়রাঁয়ার পুত্র দেওয়ান রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র রায়-রাঁয়া নবাবের রাজস্ব-বিভাগের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। জগৎ শেঠ ও বর্দ্ধমান রাজার এককোটী কয়েক লক্ষ টাকার হিসাব আলিবর্দ্দীর দপ্তরে বহুদিন যাবৎ চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, উহার অস্তিত্বও নবাব সরকারে বিস্মৃতির সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল। কীর্ত্তিচন্দ্র এই হিসাব ধরাইয়া দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া আলিবর্দ্দীর রাজভাণ্ডারে প্রদান করেন। এই কার্য্যের জন্য তাঁহার খুব সুখ্যাতি হইয়াছিল। দুর্লভরাম রাজস্ব-বিভাগে আলিবর্দ্দীর সরকারে অনেক ভাল কাজ করিয়াছিলেন এবং ইঁহার অসামান্য যোগ্যতার জন্যই ইনি প্রধান মন্ত্রীর পদ পাইয়াছিলেন। তরুণবয়স্ক মোহনলাল সিরাজের সর্ব্ববিষয়ে প্রধান মন্ত্রীর উপর কর্ত্তৃত্ব চালাইতেন,—দুঃসহ অভিমানে দুর্লভরাম সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছিলেন; মুতক্ষরিনে লিখিত আছে, মোহনলাল পলাশীর ক্ষেত্রে বন্দী হইয়া ইঁহারই করতলগত হইয়া নিহত হন। পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা, আলিবর্দ্দীর জামাতা, ঘেসেটি বেগমের স্বামী নবিসমহম্মদ খাঁন দয়াদাক্ষিণ্যের অবতার ছিলেন। তিনি মাসিক ৩৭ হাজার টাকা জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিচারে গরীব, বৃদ্ধ ও দুঃস্থদিগের মধ্যে দান করিতেন, তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন আজীব রায়, এই বিশ্বাসী দেওয়ানের সহযোগে পুণ্যবান্‌ নবাব সর্ব্বজন-প্রিয় আদর্শ-নৃপতি হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের রাজার দেওয়ান মাণিকচাঁদকে নবাব ৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ও ২০০০ পদাতিকের নেতৃত্ব প্রদান করিয়া সেই দুর্গরক্ষার ভার দিয়া চলিয়া যান। এই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যসময়ে আরও বিস্তর হিন্দুরাজকর্ম্মচারীর কথা মুসলমান ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন, ইঁহারা শান্তিপ্রিয় হইলেও রণক্ষেত্রে সিংহবিক্রান্ত ছিলেন। আলিবর্দ্দী যখন মহারাষ্ট্রাদের হাতে পড়িয়া দুর্গতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, তখন এক বঙ্গপ্রদেশের হিন্দু রাজা তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়া ভ্রম-

বশতঃ বিপথে লইয়া গিয়াছিলেন, এই ব্যাপারে তিনি এতদূর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিলেন যে তিনি নিজের তরবারি দ্বারা আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। সীতারাম রায় নামক এক হিন্দু কর্ম্মবীর, অতি অল্পবেতনের কর্ম্মচারীর পদ হইতে আজিমগঞ্জের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি হইয়াছিলেন। ইংরেজের পক্ষ হইয়া ইনি ফরাসীদের সঙ্গে যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ও তদীয় সেনানীদিগের সাহস ও রণকৌশলের ভূয়সী প্রশংসা গোলাম হসেন করিয়াছেন (মুতক্ষরিন, ১৫০ পৃঃ, দ্বিতীয় খণ্ড)। ইনি ক্লাইভকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া রাজনৈতিকক্ষেত্রে অমিত প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহার দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণের কথা মুতক্ষরিনে বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। ইনি আজিমগঞ্জ ফলফুলের বাগানগুলির উন্নতিসাধন ও সাধারণকে বিনা ব্যয়ে তাহাদের উৎপন্ন ফলভোগ করিবার সুবিধাজনক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমরা সুন্দরসিংহের কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ইনিও সেই যুগের একজন সর্ব্বজনবিদিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এক নর্ত্তকীর পুত্র গোলাম খোউস্ ইঁহারই প্রাসাদে বড় হইয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক ইঁহাকে নিহত করেন। বিহারের শাসনকর্ত্তা আলিবর্দ্দীর অতি-বিশ্বস্ত জানকীরামের নামও এখানে উল্লেখযোগ্য। এখানে বলা উচিত বঙ্গদেশের এই যুগে কায়স্থগণই অধিকাংশ সময়ে বড় বড় রাজ-পদবী ও সমরকুশলতার খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

কায়স্থ জাতি।

ক্লাইভ ও মীরজাফর যখন সিরাজের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া পরস্পরের বখরার টাকা গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন নবাবের অন্তঃপুরে যে বিরাট্ ধনাগার লুকায়িত ছিল তাহার সন্ধান ক্লাইভ পান নাই। কথিত আছে নগদ আটকোটী টাকা ও বহু মণিমুক্তা ও জহরৎ রাজ-অন্তঃপুরে ছিল। মীরজাফর ও লাভকৃষ্ণ নামক ক্লাইভের এক দেওয়ান এই টাকা আত্মসাৎ করেন। লাভকৃষ্ণ ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে ৬০ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেন। ইঁহার দশবর্ষ পরে মরিবার সময়ে তিনি নগদ ৭২ লক্ষ টাকা, ১৮ লক্ষ টাকা মূল্যের জমিজমা ও ৪০০ শত প্রকাণ্ড ঘড়া প্রভৃতি রাখিয়া যান। এই ঘড়াগুলির ৮০টির মধ্যে খাঁটি সোনার মুদ্রা ও বাকী ৩২০টিতে রৌপ্য-মুদ্রা ছিল।

ক্লাইভের প্রধান মন্ত্রী (দেওয়ান) ছিলেন রামচাঁদ। আমি শুধু নবাবের কর্ম্মচারীদেরই কথা এখানে বলিলাম। রাজাদের কথা বলিবার অবকাশ এখানে নাই। এই কাহিনী পড়িলে স্বতঃই মনে হইবে, স্বাধীনতা-হারা হইলেও হিন্দুগণ রাজসরকারে সম্মানিত সমস্ত পদই প্রাপ্ত হইতেন। ধর্ম্মের বাধা থাকিলেও অধিকাংশ বড় কর্ম্মচারীরাই হিন্দু ছিলেন, এবং ধনৈশ্বর্য্যে জগৎ শেঠ শুধু ভারতবর্ষে নহে, সমস্ত জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। প্রত্যেক যুদ্ধেই আমরা হিন্দু সেনাপতিদের শৌর্য্যবীর্য্যের কথা পাইতেছি এবং মুসলমান ঐতিহাসিকগণই ইহা কহিয়া গিয়াছেন। হিন্দুর ইতিহাস হিন্দুরা লিখেন নাই, হিন্দুর কথা হিন্দু নিজে কহেন নাই। তথাপি অনেক বাদ দিয়া বিদেশী বা এদেশীয় লোকেরা যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতেও চক্ষু ঝলসিয়া যায়। এই সময়ে ... ... নবাব দাউদ খাঁর এক হিন্দু স্ত্রী ছিলেন। রাজমহিষী যখন পূর্ণগর্ভা তখন নবাব মৃত্যুমুখে পতিত হন।

স্ত্রী সহমরণ যাওয়ার জন্ত উতলা হইয়া পড়েন, কিন্তু এখনতো তিনি রাজকুমারী [illegible]ও মুসলমান নবাবের পত্নী—বেগম। স্বামিদত্ত একখানি ছোরা তাঁহার ছিল। তিনি [illegible]নলে উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু সেই ছোরা দিয়া স্বয়ং অতি কৌশলে স্বীয় গর্ভ বিদীর্ণ করিয়া গর্ভস্থ শিশুকে ধাত্রীর হস্তে দিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য মিনতি করিয়া শান্ত সমাহিতভাবে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইলেন। স্থির মস্তিষ্কে এমন কাজ জগতে হিন্দুমহিলা ভিন্ন কে করিতে পারিত? মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা প্রণীত রাজাবলীতে পৌরাণিক এক রাজসীমন্তিনী সম্বন্ধে এইরূপ একটি উপাখ্যান পড়িয়াছিলাম। ধার-রাজ-কন্তা স্বীয় স্বামী গন্ধর্ব্বসেনের মৃত্যুতে শোক-কাতরা হইয়া "তীক্ষ্ণধার এক ছুরি লইয়া আপনার পেট চিরিয়া ফেলিলেন, তৎক্ষণাৎ রাজকন্তার প্রাণবিয়োগ হইল। বালক অক্ষত দেহে গর্ভ হইতে নির্গত হইল।" মুতক্ষরিনে লিখিত আছে :—
"Daud Khan (of Ahamadabad) had left a consort by whom he was tenderly loved. She was the daughter of a zemindar or great landlord of that kingdom where it was a standing rule, that some of these gentoo (Hindu) Princes should give their daughters to the viceroy in being. This lady who had been initiated in the Musalman religion, on her entrance into the seraglio, was now pregnant and seven months gone with the child and she had entreated for the liberty of following her husband of whom at his departure, she had obtained his poignard, as a token of his love. The news of his death in the middle of a victory having now reached Ahamadabad, she took the poignard, and opening her own belly with a precaution and dexterity that amazed everyone, she carefully drew out the child and tenderly recommended it to the by-standers, after which few words, she expired." (Mutakharin, Vol. I, p. 96.) এই আহম্মদাবাদের হিন্দুরমণীর সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত সতীর নাম করা যাইতে পারে। আমরা খাস বাঙ্গলাদেশের আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব—ইনি বর্দ্ধমানের সুন্দরী রাজকন্তা। ইনি শোভা সিংহকে যে ভাবে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে। শোভা সিংহ বৰ্দ্ধমান আক্রমণ করিয়া রাজা কৃষ্ণরামকে হত্যা করেন, রাজ-হন্তা, মহাক্ষমতাশালী শোভা সিংহ রাজকুমারীর প্রেমপ্রার্থী হইয়া তাঁহার শয্যাগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক অনেক অনুনয়বিনয় করেন, তৎপরে বলপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিতে গেলে—["she drew from under her garment a knife which she had concealed in hopes of finding an opportunity to gratify her revenge. With this weapon she ripped up his belly." ("Narrative of the Govt. of Bengal" by Francis Gladwin, 1788, pp. 5-8.] রাজকুমারী প্রতিহিংসা লইবার জন্ত যে শাণিত ছুরিকাখানি বস্ত্রাঞ্চলে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা শোভা সিংহের পেটে বিঁধিয়া দিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন।